রাজনৈতিক সংকট
ও
জনতার দৃষ্টিপাত

(POLITICAL CRISIS AND PEOPLE'S LOOK)

এস, এম, হাবিবুর রহমান

রাজনৈতিক সংকট
ও
জনতার দৃষ্টিপাত

**(POLITICAL CRISIS
AND
PEOPLE'S LOOK)**

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজনৈতিক সংকট
ও
জনতার দৃষ্টিপাত

(POLITICAL CRISIS
AND
PEOPLE'S LOOK)

এস, এম, হাবিবুর রহমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায় ঃ পুঁথি সাহিত্য
৩৮, বাংলা বাজার
ঢাকা - ১১০০।

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখকের।

প্রাপ্তিস্থান ঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার
ঢাকা - ১১০০।

কম্পোজে ঃ স্পার্ক কম্পিউটারস
৩৮, বাংলাবাজার (২য় তলা)
ঢাকা - ১১০০।
☎ ২৪ ৪০ ২৯, ২৪ ৮৪ ২০

মুদ্রণে ঃ তাওয়াক্কাল প্রেস
১০, নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা - ১১০০।

বাঁধাইয়ে ঃ দেশবিদেশ বাইণ্ডার্স
সূত্রাপুর, ঢাকা - ১১০০।

মূল্যঃ ১৩০.০০ (এক শ ত্রিশ) টাকা মাত্র।

POLITICAL CRISIS AND PEOPLE'S LOOK written by S. M. Habibur Rahr

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যে, তিনি আমার দ্বারা গ্রন্থটি রচনা করিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে, যাঁরা আমাকে গ্রন্থটি রচনা করতে দেখেছেন তাঁরা দু'টি প্রশ্ন করেছেন। গ্রন্থটি কেউ পড়বে কি? এটাতে লিখিত কথাগুলোর প্রতিফলন ঘটবে কি? তাঁরা এঅভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, রম্যরচনা, জীবনী, ইতিহাস ইত্যাদির প্রতিই পাঠকদের ঝোঁক বিধায় তাঁরা গ্রন্থটির প্রতি না–ও ঝোঁকতে পারেন। আমার ধারণা যাঁরা দেশের সঠিক বিষয়াদি ও সমস্যাবলী নিয়ে ভাবছেন তাঁরা তাঁদের ভাবের বাস্তবমুখী খোরাকের জন্যে গ্রন্থটি পড়বেন। গ্রন্থটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা করার সময় যিনি এটার যেঅংশটুকু পড়েছেন তিনি আমাকে সে আলোকে দেখেছেন। তাঁরা সবাই আমাকে একদৃষ্টিতে দেখেন নেই। এটা একান্তভাবে তাঁদের ব্যাপার। আমি আমার চাক্ষুষ ও কর্মময় তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রন্থটি রচনা করেছি। এটাতে প্রতিটি বিষয় সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে। তবে, সব বিষয় সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। একেক বিষয় একেক জনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একাধিক বিষয়ও একজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। তাই, বিষয়বস্তুগুলোর সার্বজনীনতার কারণে কেউ ক্ষিপ্ত হবেন না বলে আশা করছি। গ্রন্থটিতে জনতার দৃষ্টিপাতের আলোকে সংকট নিরসনের উপায়ও উল্লেখ করেছি। হে আল্লাহ্‌ ! আপনার জমিনে আমাদের এ প্রিয় দেশটির, সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবেশে, সার্বিক উন্নতির ও মঙ্গলের জন্যে আমার দ্বারা আপনার লিখানো গ্রন্থটির বাস্তব প্রতিফলন কুবল করার নিমিত্ত আপনার নিকট কায়মনোবাক্যে যাচনা করছি।

—গ্রন্থকার

তাওহীদী বাড়ী,
৩৫/১, মধ্যপাইকপাড়া,
মিরপুর,ঢাকা–১২১০।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ক

রাজনৈতিক সংকট আপনা-আপনি সৃষ্ট হয় না। এটা সৃষ্টি করা হয়। তবে, এটা কারা সৃষ্টি করে? রাজনীতিবিদেরাই এটা সৃষ্টি করে। যেসব রাজনীতিবিদ সুবিধাবাদী এবং বুঝে যে, ক্ষমতার মুখ না-ও দেখতে পারে তারাই সাধারণত নিপুণভাবে ও কৌশলে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে থাকে। ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে যেমন সুবিধা রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে নানাবিধ স্বার্থসিদ্ধিসংক্রান্ত কর্মসম্পাদন করতে তেমনি সুবিধা। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এধরনের রাজনীতিবিদেরা সবার শত্রু। কোন ভালো লোক জেনেশুনে কোন সংকট বা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না, কেননা সে জানে যে, কোন সৃষ্ট সংকটের বা সমস্যার পরিণতি কারো জন্যেই শেষপর্যন্ত শুভ হয় না। রাজনীতিবিদেরা ভালো হলে তারা সংকট বা সমস্যা নিরসনের জন্যে কাজ করবে, সংকট বা সমস্যা সৃষ্টির জন্যে ফাঁক খুঁজবে না। সরকার রাষ্ট্রপরিচালনা করে। প্রকৃতপক্ষে, তারাই সরকার যারা ক্ষমতাসীন। সাধারণত, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতি করেই ক্ষমতাসীন হতে হয়। তাই, রাজনীতিতে সংকট সৃষ্ট হলে তা সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু আনুষঙ্গিক সংকট সৃষ্ট হয়। এসব সংকট হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, শিক্ষাসম্বন্ধীয়, অপরাধমূলক, দুর্নীতিমূলক, আইনগত, শান্তিশৃঙখলাজনিত ইত্যাদি। রাজনৈতিক সংকট বিদ্যমান থাকলে অন্যান্য সংকট জনগণের আশাআকাঙক্ষা অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে নিরসন করা যায় না, কেননা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কোনকিছুকে নিয়মমাফিক স্থিতিশীল হতে দেয় না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাই রাজনৈতিক সংকট যৎপরোনাস্তিভাবে নিরসন করতে পারে। এসংকট নিরসিত হলে অন্যান্য সংকট থাকে না এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান থাকে বিধায় দেশ উন্নত ও রাজনৈতিক পরিবেশ কলুষমুক্ত হয়। প্রায়সব রাজনীতিবিদই দেশের, এলাকার ও জনগণের খেদমতের দোহাই দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। কিন্তু, বাস্তবে তারা নিজেদের ভাতাবৃদ্ধির, পেনশন চালু করার ও নানাবিধ সুযোগসুবিধা সৃষ্টির জন্যে ব্যতিব্যস্ত থাকে। তারা স্বাভাবিকভাবে তাদের স্বস্ব নির্বাচনী এলাকার জনগণের পাশাপশি না থেকে নিজেদের স্বার্থের পেছনে ধাবিত হয়। এধরনের রাজনীতিবিদেরা, যাদের কথার ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, কখনো দেশের, এলাকার ও

www.pathagar.com

জনগণের মঙ্গলসাধন করতে পারে না। এরা প্রতারক ও প্রবঞ্চক। সত্যিকারের রাজনীতিবিদেরা কখনো প্রতারক ও প্রবঞ্চক হতে পারে না। তারা তাদের ওয়াদা অনুযায়ী জনগণের কাজে সবধরনের কষ্টক্লেশ সহ্য করে। প্রকৃতপক্ষে, তারা হয় জনগণের সেবক ও বন্ধু। রাজনীতির নামে একশ্রেণীর লোক সুযোগ পেলেই অগাধ সম্পদের অধিকারী হয়। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে আমরা সচরাচর প্রত্যক্ষ করছি যে, বিভিন্নভাবে রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ ছিটিয়েছড়িয়ে ক্ষমতালাভ করা, ক্ষমতায় থাকলে তা মজবুত করা এবং কোন কারণে একবার ক্ষমতা চলে গেলে তা পুনরুদ্ধার করার জন্যে প্রাণপাত করে সংগ্রাম করা। যেসব রাজনীতিবিদ এধরনের উদ্দেশ্যে রাজনীতি করে তারা দেশের সেবক ও জনগণের বন্ধু হতে পারে না। তারা দেশ ও জাতিকেন্দ্রিক নয়, আত্মকেন্দ্রিক। মহৎ ও সৎগুণসম্পন্ন রাজনীতিবিদেরা আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে দেশ ও জাতিকেন্দ্রিক হয়।

যেসব রাজনীতিবিদ মানসিক ও চৈত্তিক অস্থিরতাতে ভোগে তারা বুঝে ওঠতে পারে না যে, তারা কোন্ কর্মসূচি গ্রহণ করবে। তারা নিজেদের স্বার্থে সুবিধা বুঝে দল পাল্টাতে থাকে এবং ভেতরেভেতরে তাদের মূল দলের সাথে সম্পর্ক বজিয়ে রেখে চলে। তারা যেদলে যোগদান করে সেটাতে টিকে থাকার ও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে জনগণের দিব্যদৃষ্টিতে নিকৃষ্টভাবে তোষামোদকারী, চাটুকার, স্তাবক ও মোসাহেব হতে কোনপ্রকার দ্বিধাসংকোচ করে না। এসব রাজনীতিবিদকে জনগণ নীতিহীন ও স্বার্থপর হিসেবে চিহ্নিত করে। ক্ষমতার ও ব্যক্তিস্বার্থের মোহে তারা এচিহ্নকে চিহ্নই মনে করে না, বরং তারা তাদেরকে খুব বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী মনে করে। তারা দেশ ও জনগণের কোন কল্যাণ সাধন করতে পারে না। তারা বিদেশী চক্রের চেয়েও জঘন্যতম, কারণ তারা দেশের ভেতরে থেকেই দেশের ক্ষতি করতে থাকে। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রানুযায়ী সব ক্ষমতার উৎস জনগণকে অবদমন করে শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা অনেককিছু করা এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়া ও তাতে সাময়িকভাবে হলেও টিকে থাকা যায়। তাই, দেখা যায় যে, বাস্তবে, এক হিসেবে, জনগণ ক্ষমতার উৎস নয়, শক্তিপ্রয়োগই ক্ষমতার উৎস। এজন্যে শক্তিধর হবার একটি প্রকটিতভাব রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু, সত্যব্রত ও সত্যানুরাগী রাজনীতিবিদদের এটা স্বভাবধর্ম হতে পারে না। বাস্তবে আমরা দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ রাজনীতিবিদ পাচ্ছি না বলেই রাজনৈতিক সংকটের আবর্তে ঘোরপাক খাচ্ছি এবং দেশের মঙ্গলের ও

www.pathagar.com

অগ্রগতির নামে কোন্দল, আন্দোলন, বিপ্লব, বাকযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, হরতাল ইত্যাদিতে লেগে আছি। প্রত্যেক রাজনীতিবিদ কথায় ও বক্তৃতায় বলে যে, জনগণ তার পক্ষে আছে। বাস্তবে জনগণের মধ্যে সবাই কি তার পক্ষে? প্রকৃতপক্ষে, জনগণের মধ্যে সবাই তার পক্ষে নয়। রাজনীতিবিদদের এটা একটা কথার কথা। ফলে, একটা মিথ্যাকথা। জনগণ রাজনীতিবিদদেরকে এরকম মিথ্যাকথা বলার ছাড়পত্র দেয়নি। যে রাজনীতিবিদকে যারা সমর্থন দেয় সে বলতে পারে যে, তারা তার পক্ষে আছে। তাই, প্রত্যেক রাজনীতিবিদ কথা বলার ও বক্তৃতা করার সময় বলতে হয় যে, জনগণের মধ্যে যারা তার পক্ষে আছে। জনগণের পক্ষে কোন রাজনীতিবিদ এমনকোন কথা বলা উচিত হবে না যেটা তাদের মধ্যে যারা শুনলে ভাববে যে, তারা কখনোতো তাকে এরকম অধিকার দেয়নি। বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্নভাবে দেশের সমস্যাদির কথা তুলে ধরা হয় এবং সেগুলো সমাধানের উপায়ো উল্লেখ করা হয়। রাজনীতিবিদদেরকে, বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে, দেশের বিভিন্ন সমস্যা জেনে সেগুলোর সমাধানকল্পে কাজ করে যেতে হয়। একজন লোকের পক্ষে একাকী সব সমস্যা জানা এবং সেগুলোর যথাযথ সমাধান করা বা দেয়া সর্বসময় সম্ভবপর নয়। প্রত্যহ সব পত্রিকা পড়লে মোটামুটিভাবে সমস্যাদি জানা যায় এবং সেগুলো সমাধানকল্পে চিন্তাভাবনার খোরাক পায়া যায়। ব্যস্ত ব্যক্তিরা হয়তো বলবে যে, সময়ের অভাবে এটা সম্ভব নয়। তবে, এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আবশ্যিকভাবে সময় করে নেয়াটা প্রয়োজন। এটাও বলা যেতে পারে যে, এ জাতীয় তথ্য সংগ্রহ করে সরকারের গোচরীভূত করার জন্যে সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছে। সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের এদায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে পালন করে বলে মনে হয় না। নিজেরা নিয়মিতভাবে পত্রপত্রিকা পাঠ করলে সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষও সুনির্দিষ্টভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে কোনপ্রকার গাফিলতি প্রদর্শন করতে পারেনা।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও বিষোদ্গার করছে। একদলের কর্মী ও সমর্থকরা অপরদলের কর্মী ও সমর্থকদের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তাদের এলড়াই মোরগ ও ষাঁড়ের লড়াইতে রূপান্তরিত হতে পারে। মোরগ ও ষাঁড়ের লড়াই মানুষ যেভাবে উপভোগ করে তাদের এলড়াইও তারা সেভাবে উপভোগ করবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানবৃদ্ধি, দারিদ্রবিমোচন ও দেশোন্নয়ন সম্ভব হয় না। রাজনৈতিকি

www.pathagar.com

স্থিতিশীলতা নির্ভর করে রাজনীতিবিদদের ওপর। তাই, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানবৃদ্ধি, দারিদ্রবিমোচন ও দেশোন্নয়ন না হয়ার জন্যে রাজনীতিবিদেরাই দায়ী এবং যেসব রাজনীতিবিদ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণ তারা কোনভাবেই তাদেরকে দেশের মিত্র বলে দাবি করতে পারে না। কখনোকখনো কোনকোন রাজনৈতিক নেতা যে রাজনৈতিক দলে থাকে তা ত্যাগ করে নিজেরাই অন্য একটি দল গঠন করে ফেলে। নেতাদের স্বার্থ, মতভেদ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে এটা হয়ে থাকে। যেসব নেতা একই দলে থেকে স্বস্ব স্বার্থে কাজ করে এবং মতভেদ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে লিপ্ত হয় তাদের মুখে দেশ ও জনগণের কথা ফাঁকাবুলি ব্যতীত অন্যকিছু নয়। তারা শুধু স্বার্থের পেছনে ছোটে এবং একদিকে স্বার্থহানি হলে বা স্বার্থে আঘাত লাগলে অপরদিকে ধাবিত হয়। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে বা রাজনৈতিক দল সৃষ্টির দ্বারা এধাবন সহজতর হয়। তাই, বর্তমানে আমাদের দেশে এতো রাজনৈতিক দল। রাজনীতির নামে রাজপথে রাজনৈতিক দলগুলোর হরতাল, ঘেরাও, পদযাত্রা, শোভাযাত্রা, মিছিল, আন্দোলন ইত্যাদিতে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এগুলো রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীদের নিকট খেলার মতো। তারা খেলে আনন্দ পায় আর জনগণ দিশেহারা হয়ে পড়ে। রাজনীতিবিদদের যেসব খেলায় জনগণ দিশেহারা হয়ে পড়ে ও দেশের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয় সেসব খেলা তারা না খেলাটাই জনহিতকর এবং রাজনীতি শব্দটি উচ্চারিত হয়ার সাথেসাথে মানুষের অন্তর ও মস্তিষ্কে যেউচ্চানুভূতির স্পন্দন সৃষ্ট হয় সেটার কার্যকারিতার পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি খেয়াল রেখে কথা বললে ও কাজ করলে সামগ্রিক কাজ সম্পাদিত না হয়ে চাপা পড়ে যায়। এতে মিথ্যাকে সত্যে ও সত্যকে মিথ্যায় রূপান্তরিত করা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এবিষয়টি পরিষ্কার করছি। কোথাও ঈদ-উল-আজাহার পূর্বে কোরবানির জন্যে পশুবিক্রির হাট বসেছে। যেকোন কারণে সেহাটে দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে এবং গোলাগুলিও চলছে। পুলিসকে এধরনের গোলাগুলি স্তব্ধ করতে হলে প্রয়োজনে গোলাগুলি করেই সম্মুখবর্তী হতে হয়। তা না হলে গোলাগুলিতে তাদেরো প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকে। তবে, এক্ষেত্রে তারা গোলাগুলি করলে নিরীহ লোকজন ও বোবা পশু মারা যেতে পারে। সর্বোপরি, তাদেকে এপরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হচ্ছে। এমতাবস্থায়, তারা হাটটিতে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করায় বিবদমান দল দু'টি ও লোকজন তা ত্যাগ করেছে। যারা শুধু নিজেদের স্বার্থে

www.pathagar.com

বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করছে তারা বাস্তব ঘটনাটি উল্লেখ না করে খবরের কাগজে বক্তৃতার মাধ্যমে ফলাও করলো যে, পুলিস কোরবানির জন্যে পশুবিক্রির হাটে বোবা পশুর ওপর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে বর্বরোচিত কাজ করেছে। এক্ষেত্রে সত্যবিষয়টি মিথ্যা এবং মিথ্যাবিষয়টি সত্য হয়ে গেছে। জনগণের মধ্যে যারা বিষয়টি নিয়ে না ভাববে বা বিশদভাবে জানতে চেষ্টা না করবে তারা এটা ভেবে ক্ষুব্ধ হবে যে, পুলিস কি করে এমন বর্বরোচিত কাজ করতে পারলো। যেরাজনীতিবিদ এভাবে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তুলতে চেষ্টা চালায় সে যে ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতি করে তা কারো বুঝতে বাকি থাকার কথা নয়। এধরনের রাজনীতি বাস্তবিকই হীন রাজনীতি। যেখানে রাজনীতি হীনম্মন্যতা পরিহার করতে শিখায় সেখানে যারা তাতে হীনম্মন্যতার বীজ বপন করে তারা জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ই।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন দল ক্ষমতায় যাবার সম্ভবনা না থাকলে তা বুঝা যায়। নিজেরা ক্ষমতায় যেতে পারবে না বলে যারা ক্ষমতায় থাকে তাদেরকে স্থিতিশীল পরিবেশে কাজ করতে না দেয়াটা জনকল্যাণমূলক রাজনীতির পরিপন্থী। নিজেদের ব্যর্থতা অন্যান্যকে ব্যর্থ করে ঢাকার প্রচেষ্টা সৃষ্টির সেরা মানবকুলের মাঝে অকল্পনীয় ও অচিন্তনীয়। কোন্ রাজনৈতিক দল কি চায় এবং তাদের চিন্তাধারা কি ওসব জনসাধারণ তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকলাপ থেকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। যেদলের কথাবর্তা ও ক্রিয়াকলাপ গঠনমূলক নয় এবং যেদল সমস্যার নিয়মতান্ত্রিক সমাধানে না গিয়ে বিভিন্ন মারপ্যাঁচে সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি করাতে তৎপর সেদল কালক্রমে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সত্যিকারের রাজনীতিবিদ হতে হলে এরকম হীন মনোভাব পরিহার করে চলতে হয় যে, রাজনীতিতে নিজের জন্যে সুবিধাজনক পরিসর সৃষ্টি করা যায় না বিধায় নানাপ্রকার ছলছুতার দ্বারা ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট করবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে কখনো একপক্ষের বা একদিকের এবং কখনো দু'পক্ষের বা দু'দিকের ভূমিকা এসে যায়। একপক্ষের বা একদিকের ভূমিকাতেও পরোক্ষভাবে হলেও অপর একপক্ষের ভূমিকা থাকে। এককথায়, সেপক্ষটি বা দিকটি হচ্ছে সরকার। কারো ন্যায়সংগত কাজ করে দিয়ে বা করায়ে তাকে সন্তুষ্ট করাটা একটি উৎকৃষ্টতম পন্থা। কিন্তু, কাকেও সন্তুষ্ট করার জন্যে

www.pathagar.com

বা কারো সন্তোষ অর্জনের জন্যে অন্যায়ভাবে কাজ করাটা বা করিয়ে নেয়াটা একটি নিকৃষ্টতম বা ঘৃণ্যতম ব্যাপার। অন্যায়ভাবে বা বেআইনীভাবে একপক্ষের কাজে বিশেষতঃ সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। অথচ, যারা একাজ করে তাদেরই দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের স্বার্থরক্ষা করা, কেননা সরকারী কাজে নিয়োজিত না থাকলে সাধারণত একাজ করা সম্ভব হয় না। যেক্ষেত্রে দু'পক্ষ থাকে সেখানে উভয় পক্ষই সত্যিকারার্থে ন্যায়ের জন্যে হলে তাদের কাজ তারা নিজেরাই আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে সুসম্পন্ন করতে পারে। অপরদিকে, দু'পক্ষের মধ্যে একপক্ষ ন্যায়সংগতভাবে এবং অপরপক্ষ খামখেয়ালীভাবে প্রতিকার চেলে যেকোন কারণে অপরপক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্যে কাজ করলে ন্যায্যতা ভূলুণ্ঠিত বা ধূলিসাৎ হয়। তাই, সন্তুষ্টি দু'ভাবে আসে। একভাব হচ্ছে ন্যায্যতা এবং অপরভাব হচ্ছে অন্যায্যতা। যারা ন্যায্যতার ভিত্তিতে সন্তুষ্টি পায় না তারা অসন্তোষপ্রকাশ করে এবং তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া কালক্রমে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। পক্ষান্তরে, যারা অন্যায্যতার ভিত্তিতে সন্তুষ্টি পেয়ে যায় তারা সন্তোষপ্রকাশ করলেও এটা বুঝে যে, তারা অন্যায্যভাবে সন্তুষ্টি পেয়েছে এবং যাদের কারণে তারা এসন্তুষ্টি পেয়েছে তারা তাদের যেধরনের জনই হয় না কেন তাদের প্রতি তাদের অন্তত ভেতরগত ধারণা ভালো থাকে না। যারা অন্যায্যতার ভিত্তিতে সন্তুষ্টি পেতে চেয়েও পায় না তারাও অসন্তুষ্ট হয়। তবে, তাদের এঅসন্তুষ্টি ভিত্তিহীন এবং তাদের এ ভিত্তিহীন অসন্তুষ্টির প্রতিক্রিয়াও ভিত্তিহীন হয়। সন্তুষ্টির সাথেসাথে অসন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির সাথেসাথে সন্তুষ্টি চলতে থাকে। তাই, রাজনীতিবিদেরা এটা স্থির করে কাজ করা প্রয়োজন যে, তারা কোন্ ধরনের সন্তুষ্টি ও কোন্ ধরনের অসন্তুষ্টি প্রদান করবে। ন্যায়তঃ হোক কিংবা অন্যায়তঃ হোক সবাইকে সবার ইচ্ছা অনুযায়ী সন্তুষ্ট করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি বা পয়দা করেছেন এবং আমরা তাঁর সৃষ্ট জীব বা বান্দা। তারপরো সব মানুষ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট নয় এবং তাঁর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসী নয়। তাই, রাজনীতিবিদেরা ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদের প্রতি খেয়াল না করে সবাইকে সন্তুষ্ট করার প্রবণতা ও অনুরাগ পরিত্যাগ করে অন্যায়ভাবে সন্তুষ্টি অর্জনের চেয়ে ন্যায়ানুসারে অসন্তুষ্টি অর্জনকে বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার সাথে মেনে নেয়াটা সর্বদিক দিয়ে নিরাপদ ও হিতকর।

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচি থাকে। এগুলোকে ইংরেজীতে বলা হয় ম্যানিফেস্টো। ক্ষমতাসীন দল তাদের ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী কাজ

www.pathagar.com

করে। তাছাড়া, তাদের ম্যানিফেস্টোর সাথে সংগতিপূর্ণ সব কাজই তারা করতে পারে এবং যেসব কাজ তাদের ম্যানিফেস্টোর সাথে সংগতিহীন সেগুলো তারা বাদ দিতে পারে। এককথায়, তাদের ম্যানিফেস্টোতে থাক বা না থাক তারা তাদের চিন্তাচেতনায় ও দৃষ্টিতে দেশ ও দেশবাসীর জন্যে মঙ্গলজনক সব কাজই করতে পারে। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কাজসম্পাদনকে একনিরিখে দেখা যায় না। ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে ব্যক্তিগত কাজ নিষ্পন্ন করতে পারে। কিন্তু, সে কোন রাষ্ট্রীয় কাজ রাষ্ট্রের অনুমোদন ও সহযোগিতা ব্যতীত ইচ্ছা করলেই নিষ্পন্ন করতে পারে না। অধিকন্তু, রাষ্ট্রের কাজ রাষ্ট্রকেই করতে হয়। রাষ্ট্র হচ্ছে বিমূর্ত। তাই, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা রাজনীতিবিদেরাই রাষ্ট্রপরিচালনা করে ও রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। ফলে, আইন প্রণীত, পরিকল্পনা গৃহীত, পরিবর্তন সাধিত, প্রজেক্ট অনুমোদিত ও বিভিন্ন নিত্যনতুন কাজ সম্পন্ন হয়। বিরোধী দলীয় নেতারা ক্ষমতাসীন দলের ম্যানিফেস্টোর বিরূপ ও শত্রুতাপূর্ণ সমালোচনা করতে এবং তাদের বাস্তবমুখী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে; কিন্তু জনগণ চায় যে, তারা এসব প্রক্রিয়ায় আত্মনিয়োগ না করে মঙ্গলনক কাজ করুক। ক্ষমতাসীন দল জনগণকে কোন কাজের জন্যে সোচ্চার হতে বা আন্দোলন করতে বা উদ্দীপ্ত হয়ে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানানোটা ক্ষমতাসীন দল হয়েও বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ার নামান্তরমাত্র। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তেমনকোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এতে বুঝা যায় যে, দেশ ও জনগণের কাজ ও অগ্রগতি হোক বা না হোক ক্ষমতাসীন দল ছলেবলেকৌশলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অসীম ও স্থায়ী করে নিতে চায়। কিন্তু, বাস্তবে যে তা হয় না তা তাদেরকে বাস্তবতার নিরিখে হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। তাই, তাদের মানবীয় ও নৈসর্গিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবরূঢ় ও প্রবিষ্ট না হয়ে দেশ ও জনগণের জন্যে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ন্যায়ান্যায় ও শুভাশুভ বিবেচনা করে শুধু কাজ করে যায়া। এতে বিরোধী দল অনর্থক বিরোধিতায় আবির্ভূত হলেও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ক্ষমতাসীন দলের প্রতি থাকবেই। যেহেতু ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরাই সরকারপরিচালনা করে আর সরকার হতে জনগণ বিচ্ছিন্ন ও বিমুক্ত নয় সেহেতু তারা জনগণকে যেসব কর্মের উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তুলতে, সোৎসুক হতে ও সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানায় সেগুলো তারা নিজেরাই নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে

www.pathagar.com

সম্পাদন করে যায়া তাদের পুরাদস্তুর দায়িত্ব, কেননা তারা যতোদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে ততোদিন সরকারের সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ,এজেন্সী, সংস্থা, অফিসআদালত ইত্যাদি তাদের তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বে নিয়োজিত থাকে। এজন্যেই চাই তাদের নৈতিকতা, সত্যনিষ্ঠা, প্রগাঢ় দেশপ্রেম, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে অবস্থান, দেশের মধ্যে নিজেদের নিঃস্বার্থ অস্তিত্বের উপলব্ধি, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়ার প্রবণতা পরিহার, সত্য ও ন্যায়ের জন্যে যেকোন ত্যাগস্বীকারের প্রস্তুতি, দুর্নীতিমুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি দায়িত্ব দ্রুতগতিতে পালনের প্রতি অধম্য আসক্তি ও ব্যগ্রতা, ধৈর্য ও সহনশীলতার অসীম শক্তি, হাজারো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কাজের প্রতি গভীর অনুরক্তি, স্বার্থশূন্যতা এবং সুখ্যাতি ও সুযশ রেখে অমরত্ব লাভের অভিলাষ।

যে শুধু নিজের দিক দেখে ও নিজের কথা চিন্তা করে সে স্বার্থপর এবং স্বার্থান্ধতা তাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। রাজনীতি পরিবেষ্টিত নয়, পরিব্যাপ্ত। তাই, যারা রাজনীতি করে তারা পরিবেষ্টিত না হয়ে পরিব্যাপ্ত হতে হয়। তাদের হৃদয় হতে হয় মুক্ত আকাশের মতো উদার এবং সমুদ্রের মতো বিশাল। তারা নিজেদেরকে দিয়ে অন্যান্যকে ভাবতে হয় এবং একরাজনীতিবিদ অপররাজনীতিবিদের বন্ধু হতে হয়, কেননা তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশ ও জনগণের কাজ। তাই, একজন স্বার্থকজন্মা ও সার্থকনামা রাজনীতিবিদকে তার প্রতিপক্ষের রাজনীতিবিদদের দিকগুলোও ভাবতে ও বিবেচনা করতে হয়। এতে রাজনীতি উদার হয় এবং রাজনৈতিক পরিবেশ কলুষমুক্ত হয়। সংকীর্ণ ও কলুষ রাজনীতি হানাহানি, মারামারি, কারণেঅকারণে হরতাল ও পাল্টা হরতাল এবং প্রতিপক্ষের রাজনীতিবিদদেরকে জব্দ, নাজেহাল ও হেয়প্রতিপন্ন করার কলাকৌশল উদ্ভাবনের বিষাক্ত বীজ বোনে। যেরাজনীতিবিদ এগুলো পরিহার করে চলতে পারে না সে জাতিকে কিছুই দিতে পারে না, বরং তাকে পিছু টানে ও তার ক্ষতি করে থাকে। একজন রাজনীতিবিদ সেটাই বলবে ও করবে যা সে বিশদভাবে জানে। ভাসাভাসা জ্ঞান দিয়ে কোনকিছু বলা ও করা সংকট সৃষ্টি করে। সংকট সৃষ্টি করা সহজ; কিন্তু তা নিরসন করা বড় কঠিন ও দুরূহ। তারাই যোগ্য ও পরিণামদর্শী রাজনীতিবিদ যাদের কথায় ও কাজে সংকট সৃষ্ট না হয়ে নিরসিত হয়। তারা নৈরাজ্যে ও দেশের অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা হয় এমনকোন কাজে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়তে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের আপনজন ও ছেলেমেয়ে রাজনৈতিক

www.pathagar.com

কারণে মারা যায় এমন নজির বিরল। রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক কারণে নিরীহ লোকজনের ও ছাত্রদেরই প্রাণ যায়। তাই, এটা পরিষ্কার যে, রাজনীতিবিদেরা নিরীহ লোকজন ও ছাত্র এবং তাদের আপজন ও সন্তানসন্ততিকে একদৃষ্টিতে না দেখে দু'দৃষ্টিতে দেখে। দু'রকম দৃষ্টিসম্পন্ন রাজীনতিবিদেরা স্বার্থন্বেষী ও স্বার্থপর। এধরনের রাজনীতিবিদেরা সর্বদা চায় যে, সাধারণ লোকের ও ছাত্রদের রক্ত ঝরুক। এরক্ত বা ত্যাগকে তারা পুঁজি হিসেবে কাজে লাগাতে পারে। অতীতে রক্তঝরাটা যেভাবে জনগণকে মাতিয়ে তুলতে পারতো বর্তমানে ধীরেধীরে সেটার তীব্রতা কমে যাচ্ছে, কেননা তারা রাজনীতিবিদদের চাতুরি ও চালাকি বুঝতে শিখছে। ফলে, দিনদিন রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক নেতাদের গুরুত্ব ও তাদের প্রতি জনগণের অন্তরস্থিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে। তবে, যেসব রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক নেতার গুরুত্ব নেই নীতিগতভাবে তাদের জীবনের কোন মূল্য নেই। আমাদের যেমন ব্যক্তিগত শত্রু আছে তেমনি জাতীয় শত্রুও আছে। আমাদের জাতীয় শত্রু হচ্ছে আমাদের দেশের নেতাদের কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য। তারা একরকম কথা বলে এবং বাস্তবে অন্যরকম কাজ করে, কেননা একদলের নেতারা অপরদলের নেতাদেরকে বিশ্বাস করতে পারে না। এমনকি একদলের নেতারাও পরস্পরকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে বিশ্বাস করতে ও আস্থায় রাখতে পারে না এবং তাদের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় হলেও পরস্পরবিরোধী মনোভাব ক্রিয়া করে। আমাদের সব সংকট নিরসনকল্পে এশত্রুর জীবনহানির প্রয়োজন আর নেতাদের কথা ও কাজের সমন্বয়ই এটা ঘটাতে পারে।

সবাই একই সময় একই জিনিস পেতে চেলে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি ও হানাহানি হয়। এতে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলো একই সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেতে চাচ্ছে। এজন্যে তাদের মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে বিভেদের ফলে কোন ক্ষমতাসীন দলই সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সরকারপরিচালনা করতে পারছে না, জনগণ বিভিন্ন অনিশ্চয়তা ও সমস্যার আবর্তে ঘোরপাক খাচ্ছে এবং দেশের অগ্রগতি অবর্ণনীয়ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাই, এটা পরিষ্কার যে, রাজনৈতিক দলগুলো মুখে দেশ ও জনগণের ত্রাণকর্তা ও হিতাকাঙ্ক্ষী হলেও বাস্তবে তারা ক্ষমতালিপ্সু এবং জনগণকে তারা হাতিয়ার ও পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে তাদের বুকের ওপর পা রেখে ক্ষমতাসীন হয়ার নিমিত্ত বিভিন্ন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এলিপ্ততাতে কেউকেউ সফলকাম হলেও দেশের ও জাতির ভাগ্যোন্নয়নের ক্ষেত্র বিস্তৃত ও প্রসারিত হয় না। এমতাবস্থায়, রাজনৈতিক দলগুলোর অকৃত্রিম, আন্তরিক, খাঁটি ও ছলনাহীন বোধোদয় হয়া একান্ত প্রয়োজন এবং তাদের দেশাত্ববোধক কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে একই সময়

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন না হতে চেয়ে স্বস্ব কর্মসূচি অনুযায়ী ধৈর্য ও সহনশীরতার মাধ্যমে রাজনীতি করা, শান্তিপূর্ণভাবে জনগণকে স্বস্ব কর্মসূচির প্রতি আগ্রহশীল করে তোলা এবং অধিকাংশ জনগণ যেদলের কর্মসূচি গ্রহণ করে সেদলের রাষ্ট্রপরিচালনের ক্ষেত্রে অহেতুক ও অনাকাঙ্ক্ষিত অন্তরায় ও সমস্যা সৃষ্টি না করা।

আমরা অহরহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, গণজাগরণ সৃষ্টি ইত্যাদির কথা শুনছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে বিদ্বেষ, হিংসাঈর্ষা, আইনের পরিপন্থী কার্যকলাপ, স্বার্থান্ধতা ইত্যাদি বুঝায় না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে শোষণশাসনের অবসান, সুবিচার সুনিশ্চিতকরণ, সুষম বণ্টন, দুর্নীতি দমন, সবরকমের বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি বুঝায়। গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা বলতে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মারামারিহানাহানি, যার যা খুশি বলা ও করা ইত্যাদি বুঝায় না। গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা বলতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, নিয়ন্ত্রিত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সম্মিলিতভাবে বহিরাক্রমন থেকে দেশকে রক্ষা করা, নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিতে দেশের অগ্রগতির জন্যে কাজ করে যায়া ইত্যাদি বুঝায়। গণজাগরণ বলতে জনগণের মধ্যে বিভেদসৃষ্টি, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মারামারিহানাহানি, একে অন্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ইত্যাদি বুঝায় না। গণজাগরণ বলতে অন্যায়অবিচার ও ঘুষদুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সুষম বণ্টন ইত্যাদির জন্যে জনগণের জাগরণ বুঝায়। রাজনীতিবিদেরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও গণজাগরণ সৃষ্টি বলতে বাস্তবে যা বুঝায় সে আলোকে কাজ করে গেলে দেশে কোনপ্রকার সংকট থাকার কথা নয়।

রাজনীতি উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি ও স্বার্থান্ধতার নীতি নয়। রাজনীতি উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি ও স্বার্থন্ধতার নীতি হলে বলতে হয় যে, রাজনীতি একটি অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর নীতি। আমরা কেউ মুখের কথায় হলেও কোন খারাপ নীতি পছন্দ করি না। আমরা আমাদের দেশে দেখছি যে, রাজনীতিতেই যতোসব উচ্ছৃঙ্খলতা, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর অবতারণা ও অবান্তরতা। তাই, আমাদের দেশে রাজনীতি না থাকাই ভালো। রাজনীতির পরিবর্তে কি থাকবে? প্রশ্নটি যুক্তিযুক্ত। সরকার থাকতে হবে ও দেশপরিচালনা করতে হবে। তা হলে থাকবে একনায়কত্বক এবং এনায়কের আদেশনির্দেশই হবে আইন। তার একক কথায় সরকার পরিচালিত হবে। কারো কোন ন্যায়অন্যায় আপত্তি ও প্রতিবাদ থাকবে না। স্বাধীনতার অর্থতো উচ্ছৃঙ্খলতা, খেয়ালখুশি ও বিশৃঙ্খলা নয়। রাজনীতিই স্বাধীনতার সঞ্জীবনী শক্তি। তাই, স্বাধীনতারক্ষার জন্যে রাজনীতি অপরিহার্য এবং রাজনীতি উচ্ছৃঙ্খলতা, খেয়ালখুশি ও বিশৃঙ্খলার নীতি নয়। রাজনীতিতে থাকবে শৃঙ্খলা, ধৈর্য, সহনশীলতা ও যুক্তিযুক্ততা। যেসব রাজনীতিবিদের মধ্যে এগুলো নেই

www.pathagar.com

তারা রাজনীতে কলঙ্ক। যারা রাজনীতির নামে অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় জড়িয়ে পড়ছে তারা বিশেষতঃ কিশোর ও যুবক। তারা সাধারণত রাজনৈতিক নেতাদের আদেশ ও নির্দেশে কাজ করে। বলতে গেলে তাদের কোন নিজস্ব বৈশ্লেষিক শক্তি ও সিদ্ধান্ত নেই। তারা সব শক্তি ও সিদ্ধান্ত পায় নেতাদের থেকে। নেতাদের সিদ্ধান্ত ভুল হলে তারা ভুল করে। নেতাদের সিদ্ধান্ত ভালো হলে তারা স্বাভাবিকভাবেই ভালো করে। নেতাদের সিদ্ধান্ত অরাজক ও উচ্ছৃঙ্খল হলে তারা অরাজক ও উচ্ছৃঙ্খল হয়। তাই, অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার রাজনীতি রাজনৈতিক নেতারাই শিক্ষা দিচ্ছে এবং এসব নেতা শায়েস্তা হলে রাজনীতিতে কোন অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা থাকবে না।

ষড়যন্ত্র করে কাকেও বিপাকে ফেলাটা রাজনৈতিক অপকৌশল, কৌশল নয়। রাজনীতিতে কৌশল হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধিমত্তা সফলতা আনয়ন করতে পারে; কিন্তু কাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে ও বিপাকে ফেলে নয়। রাজনীতি ও সামরিক যুদ্ধ একবিষয় নয়। সামরিক যুদ্ধে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শত্রুকে বিপাকে ফেলে ক্ষতিগ্রস্ত করতে হয়; কিন্তু রাজনীতিতে প্রতিপক্ষকে শত্রু মনে করলে রাজনীতি শত্রুতায় পর্যবসিত হয় এবং শত্রুতার রাজনীতি ও সামরিক যুদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাই, যেসব রাজনীতিবিদ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে বা সরকারকে বা সরকারের কোন অংশকে বিপাকে ফেলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিয়োজিত থাকে তারা রাজনীতিতে রাজনৈতিক কলঙ্ক। রাজনীতি হচ্ছে যথার্থ যুক্তির নীতি। তাই, রাজনীতির সম্পর্ক হচ্ছে যথার্থ যৌক্তিকতার সাথে। এতে পেশীশক্তি ও সন্ত্রাস স্থান পেতে পারে না। বাংলাদেশের রাজনীতিতে পেশীশক্তি ও সন্ত্রাস যথার্থ যৌক্তিকতার স্থান দখল করে নিয়েছে। পেশীশক্তি ও সন্ত্রাস দিয়ে শান্তির প্রচেষ্টা চালানো যায় না। তাই, পেশীশক্তির ও সন্ত্রাসের রাজনীতি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত। যেসব রাজনীতিবিদ এধরনের রাজনীতিতে জড়িত তারাও অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত। অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত রাজনীতিবিদেরা কখনো জনগনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পৌছতে পারে না। রাজনীতিবিদেরা কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত হতে হলে পেশীশক্তির ও সন্ত্রাসের রাজনীতি বাদ দিয়ে যথার্থ যৌক্তিকতার রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যথার্থ যৌক্তিকতার সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যেসব রাজনীতিবিদের নৈতিক মনোবল আছে তারা পেশীশক্তি ও সন্ত্রাসকে সমর্থন দিতে পারে না। বাস্তবে নৈতিকতার ও নৈতিক মনোবলের অভাবেই রাজনীতিতে পেশীশক্তি ও সন্ত্রাস জোরদার হয়েছে। যেসব শিক্ষক, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ও নেতা নৈতিকতা ও নৈতিক মনোবল সৃষ্টি করবে

www.pathagar.com

তাদের নিজেদের নৈতিকতা ও নৈতিক মনোবল থাকতে হয়। তাদের মধ্যে এগুলোর অভাব থাকলে পেশীশক্তি ও সন্ত্রাস থাকবেই।

রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব একই অর্থে আসে না। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে পেশীশক্তি ও সন্ত্রাসের কোন সম্পর্ক নেই। তার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে নৈতিকতার ও নৈতিক মনোবলের। আমাদের রাজনীতিবিদের অভাব নেই। আমাদের অভাব আছে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের। যেদিন আমরা রাজনীতিবিদদেরকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পাবো সেদিন রাজনীতিতে পেশীশক্তি ও সন্ত্রাস থাকবে না এবং আমরা যথার্থ যৌক্তিকতার রাজনীতির মধ্যে শান্তি ও অগ্রগতি পাবো। সৃষ্টি না করে ভোগ করা যায় না। ভোগের জন্যে সৃষ্টির প্রয়োজন। সত্যকথা বলতে কি, আমরা রাজনীতিবিদদের কর্মতৎপরতাতে শুধু ভোগের লোভলালসা দেখছি, সৃষ্টির উন্মদনা বা উন্মত্ততা দেখছি না। পেশীশক্তি, সন্ত্রাসী তৎপরতা ও স্বার্থান্ধতাতে সৃষ্টি করা যায় না, সহজভাবে ধ্বংস করা যায়। সৃষ্টি করার জন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে শ্রেষ্ঠত্ব। যেদিন আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হবে সেদিনই আমরা তাদের দ্বারা সৃষ্টির আশা করতে পারবো। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার,আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের, আইনের শাসনের, দুর্নীতি দমনের, সুষম বণ্টন সুনিশ্চিতকরণের, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার ও জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলোর ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একেক সময় একেক দল ক্ষমতাসীন হয়। ঐকমত্যের অভাবে উল্লিখিত বিষয়াবলীর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে একেক সময় একেক ক্ষমতাসীন দল তাদের ধ্যানধারণা অনুযায়ী এগুলো নতুনভাবে চালু করলে জাতি এগিয়ে যেতে পারে না, স্থিতিশীলতা ও স্থবিরতাতে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজনীতিবিদদের স্বার্থে জাতি স্থিতিশীলতা ও স্থবিরতাতে দাঁড়িয়ে থাকবে তা জনগণ কোনভাবেই নীরবে সহ্য বা বরদাস্ত করতে পারে না। কিন্তু, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভাবে জনগণের মধ্যে এস্থিতিশীলতা ও স্থবিরতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও স্বতোবৃত্ত জাগরণের সৃষ্টি হচ্ছে না। তাই, জাতীয় স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোর, তাদের যেদলের কর্মসূচি যা-ই থাকুক-না-কেন, প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে উল্লেখিত বিষয়বলীর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলোতে ঐকমত্যে পৌছা এবং সংবিধান রহিত, পরিবর্তিত ও সংশোধিত যা-ই হয়-না-কেন এঐকমত্য হতে কোনক্রমেই বিচ্যুত না হয়া।

রাজনীতিতে একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়। ফলে, রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের গোপনীয় ব্যাপারাদি গোপন রাখাটা খুব কঠিন হয়।

www.pathagar.com

তাছাড়া, একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন দলের সদস্য হওয়ায় পক্ষপাতিত্বের কারণে রাষ্ট্রপরিচালনে নানা জটিলতা দেখা দেয়। এসব জটিলতার কারণে রাষ্ট্র ও জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রজানীতিবিদেরা তাদের স্বস্ব অবস্থানে থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি করতে থাকে। এসব ক্ষতিকর দিক জনগণের কাঙ্ক্ষিত রাজনীতির আদর্শের বৈশিষ্ট্য নয় এবং গণতন্ত্রের সাথে এগুলো সাংঘর্ষিক, কেননা গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে পক্ষপাতিত্ব ও ব্যক্তিগত সুযোগ বুঝায় না। রাজনীতিবিদেরা শুধু কথা দিয়ে জনগণকে ভুলিয়েভালিয়ে রাখতে চায়। তাদের এপ্রবণতাকে রাজনৈতিক চাল বললেও অত্যুক্তি হয় না। জনগণকে ভুলিয়েভালিয়ে রেখে শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অগ্রগতিসাধন করা যায় না। ভুলিয়েভালিয়ে রাখাটা সাময়িক ব্যাপার। রাজনীতি সাময়িক ব্যাপার নয়। তাই, এটার সাথে সত্যতার সম্পর্ক বিদ্যমান। যেরাজনীতিতে সত্যতা নেই তা প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকাবাজি। প্রবঞ্চক, প্রতারক ও ধোঁকাবাজরাই অতি তাড়াতাড়ি ভুলাতে পারে। যারা সত্যতার রাজনীতি করে না তদের এবং প্রতারক, প্রবঞ্চক ও ধোঁকাবাজদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তাই, সত্যিকারের রাজনীতিবিদেরা এমনকিছু করতে নেই যাতে তারা সত্য থেকে বিচ্যুত না হয় এবং জনগণের চোখে প্রবঞ্চক, প্রতারক ও ধোঁকাবাজ হিসেবে ধরা না পড়ে।

যেসব রাজনীতিবিদ সত্যতা দিয়ে জনগণকে বশ করতে পারে তারাই সত্যিকারার্থে সফলকাম রাজনীতিবিদ। তাই, রাজনীতিতে সফলতার জন্যে সত্যতা প্রয়োজন। রাজনীতিটা পুঁজির মতো। পুঁজি লাভের জন্যে বিনিয়োগ করা হয়। এবিনিয়োগের পন্থা ও পদ্ধতি আছে। রাজনৈতিক দলে রাজনীতিও পুঁজি হিসেবে বিনিয়োজিত হচ্ছে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের রাজনীতিবিদ, কর্মী ও সমর্থকরা তাদের দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে। তারা এখেয়ালে প্রাণপণে চেষ্টা করে যে, তাদের দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তারা বিভিন্নপ্রকার সুযোগসুবিধা গ্রহণ করে লাভবান হবে। ফলে, রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হয় ব্যক্তিগত লাভ। যেরাজনীতির ধারা ব্যক্তিগত লাভলোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তা জনকল্যাণমূলক নয় এবং রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় কল্যাণসাধনে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যেহেতু রাজনীতি রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীদের, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, ব্যক্তিগত লাভলোকসানের পুঁজি হিসেবে বিনিয়োজিত হচ্ছে সেহেতু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। এপ্রসঙ্গে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সচেতনতার কথা এসে যাচ্ছে। আমরা রাজনৈতিক সচেতনতার আবরণে ব্যক্তিগত সচেতনতা দেখতে পাচ্ছি। ব্যক্তিগত সচেতনতাটা রাজনৈতিক সচেতনতার তুলনায় ক্ষুদ্র। তবে, রাজনৈতিক সচেতনতার পূর্ণতার জন্যে ব্যক্তিগত সচেতনতার প্রয়োজন। যে ব্যক্তিগত সচেতনতাতে ব্যক্তিস্বার্থ নিহিত নেই সেটাই রাজনৈতিক সচেতনতাকে পূর্ণতাদান করতে পারে। তাই, রাজনীতিবিদদেরকে

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত সচেতনতা ও রাজনৈতিক সচেতনতার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনপূর্বক এ দু'সচেতনতার মধ্যে সমন্বয়ের স্বার্থে ব্যক্তিগত সচেতনতাতে ব্যক্তিস্বার্থের সংযোজন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হয়।

নেতারা তাদের স্বস্ব অবস্থান থেকে অনেকের জন্যে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করে। এটার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তিস্বার্থ। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ হয়ার সাথেসাথে তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এধরনের নেতারা সাধারণত বিভিন্ন দলের সাথে রাজনীতিতে জড়িত থাকে। সত্যিকারের রাজনীতিবিদেরা সত্য ও ন্যায়ের জন্যে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করবে এবং এগুলো প্রতিষ্ঠা করে ছাড়বে। যেসব রাজনীতিবিদের অন্যায়, অপকর্ম ও দুর্নীতি দেশবাসীর নিকট ধরা পড়ে তারা রাজনীতিবিদ নয়, ধোঁকাবাজ। তারা রাজনীতির ছত্রছায়ায় নিজেদের অন্যায়, অপকর্ম ও দুর্নীতি ঢেকে রাখতে চায়। তাদের এসব জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ার পর তারা "রাজনীতি" শব্দটি ভুলে যায়া প্রয়োজন। তাদের লজ্জাবোধের অভাবে তারা পুনরায় দেশবাসীর উদ্দেশ্য নীতিকথা বলে। জনগণ এসব রাজনীতিবিদকে আন্তরিকতার সাথে বর্জন করলে রাজনৈতিক পরিবেশ কিছুটা হলেও কলুষমুক্ত হয়। রাজনীতিতে ভাবাবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে কাজ করলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় এবং একপর্যায়ে–না–একপর্যায়ে জনগণের বিরাগভাজন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। তাই, রাজনীতিবিদদেরকে সর্বাবস্থায় ভাবাবেগ পরিহার করে চলতে হয়। শুধু হৃদয়গ্রাহী, সময়োপযোগী, বস্তুনিষ্ঠ ও আবেগদীপ্ত সুন্দর ও মূল্যবান বক্তৃতা ও কথা দিয়ে ভালো কাজ হয় না। ভালো কাজের জন্যে প্রয়োজন অন্যায়ের সাথে আপসহীনতা এবং জ্ঞানগরিমার সাথে সদিচ্ছা ও সততা। ভালোভাবে শুরু করে শেষটা ভালোভাবে না করতে পারলে খারাপই হয়। শেষটা ভালো হলে সবটাই ভালো হয়, কেননা শেষটা তখনই ভালো হয় শুরু থেকে যখন সুষ্ঠুভাবে হতে থাকে। তাই, এমনভাবে দূরদর্শিতার সাথে কাজ করতে হয় যাতে শেষটা ভালো হয়। রাজনীতিবিদদেরকে যুক্তিবাদী হতে হয়। তারা যুক্তি দিতে হয় ও যুক্তি মানতে হয়। তারা যুক্তির ভিত্তিতে কাজ করলে রাজনৈতিক পরিবেশ কলুষমুক্ত থাকে। অযৌক্তিক কাজের ফলে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। নিত্যনৈমিত্তিক সংঘর্ষ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে। এতে জনগণের দুঃখদুর্দশা বাড়ে এবং জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়। যেসব রাজনীতিবিদের কারণে জনগণের দুঃখদুর্দশা বাড়ে এবং জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয় তারা জনগণের নেতা ও মিত্র হতে পারে না। সত্যিকার দোষী ব্যক্তির শাস্তি হলে তার মুক্তির জন্যে যারা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করতে চায় তারা দোষের সমর্থক। দোষের সমর্থকেরাও শাস্তির যোগ্য। দোষের ক্ষেত্রে আপনপর কোন বিভেদ বা ভেদাভেদ থাকতে পারে না। যারা আপন লোকের দোষকে কোন দোষ মনে করে না এবং স্বেচ্ছায় আপন লোকের সাথে শাস্তি ভোগ করতে চায় তারা দেশের মঙ্গলের জন্যে কাজ করতে পারে না। তারা

www.pathagar.com

দেশকে সামনে রেখে জনগণকে বোকা বানিয়ে ন্যায়অন্যায় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করে শুধু নিজেদের স্বার্থে কাজ করে যায়।

শরীর আছে বলে রোগ হচ্ছে। শীত আছে বলে শীতের পর বসন্ত আসছে। পাকিস্তান ছিলো বলে বাংলাদেশ হয়েছে। এ স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনীতিবিদেরা স্বাধীনভাবে রাজনীতি করছে। অর্থনৈতিক, সামজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক সবদিক দিয়ে উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যে এস্বাধীনতার প্রয়োজন। তখনই স্বাধীনতা অর্থবহ হয় যখন এগুলো সাধিত হয়। তারাই প্রকৃত রাজনীতিবিদ হতে পারে যারা এগুলো সাধনের দ্বারা স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে পারে। রাজনীতিতে স্বার্থপরতার ছোঁয়া ব্যক্তিগত জীবনের ছোটছোট ব্যাপারাদিতেও লেগে যায়। মানুষ স্বার্থপরতা দেখতেদেখতে নিজেদের মনের আগোচরেই স্বার্থপর হয়ে যায়। বাসের দৃষ্টান্তই দিচ্ছি। একজন যাত্রী নির্দ্বিধায় সিগারেট ফুঁকছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে। এতে তার আশেপাশের যাত্রীদের নাক দিয়ে ধোঁয়া ঢোকছে এবং তাদের গায়ে ছাই পড়ছে। তারা বিরক্ত ও অস্বস্থ বোধ করছে। কিন্তু, যে সিগারেট টানছে সে এসব ব্যাপার ভ্রূক্ষেপই করছে না। সিগারেট টানাটা তার অভ্যাস বলে সে তা টানছে ও তার স্বার্থ সে ঠিক রাখছে। এতে যে অন্যান্যের স্বার্থ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে সে তা আমলেই আনছে না। গরমের দিন। বাসে আগে ও পরে দু'টি সিট একটি জানালার পাশে। জানালার গ্লাসটি মাঝখানে থাকলে দু'সিটের যাত্রীই বাতাস পায়। কিন্তু, হঠাৎ দেখা গেলো যে, পেছনের সিটের যাত্রী গ্লাসটি পুরোপুরিভাবে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে তার দিকে বেশি বাতাসের ব্যবস্থা করে নিলো এবং সামনের সিটের যাত্রীর প্রতি হাওয়া বন্ধ করে দিলো।

জনগণ তাদের কাজের জন্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। প্রতিনিধিরা জনগণের খাদেম। প্রতিনিধিরাও নিজেদেরকে জনগণের খাদেম বলে নির্বাচিত হয়। রাষ্ট্রপতি হতে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর পর্যন্ত সবাই জনগণের প্রতিনিধি। অথচ, প্রতিনিধিদের নিকট জনগণ প্রয়োজনে সহজে যেতে পারে না। রাষ্ট্রপতির ও মন্ত্রীদের নিকট যায়াতো দুষ্কর। পক্ষান্তরে, জনগণ প্রতিনিধিদের খাদেম হয় এবং তাদেরকে সমীহ করে চলতে হয়। তাছাড়া, যেখানে প্রতিনিধিরা জনগণের নিকট ছোট হয়ে থাকবে সেখানে জনগণ তাদের নিকট ছোট হয়ে থাকতে হয় এবং তাদেরক ভয় করে চলতে হয়। রাজনীতিবিদেরা ভেবে দেখা দরকার যে, এটা কোন ধরনের নীতি এবং এতে কাঙ্ক্ষিত রাজনীতির অগ্রগতি সম্ভব কিনা। রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতাসীন হয়ে রাষ্ট্রপরিচালনা করা। তাই, রাজনীতিবিদেরা রাষ্ট্রের কর্ণধার। তাদের দিকে সবার দৃষ্টি থাকে। তাদের সবকিছুই জনগণের মধ্যে আলোচিত ও সমালোচিত হয়। তাই,

www.pathagar.com

তাদেরকে এমনভাবে কাজ করতে হয় যাতে তাদের চরিত্রের ওপর কোন কালিমার দাগ না পড়ে। রঙিন কাপড়ে কোন দাগ পড়লে তা সহজে দেখা যায় না। কিন্তু, সাদা কাপড়ে সামন্য দাগ পড়েলও তা সহজে দেখা যায়। রাজনীতিবিদেরা সাদাকাপড়তুল্য। তাদের যেকোন খারাপ কাজ অতিসহজেই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেরাজনীতিবিদ যেনীতিতে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেনীতিতেই তার প্রতি জনমত গঠিত হয়। কোন রাজনীতিবিদই চায় না যে, তার প্রতি জনমত খারাপভাবে গঠিত হোক। তাই, তার মনে রাখা দরকার যে, ভালো জনমত গঠনের জন্যে প্রয়োজন ভালো চরিত্রের। গায়ের জোরে ও ক্ষমতার দাপটে অনেক কিছু করা যায় ; কিন্তু চরিত্রের ওপর একবার কোন কালিমার প্রলেপ পড়লে তা জনগণের মন থেকে মোছা যায় না এবং এপ্রলেপের মোছনীয় কালি আজপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি ও ভবিষ্যতেও কেউই কোনদিন তা আবিষ্কার করতে পারবে না। কথায় বলে যে, টাকা হারালে কিছুই হারায় না, স্বাস্থ্য হারালে কিছু হারায় এবং চরিত্র হারালে সবকিছুই হারায়। যেরাজনীতিবিদ সচ্চরিত্রতার অধিকারী হতে পারে না তার কিছুই থাকে না এবং শূন্যহাতে অর্থবহ সফলতার মুখ দেখা যায় না। সে-ই সচ্চরিত্রতার অধিকারী যে সর্বপ্রকার পাপ ও অপরাধমুক্ত থাকে, মহত্ত্ব দিয়ে সবাইকে আকর্ষণ করে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েও আর্দশ হতে বিচ্যুত হয় না, পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির ধার ধারে না, দুর্নীতির পংকিলতায় আবর্তিতবিবর্তিত হয় না, ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা হয়ে কাজ করে, অন্যায়ের নিকট মাথা নত করে না, ক্ষমতায় থাকলে তা হারাবার ভয়ে যা-তা করে না ও বিচলিত হয় না, কেননা ক্ষমতা এক বিরাট দায়িত্ব যা পালনে সে আরামআয়েশ ও ভোগবিলাস বিসর্জন দিয়ে সর্বদা নিরলসভাবে কাজ করে যায়, জনগণের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করে এবং সদাসর্বদা অন্যকারো মুখাপেক্ষী না হয়ে সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী থাকে ও তাঁর ওপর নির্ভরশীলতা হারায় না।

রাজনীতিবিদেরা নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে যায়। সেখানে তাদের দ্বারা বিধিবিধান রচিত হয় এবং বিভিন্ন সমস্যার ওপর আলাপআলোচনার ও তর্কবিতর্কের পর সেগুলোর সমাধান বের করা হয়। সেখানে যেবাজেটের সফলতা ও ব্যর্থতার ওপর দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ও জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে তা পাস করা হয়। মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় প্রকল্পগুলো অনুমোদিত হয়। তবে, বিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদেরা শুধু বিধিবিধানরচনার, সমস্যাসমাধানের পথ ও পন্থানির্ধারণের, বাজেট পাসের এবং জাতীয় প্রকল্প অনুমোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তারা এগুলোর কার্যকারিতার ও বাস্তবায়নের পশ্চাতে আঠার মতো লেগে থাকে

www.pathagar.com

এবং যারা এসব দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের কাজের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে। তাছাড়া, তারা এগুলো বাস্তবে পরিণত করার সাথেসাথে সব অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা দৃঢ়চিত্তে ও সংকল্পিতভাবে সাহসিকতার সাথে দূর করে। একটি রাজনৈতিক দলে বিভিন্নধরনের নেতা ও কর্মী থাকে। তাদের সবার স্বভাবচরিত্র ও কাজকর্ম এক ও অভিন্ন হয় না। বিভিন্ন নেতা ও কর্মী ভেতরেভেতরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ও মনোভাবে কাজ করে। প্রধানপ্রধান নেতারাই দলের ভাবমূর্তির ধারক ও বাহক এবং দলের প্রতিবিম্ব হিসেবে কাজ করে। দলের সফলতা ও কৃতকার্যতার জন্যে এদেরকে দলের বিভিন্ন নেতার এবং সক্রিয়, চালু ও চটপটে কর্মীদের মনমানসিকতা ও মনোভাব সমধিক ও সম্যক জানতে হয়। তারা দেখবে যে, অনেক নেতা ও কর্মী অকৃত্রিম ও ছলনাহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং কোনকোন নেতা ও কর্মী তাদের সাহচর্যে ঘুরঘুর করছে। এসব নেতা ও কর্মী ভাব ও আচরণে প্রধানপ্রধান নেতাদের জন্যে জীবনবিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। ফলে, এরা প্রধানপ্রধান নেতাদের কাছে তাদের আপনজনের চেয়েও বেশি সমাদৃত হয়। প্রধানপ্রধান নেতারা এদেরকে সর্বদা তাদের সান্নিধ্যে পেতে চায় ও সান্নিধ্যে রাখেও। এরা এসান্নিধ্যের সুযোগ নিতে কসুর করে না। এরা এমনভাবে কথা বলে ও পরামর্শ দেয় যে, দুধে ময়লা থাকতে পারে ; কিন্তু এদের কথায় ও পরামর্শে কোন ময়লা থাকতে পারে না। এপ্রসঙ্গে বলতে হয় যে, শয়তান তার শয়তানি দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারে আলেমরা কোরআন ও হাদীসের আলোকে তাদেরকে বুঝিয়ে ততো তাড়াতাড়ি সৎপথে আনতে পারে না, কেননা শয়তান মানুষের অস্থির সাথে মিশে যেতে পারে আর আলেমরা তা পারে না। এটা জানা সত্ত্বেও মানুষ শয়তানের দ্বারা প্রতারিত ও প্ররোচিত হয়। কিন্তু, প্রকৃত মানুষকে শয়তান কোনভাবেই প্রতারিত ও প্ররোচিত করেত পারে না। শয়তানের দ্বারা প্রতারিত ও প্ররোচিত হয়ার পরিণামফল হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ততা। তাই, যেসব নেতা ও কর্মী স্বেচ্ছায় ও ছলছুতায় প্রধানপ্রধান নেতাদের সান্নিধ্যে থাকে এদেরকে তারা কড়া নজরে রাখতে হয় এবং যেসব নেতা ও কর্মী সতত অকৃত্রিম ও ছলনাহীনভাবে কাজ করে এবং অপ্রয়োজনে তাদের সান্নিধ্যে আসে না এদেরকে এদের কর্মানুযায়ী ফল দিতে তারা কোনপ্রকার দ্বিধাসংকোচ করতে নেই। প্রধানপ্রধান নেতারা এনীতিতে অটল ও অনড় থাকতে পারলে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারে, জাতীয় স্বার্থে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয় এবং দলের স্বার্থন্বেষী নেতা ও কর্মীরা ছিটকে পড়ে বিধায় তার মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে ও ফাটল সৃষ্ট হতে পারে না।

রাজনীতিবিদদেরকে কানকথা বা একতরফা কথা শুনে কোন কাজ করার প্রবণতা পরিহার করে চলতে হয়। যারা কানকথা বা একতরফা কথা বলে তাদের পূর্বপ্রস্তুতি থাকে। ফলে, এধরনের কথা অত্যন্ত সত্য মনে হয়। সত্যাসত্যের স্বার্থে এবং কারো

www.pathagar.com

ক্ষতি না হয় সেকারণে রাজনীতিবিদদেরকে যার বিরুদ্ধে কানকথা বা একতরফা কথা বলা হয় তার কথাও আবশ্যিকভাবে শুনতে হয়। এতে সত্যাসত্য বের হয়ে আসে এবং অন্যায়ভাবে কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। অপরদিকে, যারা নিজেদের কুৎসিত স্বার্থহাসিলের জন্যে কানকথা বা একতরফা কথা বলে তারা সতর্ক হয়ে যায়। মানুষকে আল্লাহ্ মুখ দিয়েছেন। এমুখ দিয়ে তারা তাদের যার যা ইচ্ছা সে তা বলতে পারে। এবলার জন্যে মুখের ওপর কোন কর আরোপিত হয় না। খাটে বা না খাটে মুখ দিয়ে যা–তা বা আবোলতাবোল অনর্গল বলতে কোন অসুবিধা বা বাধা নেই। তারপরো যেকোন বিষয় ও ব্যাপারে সঠিকতা ও বেঠিকতার প্রশ্ন এসে যায়। সব বিষয় ও ব্যাপারে সবার কথা সঠিক না–ও হতে পারে। এমনো হয় যে, বক্তব্যের চাতুর্য দিয়ে বেঠিক বিষয়কেও সঠিক বিষয় হিসেবে প্রতিপন্ন করে ফেলে। যে বা যারা এরকম করে সেও বা তারাও সঠিক বিষয়টি বুঝে। তবু, সে বা তারা তার বা তাদের স্বার্থের দিকে নজর রেখেই তা করে থাকে। রাজনীতিবিদদেরকে সঠিক বিষয় বা ব্যাপারটি বের করে নিতে পারতে হয়। তা না হলে তাদের রাজনৈতিক চর্চায় বিশুদ্ধতার অভাবে তাদের রাজনীতি রাজনৈতিক অঙ্গনকে দুর্বিষহ করে তোলে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সঠিক বিষয় বা ব্যাপারটি বের করে নিতে না পারলে প্রশাসনিক কাজে জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং দুর্নীতির মাথা সবকিছু ভেদ করে ওপরে ওঠে আসে। এসব কারণে রাজনীতিবিদদেরকে, বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে, অনেকের কথার মধ্যে যার বা যাদের কথা সঠিক হয় তার বা তাদের কথা গ্রহণ করে কাজ করে যেতে হয়।

আমাদের রাজনীতিবিদদের উপলব্ধির জন্যে উন্নত দেশগুলোর রাজনীতিবিদদের গুণাবলীর একটি গুণের কথা উল্লেখ করছি। সেসব দেশে কোন ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ কোন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লে সে নিজেই উদারচিত্তে পদত্যাগ করে সরে পড়ে। তার কেলেঙ্কারির কারণে বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদেরাতো তার সমালোচনা করেই, তার নিজের দলের রাজনীতিবিদেরাও তাকে সমর্থন দেয় না। সেসব দেশে সাধারণ ব্যক্তিদের পর্যায়ে কতো কি হয়ে থাকে। সেগুলোর প্রতি কেউই ভ্রূক্ষেপ করে না। প্রচলিত আইনানুযায়ী সেগুলোর প্রতিকার হয়ে থাকে। অথচ, ক্ষমতাসীন কেউ সামান্যতম ত্রুটি বা অপরাধ করলেই জনগণ তার প্রতি বিক্ষুব্ধ হয় এবং ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া ব্যতীত তার গত্যন্তর থাকে না। সেসব দেশে ভুলত্রুটি ও অপরাধ কারো নিকট গ্রহণযোগ্য নয় ও ক্ষমার অযোগ্য। সেসব দেশের জনগণের মতে ক্ষমতাসীনেরা হবে দেবতাতুল্য এবং কোন পাপ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। আমাদের দেশে এঅবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছে। আমাদের দেশে ক্ষমতাসীন হয়ে অপরাধ করলে তা অপরাধ হিসেবে পরিগণিত না হয়ে পুণ্যের আকারধারণ করে।

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন হতে পারলেই পুণ্যের আকারে অপরাধের অবাধ ও মুক্ত লাইসেন্স পায়া যায়। এতে বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদদের সমালোচনায় ও জনগণের বিরূপভাবের অভিব্যক্তিতে কোন লাভ হয় না। এক্ষেত্রে জনগণের নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করা ব্যতীত অন্যকিছু করার সাহস সঞ্চয়ে বেশ সময় লাগে। কোন ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদের ভুলত্রুটি ও অপরাধের বিরুদ্ধে অপরাপর ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ প্রতিবাদ না জানিয়ে তার পক্ষে, নিজেদের দলের স্বার্থের কথা চিন্তা করে, কাজ করে যায়। ফলে, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় নিজেদের স্বার্থে ভুলত্রুটি ও অপরাধ করাটাকে কিছুই মনে করে না। তবে, তারা এবৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়াটা দেশ ও জনগণের স্বার্থে সম্পূর্ণরূপে অনভিপ্রেত। আমাদেরকে উন্নত হতে হলে এবং আমাদের দেশকে উন্নত করতে হলে তাদেরকে উন্নত দেশগুলোর রাজনীতিবিদদের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। তাদেরকে পূতপবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং ফেরেশতাদের গুণে গুণান্বিত হতে হবে। ক্ষমতাসীন কোন রাজনীতিবিদের কোন ভুলত্রুটি ও অপরাধ ধরা পড়লে তাকে তার দলীয় অন্যান্য রাজনীতিবিদ সমর্থন দেবে না এবং তাকে পদত্যাগ করতে হবে। তাছাড়া, তাকে যথাসময়ে সমুচিত শাস্তি প্রদান করতে হবে। ফলে, ক্ষমতাসীন কেউই কোন অপকর্ম করতে সাহসী হবে না বিধায় কলুষমুক্ত রাজনৈতিক ধারার সৃষ্টি হবে।

দেশ ও জনগণের স্বার্থ দেখিয়ে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা জ্বালাময়ী বক্তৃতা করে। এ জ্বালাময়ী বক্তৃতা বর্তমানে চিরাচরিত বক্তৃতায় পরিণত হয়েছে এবং ঘরেঘরে ও পাড়ায়পাড়ায় জ্বালাময়ী বক্তৃতার বক্তা সৃষ্ট হচ্ছে। তাই, জ্বালাময়ী বক্তৃতার জ্বালার প্রকোপ দিনদিন কমে আসছে। এজ্বালা যতোই কমছে পেশীশক্তি ও সন্ত্রাস ততোই বাড়ছে। সেসময় আরবেশি দূরে নয় যখন জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে কোনপ্রকার জ্বালাই ধরানো যাবে না। তাই, রাজনীতিবিদেরা আর জ্বালাময়ী বক্তৃতার চর্চা না করে নৈতিকতার চর্চার দ্বারা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বনার জন্যে কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলা আবশ্যক। যারা রাজনীতি করে তাদের নিকট বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন কথা আসে। তাই, তারা যেসে কথা শুনে নিজেদের স্বার্থে মাতামাতি করা ঠিক হবে না। তাদের নিকট যেসব কথা আসে তারা ধৈর্যের ও সহনশীলতার মাধ্যমে সেগুলো বিচারবিশ্লেষণ করলে অনায়াসে বুঝতে পারে কোন কথাতে কতোটুকু সত্যতা আছে। এতে মাতামাতির মাত্রা হ্রাস পায় এবং নিজের স্বার্থে কারো প্রতি অন্যায় করার খারাপ অভ্যাসটি স্বাভাবিকভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাজনীতিবিদেরা এগুণটি অর্জন করতে পারলে এটার প্রভাব জনগণের ওপরো পড়ে এবং তারাও কোনকিছু শুনে সবদিক বিচারবিশ্লেষণ না করে শুধু নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে মাতামাতি থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করে। ক্ষমা যেমন মহত্ত্বের লক্ষণ নিজের ভুল ও অন্যায় নিজে

www.pathagar.com

স্বীকার করাও তেমনি মহত্ত্বের লক্ষণ। বাস্তবে নিজের ভুল ও অন্যায় নিজে স্বীকার করার প্রবণতা ও মনমানসিকতা খুবকম পরিলক্ষিত হচ্ছে। অপরদিকে, একজন খারাপ কিছু করলে এবং অপর একজন সেটাকে খারাপ বললে তার নিকট সে খারাপ হয়ে যায়। এককথায়, ভালো হোক বা খারাপ হোক পক্ষে গেলেই খুশি আর বিপক্ষে গেলেই অখুশি। প্রত্যেক রাজনীতিবিদই দেখায় যে, সে ভালোর পক্ষে এবং ভালোর জন্যেই কাজ করে। বাস্তবে তা হতোতো খারাপ কিছুই থাকতে পারতো না। কিন্তু, আমরা খারাপের মধ্যেই নিমজ্জিত। এনিমজ্জন এমনিতেই প্রমাণ করে যে, প্রত্যেকেই তার কোনকিছু খারাপ হলেও তা ভালো হিসেবে তার পক্ষে চায়। এজন্যেই আমরা খারাপ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি না। তাই, রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে যেকোন মূল্যে নিরপেক্ষতা বজিয়ে রাখা এবং ভালো ও মন্দের মধ্যে ভেদাভেদ লক্ষ্য না করে শুধু স্বস্ব পক্ষে বলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করা, কেননা বিভ্রান্তির রাজনীতি কারো জন্যে মঙ্গলজনক নয়। রাজনৈতিক সংকটগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম সংকট হচ্ছে যে, সব রাজনৈতিক দলই একই সময় ক্ষমতা পেতে চায়। বাস্তবে এটা কখনো সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলগুলো এবাস্তবতা সম্পর্কে বিস্মৃত। যেসব রাজনীতিবিদ বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন নয় তাদের রাজনীতি কখনো দেশ ও জাতির জন্যে মঙ্গলজনক নয়।

কোন্ রাজনৈতিক দলের কোন্ নেতা দেশকে কতোটুকু ভালোবাসে তা–ও খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা সাধারণত বুঝি যে, যারা দেশকে নিজেদের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসে ও দেশপ্রেমিক তারাই রাজনীতি করে, কেননা রাজনীতি করেই ক্ষমতাসীন হয়া যায় এবং ক্ষমতায় থেকেই দেশের জন্যে মনঃপ্রাণ দিয়ে দুঃসাধ্য বা কষ্টসাধ্য কাজ করা যায়। তদুপরি, ক্ষমতাই দুরধিগম্য পথকে সুগম্য করতে পারে। যেসব রাজনীতিবিদের বিদেশে ব্যাংক একাউণ্ট ও সহায়সম্পদ আছে তারা নিজেদের দেশকে ভয় করে। যেসব রাজনীতিবিদ দেশকে ভয় করে হয়তো তারা দেশের শত্রু নয়তো দেশ তাদের শত্রু। এককথায়, তারা কথায় দেশকে ভালোবাসে এবং বাস্তবে শুধু নিজেদের স্বার্থে দেশকে শোষণ করে নিঃশেষ করার ফন্দিফিকিরে ও চাতুর্যপূর্ণ কাজে মেতে থাকে। তারা ঘাসে লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত সাপের মতো। তাদের রাজনীতি দেশ ও জনগণের জন্যে বিষবৎ বা বিষতুল্য। বিষপানে যেমন মৃত্যুবরণ করতে হয় তাদের রাজনীতিতেও তেমনি দেশ উচ্ছসিত ও উজ্জীবিত হতে পারে না। রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক নেতাদের মুখে প্রবাদ শুনা যায়। আমরাও প্রবাদ বলি। প্রবাদ হচ্ছে তিক্ত বাস্তবতার নির্যাস। এনির্যাস দিবালোকের মতো সত্য। এটার সাথে বাস্তবতার কোন অমিল থাকে না। একেকটি প্রবাদ একেকটি আলোকবর্তিকা ও জ্ঞানমার্গ। কয়লা ধুলে ময়লা যায় না–এটা একটি প্রবাদ। সাধারণভাবে বুঝা যায় যে, কয়লা কালো বিধায় এটাকে যতোই ধোবে ততোই কালো পানি বের হবে, অন্যবর্ণের কিছুই বের হবে না।

www.pathagar.com

বাস্তবে এপ্রবাদটি মানুষের আত্মভাব ও স্বভাবের প্রতি ইংগিত দিয়েছে। স্বভাব একবার খারাপ হলে তা সহজে ভালো করা যায় না আর খারাপ স্বভাব থেকে ভালোকিছু আশা করা যায় না। আমাদেরকে দেখতে হবে যে, যারা রাজনীতি করে তাদের স্বভাবচরিত্র কি। তাদের স্বভাবচরিত্র ভালোতো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে এগরীব দেশটি বিকশিতভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারছে না কেন? তাই, রাজনীতিবিদদের উচিত প্রবাদের জ্ঞানমার্গ, অর্থাৎ ত্রাণের পথের জ্ঞানানুযায়ী জীবনপরিচালনা করা।

রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক নেতারা কাকেও তাদের দলের মনে করে একরকম কথা বললে এবং পরক্ষণে তাকে অন্যদলের জেনে অন্যরকম কথা বললে তাদের মনমানসিকতা ও চিন্তাচেতনা যে অতি নীচ এবং তারা যে পুরোপুরিভাবে পক্ষপাতদুষ্ট ও একচোখো তা এমনিতেই প্রমাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলছি যে, কোন এক নেতা হাসপাতালে আহত সাংবাদিকদেরকে দেখতে গেলো এবং তার সাথে আরো অনেক নেতা ও সাংবাদিক থাকলো। সে গুরুতরভাবে আহত একজন সাংবাদিকের পাশে দাঁড়িয়ে তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করলো এবং আল্লাহ্‌র কাছে তার আশুমুক্তি কামনা করলো। তার কাছ থেকে সরে গিয়ে সে যখন জানলো যে, সে তাদের দলের সমর্থক নয় সে তখন বললো যে, ভালো হয়েছে, উচিত শিক্ষা পেয়েছে, আরো খেলেই হতো। কোন নেতার কাছ থেকে কেউই নীতিগতভাবে অন্তত এরকম ক্ষেত্রে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ প্রত্যাশা করে না। তাই, রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক নেতারা যে যেদলেরই হয়–না–কেন নীতিগতভাবে তাদের মধ্যে কোন ঈর্ষান্বিত ও বৈষম্যমূলক আচরণ না থাকাটাই নেতৃত্বের পক্ষে, সবার মতে, শোভনীয়। রাষ্ট্রপরিচালনের ক্ষেত্রে পরিচালকেরা বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সুপরামর্শ পেয়ে থাকে। সুপরামর্শে অনর্থক ও বাহুল্য কথা থাকে না এবং তা হয় সহজসরল ও সুস্পষ্ট। এসব পরামর্শদাতারা রাষ্ট্রপরিচালকদের সাথে কোন প্রয়োজন ছাড়া মেলামেশা ও যোগাযোগ পছন্দ করে না। অপরদিকে, একধরনের পরামর্শদাতার দল আছে যারা কারণেঅকারণে রাষ্ট্রপরিচালকদের সাথে মেলামেশায় ও যোগাযোগে রত থাকে। তারাও রাষ্ট্রপরিচালকদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকে। এসব পরামর্শের মধ্যে কুপরামর্শও থাকে। একুপরামর্শের কারণে বিভিন্ন কাজে প্যাঁচ লেগে যায় এবং জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তাই, রাজনীতিবিদদেরকে সুপরামর্শ ও কুপরামর্শের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়পূর্বক কাজ করার মতো ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হয়। আমাদের দেশে আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি যে, রাজনীতিবিদেরা প্রকৃতপ্রস্তাবে বা আদতে তেমনকোন কাজ করছে না। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা সভা, বৈঠক, উদ্বোধন, উন্মোচন, বক্তৃতা, দরবার, সলাপরামর্শ, স্বার্থসিদ্ধি, দলীয় ব্যাপার ইত্যাদিতে নিরত ও নিবিষ্ট থাকে।

www.pathagar.com

তাদের এনিরতি ও নিবিষ্টতা দেখে মনে হয় যে, এগুলোই হচ্ছে ক্ষমতাসীনদের মুখ্য কর্ম। একেবারে আসলার্থে এগুলো হচ্ছে অতিশয় গৌণ কর্ম। নিজেরা কাজ না করে অন্যান্যকে কাজ করার জন্যে অনুপ্রেরণা দিলে তা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। আমিত্ব, বাহাদুরি ও গলাবাজি কোন বাস্তবসম্মত কাজ নয়। অথচ, আমাদের রাজনীতিবিদেরা এগুলোর পেছনে তাদের সময় ব্যয় করছে। এপ্রসঙ্গে সংসদের অধিবেশনের কথা এসে যাচ্ছে। সংসদ হচ্ছে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের আইনপ্রণয়নের, বিভিন্ন জাতীয় সমস্যাসমাধানের এবং সার্বিক জাতীয় বিষয়ে আলাপআলোচনার ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌছার একটি সর্বোচ্চ ফোরাম। এখানেও দেখা যায় যে, আমাদের রাজনীতিবিদেরা আমিত্বে, বাহাদুরিতে ও অপ্রাসঙ্গিক বক্তৃতায় সময় নষ্ট করে। দেশকে ভালোবাসলে এবং দেশ ও জনগণের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করার সদিচ্ছা থাকলে রাজনীতিবিদেরা সহজেই আমিত্ব, বাহাদুরি ও অপ্রাসঙ্গিক বক্তৃতা অপনয়ন ও পরিহার করে চলতে পারে। জাতীয় স্বার্থে তারা এসব দূষণীয় ও নিন্দনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে সতত মুক্ত থাকা জরুরী।

আমাদের বর্তমান আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধ। অতীত থেকে ভূয়োদর্শন বা অভিজ্ঞতা নিয়ে বর্তমানে ভবিষ্যতের জন্যে প্রতিটি কাজ সুসম্পন্ন করতে হয়। অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ও চটাচটিতে বাহাদুরির কিছুই নেই। তবে, অতীত জানতে হয় এবং বর্তমানে কোন কাজে প্রয়োজন হলে অতীতের কোনকিছুকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যায়। অথচ, আমাদের রাজনীতিবিদেরা সর্বসময় অতীত নিয়ে, নিষ্প্রয়োজনে বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে, ঘাঁটাঘাঁটি করতে খুব পছন্দ করে। তারা বিস্মৃত যে, পচা জিনিস যতোই ঘাটে তা থেকে ততোই দুর্গন্ধ বের হয়। তারা অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে সবকিছু অতীতের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দোষমুক্ত থাকতে চায়। এটা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থায় তাদের অজ্ঞাতে একটি বড় বাধা। ভবিষ্যতে মহৎ কাজের জন্যে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে সময় নষ্ট না করে এবং অতীতের ওপর সবকিছু চাপানোর প্রবণতা পরিহার করে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে ভবিষ্যতের জন্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া। দোষ ঢাকার ও পরের ঘাড়ে তা চাপানোর চেষ্টার কোন যৌক্তিকতা নেই। দোষ ঢাকতে গেলেও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। তাতেও তা ঢাকা যায় না, বের হয়ে পড়েই। অন্যের ঘাড়ে নিজের দোষ চাপালে সে তা ঝেড়ে ফেলেই। তাই, শতচেষ্টা করেও নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে রাখা যায় না। আমাদের রাজনীতিবিদেরা নিজেরা সর্বসময় দোষমুক্ত থাকতে চায়। ফলে, তারা নিজেদের দোষ ঢাকাঢাকিতে ব্যতিব্যস্ত। যেহেতু দোষ ঢাকাই যায় না সেহেতু তারা তা অকপটে স্বীকার করার গুণ অর্জন করলে তাদের মনকে কিছুটা হলেও উদার ও বড়

www.pathagar.com

করতে পারে। তাদের এতোটুকু উদারতা ও বড়ত্ব আমাদের রাজনৈতিক পরিবেশকে অনেকটা উন্নত করতে পারে।

বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে প্রগতিশীলতা সম্ভব নয়। প্রগতিশীলতার জন্যে বাস্তবতার নিরিখে কাজ করতে হয়। বাস্তবতার সাথে নিজের ধ্যানধারণার মিল না থাকলে সেটাকে এড়িয়ে প্রগতিশীলতার দোহাই দিয়ে সফলতা অর্জন করা যায় না। তারাই সত্যিকারের প্রগতিশীল যারা বাস্তবতা ও প্রাকৃতিক অবস্থাকে কোনভাবেই উপেক্ষা করে না। রাজনীতিতে এটা এক বড় গুণ। এগুণে গুণান্বিত রাজনীতিবিদ হতে হলে বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। উন্নত দেশের মতো উন্নত হয়াটা আমাদের অভিলাষ। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা উন্নত দেশগুলো ভ্রমণ করে সেসব দেশের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। বাস্তবে তারা সেঅভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছে না। তারা তা কাজে লাগাতোতো আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকতো, তাদের মধ্যে বারবার দল পাল্টানোর প্রবণতা থাকতো না এবং দেশ ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতো। প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না যে, রাজনৈতিক নেতারা কোন অপরাধ করছে। কিন্তু, তাদের কর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে অপরাধ করছে ও ধরা পড়ছে। নেতা ভালো হলে কর্মী খারাপ হয়ার কথা নয়, কেননা কর্মীরা নেতাদের আদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ করে। একদিকে নেতারা অপরাধমুক্ত থাকছে,অপরদিকে কর্মীরা অপরাধ করছে। এতে এটা পরিষ্কার যে, নেতারা অপরাধ না করলেও তাদের নির্দেশ ও ইঙ্গিতেই কর্মীরা অপরাধ করছে। একদিকে অপরাধ না করে অপরদিকে পরামর্শ ও ইঙ্গিত দিয়ে অপরাধ করালে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধীই হতে হয়। নেতাদেরকে সেদিনই অপরাধমুক্ত ভাবা যাবে যেদিন তাদের কর্মীরা অপরাধমুক্ত হবে।

সাধারণত, কখনোকখনো বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। বিরোধী দলগুলো সম্মিলিতভাবে নির্বাচনে না গেলে পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়? তারা স্বস্ব দলের ম্যানিফেস্টোর ভিত্তিতে নির্বাচনে যায়। এতে দলীয় ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী প্রচারাভিযান চলে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দাবিগুলো গৌণ হয়ে পড়ে। নির্বাচনে যেদল ক্ষমতায় আসে সেদল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দাবিগুলো কার্যকর না-ও করতে পারে, কেননা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এমনকোন শর্ত না-ও থাকতে পারে যে, যেদল নির্বাচনে ক্ষমতায় আসবে সেদল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দাবিগুলো যথাযথভাবে কার্যকর করবে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে ক্ষমতাসীন দলের পতন ঘটানো। ক্ষমতাসীন দলের পতন ঘটলে পরবর্তীতে ঐক্যবদ্ধ দলগুলো তাদের স্বস্ব অস্তিত্বে চলে যায়। ফলে, দলীয় ম্যানিফেস্টোর কার্যকারিতা এসে যায়। রাজনৈতিক দলগুলো কথায়কথায় রাজপথে আন্দোলনের কথা বলে। শতকরা

www.pathagar.com

নব্বই জন লোক গ্রামে বাস করে। রাজধানীতে, নগরে ও শহরে যারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত তাদের অধিকাংশের আবাসস্থল গ্রামে। তাদের মুখ দিয়ে গ্রাম্যপথে আন্দোলনের কথা নিঃসৃত হয় না। তাই, এটা পরিষ্কার যে, রাজনীতিবিদেরা রাজধানী, নগর ও শহরকেন্দ্রিক এবং তারা মুখেমুখে গ্রাম ও গ্রামের লোকজনের কথা বললেও গ্রামের পরিবর্তন এবং গ্রামের লোকজনের ভাগ্যোন্নয়ন হচ্ছে না। এজন্যে রাজনীতিবিদদেরকেই দায়ী করা চলে, কেননা তারাই জনগণের মুখপাত্র। রাজনীতিবিদেরা সহজে অনেককিছু বলতে পারে; কিন্তু সহজে ভালোকিছু করতে পারে না। মানুষমাত্রই ভুল আছে। মানুষের ভুল না হতোতো তারা ফেরেশতাই হতো। তাই, ভুল স্বীকার করাটা মহত্ত্বের লক্ষণ। বাস্তবে আমরা দেখছি যে, শুধু বড়বড় ব্যাপারে নয় ছোটছোট ব্যাপারেও নিজের ভুল স্বীকার করে সংশোধন না করে অন্যে ভুল করছে বলছে এবং অন্যের ভুলের পেছনে ধাবিত হচ্ছে। রাজনীতিতে সফলকাম হতে হলে নিজের ভুল নিজে স্বীকার করে সংশোধন করে নিতে হয় এবং অন্যে ভুল না করলেও খামখা বলতে নেই যে, সে ভুল করেছে। রাজনীতিবিদেরকে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়েও ভাবতে হয় এবং পরিবেশ দূষণের কবল হতে জনগণকে নিরাপদে রাখার জন্যে কাজ করতে হয়। অপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডই পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। সরকার ও জনগণের প্রতিটি কাজ পরিকল্পিত উপায়ে হলে পরিবশে দূষণ থেকে পরিত্রাণ পায়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই ম্যানিফেস্টো আছে। সব রাজনৈতিক দলের একটি ম্যানিফেস্টো হতোতো এতো রাজনৈতিক দল না থেকে একটি রাজনৈতিক দলই থাকতো। এতো রাজনৈতিক দল থাকার অর্থই হলো এক রাজনৈতিক দলের ম্যানিফেস্টোর সাথে অপর রাজনৈতিক দলের ম্যানিফেস্টোর মিল নেই। প্রত্যেক দল তাদের ম্যানিফেস্টোকে সামনে রেখেই রাজনৈতিক ময়দানে বা মঞ্চে আবির্ভূত হয়। এমঞ্চে অভিনয় করে যেদল ক্ষমতাসীন হয় সেদল তাদের ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী কাজ করার ম্যানডেট বা রায় পায়। ফলে, যেসব দল ক্ষমতাসীন হতে পারে না তারা তাদের ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী কাজ করার জন্যে আন্দোলন, হরতাল বা যেকোন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি বলপ্রয়োগ করতে পারে না। যে রাজনৈতিক দল যেটা চায় সেদল নির্বাচনে অধিকাংশ জনগণের রায় পেয়ে ক্ষমতাসীন হয়ে সেটা করাতে অন্যকোন দলের আপত্তি থাকতে পারবে না বা থাকবেও না। যখন কোন দল ক্ষমতাসীন না হয়ে বা সেদলের সমর্থকরা ক্ষমতাসীন দলকে তাদের মতানুযায়ী কাজ করতে বিভিন্নভাবে বিশৃঙ্খলায়, উচ্ছৃঙ্খলতায় ও আইনবিরোধী কার্যকলাপে মেতে থাকে তখন জনগণের নিকট এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তারা কখনো ক্ষমতাসীন হতে পারবে না ভেবে যারা ক্ষমতাসীন তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে ও স্থিরচিত্তে দেশের কাজ

www.pathagar.com

করা থেকে বিরত রেখে দেশকে অরাজকতা ও নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিয়ে ফায়দা লুটতে চায়। এধরনের রাজনৈতিক দলগুলো শেষপর্যন্ত তাদের ধিক্কৃত ও ভর্ৎসিত কার্যকলাপের কারণে জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত ও বর্জিত হয়। তাই, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাদের প্রশংসনীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে জনগণ কর্তৃক বরণীয় ও গ্রহণীয় হবার পথ বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করাটাই হবে গৌরবের অধ্যায়।

দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীরা উচ্ছৃঙ্খলতায় ও আইনবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খলতায় ও আইনবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হয়ে দেশের অপকার ছাড়া উপকার করা যায় না। উচ্ছৃঙ্খল ও আইনবিরোধী নীতি রাজনীতি নয়। এটা হলো যেকোনভাবে ক্ষমতাদখলের নীতি। যেকোনভাবে ক্ষমতাদখলের নীতির মাধ্যমে রাজনীতি দেশপ্রেম নয়, ক্ষমতাপ্রেম। ক্ষমতাপ্রেমিকেরা ক্ষমতা পায়ার ও তাতে টিকে থাকার চাতুরিতে ও ফন্দিফিকিরে মগ্ন থাকে। বস্তুত, দেশ নিয়ে ভাবার সময় তাদের থাকে না। তারা শয়নেস্বপনে শুধু ক্ষমতার কথাই ভাবে। তাদের এমন অবস্থা হয় যে, তারা ক্ষমতার জন্যে সবকিছুই করতে পারে। মিরজাফর ক্ষমতার জন্যেইতো বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। সে কি ক্ষমতায় থাকতে পেরেছিলো এবং স্বাধীনতা কি টিকেছিলো? সে ক্ষমতার থাকতে পারেনি এবং স্বাধীনতাও টিকেনি। যেক্ষমতার কারণে নিজের স্বকীয়তা হারাতে হয় সেক্ষমতার কোন মূল্য নেই। এরকম ক্ষমতার চেয়ে ক্ষমতাহীন জীবন অনেক শ্রেয় ও নিরাপদ। যারা দেশকে সত্যিকারার্থে ভালোবাসে এবং দেশের অগ্রগতি ও উন্নতির সাথেসাথে জনগণের হিত চায় তারা এরকম ক্ষমতা কামনা করতে বা ক্ষমতার প্রতি মোহাচ্ছন্ন বা মোহাবিষ্ট হতে পারে না। এটা তাদের পক্ষেই সম্ভব যাদের নিকট স্বকীয়তা মূল্যহীন এবং যারা দেশ ও জনগণকে ভালো না বেসে শুধু নিজেদেরকে বুঝে এবং দেশ ও জনগণের উর্ধ্বে ক্ষমতাকেই প্রাধান্য দেয় ও ক্ষমতার জন্যে স্বাধীনতাও হারিয়ে পরাধীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ হতে পারে। এরা নামে রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মী হলেও দেশের ঘোরতর শত্রু। জনগণ এদেরকে প্রথমপ্রথম বুঝতে না পারলেও পরবর্তীতে আস্তেআস্তে হলেও বুঝতে পারে এবং বর্জন করে।

রাজনীতিবিদেরা সত্যিকারার্থে দেশ ও জনগণের হিত কামনা করলে তারা কখনো বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা এবং ক্ষমতাসীন দলের কোন কাজেই খুব কায়দা করে হলেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। সাধারণত, যারা যেভাবে চায় তারা সেভাবে না পেলে সরকার বা ক্ষমতাসীন দলের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে। বিরোধী দলগুলো এধরনের অসন্তুষ্টিকে সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারে। রাজনীতিতে বিরোধী দলের বিরোধের অর্থ ক্ষমতাসীন দলের সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়া নয়। এটার অর্থ হচ্ছে

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গিতে ও ধ্যানধারণায় সঠিক ও নিরপেক্ষ কাজ না করলে তা যে সঠিক ও নিরপেক্ষ নয় তা তারা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সেদলকে বুঝিয়ে দেয়া ও জনগণকে জানতে দেয়া যাতে তারা তাদেরকে পরবর্তী নির্বাচনে তা করার জন্যে অত্যধিক ভোটে অদম্যভাবে নির্বাচিত করে। বিরোধিতার এমাপকাঠির বাইরে বিরোধী দলগুলো যারা সরকারের বিরুদ্ধে নানা কারণে অসন্তোষে থাকে তাদেরকে উচকিয়ে দিয়ে সমর্থন দিতে থাকলে সরকার স্থিরতার অভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজকর্মসম্পাদন করতে পারে না। ফলে, সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন, হরতাল, অসহযোগিতা ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে ও ঘটনায় পরিণত হয়। তাই, অন্যায় কাজে বিরোধী দলগুলো কাকেও সর্মথন না দিলে সন্ত্রাস, আন্দোলন, হরতাল ও কোনপ্রকার নাশকতামূলক কাজ হতে পারে না। রাজনীতিবিদেরা দেশপ্রেমিক হলে ও দেশের স্বার্থে রাজনীতি করলে ক্ষমতাসীন দলকে জব্দ করার জন্যে কখনো অন্যায়কে সর্মথন দিতে পারে না। বিরোধী দলগুলো ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনায় অতিব্যস্ত থাকে এবং পদেপদে ওদলের ত্রুটিবিচ্যুতি উল্লেখ করে ওদলকে ক্ষমতায় থাকার অযোগ্য ঘোষণা দেয়। এককথায়, ক্ষমতাসীন দলের প্রায়সব কর্ম ও কর্মপন্থাই বিরোধী দলগুলোর নিকট অপছন্দনীয় হয়ে থাকে। কিন্তু, কোন বিরোধী দল ক্ষমতাসীন হলে সেদল ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার মানসে ক্ষমতাচ্যুত দলটির কর্মপন্থাই ঘুরিফিরিয়ে অন্যভাবে গ্রহণ করে। এটা হচ্ছে নতুন বোতলে পুরোনো মদ রাখার অবস্থা। এতে এটা দেদীপ্যমান যে, সব রাজনীতিবিদের একই উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতাসীন হয়ে তাতে টিকে থাকার জন্যে নিজেদের পছন্দানুযায়ী কর্মপন্থা অবলম্বন করা। তাই, রাজনীতিবিদেরা আগপাছ ভেবে সবকিছু বিচারবিশ্লেষণ করে একে অপরের সঠিক সমালোচনা করাটাকে রাজনীতির যথার্থ দর্শনে পরিণত করতে পারলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা থাকে। এসব কারণে যেরাজনীতিবিদ যখন যা বলে তাকে তা মনে রাখার মতো জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়, কেননা তার প্রতিটি কথা হতে হয় যথার্থ এবং তাকে দেখতে হয় যে, তার কথার যথার্থতা জনগণের দ্বারা মূল্যায়িত হয় কিনা। তাই, সে-ই প্রকৃত রাজনীতিবিদ যার কথার যথার্থতা জনগণ কর্তৃক মূল্যায়িত হয় এবং কোন আলোচনাসমালোচনাই অযথা ও অগঠনমূলক হয় না।

বিরোধের বিশেষণ হচ্ছে বিরোধী। বিরোধ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হচ্ছে শত্রুতা, ঘৃণা, বিগ্রহ, লড়াই, ঝগড়াবিবাদ, বিরোধিতা, পারস্পরিক প্রতিবাদ, মতভেদ ও যুক্তিতর্ক। বিরোধী দলের বিরোধ শত্রুতা, ঘৃণা, বিগ্রহ, লড়াই ও ঝগড়াবিবাদ অর্থে নয়। এদলের বিরোধ হচ্ছে বিরোধিতা, পারস্পরিক প্রতিবাদ, মতভেদ ও যুক্তিতর্ক অর্থে। এককে

www.pathagar.com

দলের একেক মতাদর্শ বা কর্মসূচি আছে। ক্ষমতাসীন দল তাদের মতাদর্শ ও কর্মসূচি কার্যকর করে। বিরোধী দলের, একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে, দায়িত্ব হচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শ বা কর্মসূচির ত্রুটিবিচ্যুতি ও অকার্যকারিতা জনগণের নিকট তুলে ধরা এবং নিজেদের মতাদর্শ বা কর্মসূচির স্বপক্ষে জনমত গঠন করা। তাই, উভয় দলের মধ্যে মতভেদ থাকে। এমতভেদের কারণে ক্ষমতাসীন দল যেটা ভালো মনে করে বিরোধী দল সেটা ভালো না-ও মনে করতে পারে। এজন্যে বিরোধী দল যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করবে। এটা কখনো শত্রুতা, ঘৃণা, বিগ্রহ ও লড়াইয়ে রূপান্তরিত হবে না। তা হতে গেলে জনগণ বুঝবে যে, বিরোধী দল বিরোধ বলতে শত্রুতা,ঘৃণা, বিগ্রহ ও লড়াই বুঝে, যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিরোধিতা ও প্রতিবাদ বুঝে না। এ বুঝা ও না বুঝা দু'রকম রাজনৈতিক ধারণার সৃষ্টি করে। একটি হচ্ছে ধ্বংসের রাজনীতির ধারণা, অপরটি হচ্ছে সৃষ্টির রাজনীতির ধারণা। ধ্বংসের রাজনীতিতে স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়া যায় না। এক্ষমতার জন্যে সৃষ্টির রাজনীতির প্রয়োজন। কোন অবস্থাতেই জনগণ ধ্বংস চায় না। তারা চায় সৃষ্টি। যেদল ধ্বংসকে সৃষ্টি মনে করে ও জনগণকে দিয়ে মনে করাতে চায় সেদল জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয় না। জনগণ সেদলকে ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতালিপ্সু মনে করে এবং সেদলের ক্ষমতাসীন হয়া থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট থাকে। ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শ ও কর্মসূচি জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কার্যকর না-ও হতে পারে। কিন্তু, বিরোধী দল শত্রুতা,ঘৃণা, বিগ্রহ ও লড়াইয়ে মেতে থাকলে জনগণ সেঅকার্যকারিতা বুঝে ওঠতে পারে না। তাই, জনগণের দৃষ্টিতে সেঅকার্যকারিতার জন্যে বিরোধী দলই দায়ী হয়ে যায়। সংসদে বিরোধী দল মানেই সুষ্ঠুভাবে একপা সামনে ফেলতে পারলেই ক্ষমতাসীন দল হয়া। এজন্যে বিরোধী দল এমনকোন কাজ করবে না যাতে ক্ষমতাসীন দলের ব্যর্থতা এমনিতেই বিরোধী দলের ওপর বর্তে যায়, বরং বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলের কর্মকাণ্ডের পথ উদারভাবে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দেবে। এতেও ক্ষমতাসীন দল দেশকে জনগণের চায়াপায়া অনুসারে শান্তি, সুবিচার, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি দিতে ব্যর্থ হলে বিরোধী দলের সফলতা আসবেই। তাই, সফলতার জন্যে অত্যাবশ্যক হচ্ছে সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হয়া এবং অশান্তি সৃষ্টির, জনজীবন দুর্বিষহ করার, অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার ও নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার ধ্যানধারণা ও মনমানসিকতা পরিহার করে চলা। বিরোধী দল এসব পরিহার না করলে কোন সময় সরকারী দল বিরোধী দলে পরিণত হলে তারাও এসব পরিহার করবে না। তাই, বিশেষতঃ বিরোধী দলকেই এসব পরিহার করে অগ্রসর হতে হয়।

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যুদস্ত করে ক্ষমতাসীন হয়ার পথ পরিষ্কার করা যায় না। মূর্খ যেমন পণ্ডিত নয় বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী ও আইনশৃঙ্খলা

www.pathagar.com

পরিস্থিতি পর্যুদস্তকারীও তেমনি শান্তিপ্রিয় ও শান্তিকামী নয়। একজন উন্মাদ ব্যক্তি ভালো হলেও যেমন তার মধ্যে উন্মাদনার জীবাণু বিদ্যমান থাকে একজন উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি সুশৃঙ্খল হলেও তেমনি তার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা মাথাচাড়া দেয়ার ব্যাপারটি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। উচ্ছৃঙ্খলতা, জবরদস্তি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, সন্ত্রাস ও অবৈধ অস্ত্রচালনার দ্বারা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেককিছু করা যায়; কিন্তু তাদের মন জয় করা যায় না। তবে, গণতান্ত্রিক রাজনীতির সম্পর্ক হচ্ছে জনগণের মনের সাথে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী হলে জনগণের মনজয়ে বিশ্বাসী হতে হয়। এজন্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গাহাঙ্গামা, জবরদস্তি, সন্ত্রাস ও অবৈধ অস্ত্রচালনা পরিত্যাগ করতে হয়। জনগণ অশান্তিপূর্ণ কার্যকলাপ চায় না। তারা চায় সার্বিক প্রগতির সাথে শান্তি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। তারা দেখে ও বুঝে যে, কারা তাদের এচায়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। যারা এরকম করে তারা তাদের বন্ধু না হয়ে ধীরেধীরে হলেও শত্রুতে পরিণত হয়। এদেশেই যারা যখন জনগণের শত্রুতে পরিণত হয়েছে তাদের তখনি শোচনীয় পতন ঘটেছে। রাজনৈতিক দলগুলোই জনগণের অভিভাবক ও পথপ্রদর্শক। তাই, জনগণের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ এটা সুস্পষ্ট করে দেয় যে, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অভিভাবকত্বে ও সঠিক পথপ্রদর্শনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। একই পাথরে দু'বার হোঁচট খায়া একটি প্রবাদগত অপমান। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, জনগণের কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক ধারায়, রাজনীতিতে এঅপমান নেমে আসতে পারে না। সব সংসদসদস্যই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। ক্ষমতাসীন দলের সম্মুখে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর বিরোধিতা না থাকলে তারা খামখেয়ালী ও যথেচ্ছাচারী হতে পারে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে তাদেরকে খামখেয়াল ও যথেচ্ছাচার থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে একটি শক্ত ও শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই, জনগণ বিরোধী দলের, বিরোধে না জড়িয়ে, প্রয়োজনীয় ও কার্যকর বিরোধিতার মাধ্যমে, জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে, আগামীতে ক্ষমতাসীন হয়ার জন্যে যেসব কাজ করলে জনগণের চিত্তাকর্ষণ করা যায় সেগুলোতে মনোনিবেশ চায়।

আমরা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে রাজনীতি করছি। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বলতে তাদেরকেই বুঝানো হচ্ছে যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতার বিপক্ষে সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাজ করেছে। বর্তমানে এ স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের রাজনৈতিক দল আছে। এদলের মাধ্যমে তারা রাজনীতি করে সাংসদ হয়ে রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছে। লাখলাখ লোকের তাদের প্রতি সমর্থন আছে বিধায় তারা সাংসদ হতে পেরেছে। তাছাড়া, তাদের রাজনৈতিক দলে যেসব কর্মী আছে এবং বর্তমানে যারা তাদের এদলের কর্মী হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের প্রায়সবার জন্মই হয়নি। এদেরকেতো কোন যুক্তিতেই স্বাধীনতাবিরোধী

www.pathagar.com

শক্তি বলা যাচ্ছে না, কেননা এরা এদের স্বাধীন বাংলাদেশকেই বুঝে এবং এরা এদের এস্বাধীনতা রক্ষার জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত। আমি মূল কথাতে ফিরে যাচ্ছি। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিলো তাদেরকে আমরা সহ্য করতে পারছি না, কেননা তারা আমাদের অর্জিত স্বাধীন দেশে আমাদের সাথে বসবাস করছে। আমাদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের অবিচারঅত্যাচার, শাসনশোষণ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাশপাতাল বৈষম্যের অবসান ঘটানো। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি; কিন্তু এসবের অবসান ঘটেনি। তাই, আমাদের সংগ্রাম হতে হবে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যকে সফল করার সংগ্রাম। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যকে সফলকাম করা। এটার সফলতার পথে রয়েছে একই ধরনের প্রতিবন্ধকতা। সেগুলো হচ্ছে অবিচারঅত্যাচার, শাসনশোষণ এবং সমাজে বিভিন্নস্তরের লোকের মধ্যে আকাশপাতাল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্য। দেশ ও দেশের জনগণকে সত্যিকারার্থে ভলোবাসলে এবং তাদের জন্যে অবিচারঅত্যাচার, শাসনশোষণ এবং সমাজে বিভিন্নস্তরের লোকের মধ্যে আকাশপাতাল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করতে চেলে সত্যিকারের রাজনীতির মাধ্যমে এগুলো যাদের সৃষ্টি তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। তা না হলে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য পণ্ড হতেই থাকবে। এগুলো যাদের সৃষ্টি তাদেরকে রাজনীতিবিদেরা চিনে ও জানে। এচিনা ও জানা সত্ত্বেও তাদেরকে প্রতিহত করার কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বাস্তবে এদেরকে প্রতিহত করার অর্থই হবে নিজেদেরকে প্রতিহত করা। রাজনীতিবিদ ও আন্দোলনকারীরা নিজেদেরকে প্রতিহত করতে পারছে না। এটার অর্থ এ দাঁড়াচ্ছে যে, জনগণকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে তারাতারাই স্বাধীনতার ফলভোগ করে যেতে চাচ্ছে আর স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বলেবলে জনগণকে বোকা বানাচ্ছে

মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং স্বাধীনতা তাদের জন্মগত অধিকার। তাই, সবাই স্বাধীনতা চায় এবং বিশ্বের নানা স্থানে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম চলছে। কেউ পরাধীনতা চায় না। তবে, স্বাধীনতা বলতে স্বেচ্ছাচারিতা ও আইনকানুনবহির্ভূত পন্থায় যার যা খুশি সে তা করা নয়। তারপরো আমরা আমাদের দেশে স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের কথা শুনছি। এধরনের কোন চক্র থাকলে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে সেটাকে নিবৃত্ত ও প্রতিহত করা অত্যাবশ্যক। তবে, আমাদেরকে দেখতে হবে যে, যারা স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের আওয়াজ বা জিগির তোলে তারা কারা, তাদের অতীত কি এবং তারা বর্তমানে কি প্রক্রিয়ায় কি কাজ কেন করতে চায়। এপ্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, স্বাধীনতার সুফল শুধু মুষ্টিমেয় লোকের জন্যে নয়। এটার সুফল প্রতিটি নাগরিক ভোগ করতে পারতে হয়। এদিক দিয়ে আমাদেরকে দেখতে হবে যে, যারা স্বাধীনতাবিরোধী

www.pathagar.com

চক্রকে প্রতিহত করার কথা বলছে তারা অন্যান্যের তুলনায় স্বাধীনতার সুফল কতোটুকু ভোগ করছে এবং যারা অন্যান্যের মাথায় বসে একচেটিয়াভাবে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করে চলছে তাদের ব্যাপারে যোগবিয়োগ করে দেখতে হবে যে, তারা কি স্বাধীনতাপক্ষীয় চক্র, না স্বাধীনতাবিরোধী চক্র। তাই, কেউ স্বাধীনতাবিরোধী চক্রে থাকলে শুধু তাকে প্রতিহত করলে চলবে না, যারা শুধু নিজেরাই একচেটিয়াভাবে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করে চলছে তাদের ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ তাদেরকেও প্রতিহত করতে হবে। এখানে এবিষয়টি উল্লেখ করা অতীব প্রয়োজন যে, স্বাধীনতার বিরোধিতা হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহিতা যেটার, দণ্ডবিধির ১২১ ধারা মোতাবেক, শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তবে, উপযুক্ত আদালতে মকদ্দমা করে এটা প্রমাণ করতে হয়। তাই, মাঠেময়দানে ও রাজনৈতিক মঞ্চে উপস্থিত বক্তৃতায় ও কাগজে খেয়ালখুশি অনুযায়ী লেখাতে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির বা চক্রের কথা বলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টি করে দেশে কলহবিবাদ জিয়ে রাখাটা সম্পূর্ণরূপে অনভিপ্রেত। যারা স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের কথা বলে তাদেরই, তারা সত্যিকারার্থে দেশকে ভালোবাসলে এবং তাদের মধ্যে কোনপ্রকার বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা না থাকলে, পবিত্রতম দায়িত্ব হচ্ছে যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করে রাষ্ট্রদ্রোহী হয় তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে মকদ্দমাদায়েরপূর্বক তা প্রমাণ করে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়ানো। একদিকে স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের কথা বলে অপরদিকে উপরোক্ত পন্থায় যারা এরকমকোন চক্র থেকে থাকলে সেটার সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর না হলে জনগণ বুঝে নেবে যে, তারা ব্যক্তিগত আক্রোশে ও শত্রুতার কারণে একথা বলে। বাস্তবে মহৎ, সৎ ও যোগ্য রাজনীতিবিদদের মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও শত্রুতা থাকতে পারে না। যারা ব্যক্তিগত আক্রোশ ও শত্রুতা পোষণ করে রাজনীতি করে তাদের থেকে দেশ ও জনগণের কোনপ্রকার মঙ্গল আশা করা যায় না।

ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে এপ্রবণতা দেখা যায় যে, তারা অবৈধভাবে হলেও সর্বক্ষেত্রে খুঁটি শক্ত করে গাড়ার জন্যে কাজ করে। ক্ষমতায় শক্তভাবে টিকে থাকার জন্যে একাজটি করা হয়। কিন্তু, ক্ষমতার অপব্যবহার হতে থাকলে এসব খুঁটি কোনভাবেই ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে পারে না। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দেশ ও জনগণের স্বার্থে ক্ষমতাসীন দলের এআদর্শ থাকতে হবে যে, তাদের হাতে ক্ষমতা থাকুক বা তাদের হাত থেকে তা চলে যাক তারা দুর্নীতিমুক্তভাবে ন্যায়ানুগ কাজ করে যাবে। অন্যায় কাজ আদায়ের জন্যে এদিকসেদিক নানা চালাকি করতে হয়। কখনোকখনো ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রীদের কেউকেউ একাজ আদায়ে নির্বাহীপ্রধানের নাম ব্যবহার করতেও ইতস্তত করে না। নির্বাহীপ্রধান অন্যায়ভাবে হলেও কোন একটি কাজ চায় তা শুনলে কোন সরকারী কর্মকর্তা বা অন্যকেউ সাধারণত তা না করে পারে

www.pathagar.com

না। অথচ, এটা নির্বাহীপ্রধান ও ক্ষমতাসীন দলের জন্যে সুফলদায়ক নয়। এতে নির্বাহীপ্রধানের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এবং ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ দানাবাঁধতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত তাদের পতন ঘটে।

আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করছি। কিন্তু, আমাদের দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে কৃত্রিম পরিবেশে ঢুকে পড়ে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে আসাটাকে স্বাস্থ্যহানিকর মনে করে। যেসব রাজনীতিবিদের এমন চিত্তবৃত্তি ও মানসিকতা তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থ ও আরামআয়েশ। বর্তমানে বাংলাদেশে কোন রাজনৈতিক দলকেই জনগণ মনেপ্রাণে ভালোবাসতে পারছে না, কারণ তাদের কারোরই কথায় ও কাজে মিল বা সংগতি পায়া যাচ্ছে না। জনগণ সেদিন সেদলকেই মনেপ্রাণে ভালোবাসবে যেদিন যেদলের কথা ও কাজ অচ্ছিন্ন ও অভিন্ন হবে। যেখানে কোন দলকেই জনগণ মনেপ্রাণে ভালোবাসে না সেখানে কি করে কোন-না-কোন দল নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়? এপ্রসঙ্গে একটি প্রবাদ বলতে হচ্ছে যে, 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'। তাই, অধিকাংশ জনগণ তুলনামূলকভবে যেদলকে নির্বাচনে সমর্থন দেয় সেদলই ক্ষমতাসীন হয়।

ক্ষমতাসীনেরা দুর্যোগদুর্বিপাকে যত্রতত্র ছুটে যায় এবং সাহায্যসহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করে। তাদের ঘোষণায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাজ সম্পাদিত হয়। তাদের হাত দিয়ে কল্যাণের কাজে বহু টাকা ব্যয়িত হয়। তারা মানুষের খোঁজখবর নেয়ার জন্যে দেশের সব অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। তারা তাদের ব্যক্তিগত টাকাপয়সা দিয়ে এসব করে না। রাষ্ট্রের টাকাপয়সা দিয়েই তারা এসব করে। রাষ্ট্রের সব কাজই রাষ্ট্রের টাকায় হয়। কিন্তু, তারা বলে থাকে যে, এসব তারাই করে। তাদের এবলাতে এটা ফুটে ওঠে যে, তারা তাদের ব্যক্তিগত বা নিজস্ব সম্পদ ব্যয় করে এসব করে। কেউ নিজের সম্পদ ব্যয় করে এসব করলে ক্ষমতাসীন হবার আগে বা ক্ষমতা চলে গেলে করতে পারে। কিন্তু, তা করে না। তাই, এটা পরিষ্কার যে, ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করে এসব করে। ক্ষমতাসীন হলে সবাই রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করে এরকম করতে পারে। কাজেই, ক্ষমতাসীনেরা নিজেরা করে এটা না বলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ দিয়ে করে বললে তাদের অহমিকা ও দম্ভ অনেকটা কেটে যায় বিধায় তারা অনেকটা সত্যানুরাগী বা সত্যাশ্রয়ী হতে পারে। এজন্যে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা রাষ্ট্রীয় কাজে নিজেদেরকে প্রকাশ না করে রাষ্ট্রকে প্রকাশ করলে তাতে জনগণের অংশীদারিত্ব এসে যায়। টাকা খরচ করে এবং কোন-না-কোন দ্রব্য বিতরণ করে জনসভাতে লোকজন হাজির করা হয় এবং তাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন কারণে ও শ্রমিকেরা উৎপাদন বন্ধ রেখে হাজির হয়। সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তারা তা

www.pathagar.com

আয়োজনের কাজে অতিশয় ব্যস্ত থাকে। এটা একটি অবাঞ্ছিত কাজ। যেসব রাজনীতিবিদ মঙ্গলসাধন বা হিতসাধনের জন্যে রাজনীতি করে তারা এরকম কাজ পছন্দ করতে পারে না।

যারা নিজেদের দলত্যাগ করে ক্ষমতাসীন দলে যোগ দেয় বা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে কাজ করে তারা ক্ষমতাসীন দলের জন্যে বেশি অনিষ্টকর বা ক্ষতিকর হয়। ওরাই দলত্যাগী যাদের আদর্শ বলতে কিছু নেই। তাদের একমাত্র আদর্শ হচ্ছে যেকোনভাবে স্বার্থসিদ্ধি করা। তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে করতে পারে না এমনকোন কাজ নেই। তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্যতম চরিত্রের। তাদের সর্বসময় একহাত ওপরে ও একহাত নিচে থাকে। তারা তাদের প্রয়োজনে ওপরের হাত নিচে নামিয়ে পা জড়িয়ে ধরতে পারে এবং সুযোগে নিচের হাত ওপরে ওঠিয়ে দু'হাত দিয়ে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে পারে। কোনকোন রাজনীতিবিদ হাসিঠাট্টা করে বলে যে, তাদের আদর্শ ও নীতি হচ্ছে কাজ করা আর কাজ করার জন্যেই তারা যখন যেদল ক্ষমতাসীন হয় তখন সেদলে যোগ দিয়ে থাকে। তাদের এযুক্তিটি কেমন? সব রাজনীতিবিদ একই আদর্শে ও নীতিতে কাজ করবেতো এতো রাজনৈতিক দল কেন? শুধু ইসলামেই আদর্শ ও নীতি এক ও অভিন্ন। এপ্রসঙ্গে ইসলামের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দল গজিয়ে থাকার প্রশ্নটি অবশ্যই জাগে। যারা ইসলামের ওপর বিভিন্ন দল সৃষ্টি করছে তাদের মধ্যে ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যের অভাব। তাই, তাদের মধ্যে বিভিন্নতা কাজ করছে। এটা এজন্যে হতে পারে যে, তারাও একে অপরকে সহ্য করতে পারছে না, প্রত্যেকেই প্রাধান্য পেতে ও ক্ষমতাসীন হতে চাচ্ছে, প্রত্যেকের মধ্যে অহম বা আমিত্ব কাজ করছে, একজন অপরজনকে অবমূল্যায়ন করছে, প্রত্যেকেই ইসলামের ত্রাণকর্তা বলে নিজেকে প্রকাশ করতে চাচ্ছে ইত্যাদি। অথচ, এসব ইসলামের পরিপন্থী। ফলে, সাধারণ লোক বিভ্রান্তিতে। তারা বুঝে ওঠতে পারছে না যে, কারা ঠিক এবং কারা ঠিক নয়। অথচ, আল্লাহ্‌তায়ালা সূরা আল-এমরানের ১০৩ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলছেন, "তোমরা দলেউপদলে বিভক্ত না হয়ে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে, অর্থাৎ দীনকে, শক্তভাবে ধর।" আমাদের আলেমসমাজ দলেউপদলে বিভক্ত হয়ে আছে। তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না। নবীকরিম (সঃ)এর সাহাবায়েকেরামরা দলেউপদলে বিভক্ত ছিলেন না। তাঁরা নবীকরিম (সঃ) এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তাই, তাঁরা দীন, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলাম, যে শান্তি তা প্রমাণ করে গেছেন। যেপর্যন্ত আমাদের আলেমসমাজ ঐক্যবদ্ধ না হবে সেপর্যন্ত তারা যতো নসীহতই করবে-না-কেন মোসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে বলে ইসলামের আলোকে আমার বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া, আল্লাহ্ ইসলামের ভিত্তিতে গঠিত এমনকোন দলকে ক্ষমতাসীন করে তাঁর মনোনীত ধর্মের ওপর ধর্ম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারহীন লোককে দিয়ে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করাবেন না।

www.pathagar.com

দলছুট রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীরা ক্ষমতাসীন দলে যোগ দিলেও বস্তুত সেদলের অগ্রগতিতে মর্মাহত বা হৃদয়ে নিদারুণ আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং সেদলের পশ্চাৎপদতা দেখলে মনেমনে উৎফুল্ল বা আনন্দে তন্ময় হয়। তাই, তারা খুব কায়দা করে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের পাশেপাশে থাকে এবং এসব রাজনীতিবিদের সুবিধা সৃষ্টি করে এদের দ্বারা দুর্নীতিমূলক, অবৈধ ও বেআইনী এবং অন্যান্যের ক্ষতি হয় এমনসব কাজ করিয়ে নেয়। তাছাড়া, ক্ষমতাসীন দলো অন্যান্য দলের প্রধানপ্রধান নেতা ও কর্মীদেরকে নিয়ে ওদলের শক্তিসামর্থ্য ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে চায়। ওদল মনে করে অন্যান্য দলের এসব নেতা ও কর্মী ওদলে এসে গেলে সেসব দল শক্তিহীন ও হীনবল হয়ে পড়বে এবং ওদলকে অন্যান্য দল খুবসহজে ক্ষমতাচ্যুত বা ক্ষমতা হতে অপসারণ করতে পারবে না। বাস্তবে এচিন্তাচেতনা ওদলের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত অন্যকিছু নয়। আগ্রহাতিশয় ও ঐকান্তিকতা দেখিয়ে অন্যান্য দলের নেতা ও কর্মীদেরকে নিজেদের দলে আনার অর্থই হলো খাল কেটে কুমীর আনা। এতে জনগণ ওদলের কর্মসূচি সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ও সন্দিহান হয় এবং ওদলের নেতাদেরকে ও ওদলে অন্যান্য দল হতে যেসব নেতা ও কর্মী যোগদান করে তাদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খারাপ জানতে এবং অবজ্ঞা ও ঘৃণা করতে শুরু করে। এসবের পরিণাম ওদলের জন্যে কখনো শুভ হয় না। তাই, ক্ষমতাসীন দল অন্যান্য দলের রাজনীতিবিদ ও কর্মীদেরকে ওদলে গ্রহণ না করাটা এবং অন্যান্য দলের রাজনীতিবিদ ও কর্মীরা কোনভাবেই ওদলে যোগদান না করাটা সত্যিকারের রাজনীতির স্বার্থে অতীব প্রয়োজন ও আধিক্যপূর্ণ

ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে অনাবিল ও পরিষ্কারভাবে বুঝতে হয় যে, তাদের পারিষদ ও হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাদেরকে কখন কি বলে এবং কি উদ্দেশ্যে বলে, কেননা বিবেকবান ও সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিরা গায়ে পড়ে কারো পারিষদ হতে যায় না এবং তারা তাদের নিজস্ব সুখেদুঃখে স্বাধীনচেতা থাকে। বস্তুত, প্রত্যেকেই ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝে। তার অন্তর্নিহিত শক্তি বা বিবেক তাকে দুটোই বলে দেয়। রাজনীতিবিদেরা তাদের অন্তর্দৃষ্টি বা বিবেকের বলা অনুযায়ী কাজ করলে কেউই তাদেরকে দিয়ে খারাপ কোনকিছু করাতে পারে না। ব্যক্তিস্বার্থের নিকট যখন বিবেক বা নীতিবোধের বলা বিসর্জিত হয় খারাপ কাজ তখনই সম্পাদিত হয় এবং পারিষদেরা পেয়ে বসে। তাই, রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে বিবেকের বলা ও নৈতিক চেতনা অনুযায়ী কাজ করা।

ক্ষমতাসীন হোক বা ক্ষমতাহীন হোক এমনকোন রাজনীবিদ নেই যে ভালো কথা ছাড়া মন্দ কথা বলে এবং সুফলদায়ক বক্তৃতা ছাড়া কুফলদায়ক বক্তৃতা ঝাড়ে।

www.pathagar.com

এককথায়, সব রাজনীতিবিদই ন্যায় ও মঙ্গলের পক্ষপাতি এবং এদুটো অর্জনের জন্যে জান কোরবানি করতে প্রস্তুত। একোরবানি যেখানে প্রত্যেক রাজনীতিবিদের উদ্দেশ্য ক্ষমতায় কতো সময় থাকবে তা না ভেবে সেখানে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা ন্যায়নীতিতে দীপ্তিশীল ও বীরত্বপূর্ণ কাজ করে যায়াই সর্বোত্তম। সব রাজনীবিদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ার উদ্দেশ্য একই। এউদ্দেশ্যটি হচ্ছে ন্যয়নীতিতে মঙ্গলজনক কাজ করা এবং সর্বক্ষেত্রে ন্যায়দণ্ড সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাই, বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদদের উচিত ওধরনের পরিবেশপরিস্থিতি সৃষ্টি না করা যেটাতে ক্ষমতাসীন দল কাজ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে সর্বতোভাবে সহযোগিতা পায়ার পরো ক্ষমতাসীন দল ন্যায়দণ্ড সুপ্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে তারা বিরোধী দলের গঠনমূলক রাজনীতির মাধ্যমে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবেই। তাই, উভয় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে ধ্বংসাত্মক এবং হিংসা ও প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গঠনমূলক রাজনীতির মাধ্যমে ন্যায়দণ্ড সুপ্রতিষ্ঠিত ও জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা, কেননা ধ্বংসাত্মক এবং হিংসা ও প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ড গঠনমূলক রাজনীতির পরিধিতে পড়ে না। এটা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্ত জাতিকে পিছু টানার অভিপ্রায় ও লক্ষ্যের পরিধিতে পড়ে যা কোনকিছু বুঝে না এমন ব্যক্তিও চায় না।

ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে পেছনের দিকে তাকাতে হয়। অতীতে ক্ষমতায় থেকে যারা বিশাল জনসমুদ্রে ভাষণ দিতো ও দেখতো যে, দেশের আপামর জনসাধারণ তাদের, যাদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হতো, যারা ফলক উন্মোচন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্বোধনে আস্তব্যস্ত থাকতো, যারা চাটুকার, তোষামোদকারী, শুভানুধ্যায়ী, হিতাকাঙ্ক্ষী ও পারিষদ কর্তৃক বেষ্টিত থাকতো, যারা ভাবতো তাদের কথা ও বক্তৃতা জনগণের জন্যে অমৃতবাণী, যারা প্রচারমাধ্যমগুলোর একচ্ছত্র অধিকারী ছিলো, যারা মনে করতো যে, কেউই তাদের পতন ঘটাতে পারবে না, যারা জনগণের পরিপূর্ণ ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবের সুযোগ নিয়ে ধর্মকে নিজেদের রাজনৈতিক বর্ম হিসেবে প্রয়োগ করতো, যাদেরকে একনজর দেখার জন্যে জনগণ রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো, যারা জনগণের ভিড়ে মিশে গিয়ে নিজেদেরকে একাকার করে ফেলতো, যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতো, যারা মসজিদে ও মাদ্রাসায় বক্তৃতার মাধ্যমে কোরআন ও হাদীসের বাণী শুনাতো, যারা অন্যায়অবিচার ও বিভিন্ন অপরাধের বিরুদ্ধে আগুনঝরা বক্তৃতা করতো, যারা নারীদের সমভূমিকার জন্যে আন্দোলন গড়ে তুলতো, যারা শিশুদের জন্যে অকাতরে মায়ামমতা ঢেলে দিতো, যারা নিজেদেরকে জনগণের বন্ধু বলে দাবি করতো, যারা দেশ ও দেশের মাটিকে নিয়ে কবিতা ও গানরচনা করতো, যারা নিজেদেরকে সুষম বণ্টনের পথিকৃত ও পথপ্রদর্শক বলতো,

www.pathagar.com

যারা ছাত্রদেরকে নিজেদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো ও তাদেরকে দিয়ে জঘন্যতম অপরাধ সংঘটন করাতো, যারা পুরো জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার কথা শুনাতো, যারা বেকারসমস্যাসমাধানের জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করতো এবং যারা নিজেদেরকে জাতির ভাগ্যনির্মাতা মনে করতো বর্তমানে তারা কোথায় ও তাদের পরিণতিইবা কি? ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা এপ্রশ্নের উত্তর জানে। তাই, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে দুর্নীতি ও অপরাধমুক্ত থেকে ন্যায়পরায়ণতা ও সততার সাথে বাস্তব ও যথার্থ কর্মকাণ্ডে ডুবে থাকা বা বিভোর হয়া এবং এমন কাজে সময় নষ্ট না করা যেটাতে জাতির জন্যে মঙ্গলজনক কিছু রক্ষিত বা নিহিত থাকে না।

রাষ্ট্রপতি, নির্বাহীপ্রধান ও মন্ত্রীরা বিভিন্ন সময় বিদেশ সফরে যায়। তারা শুধু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ব্যক্তিদেরকেই সফরসংগী করা উচিত। দলের খাতিরে ও স্বজনপ্রীতির কারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সফরসংগী নিলে রাষ্ট্রের অনেক টাকা অপচয় হয় এবং তাদের এব্যবস্থা জনসাধারণের চোখে পড়ে যায়। তাদেরকে ভাতা দেয়া হয়। তারা ভাতাগ্রহণ করার পরো নিয়মবহির্ভূতভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থে অন্যভাবে তাদের যেকোন খরচ মেটানোটাও জনগণের দৃষ্টি বা নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। এভাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের টাকা অপচয় ও খরচ দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে না। ক্ষমতাসীন দলকে যেকোন ন্যায়সংগত ও যুক্তিযুক্ত কাজ বিরোধী দলের আপত্তিজ্ঞাপন ও প্রতিবাদের আগেই করতে হয়। বিরোধী দলের প্রতিবাদের পর তা করলে সেদলেরই কৃতিত্ব ও বাহাদুরি হয় এবং ক্ষমতাসীন দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এবং এদলে যে প্রজ্ঞাবান ও পরিপক্ক লোকের অভাব তা প্রমাণিত হয়। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যাদি সম্পাদন করতে হয় বিধায় তারা প্রশাসকো। প্রশাসকেরা রাজনীতি বুঝলেও তাদেরকে রাজনীতিবিদ হতে হয় না। কিন্তু, রাজনীতিবিদেরা ক্ষমতাসীন হলে তাদেরকে সুপ্রাশসক হতে হয়, কেননা তাদের নির্দেশেই রাষ্ট্রীয় কার্যাদি নিষ্পন্ন বা সম্পন্ন করতে হয়। বাস্তবে সংগ্রামী নেতা বলতেই সুপ্রশাসক নয়। যে সংগ্রামী ও ক্ষমতাসীন নেতা সুপ্রশাসক সে-ই মোটামুটিভাবে প্রশাসনিক কার্যাদি জুতসই বা জুতমাফিক চালিয়ে নিতে পারে। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা প্রশাসন সম্পর্কে চৌকশ ও পারদর্শী হতে হয়। তা না হলে তাদের সিদ্ধান্ত ভুল বা ভ্রান্ত হয়ার সম্ভাবনা থাকে আর তাদের ভুলের বা ভ্রান্তির মাসুল শুধু তারাই দেয় না, গোটা জাতিকেও দিতে হয়। ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার সাথে তাদের প্রতি জনগণের ভীতি সংযুক্ত থাকে। জনগণ ক্ষমতাসীনদেরকে এজন্যে ভয় করে যে, তারা ক্ষমতার বলে যা খুশি তা করতে পারে। ফলে, জনগণ যেকোন সময় যেকোন বিপদে পড়তে পারে। তাই, ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার প্রয়োগ এমন পদ্ধতিতে হতে হয় যাতে জনগণ তাদের এক্ষমতাকে নিজেদের জন্যে সাহস হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। যেদিন জনগণ

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাকে ভয়ের কারণ মনে না করে নিজেদের জন্যে সাহসের হাতিয়ার হিসেবে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করবে সেদিন হতে বহু গোলমেলে ও জটিল সমস্যারো আপনাআপনি সমাধান হবে।

দেশপরিচালনায় উভয় কঠোরতা ও নমনীয়তার প্রয়োজন রয়েছে। শুধু কঠোরতা বা শুধু নমনীয়তা দিয়ে কোন একটি শিশুকেও পরিচালনা করা সম্ভব নয় বা সম্ভবাতীত। যেখানে কঠোরতা বা নিষ্ঠুরতার দরকার সেখানে নমনীয় বা সুকুমার হয়া যাবে না আর যেখানে নমনীয় বা সুকুমার হয়া আবশ্যক সেখানে কঠোর বা নিষ্ঠুর হয়া যাবে না। যেসব রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় তাদেরকে স্থানকালপাত্রভেদে এনিয়ম অনুসরণ করতে হয়। এটাই মধ্যপন্থা আর এপন্থাই সর্বোত্তম পন্থা। তারা যা বলে তা-ই হলে এবং যারা সংশ্লিষ্ট তারা ভালোমন্দ কিছুই উল্লেখ করতে না পারলে এপন্থার কার্যকারিতা থাকে না। এপন্থার কার্যকারিতার জন্যে ভালোমন্দ জেনেই কাজ করতে হয়। এমন কাজ নেই যেটা করার নিয়মরীতি নেই। প্রত্যেক কাজই নিয়মরীতির আওতাভুক্ত। সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত নিতে ও কাজ করতে নেই। পড়াশুনা ব্যতীত এধারণা অর্জিত হয় না। অথচ, উচ্চপর্যায়ে পড়ার সময় ও ধৈর্যের অভাবের কথা শুনা যায়। শুধু তা নয়। তারা এধরনের কথা বলাতে গর্ববোধ করে ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। তারা খেয়াল করা অত্যাবশ্যক যে, তাদের সময় ও ধৈর্য সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ ধারণার সাথে সঠিক সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্যে। তারা তাদের সময় ও ধৈর্য এসিদ্ধান্ত ও কাজে না খাটিয়ে কোথায় খাটাবে। অন্যকোথাও খাটালে তারা তাদের এদায়িত্ব থেকে কেটে পড়তে হয়। কেটে না পড়লে তাদেরকে পুরো সময় ও ধৈর্য বাধ্যতামূলকভাবে এসিদ্ধান্ত ও কাজে খাটাতে হবে। এটার অন্যথা বেআইনী হবে।

ক্ষমতাসীনেরা সাধারণত তাদের সাধারণ অবস্থা থেকেই ক্ষমতায় আগমন করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তারা কিছুদিন চুপচাপ সবকিছু বুঝে নেয়। তারপর শুরু হয় হুকুম দেয়া। হুকুমের সাথে নিয়মের ও বিধির মিলের প্রয়োজন পড়ে না। হুকুমের সাথেসাথে তা তামিল বা পালন করতে হয়। যেসুযোগসুবিধা পায়ার নয় তা-ও দিতে হয়। এব্যাপারে বুঝতে গিয়ে হয়তো মৃদু হাসি দেখতে হয় নয়তো কথার মারপ্যাঁচে মৃদু ধমক শুনতে হয়। তখন ভাবনার সৃষ্টি হয় যে, ক্ষমতা চলে গেলে এশানশওকতের অভ্যাস ঠিক রাখার জন্যে অতো অর্থ কোথায় পাবে। ক্ষমতা চলে গেলে দেখা যায় যে, তাদের শানশওকতে কোনপ্রকার ভাটা পড়ে না, অর্থাৎ তারা সাধারণ অবস্থায় ক্ষমতায় আগমন করলেও শানশওকত নিয়েই তা হতে প্রস্থান করে।

www.pathagar.com

ভালো কাজের জন্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে ভালো লোকের প্রয়োজন। কিন্তু, বাস্তবে শুনা যাচ্ছে যে, ভালো লোক পায়াটা ভার বা দুষ্কর। তবে, অন্তত কিছুকিছু ভালো লোক না থাকলে কোনকিছু চলতে পারে না। কিছুকিছু ভালো লোক না থাকতোতো সর্বত্র শয়তানের প্রভাব বলবৎ থাকতো। যেহেতু সর্বত্র শয়তানের প্রভাব বলবৎ নেই সেহেতু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভালো লোকও আছে। তবে, এসব ভালো লোকের সমন্বয় ঘটাতে পারতে হয়। এটার দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। সরকার বলতে আমরা যেসব ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদকে বুঝি সর্বপ্রথমে তাদেরকে তাদের মধ্যে খারাপ কোনকিছু থাকলে তা পরিহার করতে হয়। এককথায়, নিজেরা খারাপ হলে ভালো লোকের সমন্বয়সাধন করা যায় না আর নিজেরা ভালো হলে খারাপ লোক কদাচিৎ কোন অনাকাঙ্ক্ষিত সুযোগ করে নিতে পারে। কেউকেউ যে ভালো করার চেষ্টা চালাচ্ছে না তা নয়। তবে, তাদের ব্যাপারে বলতে শুনা যায় যে, যেখানে প্রায়সবাই খারাপ সেখানে তাদের ভালো করার চেষ্টাতে কোন লাভ হয়ার কথা নয়। যারা এধরনের কথা বলে তারাও ভালো করার উদ্যোগে ও চেষ্টায় সংশ্লিষ্ট ও লিপ্ত হলে ভালো লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং খারাপ লোকের সংখ্যা কমতে থাকে। যারা দেশের শীর্ষস্থানে অবস্থান করে তারা ভালো করার চেষ্টা করলে অন্যান্যরাও ভালো করার চেষ্টা করতে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য হবে। দেশের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা। তাই, জনগণকে ভালো কাজে উজ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ করতে হলে তারা সতত ভালো কাজ করাটা বাঞ্ছনীয়।

দেশে যতোকিছু ঘটছে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সেগুলোর জন্যে আমলাদেরকে দায়ী করা হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, আমাদের এ গণতান্ত্রিক দেশে আমলারা অধীনতা ও আজ্ঞানুবর্তিতামুক্ত নয়। তারা সরাসরি ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের অধীনে, কর্তৃত্বে, নেতৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে। এসব রাজনীতিবিদের সম্মতি ও অনুমতি ব্যতীত আমলারা সরাসরি কিছুই করতে পারে না। আইনপ্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণ আমলাদের কাজ নয়। একাজটি ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরাই করে থাকে। অপরদিকে আইন ও নিয়ম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমলাদের কোন একক ভূমিকা নেই। এগুলোর বাস্তবায়ন ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের আদেশে হয়ে থাকে। এসব কারণে কোনকিছুর জন্যে আমলাদেরকে দায়ী করা যায় না। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরাই দায়ী। তারা আমলাদের সাথে পেরে ওঠে না বললে এটা তাদের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ হবে। নীতিগতভাবে সবলেরাই দুর্বলদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। দুর্বলেরা সবলদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে এটার ব্যত্যয় ঘটলে একটি জাতি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার পরিবেশ কেটে ওঠে শান্তি ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে উন্নতি ও প্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে

www.pathagar.com

পারে না। তাই, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে এমন প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও ধীশক্তির অধিকারী হতে হয় যাতে তারা আমলাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে দেশকে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিতে পারে।

সবাই আর্তমানবতার সেবার জন্যে অত্যন্ত মুখর বা সোচ্চার। এদের মধ্যে বিত্তবানেরাও আছে। এসব বিত্তবানের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক বিদ্যমান থেকে যাচ্ছে। অনুভবনীয় ও লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে বিত্ত ও সম্পদশালী ব্যক্তিদেরকেই রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন করে থাকে। বিশেষভাবে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল হতে এমনোনয়ন পায়ার জন্যে গোপন প্রভাব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। এতে সাধারণত তারাই মনোনয়ন পেয়ে থাকে যাদের বিত্ত ও সম্পদ অন্যান্যের তুলনায় বেশি এবং দলের একাউণ্টে চাহিদা অনুযায়ী চাঁদাপ্রদান করে। বিত্ত ও সম্পদহীন ব্যক্তিরা বিদ্বান, পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ইত্যাদি যতোকিছুই হয়-না-কেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ভাবতেই পারে না। টাকার কাছে বিদ্বজ্জন ও বিদ্বৎকুলের কথা অকিঞ্চিৎকর ও মূল্যহীন বিবেচিত হয়। টাকা শুধু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে দলীয় মনোনয়ন পায়ার মানদণ্ড নয় সামাজিক মর্যদা, মানসম্মান, কর্তৃত্বনেতৃত্ব ইত্যাদিরো মানদণ্ড। ফলত, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ধনবান ও ঐশ্বর্যশালীদের দ্বারাই দেশ বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় এবং অন্যান্য পর্যায় বা স্তরের লোকজনের স্বাভাবিক আশা ও চাহিদা অপূরণীয় থেকে যায় বিধায় সংকট নিরসিত না হয়ে বর্ধিত হতে থাকে। এতে বিত্তবিত্তেশ বা ধনপতিদের কিছুই যায়আসে না। তারা একদিকে বিত্তহীনদের জন্যে মায়াকান্না বা কান্নার ভান করে, অপরদিকে নিজেদের বিত্তবৃদ্ধির জন্যে হন্তদন্ত হয়ে কর্মসম্পাদনে বিত্তহীনেরা যে তাদের মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত হয় সেদিকে জেনেশুনেও দৃষ্টিনিক্ষেপ করে না। সার্বিকভাবে, আর্তমানবতার সেবার জন্যে সুষম বণ্টন অপরিহার্য। অথচ, সম্পদশালীরা সুষম বণ্টনের বিরোধিতায় আছে। সুষম বণ্টনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আর্তমানবতার সেবার জন্যে সোচ্চার হয়াটা অধিক পরিমাণে সম্পদ কুক্ষিগত করার একটি কৌশলগত পন্থা। তাই, আর্তমানবতার সেবার জন্যে রাজনীতিবিদদেরকে সুষম বণ্টনের উদ্যোক্তা ও প্রবক্তা হতে হয়। কিন্তু, ক্ষমতা ও বিত্ত একই হাতে, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, কেন্দ্রীভূত থাকা অবস্থায় এটা অচিন্তনীয় ও সম্ভবাতীত।

কোনকিছু বিবেচনা না করে ঝোঁকে চলার প্রবণতা আমাদের দেশের লোকজনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে, অগ্রপশ্চাৎ বা আগপাছ না ভেবে ও সবকিছু বিচারবিশ্লেষণ না করে ঝোঁকে চলার প্রবণতা সুফলদায়ক নয়। এভাবে ঝোঁকে চলতে গেলে হিতাহিতজ্ঞানের, ভালোমন্দবোধের ও বিবেকবুদ্ধির অসারতা প্রতিপন্ন হয়। অথচ,

www.pathagar.com

মানুষ ধীমান ও জ্ঞানসম্পন্ন। ধীশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাই সত্যকে আবিষ্কার করে সত্যপথে উদ্দীপনাময় জীবনযাপন করা যায়। বাস্তবে মানুষ এরকম একটি জীবন কামনা করে। এভাবে ঝোঁকে চলা পরিহার না করতে পারলে এরকম জীবনটি পরিচালনা করা যায় না। তাই, এভাবে ঝোঁকে চলা অকল্যাণকর এবং যেচলাতে কল্যাণ সাধিত হয় না তা জ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিহার করাটা বাঞ্ছনীয়।

একরকম কথা বলে অন্যরকম কাজ করা হচ্ছে স্ববিরোধিতা। স্ববিরোধী লোক সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করতে অসিদ্ধ ও ব্যর্থ হয়। স্ববিরোধিতার সম্পর্ক হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থের সাথে। এস্বার্থের টানে স্ববিরোধী ব্যক্তিরা এখন একটি কথা বলে পরক্ষণে কথাটির বিপরীতমুখী কথা বলতে পারে এবং এখন একটি কাজ শুরু করে পরক্ষণে কাজটি বন্ধ করে দিতে পারে। তাই, স্ববিরোধিতা হচ্ছে নীতিশূন্যতা। নীতিশূন্য ব্যক্তিরা নীতিকে ভূলুণ্ঠিত করে। ফলে, নীতিহীনতার প্রাবল্য দেখা দেয়। এপ্রাবল্যে বিধিবিধান উপেক্ষিত হয় এবং স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করতে থাকে। তাই, রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে সর্বপর্যায়ে ও কাজে স্ববিরোধিতা পরিহার বা বর্জন করে চলা।

যে যেটা বুঝে সে চায় যে, সবাই সেটা গ্রহণ করুক ও মানুক। বাস্তবে এটা কখনো সম্ভব নয়, কেননা সবার বুঝ একরকম নয় এবং সবার বুঝ যে ভালো তা–ও ঠিক নয়। তবে, সবাই সবার বুঝ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ বা ব্যক্ত করতে পারে। এবুঝ ব্যক্ত করার বিভিন্ন মাধ্যম আছে। সব বুঝের সমন্বয়ের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ার জন্যে সর্বোচ্চ ফোরাম হচ্ছে জাতীয় সংসদ। এসংসদে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রণীত আইন সংবিধানসম্মত হলে ও ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে নিরপেক্ষভাবে বাস্তবায়িত ও প্রয়োগ হতে থাকলে যথার্থ ও সঠিক বুঝ সমাদৃত হয় এবং আইনশৃঙখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে বিধায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকে ও দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।

আমাদের এদেশ বারো কোটি লোকের দেশ। এদেশে বিরাজমান পরিবেশপরিস্থিতি ও লোকজনের ছলাকলা বা হাবভাব দেখে মনে হয় যে, বারো কোটি লোকই রাজনীতিবিদ, নেতা ও কম বুঝে না। সবাই রাজনীতিবিদ, নেতা ও উন্নত চিন্তার অধিকারী হলে কেউ কারো চেয়ে কম হয় না বিধায় সবার মধ্যে সমঝোতার মনোভাব বিদ্যমান থাকে। এতে সবার স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকে এবং কেউ কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু, আমাদের এদেশে রাজনীতি না বুঝেও রাজনীতিবিদ, নেতৃত্বের যোগ্যতা না থাকলেও নেতা এবং লেখাপড়ার অভাবে জ্ঞানগরিমা না থাকলেও জ্ঞানী। এটারো কারণ আছে। জনগণ দেখছে যে, রাষ্ট্রপরিচালনায় ও রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদনে যোগ্য ব্যক্তিদের তেমনকোন কদর ও স্থান নেই। তাই, তারা ভাবে

www.pathagar.com

যে, উপযুক্ততা ও যোগ্যতা দিয়ে কিছু করা যায় না এবং কিছু করতে হলে যেভাবেই হোক নিজেদেরকে সামনে নিতে পারলেই হয়। এতে যে দেশ ও সমাজের অকল্যাণ হয় তা তারা পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে বুঝেও বুঝে না। তারা মনে করে যে, যেখানে অনুপযুক্ত ও অযোগ্য ব্যক্তি রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে থাকতে পারে সেখানে তারা যোগ্য ব্যক্তিদের ওপর সামাজিক ও অন্যান্য কর্তৃত্বে থাকতে পারাটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

দেশোন্নয়নে কোনটা খাটবে ও কোনটা খাটবে না সেদিকে আমাদের কারো খেয়াল নেই। দু'পথিক পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। একজনের মাথায় পানের ঝুড়ি এবং অপরজনের কাঁধে একটি ছোটমোট খেজুর গাছ। খেজুরগাছওয়ালা পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলো যে, তার ঝুড়িতে কি। সে উত্তরে বললো যে, পান। খেজুরগাছওয়ালা তাই রঙ্গরস করে বললো যে, সে তার কান ধরে দেবে টান। পানওয়ালা খেজুরগাছওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলো যে, তার কাঁধে কি। খেজুরগাছওয়ালা উত্তরে বললো যে, খেজুর গাছ। পানওয়ালা বললো যে, সে তাকে তা ধরে ঠেলে দেবে। খেজুরগাছওয়ালা বললো যে, তার কথাটা কি খেটেছে। সে উত্তরে বললো যে, খাটুক বা না খাটুক তারতো বারোটা বাজবে। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থাও তাই। এঅবস্থা থেকে নিষ্কৃতি বা পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে যেটা খাটে সেটাই খাটাতে হবে এবং যেটা খাটে না সেটা খাটাতে গিয়ে দেশের সর্বনাশ করা ঠিক হবে না।

শুধু রাজনীতি ও নির্বাচন দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলই রাজনীতি করে থাকে। দল বলতেই দলাদলি আর নির্বাচন বলতেই ভোটাধিকারপ্রয়োগ। ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়ার জন্যে রাজনীতিবিদেরা দলাদলি করে থাকে এবং এদলাদলিকে অস্বাভাবিক কিছু বলা যায় না। কিন্তু, যখন এদলাদলি রাজনৈতিক পরিমণ্ডল অতিক্রম করে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থে চলতে থাকে তখন তা সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি করে। দেশে বিরাজমান সমস্যাগুলো এককভাবে কোন দলের নয়। এসব সমস্যা রাষ্ট্রীয় সমস্যা। এগুলোর সমাধান রাষ্ট্রীয়ভাবেই, দলগতভাবে নয়, করতে হয়। রাষ্ট্র স্বয়ং পরিচালিত হচ্ছে না। রাষ্ট্রপরিচালনা করা হচ্ছে। তাই, রাষ্ট্রপরিচালনের দ্বারাই রাষ্ট্রীয় সমস্যাদি সমাধান করতে হয়। রাষ্ট্রপরিচালনের সুনির্দিষ্ট নীতি থাকলে এবং তা লংঘিত ও বাধাপ্রাপ্ত না হলে রাষ্ট্রীয় সমস্যাদির সমাধান সহজতর হয়। এনীতি হতে হয় জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত। দলমতনির্বিশেষে সব রাজনীতিবিদকে জাতীয় স্বার্থে এনীতির কথা তাদের অনুভূতি ও চেতনাতে বদ্ধমূল করাটা অত্যাবশ্যক। ঐকমত্যেরভিত্তিতে এনীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ ফোরাম হচ্ছে জাতীয় সংসদ। সেখানে যেপর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে এনীতি নির্ধারিত না হবে সেপর্যন্ত শুধু রাজনীতি ও নির্বাচন দিয়ে, বর্ণিত কারণগুলোর কারণে, জাতীয়

www.pathagar.com

সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব হবে না বিধায় জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষার সুফল ফলিত হবে না।

আন্দোলনে এখানো গ্রামের লোকের ঢল নামেনি। আন্দোলনে জনতার ঢল, বলতে গেলে, এখনো শহরনগরেই সীমাবদ্ধ। এআন্দোলনের তোড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, জনজীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে, অফিসআদালত বন্ধ হয়ে যায়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, হরতালের পর হরতাল পালিত হয়, বহুলোক আহত ও নিহত হয়, ক্ষমতাসীন সরকারের ভিত কেঁপে ওঠে এবং একপর্যায়ে গিয়ে সরকারের পতন ঘটে। শহরনগরের লোক অধিকার ও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন। তাদের এসচেতনতা তাদেরকে আন্দোলনমুখী করে তোলে এবং তাদের আন্দোলনের জের হিসেবে সরকারের পতন ঘটে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হয় এবং মানুষের ধারণাতীত অনেক ঘটনা ঘটে যায়। শতকরা নব্বই জন লোক গ্রামে বাস করে। বর্তমানে এটা সাধারণ কথায় পরিণত হয়েছে যে, আটষট্টি হাজার গ্রাম বাঁচলে দেশ বাঁচবে। বস্তুত, এসব গ্রামের লোক এখনো আন্দোলনমুখী হতে শিখেনি, কারণ তারা পুরোপুরিভাবে অধিকার ও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়নি। তবে, তারা যেভাবে নিগৃহীত ও বিরহিত হচ্ছে পরিবেশপরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাদেরকে পুরোপুরিভাবে অধিকার ও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। তারাও আন্দোলন করবে। তাদের আন্দোলনের ধাক্কায় শহরনগর নিশ্চল ও স্তব্ধ হয়ে যাবে। এতে শুধু সরকারের পতন ঘটবে না, রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের যে কি নিদারুণ পরিণতি হবে তা কল্পনায় আনতেও শরীরের লোম রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের প্রকৃত আবাসস্থল শহরনগর নয়। তাদের প্রকৃত ও বাস্তব আবাসস্থল গ্রাম। তাদের পিতৃপুরুষদের আবাসস্থল গ্রাম। এখনো সময় আছে। সময় এখনো পার হয়ে যায়নি। শহরনগর ও গ্রামের মধ্যে দূরত্ব ঘুচাতে বা দূর করতে হবে। এজন্যে রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা যে যেখানকার তাকে সেখানে অবস্থান নিয়ে সেখানকার জন্যেই অভিনিষ্টভাবে ও একাগ্রচিত্তে কাজ করে যেতে হবে।

খ

একটি জাতির আদর্শই তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করে। আদর্শের অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি তাকে পরনির্ভরশীল করে। এটা অন্যের অধীনতা। যেকোন জাতির আদর্শই তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। আদর্শিক শক্তিই স্থিতিশীলতা ও

www.pathagar.com

স্থায়িত্ব অর্জন করে। আমরা একটি চিরন্তন বা শাশ্বত আদর্শের অধিকারী। এআদর্শের শিথিলতাই আমাদেরকে একবার পরাধীনতার জিঞ্জিরের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিলো। বহু যুগের বহু মনীষীর চিন্তাসাধনা ও সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে আমরা পরাধীনতার গ্লানি হতে অব্যাহতি পেয়েছি। বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনে স্থিতিশীলতা ও উন্নতির জন্যে আমাদেরকে আমাদের শাশ্বত আদর্শের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বা প্রবুদ্ধ হয়া আবশ্যক। আমরা বলাবলি করছি যে, এচেতনা যাতে আমাদের মধ্যে জাগরূক বা জাগ্রত না হয় সেব্যাপারে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের চাকা ঘোরানো হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও এচাকার প্রতাপ ও প্রভাব আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের ও আমাদের মধ্যে যেপার্থক্য রয়েছে তা মুছে দিয়ে আমাদেরকে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার দূরভিসন্ধিতে ও অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। হেমিলটনে বংশীবাদকের বাঁশির সুরের মূর্ছনায় সেশহরের শিশুরা তাদের নিজেদের অজান্তেই তার পেছনে ছুটে অথৈ বা অতলস্পর্শ পানিতে ডুবে মরেছিলো। তারা এমনই বিমোহিত বা অভিভূত হয়েছিলো যে, বিপদ দেখেও দেখেনি। আমরাও আমাদের আদর্শের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল না দেখে এক মিথ্যা আকর্ষণে আটকে যাচ্ছি। একটি বহুতলবিশিষ্ট জাহাজে পানি সংরক্ষিত আছে ওপরতলায়। নিচতলায় যারা আছে তারা ভাবলো যে, ওপরতলায় না গিয়ে নিচতলায় একটি ছিদ্র করে দিলে সহজেই পানি পায়া যাবে। কিন্তু, অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা এটা ভাবলো না যে, নিচতলা দিয়ে পানি ওঠতে থাকলে জাহাজটিই ডুবে যাবে এবং কেউই বাঁচতে পারবে না। তাছাড়া, অন্যান্য তলায় যারা আছে তারা এটা শুনেও চুপচাপ থাকলে বা নীরবতা পালন করলে এবং নিচতলার লোককে প্রকৃতাবস্থা বুঝিয়ে পানির জন্যে ছিদ্র করা হতে বিরত বা নিরস্ত না করলে সবার যে সলিলসমাধি ঘটবে তাতে কোন সংশয় বা সন্দেহ থাকতে পারে না। বর্তমানে ব্যক্তিস্বার্থে পরাদর্শের প্রতি আসক্তি ও অনুরক্তির কারণে আমাদের সর্বনাশ ও ঘোর অনিষ্ট হচ্ছে। আমাদের নির্লিপ্ততা বা উদাসীনতার কারণে পরাদর্শ আমাদেরকে পুরোপুরি পেয়ে বসছে বা গ্রাস করে ফেলছে। তা থেকে বের হয়ে আসার পথ দুর্গম হবে।

মোসলমানদের জন্যে আদর্শ হচ্ছে ইসলামী আদর্শ বা মহানবীর আদর্শ। কোন মোসলমানের অন্যকোন পৃথক বা স্বতন্ত্র আদর্শ নেই। কোন মোসলমানের অন্যকোন পৃথক আদর্শ আছে বললে ও সেআদর্শ ভালো লাগছে বলে স্বীকার করা হলে ইসলামী আদর্শ বা নবীর আদর্শকে পরিহাস ও পরিহার করা হয়। এআদর্শ সার্বজনীন ও নিরপেক্ষ আদর্শ। এটা বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্যে নির্ভুল ও আলোকোজ্জ্বল সনদ যা কোন মানুষ আজপর্যন্ত দিতে পারেনি এবং কোনদিনো দিতে পারবে না। আমরা সবাই মহানবীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানাই। কোরআনে মহানবীর আদর্শে সব সমস্যা সমাধানের এবং সব মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্বসংঘাত

www.pathagar.com

অবসানের পথ ও পন্থা নির্দেশিত বা প্রদর্শিত আছে। একটি মুসলিম সমাজের নাগরিক ও মহানবীর একনিষ্ঠ অনুবর্তী বা অনুসারী বলে দাবিদার হিসেবে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু, ওরকম দাবিদার হলে চলবে না যেরকম দাবিদার ছিলো মহানবীর সময়। তারা মহানবীর পক্ষ থেকে কোন কষ্টসাধ্য কাজের হুকুম পেলে এবং সেহুকুমে তাদের ব্যক্তিস্বার্থে বা গোষ্ঠীস্বার্থে আঘাত লাগলে তা পাশ কেটে চলার কৌশল অবলম্বন করতো। নবীর আদর্শে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা দূরীভূত না হলে আমাদের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন। ইসলামী আদর্শে এক্ষমতা পেতে হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। এনির্বাচন হতে হয় অবাধ ও নিরপেক্ষ। তা না হলে জনগণ যাদেরকে চায় না তারাও নানাউপায়ে ক্ষমতায় এসে যেতে পারে। ফলে, যেসব কারণে জনগণ তাদেরকে চায় না সেগুলো তাদের ওপর চেপে বসে। যখন জনগণ দেখে যে, নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের প্রার্থীকে, অবাঞ্ছিত হয়ার দরুন অল্প ভোট পায়া সত্ত্বেও, অধিক ভোটপ্রাপ্ত কোন জনপ্রিয় প্রার্থীর মুকাবিলায় জয়ী ঘোষণা করা হয় তখন তারা নির্বাচনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এসব কারণে অন্যান্য দলো নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আস্থা ও উৎসাহহীন হয়ে পড়ে। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের পক্ষে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ও সব প্রচারমাধ্যম, পরোক্ষভাবে হলেও, কাজ করলে এবং ক্ষমতাসীনেরা সরকারী অর্থ ব্যয় করে, চালাকির সাথে সরকারী কাজের দোহাই দিয়ে, প্রচারকার্য চালালে অন্যান্য প্রার্থী তেমনকোন সুবিধা করতে পারে না। নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন হতে থাকলে সব মুসলিম দেশেই একদিন-না-একদিন ইসলামী অনুশাসন কায়েম হবে, কেননা মোসলমানেরা নবীর আদর্শে রাষ্ট্রপরিচালনা চায়।

যেকোন একটি দেশকে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে হয়। বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিকতা পরিহার করে কোন দেশই চলতে পারে না। তাই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার ও সুসম্পর্কের প্রয়োজন। আমাদের এসম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি। এনীতি জাতীয় আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হয়। তা না হলে কার্যক্ষেত্রে এটা পরিবর্তিত হতে থাকে। কোন পরিবর্তনশীল পররাষ্ট্রনীতি জাতীয় মঙ্গল সাধন করতে পারে না। তাই, জাতীয় স্বার্থে রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় আদর্শ স্থির করে জাতিকে এমন একটি পররাষ্ট্রনীতি উপহার দেয়া যেটা আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, কোন রাজনৈতিক দল দেশবিদেশে এমনকোন কর্মতৎপরতায় লিপ্ত থাকা বা হয়া উচিত নয় যেটার কারণে

www.pathagar.com

জাতিসংঘের সাথে দেশের সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন আর্থিক সংস্থাগুলো আর্থিক সহযোগিতাপ্রদানে শৈথিল্যপ্রদর্শন করে। ছিনতাইর ঘটনা অহরহ শুনা যাচ্ছে। এছিনতাইর মূল কারণ হচ্ছে যে, আমাদের জাতীয় আদর্শই ছিনতাই হয়ে গেছে। যেজাতির আদর্শই ছিনতাই হয়ে যায় সেজাতির লোকজনের স্বর্ণালঙ্কার, ঘড়ি, টাকাপয়সা ইত্যাদি ছিনতাই হয়টা মামুলি ব্যাপার। সেদিনই এসব ছিনতাই বন্ধ হবে যেদিন আমাদের জাতীয় আদর্শ পুনরুদ্ধার করা যাবে। আমাদের এ জাতীয় আদর্শ কি? আমাদের এ জাতীয় আদর্শ হচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে সামাজিক সুবিচার ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথেসাথে শান্তিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। তবে, ইসলামী বিধিবিধানের কার্যকারিতা ব্যতীত এটা অন্যকোন মতে বা পথে সম্ভব নয়। শিশুরা কোন দল ও মতাদর্শ বুঝে না। কিন্তু, তাদের স্বভাবচরিত্র ও আচারআচরণে যেভাবটি প্রতিভাত হয় তা হচ্ছে সাম্যভাব। তাই, সাম্যই সত্য। এসাম্য সাম্যবাদ বা পুঁজিবাদ কোনটিই নয়। এটা এমন একটি নীতি যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে প্রত্যেকের খেয়েপরে বাঁচার অধিকারের নিশ্চয়তাবিধান করে। নবীকরিম (সঃ) তাঁর শিশুত্বে যেমহিলার স্তনের দুগ্ধ পান করতেন সেমহিলারো একটি শিশু ছিলো। তাই, তিনি মহিলাটির একটি স্তনের দুগ্ধ পান করতেন এবং অপরটি স্তনের দুগ্ধ পান করতেন না যাতে মহিলাটির শিশুটি সেটার দুগ্ধ পান করতে পারে। শিশুর সাম্যভাব ও নবীকরিম (সঃ) এর এদৃষ্টান্তটি হতে এটা পরিষ্কার যে, এসাম্য ইসলামের মধ্যেই বিদ্যমান। মানবতার ও কল্যাণের স্বার্থে ইসলামী সাম্যই হতে হবে আমাদের আদর্শের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেসব দেশে, মুসলিম বা অমুসলিম, সাম্যের নীতি, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, বলবৎ আছে সেগুলোতে আইনানুগতা, ন্যায়ানুগতা, শান্তিশৃঙ্খলা ও প্রবৃদ্ধিতে কোনপ্রকার অপবিত্রতা, কলুষতা, নোংরামি, পঙ্কিলতা ও ভেজাল নেই।

মুখে নীতিবাক্য উচ্চারণ করে বা হিতোপদেশ দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে বা সমাজজীবনে তা কার্যকর বা বাস্তবায়িত না করলে শেষপর্যন্ত ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে হয়। নবীকরিম (সঃ) যা বলেছেন তা করেছেন। তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে স্বল্পসংখ্যক মোসলমান দেশবিদেশে বা দেশদেশান্তরে সর্বত্র অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়েছেন। তাঁদের ন্যায়নীতিতে দেশবিদেশে মানবতার শত্রুদের অন্তরাত্মা বা অন্তঃকরণ কেঁপে ওঠেছে। তাঁরা কোটিকোটি মানুষের মুক্তির পথ উন্মোচন করেছেন। তাঁরা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে এনেছেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। নবীর আদর্শের অনুসারীদের বিশ্বময় নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

www.pathagar.com

মোসলমানেরা এক সংকটময় মুহূর্তে আছে। তাদের সমস্যার অন্ত নেই। তাদের মধ্যে আত্মকলহ ও গৃহবিবাদ বিদ্যমান। তারা ব্যক্তিস্বার্থে হামলার শিকার। সব সমস্যা সমাধানের এবং আত্মকলহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষার জন্যে তাদের একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট তাদের অতীত ভুলের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে মহানবীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করা। মানুষ সর্বসময় সমাজে নেতৃবর্গ ও উঁচুস্তরের ব্যক্তিদেরকে, যাদের হাতে দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির চাবিকাঠি, অনুকরণ ও অনুসরণ করে। এসব লোক নবীর আদর্শ গ্রহণ করলে, ন্যায়বান ও খোদাভীরু হলে, ইসলামী বিধিবিধান মেনে চললে, প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত না করলে, হারাম পরিহার করলে, হালাল গ্রহণ করলে, দুর্নীতি না করলে, মানুষের প্রতি দয়ালু হলে, ন্যায়প্রতিষ্ঠার জন্যে ত্যাগতিতিক্ষা স্বীকার করলে, অন্যায় প্রতিহত করলে এবং সব মন্দ কাজ পরিহার করে সব ভালো কাজে আত্মনিয়োগ করলে জনগণ তাদেরকে অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। তাই, নেতৃবর্গ ও উঁচুস্তরের লোককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা কি নবীর আদর্শ গ্রহণ করবে, না মানববর্ণিত আদর্শ গ্রহণ করবে। তারা নীতিকথায় ও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় থেকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

নবীর আদর্শ ও অন্যান্য মানুষের আদর্শ এক ও অভিন্ন নয়। নবীর আদর্শ হচ্ছে আল্লাহ্প্রদত্ত আদর্শ এবং অন্যান্য মানুষের আদর্শ হচ্ছে তাদের স্বস্ব চিন্তাধারাভিত্তিক আদর্শ। তাই, তাদের আদর্শ সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ নয়। একমাত্র সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হচ্ছে নবীর আদর্শ। এআদর্শে কোন কৃত্রিমতা বা কপটতা নেই। এটাই একমাত্র বাস্তবসম্মত সার্বজনীন আদর্শ। এআদর্শ শুধু মানুষের নয় একটি পশুরো পর্যন্ত জীবনধারণের জোরালো নিশ্চয়তাবিধান করে। এআদর্শেই সরকার বলতে যেসব রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রপরিচালককে বুঝানো হয় তারা জনসাধারণের প্রত্যেকের জীবনযাত্রার বা জীবিকানির্বাহের সুব্যবস্থা না করা পর্যন্ত নিজেদের সুখশান্তি ও আরামআয়েশের কথা কল্পনাও করতে পারে না. এআদর্শেই কোন বিত্তবান ব্যক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হলে তিনি জনগণের প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্বপালনে ব্রতী হয়ে নিঃস্বনিঃস্বল হয়ে পড়েন। এআদর্শেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মতো গুরুদায়িত্বগ্রহণকে ভীতির চোখে দেখা হয়, কেননা এদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে ও পুঙখানুপুঙখরূপে পালিত না হলে এবং আল্লাহ্র দরবারে সেটার সঠিক জবাব দিতে ব্যর্থকাম বা ব্যর্থমনোরথ হলে তাঁর কঠোর আজাব থেকে কোনভাবেই নিষ্কৃতি বা নিস্তার পায়া যাবে না। এআদর্শেই রাষ্ট্রপ্রধানো কোন অপরাধ সংঘটন করলে সাথেসাথে বিনা দ্বিধাসংকোচে নির্ভীকতার সাথে তাঁর বিচার করা হয়, বিচারকার্যে কোনপ্রকার টালবাহানা, ছলনা, চাতুরি, ধোঁকাবাজি, মারপ্যাঁচ, হয়রানি, প্রহসন ও দীর্ঘসূত্রতা চলে

www.pathagar.com

না এবং কারো প্রতি কোন পক্ষপাতিত্বতো দূরের কথা রাষ্ট্রপরিচালকদের কারো কোন সন্তান কোন অপরাধ করলে সেও যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি হতে কোনভাবেই অব্যাহতি বা মুক্তি পায় না। পৃথিবীর ওসব দেশেই সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিটি কাজ নিষ্পন্ন হচ্ছে, স্বার্থজনিত সংঘর্ষ হচ্ছে না, সর্বক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুয়ায়ী অগ্রগতি ও উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে না, দুর্নীতি যে কি তা কল্পনায়ও আসে না, একে অপরের কোনকিছু অন্যায়ভাবে বা চুরিচামারির মাধ্যমে হস্তগত করছে না, কেনাবেচাতে ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি নেই, একের প্রতি অপরের হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ ইত্যাদি নেই, নির্বাচনে কারচুপি যে কি তা বুঝে না, প্রত্যেকেপ্রত্যেকের দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সাথে পালন করছে, কোথাও কোনকিছুতেই কোন হেরফের হচ্ছে না এবং সুষম বণ্টনের কার্যকারিতা আছে যেগুলোতে আইনের এপ্রবাহ বিদ্যমান আছে। এসব নীতিইতো শান্তিশৃঙ্খলার নির্মল উপায় ও পদ্ধতি। বিশ্বের মানুষ এগুলোরই প্রত্যাশী। আল্লাহ্‌প্রদত্ত ইসলামী আদর্শ ভিন্ন এবিশ্বে আরকোন আদর্শই এগুলোর প্রত্যক্ষ ও খোলাখুলি নিশ্চয়তাপ্রদান করছে না, অতীতে করে নেই এবং ভবিষ্যতেও করতে পারবে না। এতে এটা দেদীপ্যমান ও প্রতিভাত যে, ইসলামী আদর্শ সর্বসময় প্রগতিশীল এবং প্রগতির অগ্রদূত ও পথপ্রদর্শক। এসব আমার উদ্ভাবিত বা কল্পনাপ্রসূত নীতিকথা নয়। নবীকরিম (সঃ), খোলাফায়েরাশেদীন, ওমর-ইবনে-আবদুল আজীজ ও আরো অনেকের কোরআন ও হাদীসের দীপ্তিতে রাষ্ট্রপরিচালনের ইতিহাসে এসব নীতিকথার কার্যকারিতা ও বাস্তবানুগতা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে বা স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে আছে।

মোসলমানেরা কোরআন ও হাদীসের অর্থ জানবে, এটা স্বাভাবিক কথা। এতে অস্বাভাবিকতার কিছুই নেই। আমরা শিক্ষিত লোক বিভিন্ন কবির কবিতা, বিভিন্ন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার, বিভিন্ন সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম, বিভিন্ন চিন্তাবিদের চিন্তাধারা ইত্যাদি সম্পর্কে জানি ও জ্ঞানার্জন করি। আমরা তাদের থেকে আমাদের কথায়, লেখায় ও কাজে দৃষ্টান্ত দেই। যারা ইসলামকে শুধু অর্চনাআরাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় তারা আল্লাহ্‌র ও কোরআনের এবং নবীর ও হাদীসের কোন দৃষ্টান্ত দেয় না। অথচ, এমন কোনকিছু নেই যেটাতে কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি প্রযোজ্য নয়। আসলে কোরআন ও হাদীসের অর্থ জানাটা থেকে তারা ইচ্ছা করেই দূরে থাকছে। তারা জানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কোরআন ও হাদীসের অর্থ তুলনামূলকভাবে জানলে তাদেরকে নিঃসন্দেহে বা সন্দেহাতীতভাবে এদিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যারা কোরআন ও হাদীসের সাথে সম্পর্কহীন তাদের কাকেও ক্রীতদাস প্রথা কে উচ্ছেদ করেছে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেবে যে, আমেরিকার ১৬তম প্রেজিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকন ২১৬ বছর পূর্বে এপ্রথা উচ্ছেদ করেছেন। এটা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানহীনতার কুফল। বস্তুত, ১৪৫০ বছর পূর্বে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এপ্রথা উচ্ছেদ করেছেন। তাই, এটা

www.pathagar.com

আমাদের নৈতিক দায়িত্ব যে, আমরা কোরআন ও হাদীসের অর্থও জানবো এবং অন্যান্য বিষয়ের উদ্ধৃতির সাথেসাথে এদু'টি হতেও উদ্ধৃত করবো। জামায়াত যেটা করে বা বলে আমরা সেটা করবো না বা বলবো না তা হতে পারে না। জামায়ত খায় বলে আমরা খানা ছেড়ে দিচ্ছি না এবং জামায়াত নামাজ পড়ে বলে আমরা নামাজ ছেড়ে দিচ্ছি না। আমরা মোসলমান। আমাদের ধর্ম ইসলাম, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। জামায়াত ইসলামের কথা বলছে। তাই, আমরা জামায়াতের বিরোধিতার নামে ইসলামের বিরোধিতা করতে পারি না। আমরা যারা মোসলমান তারা ইসলাম মানবো, ইসলাম অনুযায়ী কাজ করবো, ইসলাম হতে উদ্ধৃতি দেবো ও ইসলামের কথা বলবো। তাছাড়া, বাংলাদেশ ইসলামী দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। তাই, এদেশের জাতীয় আদর্শ হচ্ছে ইসলাম।

গ

মৌল হচ্ছে মূলসম্বন্ধীয়, মূলোৎপন্ন ও আদিম। মূল হচ্ছে শিকড়, গোড়া, উৎপত্তির হেতু বা স্থান, উৎস, ভিত্তি, পুঁজি ও মূলধন। তাই, মূল ব্যতীত কোনকিছুই কল্পনা করা যায় না। কোনকিছু সম্পর্কে জানতে হলে তার মূলতত্ত্ব, মূলনীতি, মূলপ্রকৃতি, মূলভিত্তি ও মূলতন্ত্র জানতে হয়। তাই, তা নির্ভুলভাবে জানার জন্যে এগুলো জানাটা অপরিহার্য। যারা এঅপরিহার্যতার ভিত্তিতে কোনকিছু জানে তারাই সেটাতে পরিপক্ক আর পরিপক্কতা ব্যতীত নির্ভুলতাতে পৌঁছা যায় না। যারা পরিপক্কতার মাধ্যমে নির্ভুলতাতে থাকে তারাই মৌলবাদী। মূলের ভিত্তিতে মৌলবাদীদের দ্বারা প্রচারিত মত বা মতবাদই হচ্ছে মৌলবাদ। মৌলবাদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ। এবিশ্বে যতো নবীরাসূল প্রেরিত হয়েছেন সবাই একত্ববাদ প্রচার করেছেন। কেউই দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ ও বহুঈশ্বরবাদ প্রচার করেননি। ঈমানের পাঁচটি স্তম্ভ হচ্ছে কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত। কালেমা হচ্ছে চারটি যেগুলো প্রত্যেক মোসলমানকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হয়। তাইয়্যেব অর্থ পবিত্র। শিরকের অপবিত্রতা হতে পবিত্র হতে হলে যেকালেমা পাঠ করতে হয় তাকে কালেমায়ে তাইয়্যেবা বলে। একালেমার অর্থ হচ্ছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মোহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত পুরুষ (রাসূল)। এভাবে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, আমরা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও হয়রত মোহাম্মদ (সঃ) এর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিচ্ছি। কোরআনে সূরা বাকারার ১০৭, ১১৫, ১১৬ ও ১১৭ আয়াতে এবং আরোঅনেক সূরার অনেক আয়াতে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের কথা বর্ণিত আছে। সূরা যুমারের ৫ম

www.pathagar.com

আয়াতে এটা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, আল্লাহ্ সুপরিকল্পিতভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

মৌলবাদ বা ইসলামী মতবাদকে ইংরেজীতে ডগম্যা বলা হয়। ডগম্যার এডজেকটিভ হচ্ছে ডগমেটিক যার অর্থ হচ্ছে বদ্ধমূল ধারণাগত, কিন্তু যুক্তিসহ নয় এমন, মতবাদ বা যুক্তিতর্কের তোয়াক্কা না করে দৃঢ়ভাবে জাহির বা প্রকাশ করে এমন মতবাদ। ডগমেটিকের নাউন হচ্ছে ডগম্যাটিজম যার অর্থ হচ্ছে মতবাদ সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস। ডগম্যাটিজমের অর্থানুযায়ী মৌলবাদীদের রয়েছে অন্ধবিশ্বাস। অথচ, আল্লাহ্র মতবাদে কোন অন্ধত্ব নেই। তিনি চরম ও চূড়ান্ত যুক্তিপ্রমাণ দিয়েই তাঁর ইসলামী মতবাদ পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁতভাবে বিশ্বের মানুষের জন্যে দিয়ে দিয়েছেন। সূরা আনআমের ১৫০ আয়াতে এটা পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, চরম ও চূড়ান্ত যুক্তিপ্রমাণ আল্লাহ্রই। আমরা আল্লাহ্কে না দেখেও বিশ্বাস ও স্বীকার করছি। আমাদের এবিশ্বাস ও স্বীকারের উৎস হচ্ছে কোরআন ও হাদীস এবং এবিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা। তাই, আমাদের এবিশ্বাস ও স্বীকারকে অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধস্বীকার বলা যাবে না। যেখানে আমরা আল্লাহ্কে বিশ্বাস ও স্বীকার করছি সেখানে আমরা আল্লাহ্র মতবাদকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করতে পারি না। তাঁর মতবাদকে বিশ্বাস ও স্বীকার করাটাকেও অন্ধভাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করা বলা যাবে না, কেননা এবিশ্বাস ও এস্বীকারেরো যুক্তিপ্রমাণ হচ্ছে কোরআন, হাদীস ও এবিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারে ভাবনা। তাই, ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে থেকে মানুষের সঠিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে যারা রাজনীতি করছে বা করবে তাদেরকে অবশ্যম্ভাবীরূপে মৌলবাদী হয়ে মৌলবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে নিরন্তর বা অবিরাম গতিতে কাজ করে যেতে হবে। মৌলবাদের সম্পর্ক হচ্ছে ধর্মের সাথে। যতোরকমের স্বাধীনতাই আসছে-না-কেন ধর্ম ছিলো, আছে ও থাকবে। তাই, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষশক্তি হোক বা বিপক্ষশক্তি হোক, মৌলবাদ এশক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মৌলবাদ স্বাধীনতার বিপক্ষে নয়। এটা স্বাধীনতা অর্জনের ও সবাইকে সুষমভাবে স্বাধীনতার সুফলের অংশিদারিত্বপ্রদানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

রাজনীতিবিদেরকে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে অনাবিল বা নির্মল ধারণা রাখতে হয়। সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক হচ্ছে সম্প্রদায়ের সাথে। সম্প্রদায় হচ্ছে দল, সমাজ, গোষ্ঠী ও সংঘ। সম্প্রদায়ের বিশেষণ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক যার অর্থ হচ্ছে সম্প্রদায়সম্বন্ধীয় বা সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন। সাম্প্রদায়িকতার ইংরেজী হচ্ছে কমিউনেলিজম বা সেকটেরিয়েনিজম। একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকতে পারে এবং আছেও। মোসলমানদের মধ্যে আছে শিয়া ও সুন্নী, হিন্দুদের মধ্যে আছে কয়েকটি বর্ণ, খ্রীস্টানদের মধ্যে আছে ক্যাথ্যালিক ও প্রটিস্ট্যাণ্ট

www.pathagar.com

ইত্যাদি। তাই, সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে স্বস্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আসক্তি ও অনুরাগ যা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে ও রেষারেষির কারণ হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রদায়িকতাকে ইংরেজীতে সেকিউল্যারিজমও বলা হয়। কিন্তু, এ সেকিউল্যারিজম ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই, সাম্প্রদায়িকতা সেকিউল্যারিজম নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে সেকিউল্যারিজম। ধর্মের + নিরপেক্ষতা = ধর্মনিরপেক্ষতা। ফলে, ধর্ম নিরপেক্ষ থাকবে। নিরপেক্ষ থাকাটা দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থে কিছুই না বলে চুপচাপ থাকা এবং অপর অর্থে কারো লাভক্ষতি বা সুবিধাঅসুবিধার দিকে না দেখে বা না তাকিয়ে যেটা সত্য সেটা বলা ও করা। সার্বিকভাবে আমরা সবাই নিরপেক্ষ থাকাটা অপর বা দ্বিতীয় অর্থে বুঝি। তাছাড়া, সে-ই নিরপেক্ষ যার কোন পক্ষ নেই। তাই, নিরপেক্ষ হচ্ছে পক্ষপাতশূন্য, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। নিরপেক্ষতা হচ্ছে পক্ষপাতশূন্যতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য। শান্তি ও অগ্রগতির জন্যে প্রয়োজন পক্ষপাতশূন্যতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য। পক্ষপাতশূন্য লোক বিরল বা খুবকম। নবীরাসূল ও সাহাবায়েকেরামরা ছিলেন পক্ষপাতশূন্য। তাঁরা ধর্মপ্রচার করেছেন ও ধর্মের অনুশাসন মেনে চলেছেন। তাই, ধর্ম হচ্ছে পক্ষপাতশূন্য ও নিরপেক্ষ। এধর্ম হচ্ছে ইসলাম যার অর্থ শান্তি যা প্রত্যেক মানুষ কামনা করে। ইসলামই আল্লাহ্‌মনোনীত ও প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটা সার্বজনীন ধর্ম। এটা সব মানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। এটা নিরপেক্ষতার মূর্ত বা প্রত্যক্ষ প্রতীক বা নিদর্শন। বাস্তবে যারা যা চায় তা পায় না তারাই এনিরপেক্ষতার বিরোধিতা করে এবং নিরপেক্ষতা বলতে নিশ্চলতা ও নিষ্ক্রিয়তা চায়। নিরপেক্ষতা কখনো গতিহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা নয়। তাই, নিরপেক্ষতার স্বার্থে ইসলামের কোন পক্ষান্তর বা বিকল্প নেই এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এটার যতো পক্ষান্তর বা বিকল্পই বের করছে - না - কেন কোনটিই শান্তি দিতে পারছে না এবং এগুলো কালক্রমে একে একে ধ্বংস হচ্ছে।

সেকিউল্যারিজমের বাংলা অর্থ হচ্ছে এমন বিশ্বাস যে রাষ্ট্র, নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্ম হতে স্বাধীন হয়া উচিত। এবিশ্বাস কার বা কাদের তা জানতে হলে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, সেকিউল্যার স্টেট্ বলতে কি বুঝানো হয়। সেকিউল্যার স্টেট্ বলতে ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত রাষ্ট্র বুঝায়। লোকায়ত বিশেষ্য অর্থে হচ্ছে চার্বাকের মত ও নাস্তিক্যবাদ আর বিশেষণ অর্থে হচ্ছে চার্বাকের মতাবলম্বী ও নাস্তিক। চার্বাক হচ্ছে নাস্তিক মুনিবিশেষ। সে আত্মা, পরলোক বা পরকাল প্রভৃতিতে অবিশ্বাসী ছিলো। তাই, ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মহীনতা বুঝায়, কেননা নাস্তিকের কোন ধর্মকর্ম নেই। নাস্তিকেরা আল্লাহ্-খোদা, ঈশ্বর-ভগবান ইত্যাদি কোনকিছুতেই বিশ্বাসী নয়। তারা

www.pathagar.com

নিরীশ্বরবাদী, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী বা নাস্তিক। যারা আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে না তাদের ধর্ম বলতে কিছুই নেই। তাই, তারা ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার হোতা ও উদ্যোক্তা। তারা যেদার্শনিক মত প্রকাশ করছে তা হচ্ছে নিরীশ্বরবাদ বা নাস্তিক্যবাদ। নাস্তিকের বিপরীত হচ্ছে আস্তিক। নাস্তিকেরা চায় ধর্মনিরপেক্ষতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আস্তিকেরাও নাস্তিক হয়ে যাক। ধর্মনিরপক্ষেতার বেড়াজালে, ধর্মীয় জ্ঞানের বা ধর্মশিক্ষার অভাবে, ধর্মহীনতায় অবগাহন করে আস্তিকেরা আস্তিকতা হতে ছিটকে পড়ে নাস্তিকতায় বা নাস্তিক্যে জড়িয়ে পড়াটাই নাস্তিকদের অভিপ্রায়। তাই, আস্তিকেরা ধর্মহীন হবে না। তাদের ধর্ম থাকবেই। তবে, ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের ফলে ধর্ম পূর্ণত্বলাভ করেছে। তাছাড়া, যেখানে সব নবীরাসুল একত্ববাদ, অর্থাৎ ইসলাম, প্রচার করছে সেখানে দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ ও বহুঈশ্বরবাদ কোন ধর্মই হতে পারে না। শুধু একত্ববাদ, অর্থাৎ ইসলামই একমাত্র ধর্ম। তবু, দ্বিত্ববাদী; ত্রিত্ববাদী ও বহুঈশ্বরবাদীরা তাদের অভিরুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী যেসব ধর্মের অবতারণা করেছে সেগুলোর সাথে ইসলাম সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে না। ইসলাম তাদের ওসব ধর্মের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাবিধান করে। ওসব ধর্মের সাথে রাষ্ট্রপরিচালনার কোন সম্পর্ক নেই। ওসব ধর্মের সম্পর্ক হচ্ছে শুধু প্রার্থনার সাথে এবং ওসব ধর্মাবলম্বী তাদের ধর্মকে রাষ্ট্রপরিচালনার সাথে সম্পর্কহীন পাচ্ছে। তাই, নাস্তিকেরা যেভাবে চাচ্ছে যে, আস্তিকেরাও নাস্তিক হয়ে যাক অন্যান্য ধর্মাবলম্বীও সেভাবে চাচ্ছে যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মতো হয়ে যাক। আস্তিকেরা যেমন নাস্তিকদের প্ররোচনায় নাস্তিক হচ্ছে না ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও তেমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর প্ররোচনায় তাদের অনুসারী ও পশ্চাদ্ধাবক হয়ে নিজেদের উভয় দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ্ বা ধ্বংস করতে পারে না। মানুষ সুবিচারের ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে নিখুঁত ও নিরপেক্ষ আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি চায়। এ নিখুঁত ও নিরপেক্ষ আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত ও প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামে দিয়ে দিয়েছেন। এরকম নিখুঁত ও নিরপেক্ষ আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি কোন মানুষ কোনদিন দিতে পারে নেই, পারছে না এবং পারবেও না, কেননা যারাই আইনরচনা করে তারা তাদের স্বার্থের দিকে কিছু-না -কিছু দৃষ্টি দেয়ই। তাই, আর ধর্মনিরপেক্ষতার ধোঁয়া না ছেড়ে সব মানুষের কাঙ্ক্ষিত সুবিচার ও সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্যে আল্লাহ্‌প্রদত্ত নিখুঁত ও নিরপেক্ষ আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি কার্যকর করার জন্যে রাজনীতি করা রাজনীতিবিদদের পবিত্রতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইসলাম অন্যান্য ধর্মের প্রতি কোনপ্রকার বলপ্রয়োগ ও জোরজবরদস্তি করে না এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকে তাদের স্বস্ব অর্চনা-আরাধনা বিসর্জন দিয়ে বা পরিত্যাগ করে

www.pathagar.com

ইসলামী এবাদতের প্রতি বাধ্য করে না। তবে, কেউ ইসলামের প্রতি আঘাত হানাকে ইসলাম বরদাস্ত বা সহ্য করে না। তাই, ইসলামী অনুশাসন বা ইসলামী রাষ্ট্র বলতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর ধর্মকর্মের বিলয় ও অবলুপ্তি এবং তারা সবাই বাধ্যতামূলকভাবে মোসলমান হয়া বুঝায় না। ইসলামী অনুশাসন বা ইসলামী রাষ্ট্র বলতে এটা পরিস্কারভাবে বুঝায় যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে তাদের ধর্মকর্ম পালন করবে এবং নিরপেক্ষ সামাজিক সুবিচার, সুষম বণ্টন ও সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রপরিচালনের জন্যে সবার কাঙ্ক্ষিত আল্লাহ্‌প্রদত্ত নিখুঁত ও নির্ভুল আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতির প্রয়োগ হবে। এতে মানুষ তাদের অবচেতন মনে যেগণতন্ত্র লালন করছে তা অর্জিত হবে ও সাম্যভাব জেগে ওঠবে এবং পৃথিবীর কোন দেশের সাথে মোসলমানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে না ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ইসলামকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে ইসলামের প্রতি কোন বিদ্বেষাত্মক ভাব ও শত্রুতাপোষণ করবে না। পৃথিবীতে জাতিধর্মনির্বিশেষে এমনকোন দেশ আছে বলে মনে হয় না যেদেশের জনগণ নিখুঁত, নির্ভুল ও নিরপেক্ষ আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি চায় না। মোসলমান রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্‌প্রদত্ত নিখুঁত, নির্ভুল ও নিরপেক্ষ আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে সামাজিক সুবিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা এবসুন্ধরার সব দেশকে এসব আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা। অথচ, মোসলমান রাজনীতিবিদেরাও ইসলামকে তাদের স্বার্থে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করছে বা ইসলাম দিয়ে ব্যবসা করছে।

তথাকথিত পাকিস্তানের সংবিধানে এটা ছিলো যে, কোরআন ও হাদীসের পরিপন্থী কোন আইন প্রণীত হবে না। অথচ, কোরআন ও হাদীসের আলোকে কোন আইন প্রণীত হয়নি। যদি তা হতো, আমার মনে হয়, তাহলে সামাজিক সুবিচার ও সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত হতো এবং তথাকথিত দু'পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য দূর হতো ও ভৌগোলিক দূরত্ব ক্ষতিকর হতো না বিধায় হয়তোবা তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতো না। বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ, আল্লাহ্‌প্রদত্ত আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি চালু করা হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশের সংবধিানে প্রথমে "বিস্‌মিল্লাহ্‌ হিররাহ্‌মানির রাহিম" লিখা আছে এবং এসংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনের মূলনীতিগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সন্নিবেশিত আছে। "বিস্‌মিল্লাহ্‌ হিররাহ্‌মানির রাহিম" এর অর্থ হচ্ছে রহ্‌মান–রহিম আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। আল্লাহ্‌র নেয়ামত বা অবদান দু'প্রকারের–একটি হচ্ছে আয়াসনিরপেক্ষ

www.pathagar.com

এবং অপরটি হচ্ছে আয়াসলভ্য। যেসব নেয়ামত বা অবদান বিনাক্লেশে জাতিধর্ম ও পাপীপুণ্যবাননির্বিশেষে জীবমাত্রই লাভ করে সেগুলোকে আয়াসনিরপেক্ষ নেয়ামত বা অবদান বলা হয়। এগুলো হচ্ছে পানি, বায়ু, সূর্যকিরণ ইত্যাদি। যেসব নেয়ামত বা অবদান পরিশ্রমের বিনিময়ে জীব লাভ করে সেগুলোকে আয়াসলভ্য নেয়ামত বা অবদান বলা হয়। এগুলো হচ্ছে ফসল, আহার, আত্মার বিকাশ ইত্যাদি। আল্লাহ্র যেগুণ দ্বারা জীব প্রথমোক্ত অবদানগুলো লাভ করে তাঁর সে গুণবাচক নাম হচ্ছে রহ্মান আর তাঁর যেগুণ দ্বারা জীব শেষোক্ত অবদানগুলো লাভ করে তাঁর সে গুণবাচক নাম হচ্ছে রহিম। আল্লাহ্কে সর্বশক্তিমান স্বীকার করে আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্র নামে শুরু করে শেষপর্যন্ত আল্লাহ্র দেয়া আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী সবকিছু সম্পাদন বা সম্পন্ন করতে হয়। উক্ত পদ্ধতিতে সূচনা দিয়ে শেষপর্যন্ত সবকিছু নিজেদের মনগড়া পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন করাটা আল্লাহ্র সাথে গাদ্দারি এবং ইসলামের ও মোসলমানদের সাথে প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ও মোনাফেকি ব্যতীত অন্যকিছু নয়। কাজেই, রাজনীতিবিদেরা বুঝে দেখুন যে, আপনাদের কার রাজনীতি কোন ধারায় কি জন্যে প্রবাহিত হচ্ছে।

ইসলামী ধারায় জীবনযাপন ও রাষ্ট্রপরিচালনের জন্যে কোরআন ও হাদীসের আলোকে বহু বইপুস্তক প্রণীত আছে। কেউকেউ এসব প্রণেতাদের মধ্যে কারোকারো নামানুযায়ী মতবাদের কথা বলছে। যারা এমতবাদের কথা বলছে তাদের মতে এসব প্রণেতারা কোরআন ও হাদীসের দোহাই দিয়ে তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে এবং এমতবাদ ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের মত থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বের হয়ে আসছে যে, ইসলামী আদর্শের সাথে যেমতবাদ সামাঞ্জস্যহীন সেটা মানুষের মতবাদ, ইসলামী মতবাদ নয়। মানুষের অনেক মতবাদ আছে। মানুষ তাদের চিন্তাচেতনার আলোকে এসব মতবাদ আবিষ্কার করেছে। এসব মতবাদের সমর্থকো আছে। ইসলামী চিন্তাচেতনায় কেউ ইসলামী আদর্শের আলোকে ইসলামী মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে কোরআন ও হাদীসের আলোকে বইপুস্তক প্রণয়ন করলে এবং সেটা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় বলে গ্রহণ না করার জন্যে রাজনীতি করলে কোন মানুষের কোন মতবাদই গ্রহণীয় হতে পারে না। কথা ওঠতে পারে যে, ইসলামকে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করে কেউ কোন মতবাদের আওয়াজে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। এপ্রসঙ্গে এপ্রশ্ন এসে যায়, ব্যক্তিগত চিন্তাচেতনায় মতবাদ চালু করা গেলে, ইসলামকে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করে মতবাদসৃষ্টির দ্বারা কেন রাজনীতি করা যাবে না? এটা একজনের চিন্তা হতে পারে যে, সে তার মতবাদে ইসলামের সুযোগ নেবে। এপ্রসঙ্গে বলা হবে যে, ইসলাম একটি ধর্ম

www.pathagar.com

এবং এটা সার্বজনীন, বিশেষ করে সব মোসলমানের, বিধায় কেউ এককভাবে এটাকে ভুল বুঝিয়ে তার নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারবে না। এটার উত্তরে এপ্রশ্ন এসে যায়, ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছা অনুযায়ী কর্মসূচি দিয়ে মতবাদ সৃষ্টি করতে পারলে, ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামকে জড়িত করে কেন মতবাদ চালু করা যাবে না? এটার উত্তরে বলা হবে যে, ইসলাম একটি পবিত্র ধর্ম এবং এটার পবিত্রতা নষ্ট করার অধিকার কারো নেই। এটার উত্তরে যেপ্রশ্নটি ওঠে তা হচ্ছে, যে ব্যক্তিগত কর্মসূচিভিত্তিক মতবাদ ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এবং মোসলমানদেরকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে সেটার প্রতি আপত্তি না থাকলে ইসলামের নামে কোন মতবাদ চললে সেটার প্রতি কেন আপত্তি থাকবে? সব কথার মূলকথা হচ্ছে যে, ইসলাম কারো দ্বারা সূচিত মতবাদের বা মতাদর্শের বা কর্মসূচীর বাহন বা হাতিয়ার নয়। ইসলাম স্বয়ং একটি মতবাদ বা মতাদর্শ বা পরিকল্পিত বিশ্বব্যবস্থা। কোন মোসলমানের নিকট এমতবাদ বা মতাদর্শ বা পরিকল্পিত বিশ্বব্যবস্থা ব্যতীত অন্যকোন মতবাদ বা মতাদর্শ বা কর্মসূচিভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণীয় হতে পারে না, কেননা তা ইসলামের পরিপন্থী বিধায় ইসলামের পবিত্রতাক্ষুণ্নকারী। তাছাড়া, যেখানে ইসলামকে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করার মতো মতবাদ গ্রহণীয় নয় সেখানে যেসব মতবাদের কর্মসূচির সাথে ইসলামের কোনপ্রকার যোগসূত্র ও সম্পর্ক নেই সেগুলো কোনভাবেই কোন মোসলমানের নিকট গ্রহণীয় হতে পারে না।

যারা ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী নয় তারা ইসলাম বলতে এমন একটি ধর্ম বুঝে যেটাকে তাদের মর্জিমোতাবেক ধর্মীয় কাজ বলতে প্রার্থনার, অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাতের, মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। বাস্তবে ইসলাম মানুষের প্রতিটি কাজের সাথে সম্পৃক্ত বা সংস্রবযুক্ত। মানুষ নিজেদের চিন্তাচেতনা ও ধ্যানধারণার ভিত্তিতে মতবাদ সৃষ্টি করেছে মানুষের মঙ্গলের জন্যে। কিন্তু, এসব মতবাদ মানুষের প্রতিটি কাজের সাথে সুষমভাবে সম্পৃক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত নয়। ইসলাম মানুষের প্রতিটি কাজের সাথে সুষমভাবে সম্পৃক্ত বা সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া, এটা সবার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত। রাজনীতি মানুষের মঙ্গলের জন্যে। কিন্তু, মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত রাজনীতিতে সুষম মঙ্গল কখনো সাধিত হয় নেই, এখনো হচ্ছে না ও কোনদিনো হবে না। ইসলাম সুষম মঙ্গলের রাজনীতির দীক্ষা দিচ্ছে। তাই, মোসলমান রাজনীতিবিদদের পবিত্রতম দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী রাজনীতি করা এবং যারা ইসলামী রাজনীতি করছে তারা ইসলামকে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করেছে এবং মতবাদ সৃষ্টি করে ইসলামের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করছে না বলা। ইসলামের পবিত্রতা রক্ষা করতে হলে কি করতে হবে? ইসলামের পবিত্রতা ইসলামকে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করা চলবে

www.pathagar.com

না বলে এবং যারা ইসলামী অনুশাসন চালু করার জন্যে কোরআন ও হাদীসের আলোকে বইপুস্তক প্রণয়ন করে ও মানুষকে হেদায়েতের বাণী শুনায় তাদের সমালোচনা করে রক্ষা করা যাবে না। ইসলামী জিন্দিগী বা জীবনপরিচালনার দ্বারাই ইসলামের পবিত্রতা রক্ষা করা যাবে। আমরা দেখতে চাই যে, যারা ইসলামকে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত না করার ও ইসলামের পবিত্রতা রক্ষা করার কথা বলছে তারা সবাই ইসলামী জিন্দিগী পরিচালনা করছে।

যারা ইসলামী রাজনীতি করছে না তারাও ঈমানের কথা বলছে। তারা যারা ইসলামী রাজনীতি করছে তাদের কোনকোন কর্মকাণ্ডে তাদেরকে বেঈমানির কথা বলে থাকে। ঈমানের বিপরীত হচ্ছে বেঈমান। ঈমান হচ্ছে বিশ্বাস ও বেঈমান হচ্ছে অবিশ্বাসী। যার ঈমান আছে সে বিশ্বাসী এবং যে বেঈমান সে অবিশ্বাসী। এবিশ্বাস ও অবিশ্বাস কাকে কেন্দ্র করে? এটা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ও তাঁর নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কে কেন্দ্র করে। যারা আল্লাহ্র ও তাঁর নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি বিশ্বাসী তারা কোরআন ও হাদীসমোতাবেক জীবনযাপন ও যাবতীয় কার্য পরিচালনা করতে হয়। যারা বেঈমান বলে গালিগালাজ করে ও কথাবার্তা বলে তাদের দেখা দরকার যে, তারা কোরআন ও হাদীস বুঝতে চেষ্টা করছে কিনা ও এদু'টি মোতাবেক জীবনযাপন ও যাবতীয় কার্য পরিচালনা করছে কিনা। নিজে বিশ্বাসী না হয়ে এবং বিশ্বাসী হলে বিশ্বাসমোতাবেক সবকিছু না করে অন্যকাকেও অবিশ্বাসী বলাটাও ইসলামকে অবমাননা করার শামিল। কোন ব্যক্তি দাড়ি রেখে সুন্নতি পোশাকে খারাপ কাজ করলে সেটা ইসলামের দোষ নয়, সেব্যক্তির বৈশিষ্ট্যদোষ। তাছাড়া, কোন ব্যক্তি ইসলামী আচারআচরণ দেখিয়ে খারাপ কাজ করলে সে-ই দায়ী। এজন্যে ইসলামকে কোনভাবেই দায়ী করা যায় না, কেননা খারাপ কাজ পরিহার করার ও ভালো কাজে মনোনিবেশ করার প্রতিই ইসলাম উদাত্ত বা মহান আহ্বান জানায়। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অভাবে এবং যেকোন কারণে আমরা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানা থেকে দূরে সরে থাকছি বিধায় আমরা এসব চরিত্রহীন লোকের চরিত্রকে ইসলামী বৈশিষ্ট্য ধরে নিয়ে ভুলে ও ক্ষতিতে নিমজ্জিত আছি। প্রত্যেক মোসলমান এভুল ও ক্ষতি হতে বেঁচে থাকার জন্যে ইসলামের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়াটা অতীব প্রয়োজন।

বিভিন্ন নাটক ও উপন্যাসে সাধারণত খারাপ ও ব্যাঙ্গাত্মক চরিত্রগুলো সুন্নতি লেবাসে ও ইসলামের প্রতি কটাক্ষ করে বা অপাঙ্গদৃষ্টি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। এতে সাধারণ লোক মনে করে যে, যে ইসলাম সুন্নতি পোশাক পরিধান ও আকারআকৃতি ধারণ করিয়ে অশান্তি সৃষ্টি এবং খারাপ ও অকল্যাণকর কাজ সম্পাদন করায় সে ইসলাম থেকে দূরে থাকাই ভালো। বলতে হচ্ছে যে, এসব নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক

www.pathagar.com

ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানহীন এবং এজ্ঞানহীনতার কারণে তারা ইসলামবিদ্বেষী। আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম সুন্নতি পোশাক পরিধান ও আকারআকৃতি ধারণ করাকে উৎসাহিত করে এবং অন্যকারো এপোশাক ও আকারআকৃতি ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, এপোশাক এবং আকারআকৃতি ধারণ করে খারাপ চরিত্রের অধিকারী হয়াটাকে ইসলাম সর্বতোভাবে ঘৃণা করে। তবে, এটাও যেহেতু আমাদের ধারণা যে, এপোশাকে ও আকারআকৃতিতে কেউ চরিত্রহীন হতে পারে না সেহেতু ধূর্ত ব্যক্তিরা এগুলো ধারণ করে তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করে। তাই, সুন্নতি পোশাক ও আকারআকৃতি ধারণ করে যারা খারাপ করে সেজন্যে তাদের চরিত্র দায়ী, এপোশাক ও আকারআকৃতি এবং ইসলাম আদৌ বা মোটেই দায়ী নয়। আমাদেরকে এসব ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে হবে, সুন্নত ও ইসলামের প্রতি নয়। সুন্নতি পোশাকের ও আকারআকৃতির সব মোসলমানই যে খারাপ করে তা নয়। ওসব ধূর্ত মোসলমানই এপোশাকে ও আকারআকৃতিতে খারাপ করে যারা যেকোনভাবে তাদের হীন স্বার্থ সিদ্ধি করাটাকেই সবকিছু মনে করে। আমি মনে করি যে, তারা খারাপ কাজ করে এপোশাক ও আকারআকৃতিকে অপমান করে। এঅপমানের দায়ে তাদের শাস্তি অবধারিত হয়াটা একান্ত প্রয়োজন। তাই, নাটক, উপন্যাস, অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে ইসলাম ও সুন্নতের ন্যায়নিষ্ঠা, সাম্য, বিশালত্ব, উদারতা, মহানুভবতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি তুলে ধরে যেসব মোসলমান উক্ত পোশাকে ও আকারআকৃতিতে খারাপ কাজ করে তাদের চরিত্রকে ঘৃণা করার মনোভাব সৃষ্টি করে ইসলাম ও সুন্নতের উক্ত বৈশিষ্ট্য ও নীতিগুলোর প্রতি সাড়া জাগাতে হবে বা সচেতনতার উন্মীলন ঘটাতে হবে।

যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাদেরকে মোরতাদ বা ইসলামত্যাগী বলা হয়। ইসলামী আইনে মোরতাদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। সবাই খেয়েপরে বেঁচে থাকতে চায়। এজন্যে প্রয়োজন টাকাপয়সার। টাকাপয়সা আইনানুগভাবে উপার্জনের কোন উপায় না পেলে অপরাধমূলক পন্থায় তা সংগ্রহের প্রবণতা জন্ম নেয়। এটাকে বলা হয় অভাবে স্বভাব নষ্ট। কেউকেউ ধর্মান্তরিত হয়, অর্থাৎ স্বধর্মত্যাগপূর্বক অন্যধর্ম গ্রহণ করে। আমাদের দেশে জায়গায়জায়গায় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেক খ্রীষ্টান মিশান আছে। এসব মিশান আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাবে কষ্টদূরীকরণার্থে অনেক মোসলমান এসব মিশানে আশ্রয়গ্রহণ করে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে, অর্থাৎ খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। ইসলামী আইন বলবৎ না থাকলেও এআইনে তাদেরকে হত্যা করার বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। ইসলামে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা আছে। ইসলামী রাষ্ট্র এসব প্রয়োজন মেটাতে বাধ্য। এগুলো মেটানোর পরো কোন মোসলমান ধর্মান্তরিত হলে বা অন্যধর্ম গ্রহণ করলে তাকে মোরতাদ হয়ার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায়। এসব মৌলিক

www.pathagar.com

চাহিদা পূরণের জন্যে যেসব মোসলমান খ্রীষ্টান হচ্ছে তাদেরকে আমাদের কারো কিছু বলার নেই বলে আমি মনে করি। এপরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগপূর্ণ। একনিষ্ঠ সেবার দ্বারাই মানবতার প্রকৃত রূপ ফোটে ওঠে। মানবসেবার মূর্ত প্রতীক বা প্রত্যক্ষ আদর্শ মহানবী হযরত মোহম্মদ (সঃ) বর্বর আরবসমাজে সেবার দ্বারাই তাঁর ব্যক্তিত্বকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সেবাধর্মের দ্বারাই অপরের হৃদয় জয় করা যায়। ইসলামের দীপশিখা ইসলামের সেবামূলক কাজের দ্বারা কুফর ও শিরকের বহুদূরপ্রসারিত সুদৃঢ় মূল ওপড়ে ফেলে ও গভীর অন্ধকার ভেদ করে জ্বলে ওঠেছিলো। হিমালয়ান উপমহাদেশে যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের যাঁতাকলে বৌদ্ধ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ইতর জীবের ন্যায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলো সেখানে তখন নবাগত মোসলমানদের সাম্য, ন্যায়নীতি ও সেবাকর্মই তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছিলো। অথচ, বর্তমানে মোসলমানেরা আকৃষ্ট হচ্ছে খ্রীষ্টান ধর্মের দিকে।

প্রত্যেক মোসলমানের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার তাগিদে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) অর্ধাহারেঅনাহারে দিনপাত করেছিলেন। অথচ, তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান। ইসলামী আদর্শে ও নীতিতে যারা মানুষের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে তারা তাদের চাহিদাপূরণ না হয়া পর্যন্ত নিজেদের চাহিদাপূরণের কথা ভুলে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় না করে একজন অতি সাধারণ লোকের ন্যায় জীবনযাপন করে। খোলাফায়ে রাশেদীন ও ইসলামের মনীষীরা এভাবেই জীবনযাপন করেছিলেন। ফলে, মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ও যেকোনধরনের লোভলালসা বা লিপ্সা দানাবাঁধেনি। বর্তমানে অসন্তোষ ও লোভলালসা বা লিপ্সা ইসলামী সাম্য, ন্যায়নীতি ও সেবাধর্মের অভাবেই দানাবাধছে এবং মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা ও সমবেদনার অভাবে অন্যায়, অবিচার ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রপরিচালনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা মহানবী ও ইসলামের খলিফাদের মতো ইসলামী আদর্শ ও বিধান মেনে চললে ও কার্যকর করলে মোসলমানদের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসবে ও নির্যাতিত লোক ইসলামের প্রতি পুনরায় আকৃষ্ট হবে এবং মোসলমানেরা সব নির্যাতনের অবসান ঘটাতে পারবে।

শোষণের প্রক্রিয়া চালু রেখে দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোর প্রচেষ্টা অবান্তর। দারিদ্রদূরীকরণের স্বার্থে যেসব পদ্ধতিতে শোষণের অবসান ঘটানো যায় সেগুলো কার্যকর করতে হয়। তা হলে শোষণো থাকে না, দারিদ্র্যও থাকে না। উভয় শোষণ ও দারিদ্র্যের মূলোৎপাটনের জন্যে একটি মধ্যপন্থার প্রয়োজন। এপন্থা আজপর্যন্ত কোন মানুষ উদ্ভাবন করতে পারেনি এবং কোনদিনো পারবে না। এটা আছে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামে। তাই, জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই ইসলামের এপন্থা অবলম্বন করাটা

www.pathagar.com

অপরিহার্য। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর ধর্ম ও মোসলমানদের ধর্ম 'ইসলাম' এক নয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর ধর্ম ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধর্মালয়ে ও স্বস্ব গৃহে শুধু অর্চনাআরাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মোসলমানদের ধর্ম 'ইসলাম' শুধু আরাধনাপ্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি কাজ থেকে আন্তর্জাতিকতার প্রতিটি ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই, আরাধনাপ্রার্থনা ইসলামের একটি দিকমাত্র। অথচ, শুধু অর্চনাআরাধনা অন্যান্য ধর্মের আদি ও অন্ত। রাজনীতির সম্পর্ক রাষ্ট্রপরিচালন, কাজকর্ম, আইনকানুন প্রভৃতির সাথে। অন্যান্য ধর্মের এসবের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তাই, এসব ধর্ম রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এসব ধর্মাবলম্বী তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলে থাকে যে, ধর্মে রাজনীতির কোন স্থান নেই এবং ধর্ম ও রাজনীতিকে যারা একনিরিখে দেখে ধর্ম তাদের রাজনীতির হাতিয়ার। যেসব মোসলমান অন্যান্য ধর্মালম্বীর এবলাকথা বলে ও এটা নিয়ে চর্চা করে তারা নিজেদের ধর্ম 'ইসলাম' সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখে না। আল-কোরআনে সূরা মায়েদার ৪৪,৪৫ ও ৪৭ আয়াতে পরিষ্কার ও গুরুগম্ভীর ভাষায় বলা আছে যে, যারা আল্লাহ্প্রদত্ত বিধানানুযায়ী বিচারমীমাংসা করে না তারাই কাফের, জালেম ও ফাসেক, অর্থাৎ সত্যগোপনকারী ও সত্যপ্রত্যাখানকারী, সীমালঙ্গনকারী ও পাপাচারী। মোসলমানেরা কাফের, জালেম ও ফাসেক হতে পারে না। তাই, তাদেরকে আল্লাহ্র বিধান মানতে হয়।

আইনকানুন ও বিধিবিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের। তারাই সরকার গঠন করে যারা ক্ষমতাসীন হয়। রাজনীতির মাধ্যমেই ক্ষমতাসীন হতে হয়। আল্লাহ্র বিধান সরকারই কার্যকর করবে। এসরকার হতে হবে ইসলামী সরকার। তারাই এসরকার গঠন করতে পারবে যারা ইসলামের ভিত্তিতে ক্ষমতাসীন হবে। ইসলামের ভিত্তিতে ক্ষমতাসীন হতে হলে ইসলামী রাজনীতি করতে হবে। তাই, ইসলাম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যারা বলে যে, রাজনীতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই তারাও রাজনীতিতে ইসলামের কথা বলে। তবে, তারা ইসলাম সম্পর্কে কোনকিছু বলার সময় এদিকসেদিক বাদ দিয়ে শুধু নিজেদের জন্যে সুবিধাজনক অংশটুকু বলে। এটা তাদের পক্ষে এজন্যে সম্ভব হয় যে, আমরা মোসলমান, আমাদের ধর্ম 'ইসলাম' হয়া সত্ত্বেও, ইসলাম সম্পর্কে তেমনকোন জ্ঞান রাখি না। আমরা জানি যে, নারীরা তদের রূপলাবণ্য প্রদর্শন করে অশালীনভাবে চলাফেরা করলে বখাটেরা তাদের কারোকারো সম্ভ্রম নষ্ট করে এবং নানা অপরাধ সংঘটিত হবার সম্ভাবনা থাকে ও সংঘটিত হয়ো। তাই, আলেম-ওলেমারা ধর্মের দৃষ্টিতে নারীদের শালীনতারক্ষার জন্যে পর্দার কথা বলে। কিন্তু. তাদের এবলাটাকে অন্যান্যরা নিজেদের

www.pathagar.com

সুবিধার্থে নারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাধারণ লোককে তাদের প্রতি সংক্ষুব্ধ করার জন্যে এভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে যে, তারা মহিলাদের রূপলাবণ্যের প্রতি কটাক্ষ করে। যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তারা কালেমা তাইয়্যেবা থেকে বলে যে, লাইলাহা, অর্থাৎ কোন ইলাহ্ বা মাবুদ নেই। তারা 'লাইলাহা'-র পর 'ইল্লাল্লাহ্' বলে না। এ 'ইল্লাল্লাহ্'-র অর্থ হলো আল্লাহ্ ব্যতীত। তা হলে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। এভাবে যতোই বিশ্লেষণ করা যাবে ততোই দেখা যাবে যে, যারা ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ও অসহিষ্ণু তারা ইসলামের ভেতর থেকেই ইসলামের মূল কেটে দেয়ার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। তবে, যতো চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রই চলুক-না-কেন প্রকৃত মোসলমানেরা ইসলাম জানতে ও বুঝতে শুরু করেছে। অদূর ভবিষ্যতে তাদেরকে ধোঁকা দেয়া যাবে না এবং দিতে গেলে অবস্থা বেগতিক হবে।

গোঁড়া থেকে গোঁড়ামি। গোঁড়ামি হচ্ছে দৃঢ়বিশ্বাস ও নিষ্ঠা। তাই, সে-ই গোঁড়া যে দৃঢ়বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান। দৃঢ়বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ব্যতীত সফলতা সম্ভব নয়। প্রকৃত আদর্শবাদী হতে হলে দৃঢ়বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান হতে হয়। তারাই প্রকৃত আদর্শবাদী যারা মৌল বা মূলকে বাদ দিয়ে সেটার ওপর প্রতিষ্ঠিত বা বিদ্যমান কোনকিছু নাড়াচাড়া করে না। তাই, যারা প্রকৃত আদর্শবাদী নয় তারাই সার্বিক শান্তি ও অগ্রগতির পথে বড় বাধা। মৌল বা মূলই সবকিছুর অবস্থানকে ধারণ করছে। প্রগতি হচ্ছে উন্নতি। যেপ্রগতি সার্বিক শান্তি স্থাপন করে না ও নৈতিকতার খোঁজখবর রাখে না সেপ্রগতিকে বাস্তবতার নিরিখে উন্নতি বলা যায় না। তাই, মৌলবাদই সার্বিক শান্তি ও নৈতিকতার সমন্বয়সাধন করে উন্নতি দিতে পারে আর এউন্নতিই সবার কামনা। মৌলবাদ নিয়ে বাদানুবাদ চলছে। এবাদানুবাদে সবকিছু সরগরম ও কোলাহলপূর্ণ। মৌল হচ্ছে মূল আর বাদ হচ্ছে কথা। তাই, মৌলবাদ হচ্ছে মূলকথা। মৌলনীতি, মৌলসংখ্যা, মৌলপদার্থ ইত্যাদি মূলকে চিহ্নিত করে স্বীকার করে নিচ্ছে। তাই, মৌল হচ্ছে সত্য এবং সত্যের জন্যেই মৌলিক উপাদানের প্রয়োজন। এজগতে সবকিছু সৃষ্টির মূলে যেসব মৌল উপাদান রয়েছে সেগুলো বদলাচ্ছে না। বিজ্ঞানশাস্ত্রসহ সব শাস্ত্রই আমাদেরকে এজ্ঞান দান করছে যে, মানুষ কোনকিছুই সৃষ্টি ও ধ্বংস করতে পারছে না, তারা শুধু তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট উপাদানগুলোর মধ্যে কিছুকিছু উপাদানের রূপান্তরসাধন করতে পারছে। আল-কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা আছে যে, আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নির্দেশমোতাবেক জীবনযাপন করার জন্যে এবং এবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তাদের জন্যে। তাই, সবকিছু মৌলভিত্তিক ও মৌলই সবকিছুর অস্তিত্বের

www.pathagar.com

ভিত্তি এবং মৌলবাদীরাই সত্যবাদী ও মৌলবাদই সত্যবাদ এবং অন্যসব বাদ মিথ্যে ও বিভ্রান্তিকর।

মৌলবাদকে বাদ দিলে এসে যায় মিথ্যেবাদ। আমরা কোন মানুষই মিথ্যেবাদের জন্যে নই, আমরা সবাই সত্যবাদের জন্যে। মৌলবাদ মিথ্যেবাদের ও কৃত্রিমতার বিপরীত এবং মৌলিকত্ব ব্যতীত কোনকিছুই কল্পনা করা যায় না। তাই, মৌলবাদের বিরুদ্ধাচরণ হচ্ছে সুকৌশলে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণের শামিল, কেননা সবকিছুর মূলে রয়েছেন মহান আল্লাহ্ যাঁর একত্ববাদ ও হুকুমআহকামই হচ্ছে ইসলামের মৌল বিষয়বস্তু। মৌলবাদই শাশ্বত ও অন্যান্য বাদ কল্পনার ফানুস। এপৃথিবীসহ সব সৃষ্টিই মৌল। এমৌলের মধ্যেই সবকিছুর ও আমাদের অস্তিত্ব। বিশ্বচরাচরে এবং মানুষের স্বভাবে ও প্রকৃতিতে যতোকিছু অপরিবর্তনীয় সেগুলোর ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ মৌলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এগুলো সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও মানুষের শাসনে চলার পথ রুদ্ধ করেনি। এগুলোর জ্ঞান এক্রমবিকাশ ও সামনে চলার পথক প্রশস্ত করে দিচ্ছে।

ইসলামে গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, উগ্রপন্থা ও মধ্যযুগীয়তা বলতে কিছুই নেই। কোরআন ও হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামই মানুষকে সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে প্রগতি ও অগ্রগতির পথ বাতলাচ্ছে বা প্রদর্শন করছে। গোঁড়ামি হচ্ছে কোনকিছুতে শক্তভাবে লেগে থাকা এবং তা হতে নড়চড় না করা। ইসলামে আল্লাহ্র দেয়া নীতিগুলোকে মৌলনীতি হিসেবে মেনে নিয়ে সেগুলোর ভিত্তিতে নবনব আবিষ্কারের ও উন্নতির পথ উন্মোচনের নির্দেশ ও পন্থা রয়েছে। ইসলাম অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করে। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারই গোঁড়ামির কারণ। তাই, ইসলামে গোঁড়ামি বলতে কিছুই নেই। ইসলাম আবির্ভূত হয়েছে অন্ধ মানুষকে চক্ষুষ্মান করতে ও পথহারা মানুষকে পথ দেখাতে। তাই, ইসলাম মানুষকে অন্ধ করে না এবং ধর্মান্ধতা বলতে যা বুঝানো হচ্ছে ইসলামে তা নেই। যতো নবীরাসূলের আগমন হয়েছে তাঁরা সবাই ইসলাম, অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্ববাদ ও তাঁর আদেশনিষেধ প্রচার করেছেন। প্রত্যেককিছুরই নিজস্ব ধর্ম আছে। যেমন, চুম্বকের ধর্ম হচ্ছে লোহাকে আকর্ষণ করা, পানির ধর্ম হচ্ছে নিচের দিকে গড়ানো ইত্যাদি। তাই, ধর্ম হচ্ছে একটি বৈশিষ্ট্য এবং প্রত্যেককিছুরই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অনুরূপভাবে, মানুষের ধর্ম, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তাঁর নবীরাসূলদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বিভিন্ন জিনিসের বৈশিষ্ট্যের যেমন পরিবর্তন নেই মানুষকে তাদের সৃষ্টিকর্তাপ্রদত্ত বৈশিষ্ট্যেরো তেমনি কোন পরিবর্তন নেই। এজন্যেই সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতি থেকে শিক্ষাগ্রহণের জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে বলেন, "এক আল্লাহ্ ব্যতীত আরো আল্লাহ্

www.pathagar.com

থাকতোতো তারা পরস্পর আক্রমণ চালাতো, তাদের আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে সব ধ্বংস হয়ে যেতো এবং তারা তাদের সৃষ্ট সবকিছু পৃথক করে ফেলতো।" —সূরা বনিইসরাইল, আম্বিয়া ও মুমেনুন। আল্লাহ্ বলছেন, "যে ইসলাম ব্যতীত অন্যধর্ম তালাশ বা অনুসন্ধান করে তার নিকট হতে তা কবুল বা গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" তাই, এপৃথিবীতে আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এসব কথা থেকে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে, ইসলাম এসেছে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের ওপর কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করতে, তাদেরকে অন্ধ বানাতে নয় এবং ইসলাম ব্যতীত যেগুলোকে ধর্ম বলা হচ্ছে সেগুলোতে ধর্মান্ধতা থাকলেও ইসলামে ধর্মান্ধতা বলতে কোনকিছুরই সুযোগ নেই। উগ্রভাবে কোন পন্থা অবলম্বন করাই হচ্ছে উগ্রপন্থা। এপন্থার অনুসারীরা হচ্ছে উগ্রপন্থী। ইসলামে উগ্রপন্থা বলতে কিছুই নেই। এটাতে আছে মধ্যপন্থা আর এপন্থাতে আছে ধৈর্য, সহনশীলতা, সুবিচার, সুষম বণ্টন, শাসনশোষণের অবসান, সত্যপ্রতিষ্ঠা ও অন্যায়াবিচারের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত সংগ্রাম।

ইসলামের দৃষ্টিতে সব যুগই খোদার যুগ। মধ্যযুগ ছিলো নৈরাজ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইসলামই নৈরাজ্যের অন্ধকার দূর করেছে, কায়েমীস্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার মূলে আঘাত হেনেছে, বিস্ময়কর সভ্যতার সূচনা করেছে, মানুষের মুক্তির সাথেসাথে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করেছে, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং কৌলিন্যের বা কুলীনত্বের অহংকার ভেঙে চুরমার করেছে। তখনো কায়েমীস্বার্থ ও শোষকশ্রেণী ইসলামের প্রতি চরম শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করেছিলো। তখনো বলা হতো যে, ইসলাম গরীবদের ধর্ম ও তারাই ইসলাম গ্রহণ করে। নিপীড়ন ও শোষণের অবসান ঘটানোও ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মধ্যযুগে ইউরোপ বর্বরতায় আচ্ছন্ন ছিলো। অথচ, এশিয়া ও আফ্রিকায় মনোমুগ্ধকর ইসলামী সভ্যতা জগতকে আলোকিত করে তুলেছে। এসভ্যতা আজো সব উৎকর্ষের ও মানবিকতার শীর্ষে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এটার পরশে বা ছোঁয়ায় ইউরোপ জেগেছে এবং তার আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সৌধ দাঁড় করিয়েছে। অথচ, মধ্যযুগ বলে কটাক্ষ করে ইসলামের প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে। একটাক্ষের দ্বারা ইসলামকে আড়াল করে মানুষকে দিনের পর দিন ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট করে মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে, যা ইসলামের অভাবে বিদ্যমান ছিলো, ধাবিত করা হচ্ছে।

ক্রিয়ার বিপরীত শব্দ প্রতিক্রিয়া। যার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাকে বলা হয় প্রতিক্রিয়াশীল আর এ "প্রতিক্রিয়াশীল" শব্দটির বিশেষ্য হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলতা। আল্লাহ্র আদেশনির্দেশের বিপরীতমুখী কাজে যে-ই বিরোধিতা করে তাকেই বলা হচ্ছে

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়াশীল। ইসলাম ভালো অর্থে প্রতিক্রিয়াকে উৎসাহিত করে এবং খারাপ অর্থে তা অপনয়ন বা ত্যাগ করে। তাই, ইসলামের আলোকে প্রতিক্রিয়াশীলরাই সত্যাশ্রয়ী। ইসলামবহির্ভূত পন্থায় প্রতিক্রিয়াশীলরা অজ্ঞতা ও অহংকারঅহমিকাবশে এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও গদির স্বার্থে গণমানুষের স্বার্থকে পদদলিত করছে, সত্যের কণ্ঠরোধ করছে, মিথ্যের বেসাতি করছে ও জেনেশুনে সত্যকে মানছে না। তাই, যারা ইসলামকে অস্বীকার করে, ইসলামের ব্যাপারে বেহুদা বিবাদ, বিতর্ক ও ঝগড়াফাসাদ করে এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে ইসলামেরই বিরোধিতা করে তারাই প্রতিক্রিয়াশীল। তাছাড়া, সমাজ থেকে অন্যায় ও অসত্যের মূলোৎপাটনের, সত্যের আলোকে মানুষের সামাজে মানুষের অধিকার কায়েমের এবং জীবনকে উন্নত ও মহান করার বিপরীতে যা করা হয় তা–ই প্রতিক্রিয়া। এধরনের প্রতিক্রিয়াশীলরা মানুষকে বিভ্রান্তিতে রেখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে থাকে। তদুপরি, ইসলামে ন্যাৎসী ও ফ্যাসিস্ট কায়দা বলতে কোন কায়দা নেই। ইসলামবহির্ভূত পথে ও পন্থায় এগুলো বিদ্যমান বিধায় ইসলাম এগুলো অপনোদন করে।

অনেককিছু সংরক্ষণ করতে হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সত্য, ধর্ম ইত্যাদি। জগতের ও সভ্যতার কল্যাণের জন্যে সংরক্ষণ অপরিহার্য। ইসলাম ওরকম রক্ষণশীলতা বিশ্বাস করে না যেরক্ষণশীলতাতে যেটা আছে শুধু সেটাতেই লেগে থাকবে এবং সেটাকে ভিত্তি করে সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে না। আল্লাহ্র সৃষ্টিকে সংরক্ষণ না করে অগ্রগতি ও প্রগতি সম্ভব নয়। আল্লাহ্র সৃষ্টিকে স্বীকার করতে গিয়ে আল্লাহ্র একত্ববাদকে স্বীকার করতে হয় এবং তাঁর আদেশনিষেধ মেনে চলতে হয়। আল্লাহ্ই একমাত্র প্রভু এবং তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই। তিনি আদি ও অন্ত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকারো এবাদত করা যাবে না, মিথ্যাকথা বলা যাবে না, বেঈমান ও মোনাফেক হয়া যাবে না, চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ব্যভিচার ইত্যাদি করা যাবে না, অন্যায়অবিচার ও জোরজুলুম করা যাবে না, ফেতনাফাসাদ সৃষ্টি করা যাবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়া যাবে না, কারো হক নষ্ট করা যাবে না, ওজনে কম দেয়া যাবে না, নেশা করা যাবে না ইত্যাদি চিরসত্যগুলো রক্ষা করতে হবে। বিয়ে প্রথা মানবসভ্যতার অঙ্গ। নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা বৈবাহিক জীবনের মূলে আঘাত হানে। এতে পাপের জন্ম হয় ও সভ্যতা বিপন্ন হয়। তাই, ইসলামের নির্দেশে এসবের পবিত্রতা সংরক্ষণ করতে হয়। যেরক্ষণশীলতা মিথ্যাকে সংরক্ষণ করে এবং সত্যকে বাস্তবায়িত করে না সেটাই নিন্দনীয় ও প্রগতিবিরোধী। সব কায়েমীস্বার্থ সংরক্ষণই হচ্ছে রক্ষণশীলতা। এরক্ষণীলতার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। যারা সত্যকে ভয় পায় তারাই ইসলামের মধ্যে

www.pathagar.com

রক্ষণশীলতার কথা টানে। ইসলাম স্থবিরতা দূর করে ও সব কায়েমীস্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করে। এজাতীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে ইসলাম বিপ্লবসাধন করে এবং প্রগতির পথে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার ডাক দেয়। এসব রক্ষণশীলরা সত্যের আলোকে নতুনত্বকে ভয় পায় এবং এদের কাছে অন্ধকারটাই আলো। এরা আলো ও অন্ধকারের মধ্যে প্রভেদ বুঝতে, ইসলামী জ্ঞানের অভাবে, ভুল করে। মহান আল্লাহ্ এজগতটাকে মানুষের জ্ঞান ও হিকমতের অধীন করে দিয়েছেন। তারা চোখ দিয়ে তাকালেই দেখতে পাচ্ছে যে, কিভাবে এজগত চলছে, কিভাবে দিনরাত হচ্ছে, কিভাবে ঋতু পরিবর্তিত হচ্ছে, কিভাবে পাহাড়পর্বতগুলো সমুন্নত আছে, কিভাবে আকাশটা খুঁটি ছাড়া দণ্ডায়মান আছে ইত্যাদি। তাই, মিথ্যে রক্ষণশীলতার ঠাঁই ইসলামে নেই। অথচ, ঈর্ষা ও অজ্ঞতার কারণে ইসলামে রক্ষণশীলতার দোহাই টানা হচ্ছে। এককথায়, ইসলামের দৃষ্টিতে সব রক্ষণশীলতা যেমন নিন্দনীয় নয় সব আধুনিকতাও তেমনি বরণীয় নয়।

কট্টরপন্থীকে ইংরেজীতে বলা হয় আনকম্প্রমাইজিং। আনকম্প্রমাইজিং–এর অর্থ হচ্ছে আপসবিরোধী ও অদম্য। সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল ও অবিচল না থাকলে অসত্য ও অন্যায় আশকারা বা প্রশ্রয় পেয়ে যায়। অসত্য ও অন্যায়ের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করা হলে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা দুঃসাধ্য বা দুষ্কর হয়। সত্য ও ন্যায়ের তুলাদণ্ডের অভাবে সারা ভুবন আজ, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, অশান্ত, অস্থির ও দুরন্ত। সত্যাসত্য ও ন্যায়ান্যায়ের মধ্যে ভেদাভেদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ ও কর্ণপাত না করে বিরাজমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে আপসপ্রবণ হয়ে চলতে পারাটাই নরমপন্থী। তাই, কট্টরপন্থী ও নরমপন্থীর মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে যে, কট্টরপন্থীরা সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল ও অবিচল এবং নরমপন্থীরা বিরাজমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিত্তিতে অসত্য ও অন্যায়ের সাথে আপসপ্রবণ। নানাধরনের পন্থী আছে — ইসলামপন্থী, ধর্মপন্থী, চরমপন্থী, উগ্রপন্থী, ডানপন্থী, বামপন্থী ইত্যাদি। আমরা চাই সত্য, মাধুর্য, কল্যাণ ও ন্যায়পন্থা। ন্যায়পন্থীরা ন্যায় ও সত্য সুপ্রতিষ্ঠার জন্যে লড়ে যায় এবং কোন অবস্থাতেই অসত্য ও অন্যায়ের সাথে আপসপ্রবণ হয় না। ইসলামী ধারা ও রীতি সত্য ও ন্যায়প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়ে যায়ার এবং অসত্য ও অন্যায়ের সাথে আপসপ্রবণ না হয়ার বাস্তবসম্মত দীক্ষা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা কেউই উগ্রপন্থা ও নরমপন্থা চাই না। আমরা সবাই চাই ওপন্থা যেটাতে সত্য ও ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে এবং অসত্য ও অন্যায় অভ্যুত্থিত না হতে পারে। এপন্থা হচ্ছে মধ্যপন্থা। এপন্থা ইসলাম ব্যতীত এধরণীতে অন্যকোন আদর্শে বা মতবাদে নেই। তাই, সত্য, মাধুর্য, কল্যাণ ও ন্যায়ের জন্যে ইসলামপন্থী হয়াটা অনস্বীকার্য। ইসলাম হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, শত্রুতাপোষণ, অপরের অনিষ্টসাধন, সন্দেহপ্রবণতা, কলহবিবাদ,

www.pathagar.com

পরচর্চা, পরনিন্দা, কাদাছোঁড়াছুঁড়ি, অশালীন ও অশোভনীয় আচারআচারণ, অভদ্রতা বা অশিষ্টতা, শ্রুতিকটুতা, দৃষ্টিকটুতা, অসম্প্রীতি, অসদ্ভাব, অসৌহার্দ্য, অপাঙ্‌ক্তেয়তা, অপাংগদৃষ্টি বা কটাক্ষ, পরশ্রীকাতরতা, স্পর্শকাতরতা, সংবেদনশীলতা ইত্যাদি সবকিছু, যেগুলো মানুষের নিকট অপছন্দনীয় এবং সুষ্ঠু ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রাতে ও শান্তিশৃঙখলারক্ষার ক্ষেত্রে বিঘ্নসৃষ্টিকারী ও ক্ষতিকারক, পরিপূর্ণভাবে খণ্ডন ও অপসারণ বা অপনোদন করে। ইসলামের মধ্যে আছে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগতিতিক্ষা, বিসর্জন, করুণা, ক্ষমা ও অপরাধমার্জনার শিক্ষা। এতে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপরায়ণতা নেই। তবে, যারা কোরআন, হাদীস ও মহানবীর জীবনাদর্শের প্রদ্যোতে বা দীপ্তিতে ইসলাম সম্পর্কে প্রপণ্ডিত বা বিস্তৃত জ্ঞানাধিকারী নয় তারা, তাদের ধ্যানধারণা মতে ইসলামকে ঘায়েল বা কাবু করার মতলবে বা অভিপ্রায়ে, বলে থাকে যে, ইসলাম এতোসব মহৎ ও সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের বা বিশেষত্বের ধারক ও বাহক হয়া সত্ত্বেও ইসলামানুসারীদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপরায়ণতা কিভাবে ক্রিয়া করতে পারে। ইসলাম অবিচারঅত্যাচার, জোরজুলুম, শাসনশোষণ, উৎপীড়ন, অনাচারব্যভিচার, অমানবিকতা, ইসলামকে দাবিয়ে রাখার বা অবদমিত করার কর্মকাণ্ড ইত্যাদির বিরুদ্ধে আপসহীন ও অদম্য। তবে, যারা এসব অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মে ব্যাপৃত ও জড়িত তারা যেকোন উপায়ে এগুলো ঠিক রাখতে বদ্ধপরিকর। তারা যারা ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তাদের প্রতি আঘাত হানতে আদৌ অপ্রতিভ ও কুণ্ঠিত হয় না। প্রতিঘাত না করলে হয়তো শুধু আঘাতই খেতে হবে নয়তো নিশ্চুপ ও নিশ্চল হতে হবে। শুধু আঘাত খেয়ে এবং নিশ্চুপ ও নিশ্চল হয়ে কখনো এগুলোর মূলোৎপাটন করাটা সম্ভব হবে না। তাই, কালক্রমে এগুলোর মূলোৎপাটনের জন্যে আঘাতের প্রতি জোরালো প্রতিঘাতের আবশ্যকতা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। অন্যায় প্রতিহত করে ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করাতে আঘাতের প্রতি প্রতিঘাত না থাকতোতো বিশ্বচরাচরে শুধু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরই প্রভুত্ব বিরাজমান থাকতো। মহানবী ছিলেন বিশ্বস্ত, সত্যবাদী, পরহিতৈষী বা অপরের মঙ্গলাভিলাষী ও দয়ার সাগর। তিনি নির্বিবাদে অনেক অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাতে তিনি রক্তাক্ত ও রক্তস্নাত হয়েছেন। অপরদিকে, তিনি বহু যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। এসব যুদ্ধ প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপরায়ণতার কারণে নয়। এগুলো ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে ইসলামী জিন্দিগী ও অনুশাসনের মধ্যে ইসলামের সব বৈশিষ্ট্যের পরিস্ফুটন ঘটানোর ও সেগুলো কার্যকর রাখার জন্যে। তাই, ইসলামের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের নামে আঘাত প্রতিহত করার জন্যে প্রতিঘাত দেয়া যাবে না, তা নয়। যারা ইসলামের বৈশিষ্ট্যের নামে আঘাত প্রতিহত করার ক্ষেত্রে প্রতিঘাত দেয়া হতে নিবৃত্ত রাখতে চায়

www.pathagar.com

তারা অত্যন্ত চতুর ও ধূর্ত এবং চতুরতা ও ধূর্ততার সাথে গুরুগম্ভীরভাবে বলে থাকে যে, এটা কোন ধরনের ইসলাম যেটার নামে প্রতিহিংসায় রত হয়, প্রতিশোধগ্রহণ করে, প্রতিঘাত করে ইত্যাদি। তবে, তারা যতো ধূর্তামি ও ধড়িবাজিই করে–না–কেন যারা যথার্থভাবে ইসলাম জানে ও বুঝে এবং ইসলামী আদর্শে কাজ করে ও অন্যান্যকে একাজের প্রতি অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে তারা তাদেরকে বিপন্ন ও বিভ্রান্ত বা বিমূঢ় করতে পারে না। তারপরো যারা একদিকে সুন্নতি আকারআকৃতিতে চলে ও ইসলামী তরিকায় কথাবার্তা বলে এবং অপরদিকে এমন আচারআচারণ ও কাজকর্ম করে যেগুলো সম্পূর্ণরূপে সুন্নত ও ইসলামের বিপরীত তাদের মানবরচিত আইনের কারণে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ইসলামী আইন বলবৎ থাকলে তারা এরকম আচারআচরণ ও কাজকর্ম করতে পারে না, কেননা এআইনে বিনা কালক্ষেপণে তাদের প্রতি তাদের প্রাপ্যশাস্তি কার্যকর হয়ে যায়।

যারা ইসলামকে বরদাস্ত করতে পারে না এবং ইসলামের প্রতি নিন্দুক ও নিন্দাবাদ রটনা করে তারা খুব কায়দা করে প্রচারণা করছে যে, ইসলামী আইন অত্যন্ত নির্মম ও বর্বরোচিত। প্রথমতঃ, যে ইসলাম বর্বরতার অবসান ঘটিয়েছে এবং যেকোন বিদ্যমান বর্বরতার অবসান ঘটানোর জন্যে কাজ করছে তার আইন কোন যুক্তিতেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও পাশবিক হতে পারে না। দু'একটি বাস্তব ও প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিচ্ছি। একজন সন্ত্রাসক বীরদর্পে সুস্থমস্তিষ্কে অনেক নিরীহ ও নিরপরাধ লোকের প্রাণসংহার করে এবং তার সন্ত্রাসী তৎপরাতে লোকজন সর্বদা সন্ত্রস্ত বা ভয়ে ব্যাকুল থাকে। এতে সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হয় ও আইনশৃঙখলা পরিস্থিতির অধোগতি ঘটে। এমতাবস্থায়, মৃত্যুদণ্ড দিলে সন্ত্রাসকটির মৃত্যু ঘটবে বলে তাকে মৃত্যুদণ্ড না দেয়াটা ঠিক হবে, না জনগণের জানমালের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু আইনশৃঙখলা পরিস্থিতির স্বার্থে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়াটা ঠিক হবে। অবশ্যই, সবাই সমস্বরে বলা উচিত হবে যে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়াটা ঠিক হবে। একজন সন্ত্রাসককে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করাটা ও আইনশৃঙখলা পরিস্থিতির অধোগতি হতে না দেয়াটা বর্বরোচিত, না একজন সন্ত্রাসককে বাঁচিয়ে রেখে তার দ্বারা অনেক নিরীহ ও নিরপরাধ লোকের প্রাণনাশ হতে দেয়াটা, জনগণকে অনুক্ষণ সন্ত্রস্ত রাখানোটা ও আইনশৃঙখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে দেয়াটা বর্বরোচিত। এক্ষেত্রে সবাই সমস্বরে বলা উচিত হবে যে, দ্বিতীয়টিই বর্বরোচিত। একজন লোকের টাকাপয়সা ও ধনসম্পদের কোন অভাব নেই। তারপরো সে তার বৈভব বা ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্যে সরকারের বা অন্যকারো সম্পদ তসরুপ বা আত্মসাৎ করলে তার হাতের যেঅংশটি কাটা প্রয়োজন তা কেটে দিয়ে চুরি নিরুৎসাহিত করাটা বর্বরোচিত, না তাকে এরকম শাস্তি না দিয়ে চুরির মাধ্যমে একশ্রেণীর লোকের হস্তে সম্পদ স্তূপীকৃত হতে দিয়ে অধিকাংশ জনগণকে কষ্টেসৃষ্টে ও

www.pathagar.com

কায়ক্লেশে অর্ধাহারেঅনাহারে অমানবিক জীবনযাপন করতে বাধ্য করাটা বর্বরোচিত। এতেও সবাই সমস্বরে বলা উচিত হবে যে, দ্বিতীয়টিই বর্বরোচিত। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু আল্লাহ্ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা সেহেতু তাঁর আইনই নিরপেক্ষ, মানবিক ও সর্বোৎকৃষ্ট। ইসলামে মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব দু'ভাগে বিভক্ত আছে। একভাগ হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং অপরভাগ হচ্ছে একের অপরের, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব। আল্লাহ্র প্রতি দায়িত্বগুলো হচ্ছে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, জানমাল বিসর্জন দিয়ে তাঁর পথে কাজ করা ইত্যাদি। একের অপরের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে কেউ এমনকোন কাজ করবে না যাতে অন্যের, সমাজের ও রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়। যে আল্লাহ্র প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে না সে একাকী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং একে অপরের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন না করলে অপরের, সমাজের ও রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ্ করুণাময় ও ক্ষমাশীল সেহেতু তিনি তাঁর প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করতেও পারেন। কিন্তু, এটা তাঁর সুদৃঢ় ঘোষণা যে, তিনি একে অপরের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন না করাটা কোনভাবেই ক্ষমা করবেন না, কেননা এগুলো তাঁর নিজের ব্যাপার নয়, একের অপরের প্রতি ব্যাপার। তাই, তিনি একে অপরের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের আইনকানুন, বিধিবিধান, নিয়মরীতি, পদ্ধতি ও পথপন্থা তাঁর পবিত্র কোরআনে এবং তাঁর ও আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর হাদীসে দিয়ে দিয়েছেন। এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের দ্বারাই দুর্নীতি দমন, সুবিচার কায়েম, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, উন্নতি ইত্যাদি মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সম্ভব।

ইসলামে বিশ্বাসীরা বা সত্যগ্রহণকারীরা একজাতি এবং অবিশ্বাসীরা বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একজাতি। তারাই বিশ্বাসী বা সত্যগ্রহণকারী যারা আল্লাহ্র একত্ববাদের ও রিসালতের ওপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করছে ও ইসলামকেই একমাত্র সত্যধর্ম হিসেবে গ্রহণ করছে। তারাই অবিশ্বাসী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী যারা আল্লাহ্র একত্ববাদের ও রিসালতের প্রতি বিশ্বাসী না হয়ে দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ ও বহুঈশ্বরবাদ গ্রহণ করছে বা কোনটিই গ্রহণ করছে না। কাজেই, জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলো বিশ্বাস ও অবিশ্বাস এবং ইসলামের আলোকে এজাহানে দু'টি জাতির মধ্যে একটি হচ্ছে বিশ্বাসী জাতি বা মুসলিম জাতি এবং অপরটি হচ্ছে অবিশ্বাসী জাতি বা অমুসলিম জাতি। বিভিন্ন দেশের মোসলমানদের বিভিন্ন ভাষা হলেও তাদের আকিদা ও কৃষ্টি এক ও অভিন্ন। পক্ষান্তরে, ভাষা ও ভৌগোলিক সীমারেখা এক হলেও আকিদা ও কৃষ্টির বিভিন্নতার হেতুতে, মুখে বললেও, বাস্তবে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় থাকে না, আকিদা ও কৃষ্টি অনুযায়ীই ঐক্যের বন্ধনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাই, পরিলক্ষিত হচ্ছে আকিদা, ধর্ম ও কৃষ্টিভিত্তিক পরিষদ, সংঘ, সমিতি ইত্যাদি। এসব কারণে বাস্তবতার

www.pathagar.com

নিরিখে ও ইসলামের আলোকে মোসলমানদের জাতীয়তাবাদের একমাত্র উপাদান ও ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র দীন বা ইসলাম। তাছাড়া, যেহেতু মোসলমানদের জাতীয়তাবাদের একমাত্র উপাদান ও ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম সেহেতু বিভিন্ন মুসলিম দেশের কর্মপন্থা একরকম হয়াটাই প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক। তাই, একটি মুসলিম দেশের মোসলমানদের কর্মপন্থার সাথে অপর একটি মুসলিম দেশের মোসলমানদের কর্মপন্থার সামঞ্জস্য দেখে এটা বলাটা বাতুলতা ও মূর্খতা হবে যে, একটি মুসলিম দেশের মোসলমানেরা অপর একটি মুসলিম দেশের মোসলমানদের অত্যন্ত হীনভাবে তোষামোদকারী ও গাদ্দার এবং একটি মুসলিম দেশ অপর একটি মুসলিম দেশের সাথে মিশে যেতে বা সেটার অংশে পরিণত হতে চায়।

ভালো হোক বা মন্দ হোক দেশপরিচালক থাকেই। তবে, দেশপরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। সাধারণত নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার গঠিত হয়। ইসলামী সংবিধান ব্যতীত অন্যান্য সংবিধানানুযায়ী মহিলারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হতে পারে। কোন মুসলিমঅধ্যুষিত রাষ্ট্রে সরকারপ্রধান বা নির্বাহীপ্রধান, রাষ্ট্রপতি হোক বা প্রধানমন্ত্রী হোক, মহিলা হয়ার সম্ভাবনা থাকলে যারা ইসলামী অনুশাসনের জন্যে রাজনীতি করে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ার সম্ভাবনা থাকে না তারা স্বভাবতই সেদলকে সমর্থন দেয় যেদলের মহিলা সরকারপ্রধান বা নির্বাহীপ্রধান হলেও, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, ইসলামবিদ্বেষী বা ইসলামের প্রতি দ্বেষশীল হবে না এবং এটার প্রতি ঈর্ষা ও শত্রুতার মনোবৃত্তি পোষণ করবে না। ইসলামী অনুশাসনে নারী নির্বাহীপ্রধান বা সরকারপ্রধান হয়া যাবে না– এপ্রতীতির বা বিশ্বাসের বশীভূত হয়ে ইসলামের ভিত্তিতে গঠিত দল নিশ্চুপ ও নিষ্প্রভ থাকলে সেদলের মহিলাই নির্বাহীপ্রধান বা সরকারপ্রধান হতে পারে যেদল তাদের উপলব্ধি, ধারণা ও প্রত্যয়মোতাবেক ইসলামের প্রতি বিদ্বেষানলে দগ্ধ হয়। তাই, যারা ইসলামী অনুশাসনের জন্যে সংগ্রাম করছে তাদেরকে কর্মকুশলতার সাথে অগ্রসর হতে হয়, কেননা আলকোরআনে মোসলমানদেরকে আল্লাহ্‌ তাঁর এভুবনে তাঁর দীনকে বলবৎ রাখার জন্যে হেকমতের সাথে কর্মসম্পাদনের জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী প্রয়োজনে নারীরা তাদের সম্ভ্রম বজিয়ে রেখে যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে, যারা চায় না যে, ইসলামী অনুশাসন কায়েম হোক এবং মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে, ইসলাম বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, ইসলামী অনুশাসন কায়েমের পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করছে তারা এটা নিশ্চিতভাবে বুঝে ও জানে যে, আল্লাহ্‌র জমিনে ইসলামী অনুশাসন কায়েম হলে তাদের মিথ্যা কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, অহংকার, প্রভুত্ব ও রাজনীতি অন্তর্হিত ও বিলীন হয়ে যাবে। যেসব লোক মসজিদে ও মাদ্রাসায় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্যে মরিয়া হয়ে বা বেপরোয়াভাবে

www.pathagar.com

চেষ্টা করছে তারাও এগুলোতে রাজনীতি করে দেখতে পারে। তবে, তারা নিশ্চয়ই জানে যে, এগুলোতে কোরআন ও হাদীসের, অর্থাৎ ইসলামের, আলোকেই রাজনীতি করা হয়। সাধারণত, ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষকরাই এরাজনীতি করে থাকে। তাই, তারা ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষক না হয়ে এটাতে পদার্পণ বা প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষক হতে হলে তাদেরকে মাদ্রাসায় পড়াশুনা করতে হবে। তারা মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষক হয়ে তাদের কর্মসূচির আলোকে এগুলোতে রাজনীতি করুক। তবে, মাদ্রাসায় পড়াশুনা করলে তারা বুঝবে যে, তাদের কর্মসূচি ভুল। ফলে, তারা ইমাম হয়ে তাদের পূর্বের কর্মসূচির আলোকে রাজনীতি না করে কোরআন ও হাদীসের, অর্থাৎ ইসলামের, আলোকেই রাজনীতি করবে। তারা এটা ভালোভাবেই বুঝে। তাই, এটা দিবালোকের মতো সত্য যে, যারা কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানবে ও বুঝবে তারা নিঃশংকচিত্তে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করবে যে, ইসলামী রাজনীতিই কেবলমাত্র সাত্যকারের রাজনীতি এবং অন্যসব রাজনীতি ভ্রমাত্মক ও ইসলামবিদ্বেষী।

ইসলামবহির্ভূত রাজনীতি মানুষের উদ্ভাবিত রাজনীতি। এরাজনীতির ধরন ও প্রকৃতি যাই হোক-না-কেন এতে সার্বিক হিত ও কল্যাণ নেই। অস্থিতিশীলতা ও ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধতার অন্যতম কারণ হচ্ছে সার্বিক হিত ও কল্যাণের অভাব। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ অভাবযুক্ত কিছুই চায় না। তারা চায় অভাবমুক্ত সবকিছু, অর্থাৎ অভাবশূন্যতা। তখনই শান্তি আসে যখন অস্থিতিশীলতা ও ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধতা থাকে না। ইসলামের সঠিক অর্থ হচ্ছে শান্তি। ইসলাম মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকেফ্‌হাল বা জ্ঞাত। ইসলাম এমন একটি বিশুদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা যা তিনি তাদের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে প্রবর্তন করেছেন। এটাতে উভয় ইহকাল ও পরকালের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। ইহকাল ক্ষণস্থায়ী। পরকাল স্থায়ী ও অনন্ত। ক্ষণস্থায়ী জীবনের কর্মফলের ওপরই নির্ভর করছে স্থায়ী ও অনন্ত জীবনের শান্তি ও অশান্তি। এশান্তি হচ্ছে জান্নাত এবং এঅশান্তি হচ্ছে জাহান্নাম। ইহকালে বা এদুনিয়াতে কর্মফল ভালো হলে পরকালে জান্নাতলাভ করা যাবে এবং ইহকালে কর্মফল খারাপ হলে পরকালে জাহান্নাম পাবে। কর্ম ভালো হলে ফল ভালো হয় আর কর্ম খারাপ হলে ফল খারাপ হয়। পরীক্ষায় প্রশ্নে যেউত্তর চায়া হয় সেউত্তর না দিতে পারলে বা সেউত্তরের পরিবর্তে অন্যউত্তর দিলে নম্বর পায়া যায় না এবং ফল খারাপ হয় বিধায় অকৃতকার্য হতে হয়। তাছাড়া, যেঅংক যেসূত্রের সাহায্যে কষতে হয় সেটা সেসূত্রের সাহায্যে না কষে অন্যান্য সূত্রের সাহায্যে কষতে থাকলে শুধু কষেই যাবে; কিন্তু ফল মিলবে না। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ যেপদ্ধতিতে অর্চনাআরাধনা ও বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেপদ্ধতি বাদ দিয়ে

www.pathagar.com

নিজেদের মনগড়া বা অন্যর থেকে ধার করা পদ্ধতিতে এসব করলে কর্মফল কোনভাবেই ভালো হবে না এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্থায়ী শান্তিলাভের আবাস জান্নাতে প্রবেশ করাটা ভাগ্যে জুটবে না। তাছাড়া,দুনিয়াতেও একসময়–না–একসময় একভাবে–না–একভাবে অশান্তিভোগ করতে হয়।

ইসলামী রাজনীতি শুধু একটি সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত। এসংজ্ঞাটি হচ্ছে আল্লাহ্ যেগুলো করতে বলছেন যেগুলো করা এবং তিনি যেগুলো করতে নিষেধ করছেন সেগুলো বিসর্জন দেয়া। আল্লাহ্র সৃষ্ট মানুষের রাজনীতির সংজ্ঞা বিভিন্ন ধরনের। মানুষের রাজনীতির এসব সংজ্ঞার সাথে আল্লাহ্র রাজনীতির সংজ্ঞার কোন মিল নেই। মানুষের রাজনীতির এসব মনগড়া বা মনঃকল্পিত সংজ্ঞা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াভিত্তিক। তারপরো এগুলো এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ব্যতীত কোন সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল দিতে পারছে না। এগুলো আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী নয়। মোসলমানেরা আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী কাজ করতে হয়। তারাই মোসলমান যাদের ঈমান বা বিশ্বাস আছে। এঈমান বা বিশ্বাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্র, নবীর, কেতাবের, ফেরেশতাদের, পুনরুত্থানের ও পরকালের ওপর বিশ্বাস। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটে কোরআন ও হাদীসের নির্দেশালোকে কার্যানুযায়ী। মানুষের উদ্ভাবিত রাজনীতি কোরআন ও হাদীসের সাথে সম্পর্কহীন। কোরআন ও হাদীসের পরিপন্থী কাজ করে বিশ্বাসী হয়া যায় না। বিশ্বাসী না হতে পারলে মোসলমানিত্ব টিকে না। তাই, আল্লাহ্র রাজনীতির ধারাকে স্বীকার না করে মানুষের সৃষ্ট রাজনীতির ধারাকে স্বীকার করে নিলে মোসলমানিত্ব রক্ষা করা যায় না, কেননা যারা আল্লাহ্র কোন আদেশকে অস্বীকার করে তারা মোরতাদ, অর্থাৎ ইসলামত্যাগী বা খোদাদ্রোহী। একদিকে মোসলমান বলে দাবি করবে, অপরদিকে আল্লাহ্র আদেশ অস্বীকার করে ইসলামত্যাগী বা খোদাদ্রোহী হবে — এদুটো সমভাবে চলতে পারে না বা চলতে দেয়া যায় না। আল্লাহ্ হচ্ছেন এবিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা। তাঁর এরাজত্বে আমরা তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা। তাঁর এরাজ্য আমরা কিভাবে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পরিচালনা করবো এবং আমরা কিভাবে পরিচালিত হবো সেসব নির্দেশ তিনি আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এসব নির্দেশ কোরআন ও হাদীসেই বিধৃত আছে। অন্য যেসব ধর্মাবলম্বীর দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে মানুষের মনগড়া রাজনীতিকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখা হচ্ছে তাদের ধর্মের কোথাও একথা নেই যে, মানুষ তাদের মনগড়া পন্থায় কাজ করবে। ধর্মই হলো প্রকৃত কর্ম, কেননা ধর্মের ভিত্তিতে কোন কাজ অপ্রকৃত হতে পারে না। অপরদিকে, সব কর্মই ধর্ম নয়। ধর্মে পাপ ও অপরাধের কাজ নেই। অথচ, মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজে পাপ ও অপরাধ হয়। আমরা সবাই পাপ ও অপরাধমুক্ত সমাজের কথা বলছি। আমরা এটাও বুঝতে পারছি যে, নিজেদের উদ্ভাবিত পন্থায় কাজে পাপ ও অপরাধ হয় এবং ধর্মের নির্দেশিত পন্থায়

পাপ ও অপরাধ হতে পারে না। তাই, পাপ ও অপরাধমুক্ত সমাজের জন্যে আমাদের রাজনীতি হতে হবে ইসলামী রাজনীতি এবং আমাদের রাজনীতিবিদদেরকে ইসলামী রাজনীতির গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। যারা ধর্মকে, অর্থাৎ ইসলামকে, রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালন থেকে আলাদা রাখার কথা বলে তারা ধর্মকে, অর্থাৎ ইসলামকে, ছেড়ে দিতে বলছে না। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ইসলাম অনুযায়ী চলাতে তাদের কোন আপত্তি নেই। তবে, তাদের আপত্তি হচ্ছে যে, ইসলামকে রাজনীতিতে ও রাষ্ট্রপরিচালনে জড়িত করা যাবে না। ইসলাম অনুযায়ী চলার অর্থই হচ্ছে ইসলাম যা বলে তা করা। ইসলাম কি বলছে তা কোরআন ও হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে। তাই, কোরআন ও হাদীসে যা বলা আছে তা করতে হবে। যারা চায় যে, ইসলাম রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালন হতে পৃথক থাকুক তারা কোরআন ও হাদীস বাংলাতে হলেও মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করুক এবং দেখুক যে, ইসলামকে রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালন হতে বিচ্ছিন্ন করে ইসলামমোতাবেক চলা ও জীবনযাপন করা যায় কিনা।

জীবিকানির্বাহের জন্যে সবার টাকাপয়সার প্রয়োজন, কেননা এটা হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম। আলেম–ওলেমাদেরো টাকাপয়সার প্রয়োজন। আমরা প্রায় মোসলমানই পূর্ণাঙ্গ ধর্মকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই,আমাদের ধর্মীয় কার্যাদি আমরা আলেম–ওলেমাদেরকে দিয়েই করিয়ে থাকি। আমরা ইমামতি করতে, মিলাদ পড়াতে, জানাজা পড়াতে, কবর দোয়া করতে, বিভিন্ন খতম পড়তে, কোরআন অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করতে এবং ইসলাম সম্পর্কে মানুষকে বুঝাতে বা ওয়াজনসিহত করতে পারি না। আমরা পারি না বলে এগুলো বাদ দেয়া যায় না। তাই, আলেম–ওলেমারাই এগুলো করে থাকে এবং এগুলো করতে গিয়ে তারা অন্যান্য কাজে মনোযোগী হতে পারে না। অথচ, তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবিকানির্বাহের জন্যে আয়রোজগারের প্রয়োজন। এসব খেয়াল করেই আমরা যারা এগুলো না জেনে আলেম–ওলেমাদেরকে দিয়ে করাই তাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যসহযোগিতা করে থাকি। মোসলমান হিসেবে আমরা সবাই এগুলো জানলে কেউ কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না এবং আলেম–ওলেমাদেরকেও অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে এগুলো করতে হবে না। অন্যথা, একদিকে আমরা এগুলো না জানলে এবং অপরদিকে তারা এগুলো করছে বলে নানা সমালোচনার মাধ্যমে তাদেরকে এগুলো করা হতে বিরত রাখতে চেষ্টা চালালে ইসলামী আকিদা অনুযায়ী কাজকর্ম বাধাপ্রাপ্ত হবে বিধায় ধীরেধীরে মোসলমানেরা একএক করে ইসলাম থেকে সরে পড়বে এবং কালক্রমে তারা তা বিস্মৃত হয়ে যাবে। যারা সমালোচনা করছে তারাসহ আমরা আগে এগুলো শিখতে হবে এবং এগুলো আমরা নিজেরাই করে যেতে হবে। ফলে, আলেম–ওলেমারা এগুলোতে মনোনিবেশ না করে আমাদের মতো বিভিন্ন কাজকর্মে নিয়োজিত হবে এবং আমাদের মতো তাদের

www.pathagar.com

প্রয়োজনে তারা এগুলো করবে ও কেউ তাদেরকে কোন টাকাপয়সা দিতে হবে না। ইসলাম কখনো কাকেও খারাপ কাজ করতে বলে না। ইসলামের আদর্শ হচ্ছে ভালো কাজ। কেউ ইসলামের নামে বা অজুহাতে খারাপ কাজ করলে সেজন্যে ইসলাম দায়ী নয়, যে খারাপ কাজ করে সে-ই দায়ী। এটাও আমাদের অজ্ঞতা যে, আমরা ইসলাম সম্পর্কে না জেনে ব্যক্তিবিশেষের খারাপ কাজ ও অপরাধ ইসলামের ওপর চাপিয়ে দেই। এপ্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি সুন্নতি পোশাকে বা দাড়ি রেখে খারাপ কাজ করলে সেজন্যে তার স্বভাব দায়ী, সুন্নতি পোশাক বা দাড়ি দায়ী নয়। অথচ, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অভাবে আমরা সুন্নতি পোশাক বা দাড়িকে দায়ী করি। একজন লোক খারাপ কাজ করে বলে সে কোন ভালো কাজ করলে তার ভালো কাজটি সমালোচিত হতে পারে না। কিন্তু, আমরা তা এজন্যে করি যে, ইসলামের আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে আমরা পুরোপুরিভাবে ওয়াকেফহাল বা বিদিত নই। ভালো কাজ করলে ভালো ফল এবং খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল পায়া যাবে। কাজেই, খারাপ করে বলে ভালো করতে পারবে না, তা ঠিক নয়। তবে, যারা ভালো কথা বলে ও সুন্নতি পোশাক পরিধান করে তারা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে যেকোন খারাপ কাজকর্ম হতে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একজন ভালো ছাত্র পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র পেয়ে দেখলো যে তার দু'একটি প্রশ্নের উত্তর খারাপ হবে। তাই বলে কি সে যেসব প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে দিতে পারবে সেগুলোর উত্তর না দিয়ে পরীক্ষা দেয়াটা বন্ধ করবে? অবশ্যই না। সে পরীক্ষা দেবেই। অনুরূপভাবে, যে খারাপ কাজ করছে সে ভালো কাজ করাটা ঠিক হবে না — এটা কোনভাবেই ঠিক কথা নয়। তবে, তাকে খারাপ কাজ পরিহার করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

'৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পৈশাচিকতার জন্যে ইসলাম দায়ী নয়। ইসলাম পৈশাচিকতা অপনোদন করে। তাই, যারা পৈশাচিকতায় নিমগ্ন হয়েছিলো তারাই দায়ী। সর্বোপরি, ইসলাম সম্পর্কে না বুঝে ও না জেনে যে যা-ই বলে-না-কেন ইসলাম 'ইসলামই' আছে এবং 'ইসলামই' থাকবে এবং এতে ইসলামের কিছুই যাবেআসবে না। এটা অমান্যকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাছাড়া, যারা বলে যে, ইসলাম ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং এটার চর্চা ঘরের মধ্যেই হয়া প্রয়োজন তারা নিজেরাই ইসলামের মূলগ্রন্থ কোরআন ও হাদীস ঘরে চর্চা করে দেখুক। তা হলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, বাইরে এটার চর্চার প্রয়োজন আছে কিনা। থাকলে তাদেরই উচিত হবে ঘরেবাইরে এটার সমন্বয়সাধনের জন্যে এটার নির্দেশানুযায়ী কাজ করে যায়া। যারা নিখুঁতভাবে কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে ইসলাম বুঝে তারা ইসলাম সম্পর্কে ইসলামের বিপরীতে কোন মত ও ধারণা পোষণ করতে পারে না। যারা ইসলামের আবির্ভাবের সাথেসাথে যেসব ধর্ম বাতিল হয়েছে সেগুলো অবলম্বনকারীদের ধ্যানধারণা ও জ্ঞানানুযায়ী ইসলামকে

www.pathagar.com

জানে তারাই ইসলাম সম্পর্কে ইসলামের বিপরীতে কথাবার্তা বলতে পারে। মোসলমান হয়েও যাদের ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান নেই তারা তাদের ওরকম কথাবার্তায় বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে। কিন্তু, যারা ইসলাম বুঝে ও জানে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। এটাও ঠিক যে, দিন যতো যাচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে মোসলমানদের চেতনা ও সজাগতা ততো জোরদার ও বলিষ্ঠ হচ্ছে। যারা ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও বিমূঢ়তা সৃষ্টি করছে তাদের নিকট ওরাই প্রিয় যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কোরআন ও হাদীস পুরোপুরি না জেনে ও বুঝে বিষোদ্‌গার করতে পারছে। কোনকোন রাজনীতিবিদ, লেখকলেখিকা, বুদ্ধিজীবী ও বক্তা মনে করে যে, ইসলাম ও সত্যের বিপরীতে ধৃষ্টতার সাথে মারপ্যাঁচ দিয়ে নতুনভাবে কিছু লিখতে ও বলতে পারলে খুবসহজেই লোকজন তাদেরকে জানতে পারে এবং চারদিকে তাদের সম্পর্কে আলাপআলোচনা হয়। মাঝেমধ্যে লোকমুখে শুনা যায় যে, নাম করতে হলে যেকোন কাজ বীরদর্পে বা বীরত্বপূর্ণভাবে করতে হয় এবং একাজ ডাকাতি হলেও প্রখ্যাত বা প্রসিদ্ধ ডাকাত হিসেবে লোকজন জানে। আমার মনে হয় যে, যেসব রাজনীতিবিদ, লেখকলেখিকা, বুদ্ধিজীবী ও বক্তা নতুনভাবে অযৌক্তিক ও অপ্রাকৃতিক ধ্যানধারণা ব্যক্ত করে প্রখ্যাত বা যশস্বী হয়ে বাঁচতে ও একটাকিছু করতে চায় তাদের বুঝা দরকার যে, এতে সংঘাতসংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির কারণে শান্তিশৃঙ্খলা পর্যুদস্ত বা বিনষ্ট হয়।

একশ্রেণীর লোক আছে যারা আখেরাতে বা পরকালে বিশ্বাসী নয়। তারা এদুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে শুধু ভোগটাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এদেরকে ভোগবাদী বলা হয়। এরা নারীপুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ রাখে না। এরা সবকিছু উন্মুক্ত চায়। এরা এদেরকে খোলামনের অধিকারী হিসেবে প্রকাশ করে। সবকিছু মুক্ত হলে এদের সুবিধা বেশি। এরা যে ভোগবাদী তা এরা প্রত্যক্ষভাবে বলে না। তাই, এরা উদারতা, প্রগতি, নারীমুক্তি ইত্যাদি শ্লোগানের মাধ্যমে সবকিছু উন্মুক্ত করে এদের ভোগের পথ প্রশস্ত করার কাজে লিপ্ত। এধরনের ভোগের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, কেননা এভোগ মানুষকে উন্মুক্তভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত করে ও নৈতিকতার স্খলন ঘটায়। যারা ব্যভিচারমুক্ত সমাজব্যবস্থা চায় তারা ভোগবাদীদের খপ্পরে না পড়ে বা জালে আটকা না পড়ে তাদেরকে প্রতিহত করাটাই বাঞ্ছনীয়। বলতে শুনা যাচ্ছে যে, মোসলমানেরা কথায়কথায় জেহাদ করে। জেহাদেই তাদের সময় শেষ হয়ে যায় এবং তারা উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে চিন্তাভাবনা ও কাজ করার সময় পায় না। তাই, মোসলমানদের এ করুণ ও নিদারুণ পরিণতি এবং শোচনীয় অবস্থা। এপ্রসঙ্গে আমাদের জানা ও বুঝা প্রয়োজন যে, সার্বিকভাবে এবিশ্ব দু'টি ব্লকে বিভক্ত হয়ে আছে — একটি হচ্ছে সত্যগ্রহণকারী ব্লক এবং অপরটি হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ব্লক।

www.pathagar.com

মোসলমানেরা সত্যগহণকারী ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। একারণে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ব্লক সত্যগ্রহণকারী ব্লকের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার সব অপকৌশলে লিপ্ত আছে। এব্লক এসব অপকৌশল প্রতিহত করার সংগ্রামে লিপ্ত না থাকতোতো বহু আগেই এটাকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ব্লক নিশ্চিহ্ন করে ফেলতো। তাই, জেহাদ বা সংগ্রামের মাধ্যমেই এব্লকের অস্তিত্ব টিকে আছে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে আল্লাহ্‌র দীন বলবৎ রাখার ও করার মানসে এব্লককে সব অপকৌশলের বিরুদ্ধে কেয়ামত পর্যন্ত জেহাদ বা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, কেননা এটা বন্ধ হলে এব্লক যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সেটার সাক্ষ্য বিশ্বের ইতিহাস বহন করছে।

বিভিন্ন কারণে একজনের সাথে অপরজনের বনাবনি হয় না ও মনান্তর বা মনোমালিন্য হয়ে থাকে। ইসলামের ভিত্তিতে মোসলমানেরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। ধর্মের আলোকে আরো বহু জাতি আছে। কাজেই, জাতিভেদ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। একটা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে সব মোসলমান এটা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। তা হলে তারা বুঝবে যে, তাদের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। ধর্মের আলোকে বিভিন্ন জাতি ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু, মোসলমানদের মধ্যে যতোসব অনৈক্য বিদ্যমান। তবে, এটা অন্যান্য জাতির সৃষ্টি। এমনো দেখা যাচ্ছে যে, মোসলমান হয়ে মোসলমানদের সমালোচনা করে আনন্দ পায়। এধরনের মোসলমানদের অনুধাবন করা উচিত যে, তারা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করছে এবং এতে অন্যান্য জাতি আশকারা পেয়ে যাচ্ছে। এককথায়, যেখানে একজনের সাথে অপরজনের বনাবনি হয় না বা কলহ চলে সেখানে ইসলামের সাথে অন্যান্য জাতির বনাবনি হয়াটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই, আমরা আমাদের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্যে ইসলামী আদর্শের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনীতি করে যায়া উচিত। মোসলমান হিসেবে অনেকেই 'ইসলাম' শব্দটি উচ্চারণ করে ইসলামের সমালোচনা ও বিরোধিতা করার কৌশল শিখেছে। যে-ই কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ইসলামের বিপক্ষে বুঝাতে চায়-না-কেন প্রায়সব মোসলমানই ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান তা অনুধাবন করছে। যারা মোসলমান হয়েও ইসলামের পরিপন্থী কাজকর্ম করে ও কথাবার্তা বলে মোসলমানদেরকে বশ করে মানবরচিত মতবাদ বা মতাদর্শ প্রয়োগ করতে চাচ্ছে তারা বুঝে ফেলেছে যে, মোসলমানেরা অন্য কোনকিছু সহ্য করলেও এসব সহ্য করছে না। তাই, তারা ইসলামের কথা না বলে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মসজিদমাদ্রাসার কথা বলছে। তাদের ধ্যানধারণামোতাবেক তারা বুঝাচ্ছে যে, ইসলামের সাথে মৌলবাদের সম্পর্ক নেই এবং মৌলবাদীরা ইসলামের নামে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াচ্ছে ও মসজিদমাদ্রাসায় রাজনীতি করছে। তবে, মৌলবাদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ। আল্লাহ্‌র একত্ববাদসম্বলিত ইসলামে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই এবং ইসলামী দীক্ষার ও আল্লাহ্‌র একত্ববাদ

www.pathagar.com

বিশ্লেষণের উপযুক্ত স্থান ও কেন্দ্র হচ্ছে মসজিদমাদ্রাসা। তাই, মৌলবাদীরা সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াচ্ছে ও মসজিদমাদ্রাসায় রাজনীতি করছে বলে সমালোচনা করাটা খুব কায়দার সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনা। এটাও মোসলমানদের কাছে ধরা পড়েছে। তাই, মোসলমান রাজনীতিবিদদের উচিত তাদের ধর্ম 'ইসলাম' কোরআন ও হাদীসে যেরাজনীতির ধারা উল্লেখ করেছে কোরআন ও হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে সেধারায় রাজনীতি করা।

ধর্মের কোন দোষ নেই। এটা দোষমুক্ত। মানুষকে দোষমুক্ত রাখার জন্যেই এটার আবির্ভাব হয়েছে। যারা ধর্মকে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সেটা তাদের দোষ, ধর্মের দোষ নয়। নবীকরিম (সঃ) এর সুন্নত অনুসরণ করে কোন ব্যক্তি খারাপ কাজ করলে সেটা কোনভাবেই তাঁর সুন্নতের দোষ নয়, সেটা সেব্যক্তির দোষ। দোষী ব্যক্তিদের দোষের কথা বলতে গিয়ে ধর্ম ও সুন্নতকে সামনে টেনে আনা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তি দাড়ি রেখে ও টুপি মাথায় দিয়ে একটি খারাপ কাজ করলে দাড়ি ও টুপি সেকাজটির জন্যে দায়ী নয়, ওব্যক্তিটির স্বভাবচরিত্রই দায়ী। এক্ষেত্রে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ধর্ম ও সুন্নতের কোন দোষ ও অপরাধ নেই। এটা যেহেতু দোষ ও অপরাধমুক্ত সেহেতু অপরাধীরা এটার নিরাপত্তায় থাকতে চায় এবং এটার চেয়ে যে সর্বোত্তম পথ ও পন্থা বিশ্বে আরকোনটি নেই তা এমনিতেই প্রমাণিত হয়। তাই, আমাদের প্রত্যেকের উচিত ধর্মের, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামের, অনুশাসন মেনে চলা। প্রকৃতিতে দেখা যাচ্ছে যে, আগাছার জোর বেশি। তবে, শেষপর্যন্ত কেউ আগাছা রাখে না। অনুরূপভাবে, একটি দেশে অন্যায়অবিচার, জোরজুলুম, অসম বণ্টন, বিভিন্নধরনের বৈষম্য, রাজনীতিবিদের চালাকি, স্বার্থান্ধতা, দুর্নীতি, আইনের অনুশাসনের পথে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি একদিন–না–একদিন দূরীভূত হবেই। এসব হচ্ছে মিথ্যা এবং আগাছার মতো। এগুলোর মূলোৎপাটন না হলে সত্য বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকবে। যেহাতিয়ার দিয়ে এগুলোর মূলোৎপাটন করা সম্ভব তা হচ্ছে আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিধিবিধান। তাই, আমাদের প্রত্যেকের উচিত তাঁর বিধিবিধানমোতাবেক প্রতিটি কর্ম সম্পাদন করা।

ঘ

সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় আইনানুগভাবে জনগণের জানমালের নিরাপত্তাবিধান ও অধিকারসংরক্ষণের, নিঃস্বার্থভাবে দেশকে অগ্রগতি ও উন্নতির পথে এগিয়ে নেয়ার সাথেসাথে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখে শান্তির ধ্বজা সমুন্নত রাখার,

www.pathagar.com

সুবিচার কায়েম করার, সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করার এবং সবধরনের অপরাধ ও দুর্নীতি দমন করার জন্যেই সরকার। যেখানে সরকার এদায়িত্ব পালন করে না বা করতে পারে না সেখানে সরকার থাকা বা না থাকা সমান কথা, কেননা সরকার থাকতে জনগণের জানমালের নিরাপত্তাবিধান ও অধিকারসংরক্ষণ অনিশ্চিত, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধোগতি বা অবনতি, শান্তি বিঘ্নিত, সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার, সুষম বণ্টনের পরিবর্তে অসম বণ্টন ও সবরকমের অপরাধ সংঘটিত হতে এবং রাষ্ট্রের রন্ধ্রেরন্ধ্রে দুর্নীতি চলতে পারে না। একদিকে এগুলো এবং অপরদিকে এধরনের সরকার — দুটোই দেশ ও জনগণের জন্যে অভিশাপ বা অভিসম্পাত। সরকারের জন্যে প্রতিবছর কোটিকোটি টাকা খরচ হয় এবং দেশ ও জনগণের অবস্থা যা-ই হয়-না-কেন সর্বাগ্রে তাদের সুযোগসুবিধা ও আরামআয়েশ সুনিশ্চিত করার পরো তারা দেশ ও জনগণের প্রতি তাদের উপরোক্ত দায়িত্বগুলো পক্ষপাতিত্বহীন ও নিঃস্বার্থভাবে যথাসময়ে নিষ্পাদন বা পালন করতে না পারলে বা না করলে বা করতে ব্যর্থ হলে তাদের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার থাকে না। তাই, জনগণ এমন লোককে সরকার হিসেবে গ্রহণ করা ও থাকতে দেয়া জরুরী যারা উক্ত দায়িত্বগুলো নিষ্পাদন করতে সক্ষম। মানবতাবাদী, আইনানুগ, ন্যায়নিষ্ঠ, প্রজ্ঞাবান ও খোদাভীরু লোক ব্যতীত অন্যকেউ উপরোক্ত দায়িত্বগুলো উপরোক্ত পন্থায় নির্বাহ করতে পারে না। তারা ছাড়া অন্যকেউ যে তা পেরেছে ইতিহাসে সেটার কোন নজির বা প্রমাণ নেই এবং অন্যকেউ কোনদিনো, আমি হলফ করে বলছি, তা পারবে না। সরকারের ওপর জনগণের এআস্থা থাকে যে, তারা জনগণের খাদেম বা সেবক হিসেবে জনগণের স্বার্থে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদন করবে। তাতে তাদের লেশমাত্র স্বার্থ থাকবে না; তাদের কোন কাজ বেআইনী হবে না এবং দুর্নীতি তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। তারা আইনের বাস্তব প্রয়োগ এবং যেকোনধরনের অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের জন্যে। জনগণ একেবারে নির্বোধ ও বোকা নয়। তারা যখন দেখে যে, সরকার স্বার্থকেন্দ্রিক এবং তারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ, তাদের নিজেদের স্বার্থের কারণে আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ হয় না, তাদের কারণেই অপরাধ সংঘটিত হয় ও তারাই অপরাধের জন্যে দায়ী থাকে এবং তারা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ায় দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগ ও অক্ষম হয় তারা তখন সরকারের ওপর আস্থা ও ভরসা হারিয়ে ফেলে। ফলে, অশান্তি ও অন্যায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের জানমালের নিরাপত্তাসহ তাদের সব মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করা এবং এগুলো যারা নষ্ট ও পণ্ড করে তাদেরকে যথাসময়ে যথোচিত শাস্তি দেয়া। যারা এগুলো নষ্ট করে জনগণ তাদেরকে রুখে দাঁড়ালে বা তাদের গতিরোধে আক্রমণোদ্যত হলে আইন তাদের নিজেদের হাতে তুলে নেয়া হয়।

www.pathagar.com

যেখানে সরকার আছে সেখানে জনগণ আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়াটা হচ্ছে অরাজকতা বা অরাজক কাণ্ড সৃষ্টি করা। যেকোন অরাজকতা অবদমন ও নির্মূল করার দায়িত্ব সরকারের। এতদসত্ত্বেও যেসরকার জনগণকে অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্যে আহ্বান জানায় সেসরকার ক্ষমতায় থাকার অযোগ্য।

রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রপরিচালকদের সাথে অপরাধী ও ধনবানদের কোনপ্রকার ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্ক থাকলে তারা প্রশ্রয় পেয়ে যায় এবং তাদের জন্যে রাষ্ট্রপরিচালকদেরকে আইনবহির্ভূত পন্থায় কাজ করতে হয়। কাজেই, রাষ্ট্রপরিচালকদের তাদের সাথে কোনপ্রকার ঘনিষ্ঠতা ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক না থাকাই ভালো। তারা সৎকর্মে উৎসাহপ্রদানে ও পাপকর্মে শাস্তিদানে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা হতে বিচ্যুত হলে পাপকর্ম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবেই। সরকারের কথায় ও কাজে বৈপরীত্য জনগণের মধ্যে আশাহীনতা ও হতাশার সৃষ্টি করে। তারা সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পারলেও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট বা সুপ্রসন্ন থাকে না এবং নিজেরা তাদের সমালোচনা করে। কথায় ও কাজে বৈপরীত্য বা বিরুদ্ধতা নিজেদের স্বার্থে ও জনগণকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর জন্যে হয়ে থাকে। তবে, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, এতে জনগণ বোকা হয় না। তাদেরকে নিরুপায় বা উপায়হীন হয়ে বোকার মতো থাকতে হয় এবং তারা ক্ষমতাবিহীন ও সরকার ক্ষমতাসীন বলে বাধ্য হয়ে পাশ কেটে চলার চেষ্টা করতে হয়। আল্লাহ্ মানুষকে কথা বলার জন্যে মুখ দিয়েছেন। এমুখ দিয়ে যা ইচ্ছা তা বলা যায়। এমুখ দিয়ে যেকোন যুক্তির পাল্টা যুক্তি, খাটুক বা না খাটুক, দেয়া যায়। যে পাল্টা যুক্তি দেয় সে বুঝে যে তা কতোটুকু যথার্থ ও সঠিক। তবু, সে তা দেয়, কেননা সে চায় ওপরে থাকতে। রাষ্ট্রপরিচালনায় এধরনের পাল্টা যুক্তি জাতির জন্যে খুবই ক্ষতিকর। রাষ্ট্রপরিচালনা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। একাজে যথার্থ যুক্তি গ্রহণ না করলে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। তবে, সরকার নৈরাজ্যসৃষ্টির পথ সৃষ্টি করার জন্যে নয়। তাদের কাজ হচ্ছে নৈরাজ্যের অবলুপ্তি ঘটিয়ে শান্তি নিশ্চিতকরণার্থে যথার্থ যুক্তি গ্রহণ করা এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে একাগ্রচিত্তে দুর্নীতিমুক্ত থেকে আইনানুগভাবে মহান আল্লাহ্‌র ওপর অবিচল ও দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রেখে ক্ষমতাকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে ও মৃত্যুকে অবধারিত ও নিশ্চিত জেনে কাজ করে যাওয়া।

সাংবিধানিক ও নীতিগতভাবে বিধিবিধান অনুযায়ী নৈরাজ্য দূর করার দায়িত্ব সরকারের। সংবিধানে মৌলিক অধিকারসহ অনেককিছুর নিশ্চয়তা দেয়া আছে। সরকারকে কোনকিছু করতে হলে তা সংবিধানের আওতায় না পড়লে তারা তা সংবিধানবহির্ভূত দেখিয়ে করা যায় না বলে। অথচ, সংবিধানে যেসব নিশ্চয়তা আছে

www.pathagar.com

সেগুলো তারা যথাযথভাবে প্রদান করতে পারছে না বা করছে না। সংবিধান সুবিধামতো মানা এবং অসুবিধা হলে এড়িয়ে চলা কোন কল্যাণধর্মী সরকারের নীতি হতে পারে না। এনীতিতে কোন কল্যাণ সাধিত হয় না এবং কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি হয়ে থাকে। সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাস দমন করলে আইন ও সরকারের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব সরকারের। যে-ই আইনের পরিপন্থী কাজ করবে সে-ই শাস্তি পাবে। এটার সাথে জনমত গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। সরকার যারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় ও আইনের পরিপন্থী কাজ করে জনজীবন দুর্বিষহ বা দুঃসহ করে তোলে তাদেরকে আইনানুগভাবে শাস্তিপ্রদান না করে তাদের বিরুদ্ধে সভা ও মিছিল করা এবং জনগণকে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যে ডাক দেয়া তাদের প্রতি সরকারের দুর্বলতা বা শক্তিহীনতার বহিঃপ্রকাশ। আইনের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসসৃষ্টিকারীদেরকে প্রতিহত করার দায়িত্ব জনগণের নয়। এদায়িত্ব পবিত্রভাবে সরকারের। সরকার তাদের এদায়িত্ব পালন করার জন্যে জনগণকে আহ্বান জানানোর অর্থই হচ্ছে তাদেরকেও সন্ত্রাসী বানানো। সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাস দমন ও নিবারণ করা সরকারের দায়িত্ব নয়। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে আইন দিয়ে সন্ত্রাস দমন করা। সরকার আইন দিয়ে সন্ত্রাস দমন করতে না পারলে সেটা তাদের বিফলতা ও ব্যর্থতা। এব্যর্থতা ও নিষ্ফলতাতে তারা ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারিয়ে ফেলে। সরকার সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাস দমন করতে হলে তাদেরকে সন্ত্রাসী দল সৃষ্টি করতে হয় আর এ সন্ত্রাসী দল সর্বস্তরে ও পর্যায়ে রাখতে হয়। এটা অনভিপ্রেত। এটা সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত রাখে এবং জাতীয় জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাছাড়া, এদলের সন্ত্রাসকদেরকে সরকার নানা সুযোগসুবিধা দিতে হয়। এসব সুযোগসুবিধা পেতে গিয়ে তারা আইনের আওতাবহির্ভূত থাকে। ফলে, একদিকে বিরোধী দলগুলো এবং অপরদিকে ক্ষমতাসীন দল পালাক্রমে আইন অমান্য করতে থাকে। তবে, সরকার আইন অমান্য করার জন্যে নয়, আইন নিজেরা মেনে চলে কার্যকর করার জন্যে।

জনগণ ভালোমন্দ কিছুটা হলেও বুঝে। এটা সত্য যে, তাদের এবুঝের মূল্য ক্ষমতাসীন দল বা বিরোধী দলগুলোর কাছে নেই। উভয় দলই জনগণকে হাতিয়ারে পরিণত করতে সবরকমের বুদ্ধি ও চালাকি প্রয়োগ করে। সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করতে হলে সরকারী ও বিরোধী দলগুলোকে আইন মানতে হবে এবং আইন অমান্যতার শাস্তি নির্বিবাদে বা নির্বিরোধে মাথা পেতে নিতে হবে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে হত্যার মতো জঘন্যতম অপরাধো সংঘটন করা হয়। এসব হত্যাকারীদের বিচারে মৃত্যুদণ্ড হতে খুবকমই শুনা যায়। তাই, হত্যা একটি খেলাতে পরিণত হয়েছে। আইনে এখেলা নেই। আইন হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার নির্দেশ দেয়। হত্যাকারীরা স্বাভাবিক ধারায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলে এধরনের হত্যা সংঘটিত হতে পারে না। হত্যাকারীরা হত্যাকারী

www.pathagar.com

প্রমাণিত না হলে ও কোন শাস্তি না পেলে হত্যা ও পাল্টা হত্যা চলে। আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের ধারায় বা অবিরাম গতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে এমনটি হয়। এপ্রতিবন্ধকতা অপসারণের দায়িত্ব সরকারের বিধায় এহত্যার জন্যে সরকারই দায়ী হয়ে যায়। নিয়মতান্ত্রিকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এবং উৎসর্গিত ও নিবেদিত নেতৃত্ব পায়া গেলে এধরনের সরকার টিকতে এবং হত্যাকারীদের বিচার না হয়ে পারে না। সব রাজনৈতিক দলের প্রধান বা মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতা। তাদের মধ্যে নিবেদিত নেতৃত্ব না থাকলে 'কূ'-র প্রচেষ্টা চলে এবং উল্লেখিত পন্থায় নির্বাচন অনুষ্টিত হতে পারে না। তাই, রাজনীতিবিদদেরকে জাতীয় স্বার্থে নিবেদিত নেতৃত্ব প্রদান করতে হয়। একজন যতোবেশিই জানে-না-কেন সে যে সবকিছু জানে না তাতে কোন সংশয় বা সন্দেহ নেই। যেকোন বিষয়ে বিভিন্ন জন থেকে জানলে সেটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ও প্রতীতি পায়া যায়। এধারণার সাথে নিজের জ্ঞানগরিমা খাটিয়ে কোন কাজ করলে তা স্বাভাবিকভাবেই নির্ভুল হবে বলে আশা করা যায়। তাই, নির্ভুল ও সঠিক কাজের জন্যে জ্ঞানীগুণীজনদেরকে খুঁজে বের করে তাদের পরামর্শ নিতে হয় এবং তাদের সাহচর্যে থাকতে হয় ও তাদেরকে সাহচর্যে রাখতে হয়। সরকারের কাজ হচ্ছে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কাজ দেয়া এবং তাদের থেকে তা যথাসময়ে বুঝে নেয়া। যারা এভাবে কাজ বুঝিয়ে দিতে পারবে না সরকার তাদেরকে বিদায় দেবে। তা হলে তারা যথাসময়ে যথাযথভাবে কাজ করতে বাধ্য থাকবে। এনীতি কার্যকর করার জন্যে সরকারের নিঃস্বার্থপরতা ও নিরপেক্ষতার প্রয়োজন সমধিক।

ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় থাকার জন্যে নিজেদের বিবেচনায় নানাধরনের আইন পাস করে ও বিদ্যামান আইন সংশোধন করে নেয়। কিন্তু, নিজেদের স্বার্থান্ধতার কারণে নিয়তি বিমুখ হতে থাকলে কোন একপর্যায়ে কোনকিছুই তাদেরকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। তাছাড়া, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে আপসকামিতার আশ্রয় নিলে সুষ্ঠুভাবে দেশপরিচালনা করা দুষ্কর ও কঠিন হয়, কেননা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আপসকামিতাই বড় দুর্বলতা। এদুর্বলতার সুযোগ সবাই, বিশেষতঃ বিরোধী দলগুলো, নিতে চায়। এতে রাষ্ট্রে বিশৃঙখল পরিবেশ বিরাজমান থাকে, জনসাধারণ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনপাত করে এবং দেশের অগ্রগতিতে সাড়া জাগানো যায় না। দেশ ও জনগণের স্বার্থে ক্ষমতাসীনদেরকে আপসকামিতা পরিহার করে চলতে হয়। তারা অন্যায়ভাবে কাকেও খাতির করতে পারে না। তারা নিজেরাও আইনের উর্ধ্বে যাবে না এবং অন্যকাকেও আইনের উর্ধ্বে যেতে দেবে না। তাদের ক্ষমতা চলে যেতে ও তারা বিনাশ বা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তবু তারা বিশৃঙখলাসৃষ্টিকারীদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারে না। তারা ক্ষমতায় টিকে থাকার মোহত্যাগ করে দোষীদেরকে নির্মূল করতে হবে

www.pathagar.com

এবং দেশে সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজমান রাখতে হবে। ক্ষমতা পায়ার ও তাতে টিকে থাকার জন্যে সত্যমিথ্যা, ন্যায়অন্যায় ইত্যাদি বহুকিছু করা হয়। কিন্তু, ক্ষমতা পেলেও এবং তাতে টিকে থাকলেও একদিন–না–একদিন তা হারাতে হয়। যেমন জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুবরণ করতে হয় তেমনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তা একদিন–না–একদিন চলে যায়। ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী। সুনাম ও সুখ্যাতি স্থায়ী, কেননা তা মৃত্যুর পর স্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখে। নবীকরিম (সঃ) কে একবার সাহাবায়েকেরামরা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কোন লোক ভালো। তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, যাকে লোকজন ভালো বলে সে–ই ভালো। লোকে ভালো বললে আল্লাহ্ও ভালো জানেন। কারোকারো পরিবারিক দুর্বলতা থাকে। তাদের এদুর্বলতার কারণে তারা কোন ভালো কাজে পদক্ষেপ নিতে বা পদার্পণ করতে পারে না। যারা নিজেদের এদুর্বলতা কেটে ওঠতে পারে না তারা রাষ্ট্রের কাজে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে না ও আইননুগ কাজ করতে হোঁচট খায়। তাই, রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে এদুর্বলতা হতে মুক্ত থাকতে পারতে হয়। মাঝেমধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে যে, বই লিখা সহজ, রাষ্ট্র চালানো সহজ নয়। সবাই যেমন বই লিখতে পারে না সব রাজনীতিবিদও তেমনি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করতে পারে না। যার জ্ঞান ও লেখার অভ্যাস আছে সে–ই লিখতে পারে। জ্ঞানহীন ও অজ্ঞ কোন লোককে লিখতে বললে সে লিখতে পারবে না। যার রাষ্ট্রপরিচালনার মতো জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নেই সে রাষ্ট্রপরিচালক হলেও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করতে পারে না। যার এসব গুণাবলী আছে ও ক্ষমতার মোহবন্ধন বা আচ্ছন্নতা নেই এবং যে পুণ্যবান, মহৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, দুর্নীতিমুক্ত, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে, কাজ বুঝে ও তা আদায় করে নিতে পারে, নিরলসভাবে কাজ করাতে ধৈর্যশীল, জনগণের সাথে নিজেকে একসারিতে বা এককাতারে রাখতে পারে, ক্ষমতাসীন হয়েও জনগণ ও নিজের মধ্যে কোন দূরত্ব বা ব্যবধান রাখে না, প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক সুবিচার সুনিশ্চিত করার পন্থাগ্রহণ করতে পারে, সুষম বণ্টনের পথ অবরোধমুক্ত ও উন্মুক্ত করতে পারে, পাপ ও অপরাধের শাস্তি আপনপরনির্বিশেষে যথাসময়ে প্রদানের পদ্ধতি চালু করতে ও তা টিকিয়ে রাখতে পারে এবং নিজেকে খলিফাদের আদর্শে আদর্শীভূত করতে পারে তার পক্ষে রাষ্ট্র চালানো, অন্তত আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বই লিখার চেয়ে সহজ।

নিজেদের বিষয়আশয় বা বিষয়সম্পত্তি রক্ষাকল্পে বা রক্ষার অভিপ্রায়ে মানুষ জীবনো বিসর্জন দিতে বা ত্যাগ করতে পারে। অথচ, সরকারের সবকিছুতেই সবার অনাসক্তি ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকারের বলতে দেশ ও জনগণের। নিজের নামে না হয়ে সরকারের নামে হলে উদাসীনতা প্রদর্শন করার অর্থ হলো নিজের দেশের

প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করা। এজন্যেই সরকারী বিষয়আশয় আইনের ফাঁকে ও সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও শৈথিল্যের কারণে দেদার লোপাট হচ্ছে এবং বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে এগুলো লুটেপুটে খাচ্ছে ও খেতে দিচ্ছে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ধোঁকা, প্রতারণা ইত্যাদি ব্যবসাবাণিজ্য ও কাজকারবারের মধ্যেও বিদ্যমান। ব্যবসায়ীদের দ্বারা ভোক্তারা নানাভাবে শোষিত হচ্ছে। নিয়মরীতি থাকা সত্ত্বেও কোথাও এশোষণের কোন প্রতিকার বা প্রতিবিধান পায়া যাচ্ছে না। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকারের আন্তরিক ও সদিচ্ছাপূর্ণ পদক্ষেপই এশোষণের অবসান ঘটাতে বা সমাপ্তি টানতে পারে। যতো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীয়করণ হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটির প্রকৃত মূল্য ও সেটা কত মূল্যে বিক্রি হয়েছে তা নির্ণয় বা নির্ধারণ করতে হবে। নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোন শিল্পে কত টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে তা এবং এসব শিল্পের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ বা স্থিরীকরণ করতে হবে। যতোধরনের সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত ও ব্যাপক বিবরণ ও বৃত্তান্ত জানতে হবে এবং সেগুলোতে কারাকারা কিকি পর্যায়ে আছে সেসবো বিস্তারিত ও ব্যাপকভাবে জানতে হবে। বিভিন্ন ব্যাংক হতে যেসব ব্যক্তিকে বড়ধরনের লোন দেয়া হচ্ছে তারা কারা ও সেসব লোনের বর্তমান অবস্থা বা গতিক জানতে হবে। সব বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদান কিভাবে ব্যয়িত হয়েছে ও বর্তমানে হচ্ছে তা বিশদভাবে জানতে হবে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর যেসব ঘোষণার মাধ্যমে সরকারী অর্থ ব্যয়িত হয়েছে সেসব ঘোষণা ও ব্যয় সাংবাধিানিক পন্থায় হয়েছে কিনা তা-ও জানতে হবে। তারা ক্ষমতায় আসার পূর্বে তাদের কার কিকি সম্পদ ছিলো ও ক্ষমতায় আসার পরে কিকি সম্পদ হয়েছে এবং সেগুলো কোথায় কিভাবে আছে সেসব জানতে হবে। কারাগার থেকে কারাকারা কিকি অবস্থায় ছাড়া বা রেহাই পেয়েছে সে সম্পর্কে জানতে হবে। এসব জেনে, প্রকৃত অর্থে, লোক দেখানো অর্থে নয়, আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ ও সরকারী কর্মচারীরা রাষ্ট্রের কাজের জন্যে। রাষ্ট্রের কাজই তাদের পবিত্রতম দায়িত্ব। বাস্তবে তারা রাষ্ট্রের কাজের চেয়ে নিজেদের কাজে বেশি ব্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রের কাজে নির্বাচিত ও নিয়োজিত হয়ে ব্যক্তিগত কাজে মনোনিবেশ বা মনঃসংযোগ করলে রাষ্ট্রের কাজ যে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞেয় হয় তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে লিখার প্রয়োজনীয়তা নেই। রাষ্ট্রের কাজ উপেক্ষিত ও অবজ্ঞেয় হতে থাকলে জনগণের অসুবিধা বৃদ্ধি পেতে বা বর্ধিত হতে থাকে। অথচ, জনগণের অসুবিধা অপসৃত বা লাঘব করে সুবিধাদি সৃষ্টি করার জন্যে ক্ষমতাসীনেরা নির্বাচিত ও সরকারী কর্মচারীরা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। কোন দল ক্ষমতাসীন হলে তাদের ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় কাজে প্রয়োগ করতে হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসনটি নিরপেক্ষ আসন। যেদল এআসনটিতে অধিষ্ঠিত হয় তাদের সব কাজ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ও স্বার্থে নিরপেক্ষ হতে

www.pathagar.com

হয়। বাস্তবে তারা এনিরপেক্ষতা বজিয়ে রাখতে পারে না। দলীয় কাজে এক্ষমতার অপপ্রয়োগ হয়। তারা রাষ্ট্রীয় কাজের আবরণে দলীয় কাজই বেশি করে থাকে এবং তাদের কাজকর্মগুলোতে তাদের দলের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য এসে যায়। অথচ, রাষ্ট্রীয় কাজে থাকবে আইনের প্রাবল্য ও প্রাধ্যন্য। তাছাড়া, তাদের নিজস্ব কাজগুলোও অন্যভাবে রাষ্ট্রীয় খরচে হয়ে যায়। সবকিছু মিলিয়ে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ ও সরকারী কর্মচারীরা পুরোপুরিভাবে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অভিনিবেশ ও আত্মনিয়োগ করলে রাষ্ট্র ও জনগণের মঙ্গল সাধিত না হয়ে পারে না।

৬

গণতন্ত্রের কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ না করে বলতে হয় যে, গণতন্ত্র বলতে মানুষ চায় যে, তাদের মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষিত ও সামাজিক সুবিচার সুনিশ্চিত থাকবে, সুষম বণ্টনের নীতি প্রবর্তিত হবে ও অব্যাহত থাকবে, দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি থাকবে না, সবাই কার্যত আইনের অধীনে থাকবে ও যে-ই হোক-না-কেন অপরাধ করলে সাথেসাথে পক্ষপাতশূন্য শাস্তি পাবে এবং এসব ব্যাপারে তারা তাদের চিত্তবৃত্তি ও মনোভাব খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করতে পারবে। এগুলোর বাস্তবায়ন নির্ভর করে সরকারের ওপর। একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখার মাধ্যমে এগুলো বাস্তবায়ন করতে হয়। এরূপরেখার আওতায় থাকে সংবিধান, আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি। সরকারকে এগুলোর অধীনে কাজ করতে ও করিয়ে নিতে হয়। এগুলো থেকে সরকার নড়চড় না করলে বা সরকার এগুলোর ব্যত্যয় না ঘটালে অন্যকেউ তা পারে না। সরকার এগুলোতে অটল ও দৃঢ় থাকলে প্রত্যেকটি কাজ তার নিজগতিতে নিষ্পাদিত বা সম্পাদিত হতে বাধ্য। প্রতিটি কাজ তার নিজগতিতে নিষ্পাদিত বা সম্পাদিত হবে এবং শান্তি ও শৃঙখলা বিরাজমান থাকবে — এটাই, আমার মতে, গণতন্ত্র বলতে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, প্রতিটি মানুষের কামনা বা মনস্কাম। আমরা সবাই যথার্থ গণতন্ত্রের জন্য উৎসুক ও সোচ্চার। এরপরো যখনই যারা ক্ষমতাসীন হয় তাদেরকে গণতন্ত্রের শত্রু বলে আখ্যাত করা হয়। কতো সরকারইতো আসলো ও গেলো ; কিন্তু গণতন্ত্রতো প্রতিষ্ঠিত হলো না বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করতে পারলো না। ভবিষ্যতেও সরকার আসবে। কিন্তু, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে কি বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করবে কি? প্রত্যেক মানুষই ভালো ও মন্দের মধ্যে প্রভেদ ও ভেদাভেদ বুঝে। ফলে, ভালো বা মন্দ যেকোন একটা করাটার জন্যে এবুঝটাই যথেষ্ট। ভালো বুঝটা শুভানুধ্যান বা সদিচ্ছা এবং খারাপ বুঝটা অশুভানুধ্যান বা অসদিচ্ছা। আইনকানুন, বিধিবিধান ও নিয়মপদ্ধতি যতোই থাকুক-না-কেন সবকিছু সদিচ্ছা ও অসদিচ্ছার এখতিয়ারাধীন। সদিচ্ছার ফলে

www.pathagar.com

ভালো ও শুভ হয় এবং অসদিচ্ছার ফলে খারাপ ও অশুভ হয়। বাস্তবে আমরা গণতন্ত্র বলতে সদিচ্ছা চাই। একজনের সদিচ্ছা আছে। সে ভালো করছে। অপরজনের অসদিচ্ছা আছে। সে খারাপ করছে। সদিচ্ছাধারী লোকটি খারাপ কাজ এড়িয়ে চলতে এবং তা প্রতিহত করতে চাচ্ছে। তবে, অসদিচ্ছাধারী লোকটিকে প্রতিহত করার দায়িত্ব সরকারের। এ অসদিচ্ছাধারী লোকটি সরকারের দ্বারা প্রতিহত না হলে সে একটির পর একটি খারাপ কাজ করতেই থাকবে। ফলে, গণতন্ত্র বলতে মানুষ যা চায় তা বাধাপ্রাপ্ত হবে। একজন সরাসরি অপরজনের অসদিচ্ছা প্রতিহত করতে চেলে প্রকারান্তরে আইন হাতে তুলে নিতে হয় এবং আইন হাতে তুলে নিলে তাকে নানাভাবে নাজেহাল হতে হয়। তাই, অসদিচ্ছা প্রতিহত করবে সরকার। বাস্তবে অসদিচ্ছাধারীদেরই সর্বত্র প্রভাবপ্রতিপত্তি, অর্থবিত্ত ইত্যাদি। অসদিচ্ছাধারীদের অসদিচ্ছা প্রতিহত করার জন্যে সরকারেরো থাকতে হয় সদিচ্ছা । সদিচ্ছা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার পথে একটি বিরাট বাধা। সরকার ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিতে পারলেই তাদের মধ্যে সদিচ্ছা জাগ্রত হয়। তাছাড়া, যারা ক্ষমতাসীন হয়ে সরকার গঠন করে তারা সতত বা সদাসর্বদা জাতীয় স্বার্থের কথাই বলে। যাদের নিকট জাতীয় স্বার্থ গুরুত্ব পায় তাদেরই সদিচ্ছা আছে। সরকার সদিচ্ছার সাথে কাজ করলে অসদিচ্ছাধারীরা নির্মূল বা উৎপাটিত হয়। তারা নির্মূল বা উন্মূলিত না হলে তাদের মূল শক্ত ও রসালো হয়। তাই, গণতন্ত্রে অসদিচ্ছাধারীদের নির্মূলন বা উন্মূলন চায়া হয়। যেসরকার অসদিচ্ছাধারীদেরকে নির্মূল বা উৎসাদন করতে পারবে সেসরকারই হবে সদিচ্ছার অধিকারী এবং মানুষের অভিলষিত বা কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তাই, গণতন্ত্র বলতে অসদিচ্ছার অন্ত ও অবসান চায়া হচ্ছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণতন্ত্রের দু'টি দিক আছে–সুবিধা ও অসুবিধা। সব অসুবিধাই ক্ষমতাসীনদের মূল হাতিয়ার। তারা ক্ষমতাসীন হয়ে অসুবিধাগুলো দেখিয়েই কাজ চালিয়ে যায়। এতে সুবিধাগুলো চাপা পড়ে যায়, অর্থাৎ জনগণ গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করতে পারে না। সদিচ্ছাধারীরা সুবিধার পক্ষে এবং অসদিচ্ছধারীরা অসুবিধার পক্ষে। সব প্রতিকূলতা উপেক্ষিত হয়ে সুবিধাগুলোর বাস্তব প্রতিফলন ঘটতে থাকলে অসদিচ্ছাধারীরা নির্মূল হয় বিধায় মানুষের কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের সুফল প্রতিটি নাগরিক ভোগ করতে সক্ষম হয়। গণতন্ত্র বলতে আইন অমান্যতা বুঝায় না। গণতন্ত্র হচ্ছে আইনশৃঙ্খলার মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার একটি অসাধারণ ও অনন্য উপায়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব সরকারের। গণতন্ত্রের নামে লোকজন আইন অমান্য ও লংঘন করবে এবং সরকারের পক্ষে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা তা সহ্য করবে বা সেটার প্রতি সহনশীলতা দেখাবে, এটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা নয়। কেউকেউ আইন অমান্য করলে কিছুই করা যাবে না, এটা হতে পারে না। রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

আকৃতি ও ধরন যা-ই হোক-না-কেন, গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা থাকবেই। রাষ্ট্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংহত বা সুদৃঢ় করার জন্যে এটা অপরিহার্য। গণতন্ত্রের চর্চা বা অনুশীলন হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিধিসম্মত ও সুষ্ঠুভাবে আপনআপন কাজ করে যাওয়া। এচর্চার অভাবে সংঘাত ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায় এবং দাবিদাওয়ার নামে বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এচর্চায় বিরক্তি ও ক্ষুব্ধতা থাকবে না, সহনশীলতা থাকবে। তাই, গণতন্ত্রের চর্চা বলতে তা বুঝায় না যে, যার যা খুশি সে তা করবে।

গণতন্ত্রের সাথে অধিক জনগণের আস্থাঅনাস্থার বিষয়টি বিজড়িত। গণতন্ত্রে নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দলের প্রতি অধিকসংখ্যক জনগণ আস্থাপ্রকাশ করে সেদলই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সেদলের প্রতি আস্থাপ্রকাশ করার অর্থই হলো সেদলের কর্মসূচির প্রতি আস্থাপ্রকাশ করা। কাজেই, গণতন্ত্রে সেদল তাদের কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পায়। এঅবস্থায় সেদলকে অন্যান্য দল সেদলের কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করাতে অন্তরায় সৃষ্টি করে তাদের কর্মসূচি বা আশাআকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কাজ করার জন্যে আন্দোলন করাটা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। গণতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ করে গণতান্ত্রিক সংকট উত্তরণ বা অতিক্রম করা যায় না, বরং এসংকট বৃদ্ধি পায়। যারা একদিকে গণতন্ত্রের জন্যে সোচ্চার এবং অপরদিকে নিজেদের নীচ স্বার্থে গণতান্ত্রিক সংকট বৃদ্ধি করে তারা প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রীমনা নয়, গণতন্ত্রের শত্রু। গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলো তাদের কর্মসূচি ও আশাআকাঙ্ক্ষার পক্ষে কাজ করে যেতে হয় এবং ক্ষমতাসীন দলের ভুলত্রুটি জনসমক্ষে বা জনগণের দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরে তাদের কর্মসূচি যে ভালো তা প্রমাণ করে পরবর্তীতে ক্ষমতায় এসে তা কার্যকর করার জন্যে ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়। এটা না করে বিরোধী দলগুলো তাদের কথা অনুযায়ী ক্ষমতাসীন দলকে কাজ করতে বাধ্য করার জন্যে আন্দোলন, হরতাল ও গণ্ডগোলে মেতে থাকলে তাদের যে গঠনমূলক কর্মসূচি নেই তা প্রতিপন্ন বা প্রমাণিত হয়। এপরিবেশ একটি বিষাক্ত পরিবেশ। অথচ, গণতন্ত্র সুষ্ঠু পরিবেশের পরিচায়ক। যখন কমসংখ্যক জনগণ সমর্থিত বিরোধী দলগুলো বেশিসংখ্যক জনগণ সমর্থিত ক্ষমতাসীন দলকে তাদের মতে কাজ করার জন্যে চাপপ্রয়োগ বা চাপসৃষ্টি করে তখন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে গণতন্ত্রকামী হওয়া যায় না। তাই, জাতীয় ও গণতান্ত্রিক স্বার্থে রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীদের উচিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে গণতন্ত্রকামী হওয়া এবং অধিকসংখ্যক জনগণের রায় মেনে নিয়ে নিজেদের কর্মসূচি যে বলিষ্ঠ সেটার পক্ষে জনমত গঠনের জন্যে কাজ করে যাওয়া। আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। গণতন্ত্র হচ্ছে সহাবস্থানের ব্যাপক ও বিস্তৃত ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে, কেউ কারো ক্ষতি না করে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের

www.pathagar.com

উচিত ও ন্যায়সংগত কাজ করার অধিকার থাকে। এতে একের সাথে অপরের সংঘাতসংঘর্ষের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু, আমাদের দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংঘাতসংঘর্ষে লিপ্ত এবং তাদের মধ্যে সহাবস্থানের চেতনা ও ধারণা অভাবনীয় ও কল্পনাতীত। একদিকে গণতন্ত্রের কথা বলা হবে, অপরদিকে সহাবস্থানের কোন নিশ্চয়তা থাকবে না—এঅবস্থায়রাজনীতিবিদদেরকে কোনভাবেই স্বার্থপরতার উর্ধ্বে দেশ ও জনগণের মঙ্গলের কাজের জন্যে মনন করা বা ভাবা যায় না। যেদিন আমাদের রাজনীতিবিদদের সহাবস্থান সুদৃঢ় হবে সেদিন তাদের সম্পর্কে জনগণের এ নির্মল ও স্বচ্ছ ধারণা হবে যে, তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং এটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হবে।

সচিবালয়ে শুধু সচিবরা কাজ করে না। সেখানে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কাজ করে। শুধু তা নয়। সেখানে মন্ত্রীরাও কাজ করে। এরা সবাই দেশ ও জনগণের কাজে নিয়োজিত। কাজেই, সচিবালয় শুধু সচিবদের আলয় নয়, দেশের সবার আলয়। অথচ, জনগণ এটাতে যুগ্ম–সচিব থেকে উর্ধ্বের কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের থেকে পাস না নিয়ে প্রবেশ করতে বা ঢুকতে পারছে না। এব্যবস্থা সচিবালয়ের নিরাপত্তার বা তাতে যাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজে ব্যাঘাত না হয় সেজন্যে করা হয়ে থাকতে পারে। প্রথমতঃ, সচিবালয়ের কেউ ক্ষতি করতে চেলে এনিরাপত্তা তা রুখতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজে ব্যাঘাত ঠেকাতে বা রুখতে চেলে তারা যখনকার যেকাজ তখন সেকাজ নিষ্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট তাদের স্ব স্ব গৃহে বা স্থানে বা কার্যালয়ে সেটার ফলাফল পৌছিয়ে দিতে হবে। অথচ, দেশের এ সর্বোচচ কার্যালয়েও প্রায় কাজই এনিয়মে হচ্ছে না। যেকোন কাজের জন্যে চেষ্টাতদবির, সুপারিশ, ঘুষ ইত্যাদির প্রয়োজন। এসব কারণেই জনগণ বাধ্য হয়ে সচিবালয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে টাকাপয়সা খরচ করে এসে সচিবালয়ে ঢুকবার তেমন আগ্রহ ও ব্যাকুলতা জনগণের থাকার কথা নয়। তাছাড়া, কতোজনেরইবা যুগ্ম–সচিব থেকে উর্ধ্বের কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের সাথে যোগাযোগ বা পরিচিতি আছে যে তাদের থেকে পাস সংগ্রহ করবে। তাই, একান্ত প্রয়োজনে পাস সংগ্রহ করতে তাদের ভোগান্তি ও কষ্টের ইয়ত্তা বা সীমাপরিসীমা থাকে না। পাসের এনিয়মের কারণে গেটে পুলিশদেরো যে সুবিধা হচ্ছে না তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। যারা তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জানার জন্যে সচিবালয়ে ঢুকতে না পারে তারা যেকোনভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঠিকানা সংগ্রহ করে তাদের বাসাবাড়িতে হলেও যায়। এতে তাদের সুবিধা যে অবাধ ও জোরদার হয় তাতে তেমনকোন দ্বিধা ও সন্দেহ থাকার কথা নয়। সচিবালয়ের বাইরে যেসব মন্ত্রণালয় ও অফিস আছে সেগুলোতে জনগণ সহজে যাতায়াত করছে। সেগুলোর নিরাপত্তাতে অসুবিধা হচ্ছে না এবং সেগুলোতে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটছে না। তাছাড়া, আমাদের সরকারপদ্ধতি

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক সরকারের মন্ত্রী এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সচিবালয়ে কাজ করে এবং একাজ হচ্ছে দেশ ও জনগণের। তাই, বিভিন্ন দিক বিচারবিশ্লেষণে সচিবালয় জনগণের জন্যে অবরোধমুক্ত ও উন্মুক্ত থাকাই যুক্তিযুক্ত ও যথোচিত। এতে জনগণ, যে যেপর্যায়ে ধরা দেবার সে সেপর্যায়ে ধরা দিয়ে, তাদের কাজ সময়মতো করিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা চালাতে পারবে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও সময়মতো কাজ করতে কিছুটা হলেও বাধ্য হবে, কেননা তারা তা না করলে তাদের ব্যাপারে সাথেসাথে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা বা জানানো যাবে। এটা জনগণের পক্ষে গণতান্ত্রিক পরিবেশ আঁচ বা উপলব্ধি করতে পারার একটি অকাট্য ও মোক্ষম সুযোগ। একারণে সব অফিসআদালত এবং রাষ্ট্রপতি, সব মন্ত্রী ও সব কর্মকর্তার দরজা জনগণের জন্যে প্রবেশ্য ও উন্মুক্ত থাকতে হবে।

সব মানুষ খেয়েপরে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। শান্তিঅশান্তির বোধশক্তি মানুষের মধ্যে প্রকট। বোধশক্তির কারণেই মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী। এখানেই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য। তাই, মানুষের জন্যেই যুক্তিবাদ। এযুক্তিবাদই গণতান্ত্রিক চেতনার উৎস। গণের তন্ত্রই হচ্ছে গণতন্ত্র। গণ হচ্ছে জনসাধারণ আর তন্ত্র হচ্ছে মত বা বাদ। তাই, গণতন্ত্র হচ্ছে জনসাধারণের এমন একটি মত বা বাদ যা সার্বিকভাবে বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত হতে হয়। একারণে গণতন্ত্র হচ্ছে সাধারণতন্ত্র বা জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা সুষমভাবে রাষ্ট্রপরিচালনের নীতি। সুষম হচ্ছে সুসংগতিপূর্ণ। ইংরেজীতে সুষম হচ্ছে ব্যাল্যানসড্। ব্যাল্যানস্ হচ্ছে ভারসাম্য। এপৃথিবী ভারসাম্যের ওপর টিকে আছে। ভারসাম্য ব্যতীত কোনকিছু টিকতে পারে না। মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্যই অতীব বা অত্যন্ত প্রয়োজন। এভারসাম্যের অভাবেই মানুষে মানুষে ও দেশে দেশে বিশ্বময় বা পৃথিবীব্যাপী এতো সংঘাত ও সংঘর্ষ। সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ এভারসাম্য দিতে পারছে না এবং পারবেও না। পুঁজিবাদ গণতন্ত্র নয়। পুঁজিবাদের সম্পর্ক হচ্ছে পুঁজির বা অর্থের সঙ্গে। গণতন্ত্রের সম্পর্ক হচ্ছে জনগণের সাথে। জনগণ চায় সুসংগতিপূর্ণ অবস্থা ও ব্যবস্থা। পুঁজিপতিরা জনগণের একটা অংশ। এঅংশ চায় সব সম্পদ তাদের হস্তগত বা কুক্ষিগত হোক। জনগণ চায় সম্পদ এমনভাবে কাজে ব্যবহৃত হোক যাতে তাদের কেউই সংগতির বা সংস্থানের অভাবে কষ্ট না পায়। পুঁজিপতিরা এটা কখনো ভাবে না। তাই, যেপদ্ধতিতে পুঁজি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিনিয়োজিত হয়, সংঘাত ও সংঘর্ষ বিদূরিত বা দূরীভূত হয়, যুক্তিযুক্ত, শিক্ষণীয় ও কল্যাণকর অভিমত বা মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকে না এবং জনগণ সুসংগতিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারে সেটাই গণতন্ত্র।

www.pathagar.com

চ

সুষম বণ্টনহীন অর্থনৈতিক পদ্ধতিই ধনীদেরকে আরো ধনী এবং গরীবদেরকে আরো গরীব করছে। দুর্নীতির কারণে ধনীরা টাকার বিনিময়ে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করে নিতে পারছে। গরীবেরা টাকার অভাবে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারছে না বিধায় সত্য থেকে বঞ্চিত থাকছে। তাছাড়া, একথাটি সত্য যে, টাকায় টাকা আনে। তাই, ধনীদের সাথে গরীবেরা প্রতিযোগিতায় আসতে পারছে না। বলতে গেলে শতকরা ৮৫ জন লোক গরীব। নির্বাচনেও টাকার খেলা চলে। টাকা ছাড়া রাজনীতি করার ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা ভাবাই যায় না। গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যেই জ্ঞানীগুণী ও সৎলোকের সংখ্যা বেশি। কিন্তু, তারা টাকার অভাবে রাজনীতির মাধ্যমে নির্বাচনে আসতে পারছে না। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করতে পারলে ধনী ও গরীবদের মধ্যে দূরত্ব কমে আসবে। ফলে, জ্ঞানীগুণী ও সৎলোক রজনীতিতে আসতে পারবে এবং রাজনৈতিক পরিবেশ সুষ্ঠু হবে। সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশই উন্নয়নের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। জনগণ তাদের পছন্দসই প্রতিনিধি নির্বাচিত করার জন্যেই নির্বাচন। এনির্বাচনকে কেন্দ্র করে মারামারি, হানাহানি, ভোটচুরি, ভোটের বাক্স ছিনতাই ও ভোটপ্রদান না করা হলেও প্রদান করা দেখানো হয়। এসব ক্ষেত্রে নির্বাচন ক্ষমতায় যাবার একটা উপলক্ষ হয়। নিরপেক্ষ নির্বাচন ক্ষমতায় আরোহণ না করালে এবং নির্বাচনকে উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করে ক্ষমতায় আরোহণ করলে ক্ষমতাসীনদেরকে জনগণের সরকার বলা যায় না এবং এধরনের ক্ষমতাসীনেরা জনগণের কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের স্বার্থে কাজ করে, কেননা তারা বুঝে যে, তারা জনগণের ভোটে ক্ষমতাসীন নয়। তাছাড়া, যেভাবেই হোক যারা একবার ক্ষমতায় যায় তারা ক্ষমতায় থেকে নির্বাচনে গেলে তাদেরকে পরাজয় করা কঠিন হয়, কেননা প্রশাসন ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের সরাসরি অধীনে থাকে বলে তাদের জন্যে পরোক্ষভাবে হলেও কাজ করতে হয় এবং জনগণো এসব কারণে ভীতির মধ্যে থাকে ও ক্ষমতাসীনদের কর্মীরা সুযোগ সৃষ্টি করে নিতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এবং তাদের নির্বাচনে ধনী ব্যক্তিরা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে। কোন গরীব লোককে বা কোন ভিক্ষুককেতো তারা এতো উদারচিত্তে সাহায্যসহযোগিতা করে না। এক্ষেত্রে 'তেলা মাথায় তেল দেয়া' প্রবাদটি প্রযোজ্য। গরীব ও ভিক্ষুকেরা বিনিময়ে কিছুই দিতে পারে না বিধায় ধনী ব্যক্তিরা তাদেরকে এতো উদারচিত্তে সাহায্যসহযোগিতা করে না। কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গেলে বা কোন রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাব খাটিয়ে ধনী ব্যক্তিরা অনেক কাজ উদ্ধার করে নিতে পারে। তাই, তারা রাজনৈতিক দলগুলোকে বা তাদের নির্বাচনে উদারচিত্তে

www.pathagar.com

সাহায্যসহযোগিতা করে থাকে। তবে, তারা যেসব কাজ উদ্ধার করে নেয় সেগুলো সাধারণত ন্যায়সংগত হয় না। তাই, জাতীয় স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোর, তাদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ থাকলে, উচিত কোনভাবেই ধনী ব্যক্তিদের সাহায্যসহযোগিতার মুখাপেক্ষী না হয়া। সুষম বণ্টন থাকলে নির্বাচনে টাকার খেলা চলবে না। ফলে, ভোটাররা যেমানে বা যেনীতিতে প্রার্থীকে ভোট দেবে তা হবে যোগ্যতা এবং প্রতিযোগিতায় যোগ্য প্রার্থীই নির্বাচিত হবে। কয়েকজনের কথা ও দাবি যে সবার কথা ও দাবি তা কোনভাবেই ঠিক নয়। আমাদের এদেশ বারো কোটি লোকের দেশ। তাই, এদের মধ্যে একজন বা কয়েকজন বক্তৃতাবিবৃতিতে বা লেখাতে একটা কিছু চেলেই তা যে বারো কোটি লোকের দ্বারা সমর্থিত হয় তা নিশ্চিতভাবে কেউই মনে করতে পারে না। তবে, তার বা তাদের দাবি যে জনগণের দাবি তা বুঝার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। তাই, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকৃত কাজ হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেয়া এবং যেদল ক্ষমতাসীন হয় সেদলকে মেনে নিয়ে সুষ্ঠু পরিবেশে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যায়া। তবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কলহে লিপ্ত থাকলে, শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্ট হতে থাকলে, দেশ উন্নতির পথে আগাতে না পারলে ও বিভিন্ন সমস্যা প্রকট হতে থাকলে সামরিক শাসন এমনিতেই পথ পেয়ে যায় এবং রাজনীতিবিদদের অদূরদর্শিতাই সামরিক শাসন কায়েমের জন্যে দায়ী হয়ে যায়।

সংসদ হচ্ছে আলাপআলোচনার ও তর্কবিতর্কের মাধ্যমে সঠিক জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ার আইনস্বীকৃত সর্বোচ্চ জাতীয় ফোরাম। জনপ্রতিনিধিরা এখানেই জনগণের স্বার্থে কথা বলতে হয়। এখানে সবার কথা গৃহীত হবে এমনকোন কথা নেই। কারো কথা গৃহীত না হলেও জনগণ বুঝতে পারে যে, কে সঠিক কথা বলছে। কথা গৃহীত হোক বা না হোক সঠিক হলে সেটার পক্ষে জনমত গঠিত হতে থাকে এবং এটা পরবর্তী নির্বাচনে কাজে লাগে। তাই, কথায়কথায় সংসদের অধিবেশন বর্জন না করাটা দেশ, জাতি, জনগণ ও রাজনীতিবিদ প্রত্যেকের জন্যেই সুফলদায়ক। সংসদে বিরোধী দল ও ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে মানঅভিমান চলে। এমানঅভিমান বিস্তীর্ণ পরিসরে হতে হয়, কেননা এটার সাথে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি জড়িত থাকে। এটা সংকীর্ণ পরিসরে হলে স্বামীস্ত্রী ও জামাইশ্বশুরের মানঅভিমানের মতো হয়ে যায় এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে পড়ে যায়। রাজনৈতিক আচরণ উদার ও মহৎ আচরণ। যেআচরণে উদারতা ও মহত্ব পরিলক্ষিত হয় না সেটাকে রাজনৈতিক আচরণের নিরিখে দেখা যায় না।

www.pathagar.com

যেদেশে আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি বিনা হস্তক্ষেপে সক্রিয় সেদেশে কদাচিৎ হরতাল পালিত হয়। কারো কোন দাবি থাকলে তা সরকারের নিকট করতে হয়। সরকার সেটা আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিবেচনা করতে হয়। সরকার এভাবে কিছু করতে পারবে না; কিন্তু হরতাল করলে পারবে তা হলে হরতালের পর হরতাল চলতে থাকবে। আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি না পারলে হরতালের প্রেক্ষিতেও পারবে না। এটাই আইনানুগ কথা। তাই, যারা দেশ ও জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হরতালে নামে তাদেরকে সরকার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হয় এবং সরকার যা পারবে না ক্ষমতাচ্যুত হলেও তা পারবে না। হরতালকারীদেরকে জাতীয় স্বার্থের বিপরীতে সন্তুষ্ট করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। কথায় বলে যে, শেয়ালকে ভাঙাবেড়া দেখাতে নেই। শিয়াল ভাঙাবেড়া দেখতে পেলে সেখান দিয়ে প্রবেশ করে মুরগি থাকলে তা নিয়ে যায়। একশ্রেণীর হরতালকারীকে সন্তুষ্ট করলে সেশ্রেণীই বারবার হরতাল করে। তাদের দেখাদেখি বিভিন্ন শ্রেণীর ও দলের হরতাল শুরু হয়, কেননা এধারণা পাকাপোক্ত হয় যে, হরতাল করলেই যেসে দাবি পূরণ হয়ে যায়। হরতাল ছাড়াই পূরণ করাটা যুক্তিসংগত, কেননা হরতালে জনজীবন দুর্বিষহ হয় এবং দেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। সরকার বলতে পারে যে, তারা বাধ্য হয়ে মেনে না নেয়ার মতো দাবিও মেনে নেয়। বাধ্য হয়ে কারো অযৌক্তিক দাবি মেনে নেয়ার জন্যে সরকার নয়। সরকার হচ্ছে এধরনের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে প্রতিহত করার এবং আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপরিচালনার জন্যে। যেসরকার এটা পারে না সেসরকার ক্ষমতার মোহে নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতায় না থেকে তা ছেড়ে দিতে হয়। জনগণের সরকার কারো নিকট অন্যায়ভাবে আইনের পরিপন্থী নতিস্বীকার করার জন্যে নয়, কোনপ্রকার অন্যায় আপসকামিতা ব্যতীত দেশপরিচালনার জন্যে। আইনকানুনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী দাবিদাওয়া সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়। সরকার অন্যায় দাবিদাওয়া না মানতে পারলে হরতালে নেমে জনজীবন দুর্বিষহ করে তোলে এবং সরকার ও দেশের বিপুল পরিমাণে ক্ষতিসাধন করে। এধরনের হরতাল ফাসাদ সমতুল্য। ইসলামের দৃষ্টিতে ফাসাদ হত্যার চেয়েও জঘন্যতম। হত্যা করা হয় নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে। কিন্তু, ফাসাদে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অনেকেই। তাই, এধরনের হরতাল আহ্বানকারীরা দেশের শত্রু ও হত্যাকারীর চেয়েও জঘন্যতম। সরকার এদেরকে বরদাস্ত বা সহ্য করার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সরকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থেকে এদেরকে ভয় করে। এরাও মনে করে যে, সরকার এদেরকে ভয় করে। ফলে, এরা হরতাল বা ফাসাদ জোরদার করতে থাকে। সরকারের উচিত দেশ ও জনগণের স্বার্থে এদেরকে বরদাস্ত না করা এবং আইনানুগভাবে দ্রুতগতিতে এদেরকে নির্মূল করা। এতে জনগণ সরকারের বিরোধিতা না করে সরকারকে দোয়া করবে। বিরোধী

www.pathagar.com

দলের নেতা ও কর্মীরাও দেশের মানুষ ও জনগণ। তাই, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার না করা, অর্থাৎ দেশ ও জনগণের স্বার্থে এধরনের হরতালকারীদেরকে গোপনে বা প্রত্যক্ষভাবে কোনপ্রকার সমর্থন না দেয়া এবং নিজেরাও কথায়কথায় হরতালে ঝাঁপিয়ে না পড়া। বাংলাদেশে হরতাল একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কথায়কথায় যেসে হরতাল ডাকে। হরতালের কোন গুরুত্ব বর্তমানে বাংলাদেশে নেই। এটা দিচ্ছে শুধু ভোগান্তি, ক্লেশ, বোমাবাজি, ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি। এটা এখন আর জনসমর্থনের পরিচায়ক নয়। ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি, শিল্পপতি, শ্রমিকমালিক, ছাত্রশিক্ষক ও জনসাধারণ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতে নারাজ। তাই, কেউ কাজকর্মে বের হয় না। কিন্তু, যতো বিপদ হচ্ছে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। তাদের হাজিরার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করা হয়। ফলে, অফিসে আসতে ও অফিস থেকে যেতে তাদের ভোগান্তি ও কষ্টের সীমা থাকে না। অপরদিকে, অফিসআদালতে বলতে গেলে তেমনকোন কাজকর্ম হয় না। তাই, তাদেরকে অযথা ভোগান্তিতে ও কষ্টে নিপতিত করাটা মানবোচিত হয় বলে মনে হয় না। সাধারণত গাড়ি বের করলে ওটাকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোঁড়া হয়, বোমা নিক্ষেপ করা হয় এবং, এমনকি, গুলিও করা হয়। কিন্তু, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের গাড়ি বের করা হলে সাধারণত সেটার প্রতি কোন বাধা সৃষ্টি করা হয় না। এটা যেন একটা আপসকামিতা। হরতালতো বলতে গেলে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধেই। অথচ, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে হাতের মুঠোতে পেয়েও কিছু করা হয় না। নিরীহ জনগণকেই, যারা হরতালের সাতেপাঁচে থাকে না, বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। এতে এটা বুঝা যায় যে, সব দলের রাজনীতিবিদেরা নিজেরানিজেরা ঠিক আছে এবং জনগণ সব দলেরই পুঁজি। এপুঁজিকে তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী খাটাবে ও ধোলাই করবে। জনগণ হচ্ছে মরিচ আর রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীরা হচ্ছে পাটাপুতা। বাস্তবে পাটাপুতা ঠিকই থাকে এবং তাদের ঘর্ষণে মরিচের অবস্থা ত্রাহিত্রাহি হয়। অথচ, রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীরা কথায়কথায় বলে যে, জনগণই সব ক্ষমতার উৎস এবং বাংলাদেশের সংবিধানেও তা-ই বলা আছে। কথায় বলে যে, কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরলে পাজী। প্রয়োজনে, কাজে ও নির্বাচনে জনগণ সবকিছু আর এগুলো ফুরে গেলে তারা আবর্জনার চেয়েও খারাপ। দেশ ও দেশের সম্পদ আমাদের। এসম্পদ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আমাদেরই কাজে লাগে। কোন সম্পদ নষ্ট করা মানেই নিজেদের ক্ষতি করা। ক্ষোভপ্রদর্শন করতে গিয়ে সম্পদ নষ্ট করাটা জাতিকে পেছনে টানার শামিল। ব্যক্তি দোষী হতে পারে। সম্পদের কোন দোষ নেই। ব্যক্তির কারণে সম্পদ নষ্ট করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া, সম্পদ নষ্ট করা খুবই সহজ। কিন্তু, তা সৃষ্টি করা খুবই কঠিন। একটা বই লিখতে যথেষ্ট শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয় এবং মস্তিষ্ক

www.pathagar.com

খাটাতে ও চিন্তাভাবনা করতে হয়। কিন্তু, বইটি ধ্বংস করতে ম্যাচের একটি কাঠির আগুনই যথেষ্ট। একটি সেতু নির্মাণ করতে কোটিকোটি টাকা খরচ হয়। কিন্তু, তা ধ্বংস করতে একটি বোমই যথেষ্ট হয়। গড়া যে কঠিন এবং ধ্বংস করা যে সহজ তা বিশ্লেষণ করে বলার দরকার নেই, কেননা আমরা সবাই তা বুঝি এবং প্রত্যেকে কথায়ও বলি যে, নষ্ট করা সহজ, গড়া কঠিন। রাজনৈতিক কারণেই ধ্বংসযজ্ঞ বা ধ্বংসলীলা বেশি হয়ে থাকে। অথচ, রাজনীতিবিদেরাই দেশের কর্ণধার এবং জনগণের নেতা ও ত্রাণকর্তা। কাজেই, রাজনীতিবিদদের এব্যাপারে চৈতন্যোদয় বা বোধোদয় হয়া প্রয়োজন যে, তারা কোনভাবেই ধ্বংস করবে না ও ধ্বংসের কারণ হবে না, তারা গড়বে ও গড়ার কারণ হবে। কোন সরকারের পতনের কারণ শুধু হরতাল নয়। সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে তাদের বিভিন্ন কাজে ও পেশায় যেতে না দিয়ে গৃহাবদ্ধ করে রাখাটা হরতাল নয়। এটা হরতালের নামে সন্ত্রাসি তৎপরতার মাধ্যমে জনগণের অধিকারে সরাসরি হস্তক্ষেপ যা গণতন্ত্রের ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। সরকারের ওপর জনগণ সহজে আস্থা হারায় না। সরকারের জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী কর্মকাণ্ড যতো প্রকট হতে থাকে জনগণ সরকারের প্রতি ততোই ক্ষুব্ধ হতে থাকে এবং তাদের এক্ষোভ চরম পর্যায়ে পৌছলে সরকারের পতন ঘটে। লাখোলোখো জনতার মিছিল এবং সভাসমিতিই এক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এগুলোই গণতন্ত্রের ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বৈশিষ্ট্যের আওতায় পড়ে, কেননা এগুলোর দ্বারা জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ আসে না। জনগণের পুঞ্জীভূত বা রাশীকৃত ক্ষোভে হরতালেরো প্রয়োজন হয়। এহরতালের ডাক আসতে হয় ঐকমত্যের বা মতের অভিন্নতার ভিত্তিতে। এহরতালে সন্ত্রাসি তৎপরতার প্রয়োজন হয় না। এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অর্থাৎ পরের চেষ্টা ব্যতিরেকেই, পালিত হয়। তবে, যেসে যখনতখন যেসে কারণে হরতাল ডেকে জনজীবন অসহনীয় ও দুর্বিষহ করে না তোলাই মঙ্গলজনক ও হিতকর।

শুধু অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় না, অতিরিক্ত সম্পদো স্বভাব নষ্ট করে। অভাবে বাধ্য হয়ে স্বভাব নষ্ট করে। কিন্তু, অতিরিক্ত সম্পদে স্বভাব নষ্ট করতে কোন বাধ্যতা থাকে না। তাই, অভাবে নষ্ট স্বভাব সম্পদে নষ্ট স্বভাবের তুলনায় খুবই নগণ্য। কোনকোন অধিক সম্পদের মালিক মদ, জুয়া ও ব্যভিচারে জড়িত হয়ে পড়ে এবং হিতাহিতজ্ঞান বা ভালোমন্দবোধ হারিয়ে ফেলে। তাদের কেউকেউ সম্পদ আরো বাড়ানোর জন্যে ব্যাপকতর দুর্নীতির আশ্রয় নেয় এবং ঘুষপ্রদান করে বহু টাকা ব্যয় করে। কেউকেউ সুবিধাদি আদায়ের জন্যে গুণ্ডাবাহিনী পোষে ও রাজনৈতিক দলগুলোকে সাহায্যসহযোগিতা করে থাকে। তারা অন্যায়অবিচার ও জোরজুলুম করতে ইতস্তত করে না, কেননা অর্থ দিয়েই তারা এসব থেকে নিষ্কৃতি বা অব্যাহতি পায় এবং এসব দূরীকরণের কাজে যারা নিয়োজিত তারা এদের থেকে অর্থ পেয়ে এদের তাঁবেদারে বা

www.pathagar.com

অনুগত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। সেজন্যেই ইসলাম সাম্য ও সুষম বণ্টনের যেপদ্ধতি দিয়েছে তাতে অভাবীদের অভাব লাঘব হয় এবং সম্পদশালীদের হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ থাকতে পারে না। তাই, রাজনীতিবিদেরা ইসলামী অর্থনীতি একান্তভাবে অধ্যয়ন করে তার বাস্তব প্রতিফলনের জন্যে কাজ করতে হয়। উভয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের অর্থের প্রতি লোভ রয়েছে। সাধারণত উভয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক ভালো কথা বলে ও অন্যায়ের সমালোচনা করে। কিন্তু, তাদের অধিকাংশই যাদের সমালোচনা করে তাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবেও কোন সুবিধা পেলে তাদের, সমালোচনা না করে, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এধরনের কাজ বেশি হয়। এটা মোনাফেকি ও গাদ্দারি। জনগণের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বহুলাংশে রাজনীতিবিদদের কর্মের ওপর নির্ভর করে। তাই, তারা এমন কাজ করা উচিত নয় যাতে জনগণ মোনাফেকি ও গাদ্দারিতে নিমজ্জিত হয়ে তাদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটিয়ে জাতীয় চরিত্র বিনষ্ট করে। সময় কাটানোর একটি পন্থা হলো অশ্লীল বিনোদন। একটি জাতির লোককে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে পারলে অশ্লীল বিনোদনের জন্যে কোন সময় থাকে না। বিভিন্ন পেশায় ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করে নিষ্ঠার সাথে সংসার করলে, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করলে, নামাজকালাম পড়লে, অর্চনাআরাধন করলে ও শরীর ঠিক রাখার জন্যে কিছুটা শারীরিক পরিশ্রম করলে, অশ্লীল বিনোদন কেন, কোন ভালো বিনোদনের জন্যেও তেমনকোন সময় পায়ার কথা নয়। ছাত্ররা কিশোর ও যুবক। তাদেরকে সঠিকভাবে লেখাপড়ায় ও জ্ঞানার্জনে লিপ্ত রাখলে তাদেরো অশ্লীল বিনোদনের জন্যে সময় থাকতে পারে না। জাতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদেরকেই পালন করতে হয়।

যারা অন্যান্য বিদ্যাচর্চার সাথেসাথে কোরআন ও হাদীসও চর্চা করবে তারা অবশ্যই বলবে যে, ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত অন্যকোন শিক্ষায় নৈতিকতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের সাথে ইসলাম ধর্মের কোন সংঘর্ষ নেই, বরং কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস। মানুষের জন্যে যতোকিছু খারাপ ইসলাম সেগুলো অপনোদন বা খণ্ডন করে। ইসলামে যে গণতান্ত্রিকতা ও উদারতা আছে বিশ্বের অন্যকোনকিছুতে সেগুলো নেই। ইসলামের আবির্ভাব না হতোতো কি যে হতো তা কল্পনাই করা যায় না। ইসলামের অনুসারী ও ইসলামের পক্ষে কথা বলার লোক না থাকতোতো সবধরনের অপরাধ ও দুর্নীতি যে আরোকতো বৃদ্ধি পেতো তা অচিন্তনীয়। যারা ইসলামকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছে ও শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার বিরোধিতা করছে তাদের উচিত ইসলাম কি তা আগে বুঝতে চেষ্টা করা। শুধু কথা, আদেশ, উপদেশ, নসিহত, হেদায়েত ও উচ্চশিক্ষা দ্বারা মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব নয়। মানসিকতার পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন

www.pathagar.com

সঠিক পথ ও পন্থা। যেসব পথে ও পন্থায় মানসিকতার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চলছে সেগুলোতে সবাই দেখছে যে, কোন পরিবর্তন আসছে না, বরং দিনদিন বিকৃতির মাত্রা বেড়েই চলছে। তাছাড়া, মানসিকতাকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ও রাষ্ট্রপরিচালকদের মানসিকতা এবং জনসাধারণের মানসিকতা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ও রাষ্ট্রপরিচালকদের মানসিকতার পরিবর্তন ব্যতীত জনসাধারণের মানসিকতার পরিবর্তন আসতে পারে না। এভাবে আপনাআপনি জনসাধারণের মানসিকতা পরিবর্তিত হতোতো এতো আইন, বিধান, নিয়ম ও পদ্ধতির কোন প্রয়োজনীয়তা থাকতো না। এগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ও রাষ্ট্রপরিচালকরা। এগুলোর সঠিক প্রয়োগের ব্যাপারে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন অপরিহার্য। তারা এগুলোর উর্ধ্বে থাকবে না ও অমান্য করবে না এবং এগুলো অমান্যকারী যে-ই হয়-না-কেন সে যথার্থ শাস্তি হতে কোনভাবেই নিষ্কৃতি পাবে না। তাদের এসব মানসিক পরিবর্তন আসলে জনসাধারণের মানসিক পরিবর্তন এভাবেই আসবে, কেননা এধরনের পরিবর্তন নিচদিক থেকে শুরু না হয়ে ওপারদিক থেকেই শুরু হয়। জনসাধারণ সাধারণত ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রপরিচালকদের পদাংক অনুসরণ করে। এসব কারণে রাজনীতিবিদ ও নেতাদেরকে মহৎ মানসিকতার অধিকারী হতে হয় এবং আদর্শিকভাবে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ার মতো কাজ করে যেতে হয়। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য যে লোকজন বুঝে না তা নয়। মন্দ পথ পরিহার করে ভালো পথে যে তারা চলতে চায় না তা-ও নয়। ভালো পথে চলতে চেলেই চলা যায় এরকম হলে এতো আইন, বিধান, নিয়ম ও পদ্ধতির প্রয়োজন হতো না। প্রত্যেকের খেয়েপরে বাঁচার অধিকার এবং তাদের সন্তানসন্ততিরো এঅধিকার নিশ্চিত থাকলে মানুষ কোন ব্যতিক্রম ছাড়া খারাপ কাজ করতো না। বর্তমানে ভালো পথে চলার খেয়াল থাকলেও নিজেদের ও সন্তানসন্ততির নিশ্চয়তাবিধানকল্পে ভালোমন্দ ভুলে গিয়ে যে যেদিকে সুযোগসুবিধা পায় সে সেদিকে ধাবিত হয়। অর্থসম্পদ ও প্রভাবপ্রতিপত্তি যশ ও সম্মানের বিষয়বস্তু না হয়ে অতীতের ন্যায় মহৎ ও সৎজীবন যশ ও সম্মানের বিষয়বস্তু হলে এবং উল্লেখিত নিশ্চয়তাবিধান করা হলে অর্থসম্পদ ও প্রভাবপ্রতিপ্রত্তির পেছনে লোকজন কদাচিৎ ধাবিত হবে। এটার জন্যে পথপ্রদর্শন করতে হবে সব জননেতা ও রাজনীতিবিদকে।

আজকাল প্রায়ই শুনা যায় যে, সন্তানসন্ততি মাতাপিতার অবাধ্য হচ্ছে। শিশুরা সচ্চরিত্রতার অধিকারী হলে মাতাপিতার অবাধ্য হয় না। তাদেরকে সচ্চরিত্রতার অধিকারী বানানোর সুতিকাগৃহ বা আঁতুড় ঘর হচ্ছে পরিবার। শিশুরা মাতাপিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে। সব মানুষ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

পরিবারে মাতাপিতা ও অন্যান্য সদস্য সচ্চরিত্রতার অধিকারী হলে সন্তানরাও সচ্চরিত্রতার অধিকারী হয়। যেহেতু সব লোক পরিবারের আওতায় সেহেতু তারা সবাই চরিত্রবান হলে ও সচ্চরিত্রতার পরিবেশ বিরাজমান থাকলে শিশুরা এপরিবেশে তাদের মাতাপিতার অবাধ্য হতে পারে না। একটি বীজের যতোভালো মাটিতেই অংকুরোদগমন হয় না কেন চারাটির ওপর ঢাকনি থাকলে ও রোদ না লাগলে সেটা স্বাভাবিকভাবে বড় হয় না। সেটার পাতা সাদা ও দুর্বল হয়ে যায়। তাছাড়া, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত তাকে কীটপোকা, গরুছাগল ও ঝড়ঝাপটা হতে রক্ষা করতে হয়। এসব পূর্বশর্ত পালিত হলে চারাটি বৃক্ষে পরিণত হয় এবং ফুলেফলে সুশোভিত হয়। সন্তানদেরকে পরিবারে সচ্চরিত্রতার পরিবেশের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যত্নসহকারে গড়ে তুলতে হয়। এপরিবেশ ইসলামের মধ্যে নিহিত আছে। মহানবী বলেছেন যে, তিনি মানবচরিত্রে যাবতীয় সদ্‌গুণের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের ও পরিপূর্ণতাবিধানের জন্যে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি তাঁর কথা অনুযায়ী তাঁর চিন্তায় ও কর্মে এটার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তগুলো মানবেতিহাসে রেখে গেছেন। তিনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ার সূচনাপর্বেই তার কানে আযানইকামত দানের নির্দেশ দিয়েছেন। তার মুখ ফুটলে তাকে আল্লাহ্ ও নবীসম্পর্কীয় কথাবার্তা শিখানো অত্যাবশ্যক বলে জানিয়েছেন। তিনি শিশুকে তার সাত বছর বয়সে নামাজের হুকুম করতে ও দশ বছর বয়সে মেরেপিটে হলেও তাকে নামাজে অভ্যস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে সেব্যক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট যে কোরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়। তিনি সন্তানদেরকে নিয়ে কোরআন ও ইসলামী তালিমের মজলিস করার জন্যেও শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্ অভিভাবকদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন যে, তারা যাতে নিজেদেরকে ও পরিবারের সদস্যদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করে। মহানবী সন্তানদেরকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলাকে স্থায়ী দান হিসেবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আল্লাহ্ নিজেকে ও বংশধরদেরকে নামাজী বানানোর জন্যে দোয়া করতে বলেছেন। মহানবীর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজব্যবস্থার ও অনুশাসনের ভবিষ্যৎ কর্ম হচ্ছে শিশু। তাই, শিশুদেরকে সচ্চরিত্র পেতে হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যেখান থেকে কাজ শুরু করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র রাসূল যেস্তর থেকে কাজ করেছেন সেখান ও সেস্তর থেকে কাজ করতে হবে। একাজের পরিবেশ সরকার, সব পরিবারের বড় পরিবার ও সব অভিভাবকের বড় অভিভাবক হিসেবে, সেভাবে সৃষ্টি করতে পারে যেভাবে মহানবী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এপরিবেশ সৃষ্ট হলে মহৎ প্রাণের রাজনীতিবিদদের উদ্ভব ঘটবে এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজমান থাকবে। মুখের কথায় নৈতিকতা কার্যকর হয় না। নৈতিকতার সম্পর্ক হলো বাস্তবতার সাথে। বাস্তবে অনুকরণপ্রিয়তার ওপরই নির্ভর করে নৈতিকতা। সাধারণত

www.pathagar.com

ওপরের দিককেই অনুকরণ করা হয়, কেননা ওদিকই সবকিছু পরিচালনার ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত। তাই, ওপরের দিকে, অর্থাৎ প্রবীণদের মধ্যে, নৈতিকতা থাকলে অন্যান্য দিকেও, অর্থাৎ নবীনদের মধ্যেও, নৈতিকতা থাকবে। অন্যান্য দিকে নৈতিকতা না থাকার কারণ হলো যে ওপরের দিকে নৈতিকতা নেই। বর্তমানে সর্বত্র নৈতিকতার জন্যে ওপরের দিকে, অর্থাৎ প্রবীণদের মধ্যে, নৈতিকতাবোধ পুরোপুরিভাবে জাগ্রত হতে হবে। সিনেমা ও নাটকে কল্পনা স্থান পেয়ে থাকে। উপন্যাসেও কল্পনার স্থান আছে। কল্পনা দেখতেদেখতে ও পড়তেপড়তে তা মনে দাগ কাটে এবং তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে অনেকাংশে নৈতিকতা হারিয়ে ফেলে।

দেখাদেখি অসামাজিক কার্যকলাপ, অপরাধ, মস্তানি, চাঁদাবাজি, বোমাবাজি, ইত্যাদি হয়ে থাকে। যখন একজন দেখে যে, অপরজন এগুলো করে বাহাদুর হয়ে যায় এবং তাকে ও তার বাবাভাইকে সবাই খাতির ও সমীহ করে তখন তার মধ্যে এপ্রবণতা কাজ করে যে, সেও এগুলো করলে বাহাদুর হতে পারবে এবং তাকে ও তার বাবাভাইকে সবাই সমীহ বা সশ্রদ্ধ সংকোচ প্রদর্শন করবে। একজন ছাত্র যখন দেখে যে, অপর একজন ছাত্র রাজনীতির নামে অনেক অসাধ্য সাধন করে সেও তখন এরকম রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। একজন মহিলা যখন দেখে যে, অপর একজন মহিলা মুক্তভাবে যেসে পুরুষের সাথে চলাফেরা করে অনেককিছু করে ফেলছে সে তখন ওমহিলাকে অনুকরণ ও অনুসরণ করে। এঅবস্থা চলতে থাকলে কেউ কারো চেয়ে কম হবে না এবং ঘরেঘরে মস্তান, ছাত্রনেতা, চাঁদাবাজ, দুষ্কৃতকারী, অপরাধী ইত্যাদি জন্ম নেবে। এটাই হচ্ছে পরিবেশের কুপ্রভাব। একই দেশ ও সমাজে বসবাস করে অনুকরণপ্রিয়তা পরিহার করে চলাটা সাধারণত সম্ভব হয় না। একজন যেভাবেই হোক বিভব ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হলে তার দেখাদেখি অন্যজনো যেকোনভাবে ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে চায়। একজন লোক দালানে বসবাস করলে, কারে চলাচল করলে, নিত্য ভালোভালো খাবার খেলে, রেডিও ও টেলিভিশন চালালে, ভালোভালো পোশাক পরিধান করলে, ছেলেমেয়েদেরকে ভালোভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শিখালে, গৃহশিক্ষক রাখলে, বিভিন্ন উপলক্ষে ভোজের আয়োজন করলে, ব্যাংকে প্রচুর টাকা জমালে ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করলে অন্যান্য লোকেরো এগুলোর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্ট হয়। এগুলোর জন্যে অর্থের প্রয়োজন। এঅর্থ সৎভাবে অর্জন করতে না পারলে অসৎভাবে হলেও অর্জনের প্রবণতা জন্ম নেয়। ফলে, দুর্নীতি ও অসদুপায় চলতে থাকে। এগুলো বন্ধের জন্যে উচ্চাভিলাষী অনুকরণপ্রিয়তা পরিহার করতে হয়। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা উচ্চাভিলাষী না হলে এবং তাদের জীবনযাত্রা সহজসরল হলে ও তারা অগাধ সম্পদের মালিক না হলে জনগণ অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদেরকে অনুকরণ করবে। রাজনীতিবিদেরা জাতীয় স্বার্থে এঅনুকরণপ্রিয়তার পথিকৃত হতে হবে।

www.pathagar.com

আটকাআটকি একটা প্রথায় পরিণত হয়েছে। একজন অপরজনের নিকট আটকা পড়ে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা মানুষ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। তাই, একজন অপরজনকে কোন কাজে আটকালে সেও অন্যএকজনকে আটকায়। তাই, আটকাআটকি একটা প্রথায় পরিণত হয়েছে এবং একে অপরের বদনাম ও সমালোচনা করে চলছে। এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবাই একে অপরের দ্বারা একভাবে–না–একভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অফিসার শিক্ষককে আটকাচ্ছে। শিক্ষক আবার ছেলেমেয়ে ভর্তির ব্যাপারে অফিসারকে আটকাচ্ছে। এভাবে আটকাআটকির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খেলা চলছে। কিন্তু, সাধারণ লোকজন এদের কাকেও আটকাতে পারছে না এবং নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তবে, সাধারণ লোকজনো বসে নেই। তারাও একে অপরকে আটকাচ্ছে এবং এদেরকেও আটকাবার পথ ও পন্থা বের করছে। এআটকাআটকির ফলে মানসম্ভ্রম ওঠে গেছে এবং কেউ কারো কাছে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কোন মূল্য পাচ্ছে না। এসব কারণে শত্রুতা সৃষ্ট হচ্ছে। যে যাকে যেখান দিয়ে পাচ্ছে সেখান দিয়ে তার থেকে শত্রুতা উদ্ধার করছে ও তাকে জব্দ করছে। এতে চলছে শত্রুতা ও জব্দাজব্দি। এটা জাতিকে পিছু টানছে। আগেকার লোক নাকি সরল মনে সরল কথা বলতো এবং তাদের কথার ও কাজের মধ্যে কোনপ্রকার বৈপরীত্য বা বিপরীত ভাব থাকতো না। তাদের কথাই বা জবানই নাকি দলিলের চেয়েও বেশি মূল্যবান ছিলো এবং তাদের জবানের পর কোন দলিলেরো প্রয়োজন হতো না। বর্তমানে কথা বা জবান কেন দলিলো ঠিক থাকে না। রাজনীতিবিদদের কথার মারপ্যাঁচ কেন সাধারণ লোকের মধ্যে একে অপরের কথার মারপ্যাঁচ বুঝাও ভার বা দুষ্কর। তাছাড়া, রাজনীতিবিদদের দেখাদেখি সাধারণ লোকজনো মারপ্যাঁচ দিয়ে কথা বলার ভঙ্গি রপ্ত করছে। তাই, কথার মারপ্যাঁচেও বহু সমস্যার ও সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে।

নর ও নারীর সমন্বয়ে মানব বংশের অস্তিত্ব। জীবনে হাসিকান্নায় ও সুখদুঃখে উভয়ের অংশিদারিত্ব সমান। একের উন্নতি ও অগ্রগতি অপরের উন্নতি ও অগ্রগতিকে উপেক্ষা করে কোনভাবেই সম্ভব নয়। জাতির সামাজিক উন্নতি ও সুখসমৃদ্ধি উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা ও কর্মপ্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল। তবে নর ও নারীর মধ্যে শারীরিক ও মানসিক ন্যূনাধিক্য বা তারতম্য আছে। নারীদেরকে কাজে লাগানোর সময় এতারতম্যের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আল্লাহ্ নারীদেরকে প্রকৃতিগতভাবে যেকাজ করার ও যেদায়িত্ব পালনের ক্ষমতা দিয়েছেন তাদেরকে সেকাজের ও সেদায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ ও দায়িত্ব দেয়াটা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা করা। প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ে। নারীদেরকে কাজে লাগাতে কারো আপত্তি নেই। তবে, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে না লাগিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী

www.pathagar.com

আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ ও জাতীয় আদর্শের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লাগানোটাই সংগত। আমরা চোখ মেললেই দেখতে পাই যে, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে নারীদের সমঅধিকার, মর্যাদা ও জাগরণের নামে নারীজাতির অমর্যাদা ও অবমাননার কারণে পারিবারিক ভিত ধ্বসে পড়ছে। ইসলামী আদর্শ নারীদের মর্যাদার নামে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা বিনোদনের উপকরণ ও ভোগ্যপণ্য মনে করাটার বিরোধিতা করে। ইসলাম নারীদেরকে মূর্খ রাখতে ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত করতে চায় না। ইসলাম চায় তারা শিক্ষার ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো দ্বারা তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করুক। ইসলামী আদর্শের আলোকে নারীরা উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত শিক্ষালাভ ও কাজ করলে এবং জাতীয় জীবনে গুরুদায়িত্বে অংশ নিলে কারো কোন আপত্তি ও বিরোধ থাকতে পারে না। কোন মহিলা স্বতন্ত্র পরিবেশে শরীরচর্চা করলে, মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শিখলে ও চাকরি করলে, মহিলা শিল্পকারখানায় চাকরি করলে ও মহিলা হাসপাতালে সেবাকর্মে জড়িত হলে ইসলাম বাধাপ্রদান করে না। তবে, ইসলাম যেকর্মনীতিতে নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকে সেটা অপনোদন করে। নারীদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে জোরালো কথাবার্তা হলেও তাদের সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান হচ্ছে না। তারা তাদের সমস্যাসমাধানের জন্যে সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হয়ে যথেষ্ট ভোগান্তির সম্মুখীন হয়। নারীসুলভ সম্ভ্রম ও অধিকার বজিয়ে রেখে কোন দায়িত্ব পালন করতে তাদেরকে যেমন অসুবিধায় পড়তে হয় নারীপুরুষের সহকর্মস্থল হতে কোন কাজ আদায় করতে তাদেরকে তেমনি প্রাণান্তকর অবস্থার বা নিদারুণ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কর্মজীবী হিসেবে সহকর্মস্থলে তারা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এজন্যে শিক্ষা, চিকিৎসা, দেশরক্ষা, আইনশৃঙ্খলা, অফিসআদালত, যানবাহন, খেলাধুলা, ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা নিরাপদ ও কল্যাণকর। এরকম আলাদা ব্যবস্থা তাদের যেমন মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার উপায় তেমনি সহকর্মস্থলজনিত বিভিন্ন সমস্যাপ্রতিরোধক। নরনারীর সহকর্মস্থলের কুফল মুসলিমঅমুসলিম সব দেশই জানে। নারী হচ্ছে মা। সন্তানসন্ততি সাধারণত নারীদেরকেই অনুকরণ ও অনুসরণ করে। তাদের মধ্যে শালীনতা ও নৈতিকতাবোধ থাকলে শিশুরা অশালীন ও অনৈতিক হতে পারে না। মানুষ সমাজ ও পরিবেশ সৃষ্টি করে, সমাজ ও পরিবেশ মানুষ সৃষ্টি করে না। সব মায়েরা মিলেই নারীসমাজ। কাজেই, শিশুদের ও নিজেদের স্বার্থে সব নারী শালীনতা ও নৈতিকতার অধিকারী হলে সমাজ ও পরিবেশ ভালো হয় এবং শিশুরাও শালীনতা ও নৈতিকতার অধিকারী হতে পারে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারীদেরকে দিয়ে অভ্যর্থনা

www.pathagar.com

দেয়ানো এবং আপ্যায়ন করানো হয়। এটা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নারীদেরকে দিয়ে অভ্যর্থনা দেয়ানো ও আপ্যায়ন করানো মনোরম ও আনন্দদায়ক। মনোরম ও আনন্দদায়ক জিনিস উপভোগের যোগ্য। এভাবে নারীরা অন্যপুরুষের উপভোগের বস্তু হয়াটা তাদের মর্যাদা বা স্বাধীনতা নয়। নারীরা ওধরনের মর্যাদা ও স্বাধীনতা পায়া উচিত নয় যেগুলোতে তারা তাদের অজ্ঞাতে অন্যান্যের আনন্দ ও উপভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়। মহিলাদের আকর্ষণী শক্তি বেশি। তাই, তাদেরকে দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। অন্যপুরুষকে নিজের রূপ ও ভঙ্গি দিয়ে আকর্ষণ করাটা নারীদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা নয়। এটা হচ্ছে মর্যাদাহানি ও স্বাধীনতার প্রতি অবমাননা। তাছাড়া, যেস্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট করে তা স্বাধীনতা নয়। তা হচ্ছে উচ্ছৃঙখলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা। যারা নারীদেরকে এসব উচ্ছৃঙখলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি আহ্বান জানায় তারা বস্তুত নারীদের স্বার্থে কাজ না করে তাদের নিজেদের স্বার্থচরিতার্থ করে এবং ফাঁকতালে বা সহসালব্ধ সুযোগে নারীদের নিকট আদরণীয় ও বরণীয় হয়। রাজনীতিবিদেরা নারীদের স্বাধীনতার জন্যে রাজনীতির ক্ষেত্রে এসব দিকে দৃষ্টি দিলে নারীদের মর্যাদা সংরক্ষিত হতে বাধ্য। তুলনামূলকভাবে পুরুষদের চেয়ে নারীরা বেশি লোভী। তারা প্ররোচিত হয় বেশি। শয়তান আদমকে প্রতারিত করতে পারেনি। সে প্রতারিত করতে পেরেছিলো হাওয়াকেই।

ব্যক্তি ও পরিবার নিয়েই সমাজ গঠিত। পরিবারের ভিত্তি হলো নারী। শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয়ার পর থেকে ১২/১৫ বছর মায়েদের সংস্পর্শে থাকে। তারা সব ব্যাপারে তাদের মায়েদেরকে অনুকরণ ও অনুসরণ করে। মায়েদের পারিবারিক পরিধি ও পরিমণ্ডল হচ্ছে প্রকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়। অথচ, নারীদের ইসলামী ধারায় উচ্চশিক্ষার তেমনকোন সুযোগ নেই। ফলে, তারা তাদের শিশুদেরকে সুন্দর ও সাবলীল পরিবেশে চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। মহানবী ইসলামী সমাজ গঠনের সূচনা করেছিলেন তাঁর পরিবার থেকেই। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা নিকটস্থদেরকে আল্লাহ্র অবাধ্যজনিত পরিণতির ভয় দেখাও এবং তোমরা নিজেদেরকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও।" এটাই ইসলামী সমাজব্যবস্থার ও অনুশাসনের ভিত্তি। মহানবী এভিত্তিকে শক্ত করার জন্যে ঘোষণা করেন, "তোমাদের সন্তানেরা সাত বছর বয়সে উপনীত হলে তোমরা তাদেরকে নামাজের জন্যে নির্দেশ দাও এবং তারা দশ বছরে পৌঁছলে তাদেরকে তোমরা প্রহার করে হলেও নামাজে অভ্যস্ত করে তোল।" তিনি আরো ঘোষণা করেন, "মানুষ মরে যায়ার সাথেসাথে তাদের পাপপুণ্য বন্ধ হয়ে যায়। তখন স্থায়ী দান, দীনের জ্ঞান ও নেক সন্তানের দোয়ার মাধ্যমেই, মৃত্যুর পরেও, তারা সওয়াবের অধিকারী

www.pathagar.com

হতে পারে।" তাই, পারিবারিক পরিমণ্ডলের মূল শিক্ষয়িত্রী মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারীকে ইসলামী উচ্চজ্ঞান থেকে দূরে রেখে চরিত্রবান ও আদর্শ নাগরিক আশা করা যায় না। রাজনীতিবিদেরা তাদের কথায়, বক্তৃতায়, আচারআচরণে ও কর্মপন্থায় নারীরা উক্ত ধারায় তাদের সন্তানসন্ততিকে চরিত্রবান ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারে। যেসব নারী চাকরি বা বাইরে কোন কাজ না করলে চলে না তারা তা করতে কোন আপত্তি নেই। তবে, তাদের চাকরির বা কাজের ক্ষেত্র হতে হবে আলাদা। পুরুষদের সঙ্গে নারীদের একসাথে চাকরি বা কাজ বড়ধরনের মানসিকতা ও উদারতার পরিচয় হলেও এধরনের মানসিকতা ও উদারতা যে ভেতরেভেতরে স্বভাবগত কারণে অনেক অঘটন ঘটায় সেগুলো কমবেশি সবাই বুঝে। তাই, সত্যিকারের রাজনীতিবিদ হতে হলে মনজয় করার জন্যে অন্ধভাবে কথা না বলে স্বভাবধর্মের ও বাস্তবতার নিরিখে বলতে হবে, কেননা অসংলগ্ন কথা ও বক্তৃতা জাতির জন্যে খুবই ক্ষতিকর। টেলিভিশনে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও খবর পড়ছে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঘোষিকার কাজ করছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরকে রাখা হচ্ছে। এটা কি সমানাধিকারের কারণে, না অন্যকোন কারণে? এটা যে সমানাধিকারের কারণে নয় তা নিশ্চয়ই সবাই অনুধাবন করছে। এটা অবশ্যই একারণে যে মহিলাদেরকে ভালো মানায়। মহিলাদেরকে ভালো মানানোর অর্থই হলো তারা আকর্ষণ করতে পারে। যারা আকর্ষণ করতে পারে তাদের নিশ্চয়ই আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের এ আলাদা বৈশিষ্ট্যটি এমন যে তা খোলামেলা প্রদর্শিত হলে অন্যরকম সাড়া জাগে। এটা সবাই বুঝে। তবে, কেউকেউ মুখ খুলে বলে আর কেউকেউ বলে না। এজন্যেই মহিলাদের পর্দা বলতে শালীনতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ছ

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতীত মাঝেমাঝে ভালো কাজের উদ্যম ও উদ্যোগ সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। এধরনের উদ্যোগ হচ্ছে চতুরতা ও জনগণকে আকৃষ্ট করার পন্থা। জনগণ এসব বুঝে; কিন্তু তাদের কিছুই করার থাকে না। সব সমস্যার সমাধান একএক করে পরিকল্পনার মাধ্যমেই করতে হয়। পরিকল্পনাবহির্ভূত পন্থায় যেকোন সমস্যাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে সমাধানের জন্যে কাজ করাটা পরিকল্পনার সাথে সাংঘর্ষিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দেশে ছোটবড় বহু সমস্যা আছে। এসব সমস্যা

www.pathagar.com

অগ্রাধিকারের বা প্রাধান্যের ভিত্তিতে সমাধান করার জন্যে পরিকল্পনার আওতায় আনতে হয়। এভাবে জাতীয় অগ্রগতি সাধিত হয় এবং জাতীয় ব্যয় সুসংহত হয়। জাতীয় ব্যয় সুসংহত করার মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতিসাধনের নীতি রাজনীতিবিদদেরকে জানতে ও বুঝতে হয়। অবস্থা বুঝে বা অবস্থার আলোকে ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হয়। অবস্থার আলোকে ব্যবস্থা না হলে ক্ষতিই হয় ও ব্যর্থতাই আসে, সফলতার মুখ দেখা যায় না। আমাদের এদেশ উন্নত নয়। আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেয়া। আমরা এটাকে আমাদের সংগতি, পরিবেশপরিস্থিতি ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল রেখে উন্নত করার প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ অপ্রতিহত বা অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের রাজনীতির ধারাও এরকম হতে হবে, কেননা উন্নয়ন ও রাজনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আমাদের রাজনীতির গতিপ্রকৃতির ও ধরনধারণের ওপরই নির্ভর করছে আমাদের উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি। অন্যদেশের ইঙ্গিতে বা ইশারায় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকলে উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকবে। এতে উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকবে, কেননা উন্নয়ন হচ্ছে একটি অবিরাম প্রক্রিয়া যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যতীত সম্ভব নয়। আমরা উন্নয়ন চেলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু, অন্যদেশের নির্দেশে আমাদের দেশের রাজনীতি চলতে থাকলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দিবাস্বপ্নের বিষয়ে রূপান্তরিত হবে। এব্যাপারে আমাদের সবার রাজনৈতিক সচেতনতার প্রয়োজন। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতীয় অগ্রগতির জন্যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় এবং এপরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজ সম্পাদিত হয়। পরিকল্পনাই স্থির করে কোন কাজ আগে ও কোন কাজ পরে হবে এবং কোন কাজ কখন কতোটুকু করতে হবে। পরিকল্পনার প্রতি কেয়ার বা তোয়াক্কা না করে নিজের গৌরবের ও ক্ষেত্রসৃষ্টি করার জন্যে কেউ ক্ষমতায় থেকে জায়গায়জায়গায় কোটিকোটি টাকার কাজের ঘোষণা দিলে পরিকল্পনা ভেস্তে যায় বা পণ্ড হয়, কেননা প্রয়োজনানুযায়ী গৃহীত পরিকল্পনা বাদ দিয়ে ঘোষিত কাজে বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা খরচ করতে হয়। এতে পরিকল্পনার সাথে বাস্তবতার সম্পর্ক নষ্ট হয় বিধায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং সব দোষ পরিকল্পনার ওপর চেপে যায়। পরিকল্পনার মাধ্যমেই সুষম বণ্টন ও সুষম উন্নয়ন সম্ভব। পরিকল্পনাকে অতিক্রম করে যেখানেসেখানে ক্ষমতার কারণে স্বার্থের দিকে তাকিয়ে যেসে কাজের ঘোষণা সুষম বণ্টন ও উন্নয়নের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। ঘোষিত কাজ অপরকল্পিত কাজ। পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত কাজ পাশাপাশি চলতে গেলে ক্ষমতার কারণে পরিকল্পিত কাজে ভাটা পড়ে এবং অপরিকল্পিত কাজ জোরদার হয় বিধায় দুর্নীতি ও আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্ট হয়। এসব কারণে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে তাদের ঘোষণার দ্বারা অপরিকল্পিত কাজ বাদ দিয়ে পরিকল্পিত কাজে আত্মনিয়োগ করতে

www.pathagar.com

হয়। সমন্বিত কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। যেসব কাজের মধ্যে সমন্বয়ের দরকার সেগুলো সমন্বয়হীনভাবে সম্পাদিত হলে জাতীয় ক্ষতি হয় এবং জনগণ দুর্গতির বা দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছি। শহরের যেকোন রাস্তা দিয়ে পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদির লাইন নিতে হয়। একেক সময় একেক লাইন নিতে গেলে রাস্তাটি বারবার কাটা হয়। এতে সরকারের বিপুল পরিমাণ টাকা অপচয় হয় এবং জনগণের কষ্ট ও ভোগান্তি বাড়ে। তাই, বিভিন্ন অফিসের সমন্বয়ের দ্বারা এসব কাজ একবারে হলে সরকারের বিপুল পরিমাণ টাকা বেঁচে যায় এবং জনগণকে ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয় না। এভাবে প্রতিটি কাজ সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হতে থাকলে সরকারের অনেক সমস্যার সমাধান অতিসহজেই হয়ে যায়। যেসব কাজে বিভিন্ন দিক জড়িত সেগুলোতে উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন দিকের সমন্বয়ের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। বিভিন্ন দিকের সমন্বয় বাদ দিয়ে হঠাৎ দু'একটা দিকে পরিবর্তন আনলে নানাধরনের জটিলতা দেখা দেয়। এতে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং জনগণ দুর্ভোগে নিপতিত হয়। ধারণা করা হচ্ছে যে, শিল্পোন্নয়নের জন্যে যেঋণ দেয়া হয় সেটার সুদের হার কম হলে শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এজন্যে আমানতকারীদের আমানতের ওপর সুদের হার কমিয়ে দিলে শিল্পোদ্যোক্তরা কম সুদে ঋণ পেয়ে শিল্পোলন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারবে। এটা করার পূর্বে সরকারকে দেখতে হবে যাতে শুধুশুধু ব্যাংকগুলো লাভবান না হয় ও শিল্পোদ্যোক্তাদের সুযোগসুবিধা বেড়ে না যায়, দ্রব্যমূল্য আনুপাতিক হারে কমতে থাকে এবং আমানতকারীরা মাঝখান দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সিদ্ধান্তহীনতা অগ্রগতি ও অগ্রযাত্রার পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা। সিদ্ধান্তহীনতা দু'কারণে আসে। একটি হচ্ছে কাজ না বুঝা এবং অপরটি হচ্ছে স্বার্থসিদ্ধি না হয়া। কেউকেউ কাজ না বুঝে সিদ্ধান্ত দিতে না পেরে সিদ্ধান্তহীনতাতে ভোগে এবং কেউকেউ কাজ বুঝেও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি না হলে সিদ্ধান্ত দিতে গড়িমসি বা টালবাহানা করতে থাকে। বড়বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো সরকারের উচ্চপর্যায়ে, যেখানে মন্ত্রীরা সংশ্লিষ্ট থাকে, গৃহীত হয়। তাই, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে প্রতিটি কাজ স্বচ্ছভাবে বুঝতে হবে এবং সর্বসময় সজাগ থাকতে হবে যাতে সিদ্ধান্তহীনতার কারণে জাতীয় অগ্রগতিতে ও অগ্রযাত্রায় কোনপ্রকার অন্তরায় সৃষ্ট না হয়। একটি কাজের সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অফিস সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। এরকম কাজে একেক মন্ত্রণালয় ও অফিস স্বতন্ত্রভাবে একেক সিদ্ধান্ত দিতে থাকলে শেষপর্যন্ত শুধু শ্রম নষ্ট ও অর্থের অপচয় হয়; কিন্তু কাজটি নিষ্পাদিত বা সম্পাদিত হয় না বিধায় ব্যক্তি ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্যে যেসব কাজের সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অফিস সংশ্লিষ্ট সেগুলোর ব্যাপারে বিচ্ছিন্নভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করার প্রতি ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। বহু

www.pathagar.com

সভা, সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এগুলোতে জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে। বাস্তবে এগুলো এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে এবং বাস্তবায়নের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কাজেই, আমাদের রাজনীতিবিদ এবং উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাদের কাজ হচ্ছে সময় অতিবাহিত করার জন্যে সভায়, সেমিনারে ও আলোচনায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলোকে কয়েক বছর ফাইলবন্দি রেখে পরে আগুন দিয়ে পোড়ানো বা মণ দরে বিক্রি করা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অফিসে বিভিন্ন সময় ও রুটিনমোতাবেক বিভিন্ন সভা হয় এবং এসব সভায় আলাপআলোচনা অন্তে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তাবলী গৃহীত হয়। বাস্তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কে পরবর্তীতে কার্যক্রম চালিয়ে যায়ার ওপর তেমনকোন প্রক্রিয়া বা প্রণালী থাকে না বিধায় প্রায় সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্তের পর্যায়ে থেকে যায় এবং আগের ও পরের কাজের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্ট হয় তা কাজের ধাবারাহিকতা নষ্ট করে এবং নানা অহেতুক বা অনর্থক ঝামেলার উদ্ভব হয় ও দুর্নীতির সুযোগ হয়ে যায়। কথায় বলে যে, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। যেকোন কাজ শুরু করার পূর্বে বিচারবিশ্লেষণ ও চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্তে বা মতে পৌঁছতে হয়। তা না করে বারবার সিদ্ধান্ত বা মত পাল্টাতে থাকলে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পাদিত বা সম্পাদিত হয় না এবং অহেতুক সময় ও শ্রম নষ্ট হয় ও বিরক্তিকর পরিবেশের উদ্ভব বা উৎপত্তি হয়। সিদ্ধান্তের সাথে তা বাস্তবায়নের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যেসিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় না সেটার কোন মূল্য নেই। প্রয়োজনের তাগিদেই সিদ্ধান্তের প্রশ্ন আসে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হলে প্রয়োজন যে মিটে না তা এমনিতেই বুঝা যায়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হয়ে প্রয়োজন না মিটলে সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশে বহু সমস্যা আছে। এসব সমস্যার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে সব সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়নের অভাব। সিদ্ধান্তের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ধারাবাহিকভাবে কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার ওপর নির্ভর করে। তাই, সমস্যা দূরীভূত করার মানসে বা উদ্দেশ্যে কোন সিদ্ধান্তই অবাস্তবায়িত অবস্থায় ফেলে রাখা ঠিক হবে না।

"Nurse the baby, protect the child and free the adult." এউক্তিটি হচ্ছে দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা সম্পর্কে। দুগ্ধপোষ্য শিশু, শিশু ও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় এসব প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনা করা হয়েছে। কোলের শিশুকে সেবাযত্ন বা শুশ্রূষা করতে হয়। সে সম্পূর্ণরূপে তার শুশ্রূষাকারীদের ওপর নির্ভরশীল। শুশ্রূষাকারীরা একইভাবে একই পদ্ধতিতে শুশ্রূষা করে। যখন শিশু নিজে চলার ও লয়ে খায়ার বয়সে উপনীত হয় বা পৌছে তখন তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হয়। এবয়সে তার ভালোমন্দের জ্ঞান থাকে না এবং কি করলে তার ভালো হবে ও কি করলে তার খারাপ হবে তা সে বুঝে না। এবয়সে সবকিছুই তার নিকট

www.pathagar.com

বরাবর ও সমান। কাজেই, এবয়সে সে ভালো খানা মনে করে তার নিজের পরিত্যক্ত মলো খেতে পারে এবং সুন্দর জিনিস মনে করে আগুনে পড়তে পারে। এঅবস্থায় তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হয়। যখন সে বুঝতে শুরু করে তখন থেকে সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়া পর্যন্ত তাকে খারাপ পথ পরিহার করে ভালো পথে চলার দীক্ষায় দীক্ষিত করতে হয়। প্রাপ্তবয়সে পৌছলে সে মুক্ত হয়। তার বুঝ না হয়ার বয়স পর্যন্ত সে যতো অপরাধই করে-না-কেন সেগুলোকে কেউ অপরাধ মনে না করে হাসির ব্যাপার মনে করে। এসময় সে মাতাপিতাকে চড় বা থাপ্পড় মারলে তারা হাসে। কিন্তু, তার বুদ্ধি হয়ার পর সে তাদের সাথে একটু কটুকথা বললেও তাদের দুঃখের সীমাপরিসীমা থাকে না। সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার মুক্তি সম্পূর্ণরূপে অবাধ হয় না। সে আইনশৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণাধীনে ওপর্যায় পর্যন্ত মুক্ত যেপর্যায়ে তার কারণে অন্যকেউ ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যকারো মুক্তির পথ অবরুদ্ধ হয় না। অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাধ্যমে চরমপন্থা ও বেকারত্ব দূর করার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে, এ ইংরেজী উক্তিটিকে কিভাবে বাস্তবে কাজে লাগানো যায় তা কিছুটা আলোচনা করা দরকার। শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নসংক্রান্ত প্রকল্পগুলোকে তাদের শৈশবাস্থায় সেবাযত্ন ও শুশ্রূষা করতে হবে। কোন শিশু তার শৈশবাবস্থায় সেবাযত্ন ও শুশ্রূষা না পেলে সে নির্ঘাত বা অবশ্যই মারা যায়। শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নসংক্রান্ত প্রকল্পগুলোও তাদের শৈশবাবস্থায় সেবাযত্ন ও শুশ্রূষা না পেলে নষ্ট ও বিনাশ হয়ে যায়। এগুলো স্বয়ং চলার পথে অগ্রসরমান পর্যায়ে এগুলোকে নিরাপত্তা দিতে হয়। এপর্যায়ে এগুলো যাতে এমন নীতি বা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারে যা গ্রহণ করলে এগুলো বিভিন্ন সংকট নিরাকরণ বা অতিক্রম করে প্রাপ্তপর্যায়ে উপনীত হয়ে জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান রাখতে ব্যর্থ হবে। প্রাপ্তপর্যায়ে এগুলো একেবারে মুক্ত থাকলে এগুলোর উৎপাদন একচেটিয়া হয় বলে এগুলো এগুলোর ইচ্ছা অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি ও হ্রাস করে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টিপাত ও ভ্রূক্ষেপ না করে বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই, এগুলোর কার্যক্রমকে জাতীয় অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল রেখে মুক্ত রাখতে হয়। এভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাধ্যমে চরমপন্থা ও বেকারত্ব দূর করার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে, এগুলো উক্ত ইংরেজী উক্তিটির যথার্থতা রক্ষা করতে পারে। তাই, রাজনীতিবিদদেরকে অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়, কেননা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিরূপণের ব্যারমিট্যার।

ব্যক্তি মালিকানায় কলকারখানায়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ও ব্যবসাবাণিজ্যে লাভ হয় এবং রাষ্ট্রীয় মালিকালানায় এগুলোতে শুধু লোকসান হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় লোকসানের কারণ হচ্ছে কর্তব্যে অবহেলা, উদাসীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অব্যবস্থা, আয়ের সাথে

www.pathagar.com

সামঞ্জস্যহীন ব্যয়, জিনিসপত্র কম দামে কিনে বেশি দাম দেখানো, উৎপাদিত দ্রব্য বেশি দামে বেচে কম দাম দেখানো, অনভিজ্ঞতা, হিসেবে হেরফের ও দুর্নীতি। ব্যক্তি মালিকানায় এগুলো সম্ভব হয় না, কেননা এগুলোর দায়ে বা অভিযোগে অভিযুক্ত হলে চাকরি হারাতে হয় এবং চাকরি হারিয়ে মালিকের বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত কিছু করার থাকে না। ভাবতে অবাক লাগে যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এগুলোর দায়ে অভিযুক্ত হয় না, হলেও চাকরি হারায় না এবং হারালেও সরকারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে পারে। সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রপরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। সরকার আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। কোন মালিক রাষ্ট্রপরিচালক ও নিয়ন্ত্রক নয়। সে আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে না। তার কর্তব্য হলো এগুলো মেনে চলা। অথচ, তার ক্ষেত্রে ক্ষতি হয় না এবং সরকারের ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়। এটা সরকারেরই অনুপযুক্ততা। কোন অনুপযুক্ত সরকার দেশের মঙ্গলসাধন করে দেশকে দিনের পর দিন ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে পারে না। সরকারের কাজ হচ্ছে আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে ও পক্ষপাতিত্বহীনভাবে সবকিছু পরিচালনা করা। এপরিচালনায় কে লাভবান হবে বা কে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা দেখার দায়িত্ব সরকারের নয়। সরকার এটা দেখলে আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতির আওতায় কাজ করতে ব্যর্থ হয় বিধায় কথিত অসুবিধাগুলো দেখা দেয় এবং কথিত অপরাধগুলো সংঘটিত হয়। সরকারের কাজ হচ্ছে আইনানুগভাবে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ও অগ্রগতি সাধন করা, আইনবহির্ভূত পন্থায় ব্যক্তিস্বার্থ ঠিক রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ নষ্ট করা নয়। তাছাড়া, কলকারখানায়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ও ব্যবসাবাণিজ্যে ক্ষমতাসীনদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হলে সেগুলোর ব্যবস্থাপনাতে দুর্নীতি ঢুকে পড়ে বিধায় সেগুলোতে ক্ষতিই হয়, কেননা ব্যবস্থাপনাতে নিয়োজিত ব্যক্তিরা জানে যে, ক্ষমতাসীনেরা তাদের সাথে আছে বিধায় তাদের কোন অসুবিধা হবে না। শ্রমিক ও কর্মচারীরা এটা প্রত্যক্ষ করে এবং কাজের প্রতি তাদের অনীহা ও নিস্পৃহতা দেখা দেয়। ফলে, তারা, যে যেভাবে পারে সে সেভাবে, লাভবান হয়ার প্রতিযোগিতায় লেগে যায় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এসব মারাত্মক ত্রুটি উপেক্ষা করে ক্ষতিকে কারণ হিসেবে দাঁড় করানো হয় এবং সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়। অপরদিকে, ক্ষমতাসীনদের হস্তক্ষেপের ফলে তাদের মদদপুষ্ট ব্যক্তিরাই কোটিকোটি টাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো লাখলাখ টাকায় ব্যক্তিমালিকানায় পেয়ে যায় এবং শেষপর্যন্ত সরকার সে লাখলাখ টাকাও পুরোপুরিভাবে পায় না।

গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী কোন দেশেই শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার পাচ্ছে না। কোথাও মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক নেই। তাই, শ্রমিকরা কোথাও শান্তিতে ও স্বস্তিতে নেই। ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার নামে যেসব

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্রের আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে সেসব দেশের শ্রমিকরা অশান্তির নরককুণ্ডে জ্বলেপুড়ে ভস্ম হচ্ছে। তারা কোন শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করতে, বিক্ষোভপ্রদর্শন করতে ও কোন প্রতিবাদসভা করতে পারছে না। তাদের কথা বলার কোন অধিকার নেই এবং 'টু' শব্দটি করারো কোন ক্ষমতা নেই। শ্রমিকরাজ কায়েমে প্রতিশ্রুত এসব দেশে পলিটব্যুরোর সদস্যদের সন্তানদের ও শ্রমিকদের সন্তানদের সুযোগসুবিধা সমান নয়। শ্রমিকদের অসন্তোষের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় ও হ্রাস পায়। বর্তমানে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিকের ব্যাপারে সচেতন। তারা বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের দাবি আদায় করতে পারে। কিন্তু, তারা তাদের সত্যিকার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তাদের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত আছে ইসলামে। ১৮৮৬ সনের ১লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরের 'হে' মার্কেটে ন্যায্য পারিশ্রমিকের জন্যে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ করায় বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে এদিনটি পালিত হচ্ছে। অথচ, প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলাম শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদার মূলনীতি দিয়ে দিয়েছে। ইসলাম শ্রমিক ও মালিককে একই নজরে দেখছে। মালিকেরা যা খায় ও পরে শ্রমিকদের সে অনুপাতে খাওয়াপরার ব্যবস্থার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে এবং তারা মালিকদের সাথে বসে খাওয়ার কথাও ইসলামে বলা আছে। তাদের প্রয়োজনানুযায়ী পারিশ্রমিক নির্ধারণের ও উৎপাদিত সম্পদ হতে তাদেরকে লভ্যাংশ বা লাভের অংশ দেয়ার বিধান ইসলামেই আছে। ইসলামী সমাজব্যবস্থার ও অনুশাসনের অভাবে এগুলো কার্যকর হচ্ছে না। শিল্পকারখানায় বিরাজমান সংঘাত ও শ্রমিক অসন্তোষ দূরীকরণার্থে ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়ন অপরিহার্য। শ্রমিকদের অধিকারপ্রতিষ্ঠার নামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যতোকিছুই করা হচ্ছে-না-কেন একমাত্র ইসলাম ব্যতীত কেউই শ্রমিকদের সাম্যের বাস্তব নজির বা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারেনি। বাংলাদেশে দু'শ্রেণীর লোকের মধ্যে একশ্রেণীর লোকের নিকট বিভিন্ন পথে অঢেল অর্থসম্পদ এবং তাদের বিলাসিতার ও আরামআয়েশের অন্ত নেই। এশ্রেণীটি ক্ষুদ্রতম। অপরশ্রেণীর লোকের কষ্টক্লেশের সীমাপরিসীমা নেই। এশ্রেণীটি বৃহত্তম। শ্রমিকেরা এ বৃহত্তম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তারা স্বচক্ষে দেখে যে, মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাদের সম্পদের অভাব নেই। তাছাড়া, সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কলকারখানাগুলোতে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তারা কিভাবে সুকৌশলে বা চমৎকার কৌশলের দ্বারা অগাধ সম্পদের মালিক হচ্ছে তা-ও তারা দেখছে। অথচ, তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরাচ্ছে। এ আকাশপাতাল বৈষম্য তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম দিচ্ছে। ফলে, তারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ও কলকারখানার উন্নতির কথা বিস্মৃত হয়ে আন্দোলনের পর

www.pathagar.com

আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সুষম বণ্টনের মাধ্যমেই উক্ত বৈষম্য দূর করা সম্ভব। এতে শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য হক পাবে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কলকারখানাকে তাদের নিজেদের মনে করে সুশৃঙ্খল পরিবেশে শ্রম দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না এবং মালিক ও পরিচালকদের বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়ার পথ অবরুদ্ধ হবে।

আমাদের টাকার অবমূল্যায়নই প্রমাণ করে যে, আমরা কতোটুকু উন্নত বা অনুন্নত। গত বিশ বছরে আমাদের টাকার মূল্য ৭৬ বার হ্রাস পেয়েছে। আমরা যে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারছি না এটাই তার বাস্তব প্রমাণ এবং এটা আমাদের সরকার, রাজনীতিবিদ, আমলা ও টেকনক্রেটদের অবদান। সবকিছু ঢাকাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। রাজনীতিবিদ, টেকনক্রেট, বড়বড় বিদ্বান ব্যক্তি, শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও আরো অনেকেই ঢাকা অরিয়েনটেড। এরা যে যেখানেই যায়–না–কেন ঢাকাই এদের সবকিছু। ফলে, ঢাকার দিকেই সবার দৃষ্টি। গ্রামোন্নয়নের জন্যে এদেরকেই সর্বপ্রথমে ঢাকাবিমুখী হতে হবে। এজন্যে বড়বড় অফিসআদালত ও কলকারখানা দেশের বিভিন্ন গ্রামে স্থাপন করাটা অপরিহার্য। রাজনীনিতিদেরা দেশকে ভালোবাসলে এ ঐকমত্যে পৌছতে হবে যে, আর কোন অফিসআদালত ও বড়বড় কলকারখানা ঢাকা ও বড়বড় শহরগুলোতে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এগুলোর জন্যে সব সুযোগসুবিধা সেখানেই সৃষ্টি করা হবে। চিকিৎসা আমাদের একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার। ধনী ও দরিদ্রদের একই রকম রোগ হলে একই ধরনের চিকিৎসার প্রয়োজন। অথচ, এচিকিৎসার ক্ষেত্রেও বিরাট বৈষম্য বিদ্যমান। সরকারী হাসপাতালের পাশাপাশি প্রাইভেট ক্লিনিক বিদ্যমান রয়েছে। গরীবেরা তাদের অসুখবিসুখে সরকারী হাসপাতাল পর্যন্ত ছুটে যেতে পারে। কিন্তু, সেখানে নানা কারণে চিকিৎসার সুব্যবস্থার অভাবে তাদের অনেককেই শেষপর্যন্ত ধুঁকেধুঁকে মরতে হয়। অপরদিকে, ধনীরা প্রাইভেট ক্লিনিকে অজস্র টাকা খরচ করে সুচিকিৎসা পেয়ে থাকে। এসব ক্লিনিক এদেশের ডাক্তারদের দ্বারাই পরিচালিত। তাই, ডাক্তাররা যাদের টাকা আছে তাদের সুচিকিৎসা করে থাকে। একটি মৌলিক চাহিদা হিসেবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এরকম একটি মারাত্মক বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে অমানবিক। জনগণকে এঅমানবিকতা হতে রক্ষা করতে হলে সর্বস্তরে চিকিৎসার জন্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাসস্থান জনগণের একটি মৌলিক অধিকার। মানুষের সব কর্মকাণ্ডই সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বসবাসের জন্যে। যেদেশে একদিকে মুষ্টিমেয় লোকের সুউচ্চ অট্টালিকা ওঠতে থাকে এবং অপরদিকে বাস্তুহারার সংখ্যা বাড়তে থাকে সেদেশ কখনো উন্নত হতে পারে না। আমাদের রাজনীতিবিদেরা দেখাচ্ছে যে, তারা দেশের অগ্রগতির জন্যেই তাদেরকে রাজনীতিতে নিয়োজিত করছে। সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সেটার দুর্নীতিমুক্ত বাস্তবায়নই দেশের উন্নয়নের প্রবেশপথ ও চাবিকাঠি। সবলদেরকে কমবেশি সবাই ভয় করে। যারা

www.pathagar.com

অন্যায়কে ঘৃণা করে তারা সবলদেরকে ভয় না করলেও তাদের ব্যাপারে নীরবতা পালনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যেহেতু দুর্বলেরা কোন ক্ষতি করতে পারে না বা কোন কাজে সফলতায় পৌঁছতে পারে না সেহেতু তাদের প্রতি ভয় ও প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকে না। তাই, সবলেরা দুর্বলদেরকে বিভিন্নভাবে জব্দ করে ও করার সুযোগ খোঁজে। দুর্বলেরা এভাবে বসে থাকে না। তারাও সবল হয়ার চেষ্টা চালায়। আস্তেআস্তে দুর্বলেরাও সবলদের সমকক্ষ হয়। এতে দুর্বল ও সবলদের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ চলতে থাকে। সংঘাত ও সংঘর্ষে দেশ ও জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। প্রত্যেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করলে সবল ও দুর্বলের প্রশ্ন আসে না। অথচ, সবলেরা যেকোনভাবে সর্বদা সবল থাকার মানসে অন্যকাকেও সম্মুখগামী হতে দিতে চায় না বিধায় সবল ও দুর্বল দু'টি শ্রেণী দাঁড়িয়ে যায় এবং এ দু'টি শ্রেণী সৃষ্টির ফলে দেশ ও জনগণের ক্ষতির জন্যে সবলেরাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী হয়ে যায়। তাছাড়া, প্রকৃতিগতভাবে দুর্বলেরা সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চায় না। বিভিন্নভাবে সবলেরাই তাদেরকে এগুলোতে লিপ্ত করে ফেলে। তাই, সংঘাত ও সংঘর্ষ এড়ানোর মুখ্য ভূমিকা সবলদেরকেই পালন করতে হয় এবং তারা সদা ন্যায়নীতিতে থাকলে দুর্বলেরা এমনিতেই তাদের সামনে টিকতে পারে না এবং স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রতি জনসমর্থন থাকে না। তবে, দুর্বলেরা ন্যায়নীতিতে থাকলে এবং সবলেরা জোরজুলুম, অসংগত দাবিদাওয়া, অসংলগ্ন কথাবার্তা, অবিচারঅত্যাচার ইত্যাদিতে ডুবে থাকলে জনগণ ক্রমান্বয়ে তাদের প্রতি আস্থা হারাতে থাকে এবং দুর্বলেরা যতোই সবল হতে থাকে তাদের প্রতি জনগণের আস্থা ততোই বর্ধিত হতে থাকে।

আমাদের কথায় ও বক্তৃতায় উন্নত দেশগুলোর কথা এসে যায়। আমরা উন্নত দেশগুলোর মতো উন্নত হতে চাই। এটা শুধু আমাদের মুখের কথা, কাজের কথা নয়। রাজনীতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি কোনটিতেই আমরা উন্নত দেশের মতো নই। এসব ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোকে অনুসরণ করা হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতো ও আইনের গতি অবরুদ্ধ হতো না। বাস্তবে আমরা এসব ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর ধারেকাছেও নেই। এসব ক্ষেত্রে আমরা অবর্ণনীয়ভাবে সেসব দেশের চেয়ে অনুন্নত। তবে, একটা দিক দিয়ে আমরা তাদের চেয়ে উন্নত। তা হচ্ছে অপকর্ম। বিপুল সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ, আমলা ও টেকনক্রেটরা পরস্পরের সাহায্যকারী। তারা জানে যে, নির্বাচনে টাকার খেলা না চললে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে সৎলোক প্রার্থী হবে ও নির্বাচিত হবে। ফলে, সম্পদশালীরা যথেচ্ছাচার চালাতে পারবে না এবং ন্যায়বিচার ও সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত হবে। তাই, বর্তমানে বাস্তবে সমাজে একদিকে রয়েছে পুঁজিপতি, শিল্পপতি, বড়বড় ব্যবসায়ী, প্রাইভেট ব্যাংকের মালিক, রাজনীতিবিদ, আমলা, টেকনক্রেট, দুর্নীতি করা যায় এমন

www.pathagar.com

পর্যায়ের বা সুযোগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, প্রতিষ্ঠিত এডভোকেট ও শিক্ষক ইত্যাদি এবং অপরদিকে রয়েছে কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষক, ছোটছোট ব্যবসায়ী, সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী, অত্যাচারিত ও নির্যাতিত লোকজন, ছিন্নমূল ও গৃহহারা মানুষ ইত্যাদি। এ অমানবিক বৈষম্য ন্যায়বিচার ও সুষম বণ্টনের পথে একটি বিরাট বাধা। এবাধা অপসারণ করে ন্যায়বিচার ও সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজন কর্মক্ষেত্রে একচেটিয়া ক্ষমতার বা অধিকারের বিলুপ্তি ঘটানো। কেউই একটি ক্ষেত্রের অধিক ক্ষেত্রে পদার্পণ করতে পারবে না। ফলে, অর্থসম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের বা ওপরে কথিত শ্রেণীটির হাতে পুঞ্জীভূত হতে পারবে না এবং তাদের যথেচ্ছাচারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই, যারা একটি ব্যাংক স্থাপন করেছে তারা অন্যকোন ব্যাংক স্থাপন করতে পারবে না এবং অন্যকোন পেশা গ্রহণ করতে পারবে না ও অন্যকোন কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করতে পারবে না। যে বা যারা একটি শিল্প স্থাপন করেছে সে বা তারা আর কোন শিল্প স্থাপন করতে পারবে না এবং অন্যকোন পেশা গ্রহণ করতে পারবে না ও অন্যকোন কর্মক্ষেত্রে কোনপ্রকার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যকোন কর্ম গ্রহণ করতে পারবে না এবং কোনপ্রকার ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পকারখানা নিজে বা অন্যকাকেও দিয়ে চালাতে পারবে না। তার অবসরগ্রহণের সময়ের অতিরিক্ত সময়, প্রাইভেট হলেও, ও অবসরগ্রহণের পর সে কোন চাকরি করতে পারবে না এবং তার চাকরির মেয়াদ কোনভাবেই বর্ধন করা যাবে না। একজন রাজনীতিবিদ একাধিক সুযোগ নিতে পারবে না। বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা একদিকে ক্ষমতাসীন থাকতে এবং অপরদিকে অন্যকিছুই, যেমন – শিল্প, কলকারখানা ইত্যাদি, চালাতে বা সেটাতে অংশীদারিত্ব রাখতে পারবে না। সংসদসদস্যরা ভাতাদি নিচ্ছে বিধায় তাদের কোন ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পকারখানা বা এগুলোতে কোন অংশও থাকতে পারবে না। এভাবে একজন বা কয়েকজন যেটাই হোক শুধু একটাই, এটার একটা ও সেটার একটা নয়, করবে। প্রাইভেট পর্যায়ে নিজেদের চলাচলের জন্যে একটির বেশি যানবাহন থাকতে পারবে না এবং বছরবছর যানবাহনের মডেল পরিবর্তন করা যাবে না। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা স্বস্ব ব্যবস্থায় অফিসে যাতায়াত করবে। সরকার থেকে লোন নিয়ে তারা বাইসিকল কিনে ব্যবহার করতে পারবে। মন্ত্রীদেরকেও সরকার কোন গাড়ি সরবরাহ করবে না, কেননা তারা জনপ্রতিনিধি ও তাদের ওয়াদামোতাবেক তাদের কাজ হচ্ছে জনগণের খেদমত করা। যাদের সামর্থ হবে তাদের কেউই একের অধিক বাড়ি নির্মাণ করতে পারবে না এবং এবাড়ির আকার ও আয়তন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত থাকবে। প্রতিটি কাজ সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনামোতাবেক হতে হবে। এতে কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হবে, অর্থসম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হবে না, বিলাসিতা চলবে না,

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতা চলবে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে, একজন অপরজনের দ্বারা নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হতে পারবে না এবং দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোরেরা শাস্তি এড়াতে পারবে না। এব্যবস্থায় সুবিচার ও সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত হবে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। মোদ্দাকথায়, মৃত্যু যেখানে অবধারিত অর্থ পুঞ্জীভূতকরণ সেখানে বোকামি ও অনর্থক। অর্থ বিলাসিতায় ব্যয় না করে জনগণের প্রয়োজনে ব্যয় করাটা যুক্তিযুক্ত, কেননা সম্পদশালী হোক আর সম্পদহীন হোক মৃত্যুর পর সবাইকে মাটির ভেতরে একই নিয়মে রেখে আসা হয় এবং কারো সাথে তার নিজস্ব আমল ব্যতীত অন্যকিছু যায় না। সম্পদ সম্পদশালীদের জন্যে একটি বিরাট পরীক্ষা। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে দেশোন্নয়নের কাজে সম্পদ সঠিক পন্থায় কাজে লাগিয়ে সেটার সদ্ব্যবহার করা, কেননা দেশের যেকোন কাজে তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ থেকে যাচ্ছে।

জ

আইনের শাসনই একটি রাষ্ট্রে শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নতি, অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রপতিসহ সব রাষ্ট্রপরিচালক আইনের সঠিক ও যথার্থ প্রয়োগ না করলে এবং এটার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও পূর্ণ আস্থাবান না থাকতে পারলে শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নতি, অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সমস্যাসৃষ্টির মূলে আইনের প্রতি, এটার অপপ্রয়োগের ফলে, জনগণের অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা কাজ করছে। এসব সমস্যার প্রতি একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে বা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এটা উপলব্ধি বা অনুভব করা যায়। আইনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করা ও অন্যায়ভাবে এঅধিকার হরণের তৎপরতাকে নস্যাৎ করা। আইনের সঠিক প্রয়োগের দ্বারা ন্যায় ও অন্যায়ের এবং অধিকার ও অনধিকারের মধ্যে পার্থক্য বজিয়ে রাখার পবিত্রতম দায়িত্বটি সরকারের। কিন্তু, সরকার, যেভাবেই হোক, এপার্থক্য ঠিক না রাখলে বা রাখতে ব্যর্থ হলে সেটার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আইন না মানার প্রবণতা অন্যান্যের মধ্যে সংক্রমিত হয়। ক্ষমতায় থাকলে আইনের প্রয়োগ একরকম হলে এবং ক্ষমতা চলে গেলে তার প্রয়োগ অন্যভাবে চেলে আইনের শাসন থাকে না। আইন হচ্ছে ন্যায়কে সমুন্নত রাখতে একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি। তবে, আইনকে পদ্ধতি না বলে আইন এজন্যেই বলা হয় যে, এপদ্ধতিটি অমান্য করলে শাস্তি পেতে হয়। আইনের নামে নিজের স্বার্থসিদ্ধি এবং প্রতিহিংসাচরিতার্থ করা হলে আইন ন্যায়প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি না হয়ে স্বার্থসিদ্ধি ও প্রতিহিংসাচরিতার্থ করার শাণিত বা ধারালো হাতিয়ারে পরিণত হয়। আইনের প্রতি জনগণের আস্থা নেই।

www.pathagar.com

চোরডাকাতদের বিচারের জন্যে জনগণ আইনের আশ্রয় নিতে অনিচ্ছুক ও নারাজ। জনগণ তাদেরকে ধরে নিজেরাই বিচার করতে চায়। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতির বিরুদ্ধে তারা মুখর ও সোচ্চার। দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের অর্থলিপ্সার রশি টেনে ধরে রাখা যাচ্ছে না। চালকেরা যানবাহন বিধিকে কেয়ার বা তোয়াক্কা করছে না। অথচ, দুর্ঘটনা এড়িয়ে জনগণের নিরাপত্তাবিধানের জন্যে যানবাহন বিধি প্রণীত হয়েছে। এআইনের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞাপ্রদর্শনের ফলে বহু মূল্যবান প্রাণের হানি ঘটছে। সব ব্যাপারেই বিধি প্রণীত আছে। কিন্তু, তা যথারীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে না বিধায় সেটার উদ্দেশ্য বিফলীকৃত ও ব্যাহত হচ্ছে। ফলে, সর্বত্র যে যেভাবে পারছে সে সেভাবে নিজের স্বার্থে বিধিবিধানকে পাশে রেখে দিয়ে কাজ করছে আর যারা এসব সুযোগ পাচ্ছে না তারা হচ্ছে বাস্তুহারা, সর্বহারা, দিনমজুর, খেতমজুর, শ্রমিক, চোরডাকাত, মস্তান ইত্যাদি। তবে, তারাও বসে নেই। তাদের মধ্যেও যে যেভাবে পারছে সে সেভাবে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছে। কোনপ্রকার যুক্তি ছাড়াই দুর্নীতিবাজ লোকেরা যা দাবি করে তা দিতে হয়। না দিয়ে উপায় থাকে না। কোনকোন দেশে পুরুষদের বলাৎকারের বা ধর্ষণের কারণে রাস্তায় বেরুতে পারে না বিধায় হাজারহাজার যুবতী বিক্ষোভপ্রদর্শন ও প্রতিবাদমিছিল করছে। আমাদের দেশেও নারীপুরুষের অবাধ বা বাধাহীন মেলামেশা শুরু হয়েছে এবং পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দিচ্ছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে পারিবারিক আইনসহ বিভিন্ন আইন আছে। এসব আইন প্রয়োগের পদ্ধতি সহজসরল হলেও আদালতে বিভিন্ন কারণে দীর্ঘসূত্রতার ফলে এগুলোতে সময়মতো সুষ্ঠু বিচার পায়াটা ভাগ্যের ব্যাপার হয়। তাছাড়া, নিরীহ ও অশিক্ষিতা মহিলারা ভয়ভীতির শিকার হয়ে কোন প্রতিকার পায় না। ভি, সি, আর,-এ, ব্লু ফিল্মস-এ, সিনেমায়, পত্রপত্রিকায় ও বইপুস্তকে নারীদেহের প্রদর্শনী চলছে। শহরের রাস্তায় কোরআনের আয়াতলিখিত বোর্ডের পাশাপাশি অর্ধনগ্ন নারীদের বোর্ড ঝুলছে। সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সিনেমা, সংগীত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ধর্মানুরাগীদেরকে হেয়প্রতিপন্ন বা অবজ্ঞার যোগ্য করে সমাজ থেকে ধর্মীয় ও মানবীয় মূল্যবোধ নষ্ট করা হচ্ছে। ক্ষমতা হারাবার ভয়ে এসবের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। আইন কার্যকর না থাকলে দুর্নীতি ও অসাধুতা সবকিছু গ্রাস করে ফেলে। দুর্নীতিপরায়ণ ও অসাধু ব্যক্তিরা আইনের অবাধ ও ত্রুটিমুক্ত গতিতে শাস্তি পেলে দুর্নীতি ও অসাধুতা কদাচিৎ সংঘটিত হবে। বাস্তবে এদের মধ্যে যারা সরকারের, অর্থাৎ যারা রাষ্ট্রপরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট, সাথে যোগাযোগরক্ষা করতে ও প্রচুর পরিমাণে অর্থ খরচ করতে পারে তাদের কোন শাস্তি ও কোনপ্রকার অসুবিধা হয় না। এতে এটা পরিষ্কার যে, রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা দুর্নীতিপরায়ণ ও অসাধু হলে, কেননা তারাই আইনপ্রণয়ন ও

www.pathagar.com

প্রয়োগের দায়িত্বে নিয়োজিত, তাদের ছত্রছায়ায় নিরাপদ আশ্রয়ে দুর্নীতিপরায়ণ ও অসাধু ব্যক্তিরা আইনের আওতা ডিঙিয়ে বা উল্লংঘন করে চলতে পারে। তাই, যারা আইনপ্রণয়ন করে আর যারা আইনপ্রয়োগ করে তাদেরকেই সর্বপ্রথমে আইন মেনে চলতে হয়। রাজনীবিদেরাই সাসংদ হয়ে আইন প্রণয়ন করে এবং যারা আইনপ্রয়োগ করে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা। তাই, যেসব রাজনীতিবিদ আইন অমান্য করে তাদের নীতি রাজনীতি নয়, ব্যক্তিস্বার্থে দুর্নীতি।

ক্ষমতাসীনদের পক্ষে কাজে আইন অমান্য করলেও যে কিছু হয় না সেটার দৃষ্টান্ত যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই পরিলক্ষিত হয়। এতে মনে হয় যে, আইন তাদের বিরুদ্ধে রচিত যারা ক্ষমতাসীনদেরকে সমর্থন দেয় না বা তাদের পক্ষে কাজ করে না এবং তা দলমতনির্বিশেষে অপরাধীদেরকে শাস্তিপ্রদান করার জন্যে নয়। রাজনীতিবিদদের ভুলে থাকা সমীচীন বা সংগত নয় যে, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং জনগণ যখন দেখবে যে, রাজনীতিবিদেরা আইন পুরোপুরি মেনে চলছে তারা তখন আইনের ও রাজনীতিবিদদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে আর শ্রদ্ধাই সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিকে বেগবান করে তোলে। কখনোকখনো আইনশৃঙখলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের সাথে অন্যান্যের সংঘর্ষে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের পক্ষে কাজ করে যেতে হয়। ক্ষমতাসীনদের প্রভাবে ও ভয়ে এবং এসুযোগে নিজেদের স্বার্থে তারা ক্ষমতাসীনদের সমর্থকদের পক্ষে কাজ করে। এতে সাধারণ মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস হারিয়ে ফেলে এবং ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদেরকে কারণেঅকারণে সমীহ বা সশ্রদ্ধ সংকোচ প্রদর্শন করে চলতে হয়। আইনের কাজ হচ্ছে অমঙ্গল প্রতিহত করে মঙ্গলসাধন করা। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলতে পারলেই তার পক্ষে একাজটি করা সম্ভব হয়। কারণেঅকারণে নানা অজুহাতে আন্দোলনের পর আন্দোলন চলতে থাকলে আইনের নিজস্ব গতি স্তব্ধ হয়ে যায় এবং সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করতে থাকে। এক আইনের আনুষংগিক ত্রুটি দূর করার জন্যে সেটা বাতিল করে আরো আইন প্রণয়ন করতে হয়। তাছাড়া, বহু আইন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হয়। কিন্তু, আইনের যেউদ্দেশ্য তা অর্জিত হয় না। এতে বহু আইন রচিত হচ্ছে এবং এগুলোর ব্যাখ্যাও দেয়া হচ্ছে। কিন্তু, কোনভাবেই লক্ষ্যার্জিত হচ্ছে না। কার্যকারিতা ব্যতীত যতো আইনই করা হয়-না-কেন কোন সুফল না এসে জটিলতাই বাড়ে। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কারোকারো বিরুদ্ধে মামলা করা না গেলে এবং কেউকেউ বিনা অনুমতিতে প্রয়োজনে দেখামাত্র গুলি করার আদেশ পেয়ে গেলে আইন সবার উর্ধ্বে হয় না এবং আইনের অনুশাসন থাকে না। আইনানুযায়ী শাস্তি দিলে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের পক্ষে তার বা তাদের সমিতি বা সংস্থা ঝামেলা সৃষ্টি করবে এবং নিরিবিলি ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে না বা ঝামেলা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে

www.pathagar.com

ক্ষমতা হারাতে হবে বলে আইন অমান্যকারীদেরকে শাস্তি না দিলে আইন ও সরকার থাকা বা না থাকা একই কথা হয় এবং সরকার বলতে যারা ক্ষমতাসীন তাদের জন্যে অকারণে দেশের জনগণের কোটিকোটি টাকা নষ্ট হয়। ক্ষমতাসীনদেরকে সর্বসময় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে ক্ষমতায় বসানো হয় না বা তারাও সর্বসময় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে ক্ষমতাগ্রহণ করে না। তাদেরকে আইন কার্যকর করার জন্যে ক্ষমতায় বসানো হয় এবং তারাও আইন কার্যকর করার জন্য ক্ষমতাগ্রহণ করে। তাই, যারা ক্ষমতাসীন হয়ে আইন কার্যকর করার কাজে মনোনিবেশ না করে ক্ষমতায় টিকে থাকার কাজে মনোনিবেশ করে তারা ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারিয়ে ফেলে।

আইন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব কোথাও তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে না। আইনকে উপেক্ষা করে বা এড়িয়ে সহজ পথে বিত্তশালী ও প্রভাবশালী হয়ার প্রবণতাই সর্বত্র সক্রিয়। আইনের সীমায় কেউ আবদ্ধ থাকতে চায় না, কেননা এটার সীমায় আবদ্ধ থাকলে অপ্রত্যাশিতভাবে সমৃদ্ধ হয়া বা ফুলেফেঁপে ওঠা যায় না। তাই, সর্বত্র আইন গৌণ এবং স্বার্থসিদ্ধি মুখ্য। এটা সম্পূর্ণরূপে একটি ওল্টা ব্যাপার। এটা এমন একটি ওল্টা ব্যাপার যে, সামনের দিকে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনে মুখ রেখে পেছনে হাঁটতে থাকা। পেছনে হাঁটতে থাকলে দুর্ঘটনা ঘটে, গন্তব্যস্থলে পৌছা যায় না। গন্তব্যস্থলে পৌছতে হলে সামনে হাঁটতে হয় এবং এতে দুর্ঘটনাও ঘটে না। মানুষের ধৈর্য ও সহনশীলতা থাকতে হয়। এগুলোর অভাবে অঘটন ঘটে ও অপরাধ সংঘটিত হয়। আইন হচ্ছে অঘটন ও অপরাধদূরীকরণের এবং অঘটনসৃষ্টিকারী ও অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্যে। সরকার আইনপ্রয়োগের দায়িত্বে নিয়োজিত। অঘটনসৃষ্টিকারী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনপ্রয়োগ না করে সরকার সহনশীলতা দেখালে সেটা সরকারের সহনশীলতা না হয়ে আইনের সহনশীলতা হয়। আইনে সহনশীলতার অর্থ হচ্ছে অঘটন ও অপরাধকে আশকারা বা প্রশ্রয় দেয়া এবং এগুলোর সাথে আপস করে এগুলো চলতে দেয়া। এতে নৈরাজ্য সৃষ্ট হয়, দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয় ও মানুষের জীবন দুর্বিষহ বা দুঃসহ হয়ে ওঠে। তবে, আইন যেখানে অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে অপরাধ দমনের জন্যে আইনে সেখানে সহনশীলতা, আপসকামিতা ও পক্ষপাতিত্ব বলতে কিছুই নেই। আইন স্বেচ্ছায় কিছু করতে পারে না। এটা প্রয়োগ করতে হয়। যারা এটা প্রয়োগের দায়িত্বে নিয়োজিত তারা সহনশীলতার নামে এটা প্রয়োগ না করলে তারাই দায়ী হয়ে যায়। কিন্তু, তারা যতোক্ষণ ক্ষমতায় থাকে ততোক্ষণ দায়ী হয় না বিধায় আইনের কার্যকারিতা থাকে না এবং তাদের সহনশীলতা সব অনাসৃষ্টির উৎস হিসেবে কাজ করে। তাই, রাজনীতিবিদেরা সহনশীলতার নামে আইনের চলার গতিতে প্রতিবন্ধতাসৃষ্টি না করাটাই সবার জন্যে হিতকর। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে আইনপ্রয়োগ করা। তারা যেআইন যেভাবে প্রয়োগ করার সেটা সেভাবেই

www.pathagar.com

করবে। তা না করে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী করলে আইনের কোন কার্যকারিতা থাকে না। ফলে, আইনের কার্যকারিতার পরিবর্তে ইচ্ছার ও নির্দেশের কার্যকারিতা এসে যায়। এজন্যে দেশ ও জাতি বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মধ্যে থাকে এবং ক্ষমতাসীনেরা ও তাদের সঙ্গীসাথীরা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ বা সফল করতে পারে। আইন তার নিজের গতিতে চলতে পারলে যার যেশাস্তি হয়ার হবে সেটা ভাবতে গেলে আইন নিরপেক্ষভাবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে কার্যকর করা যাবে না। অপরাধ অনুযায়ীই আইনপ্রয়োগ করতে হয়। অপরাধ নির্মম হলে আইনও নির্মমভাবে প্রয়োগ করতে হয়। নির্মম অপরাধের ক্ষেত্রে আইন নির্মম না হলে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং মুষ্টিমেয় অপরাধীর জন্যে জনসাধারণের অশান্তি বেড়ে যায়। যারা এভাবে আইনপ্রয়োগের পক্ষে থাকে না তাদের কি স্বার্থ থাকতে পারে? এপ্রশ্নের উত্তরে এটাই বলা যায় যে, তারা নিজেরাই আইনবহির্ভূত পন্থায় কাজ করে ও করায় বিধায় আইনের সময়োচিত সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত হয়াটা চায় না। সংসদে সব পেশার প্রতিনিধি থাকলেই যে জনগণের মঙ্গল হবে তা নয়। সংসদসদস্যদের কাজ হচ্ছে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় দেশের বিভিন্ন সমস্যার ওপর আলাপআলোচনা করা, আয়ব্যয়নির্ধারণ করা ও আইনপ্রণয়ন করা। বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি সম্পর্কে যুক্তি হচ্ছে যে, তারা তাদের স্বস্ব পেশাজীবীদেরকে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদের সমস্যাদি পর্যালোচনা করবে ও সেগুলো সমাধানের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন রচনা করবে। শুধু আইনরচনায় কোন সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যসমাধানের নিমিত্ত আইনের সময়োচিত বাস্তব প্রয়োগের প্রয়োজন। আইনপ্রয়োগকারীরা সৎ না হলে ও তারা সরকার কর্তৃক প্রভাবিত হলে এবং কেউকেউ আইনের আওতাবহির্ভূত ও উর্ধ্বে থাকলে কোন সমস্যার সামাধান হয় না, বরং অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় ও জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাই, রাষ্ট্রপতি হতে সবাই আইনের অধীনে হলে এবং আইনপ্রয়োগকারীরা সরকার কর্তৃক কোনভাবে প্রভাবিত না হলে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলতে পারে। ফলে, সব সমস্যার সমাধান হয় এবং সাংসদদের সংখ্যা বাড়ানোর কোন প্রয়োজন হয় না। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলতে না পারলে হাজারহাজার সাংসদ হয়েও কোন লাভ হবে না।

নিয়মই দিকভ্রষ্টতা হতে রক্ষা করে। নিয়ম হচ্ছে কর্মপদ্ধতি। প্রত্যেক কাজেরই নিয়ম বা পদ্ধতি আছে। অথচ, প্রায়ই শুনা যায় যে, নিয়ম মেনে কাজ করা যায় না। নিয়মের বিপরীত শব্দ হচ্ছে অনিয়ম। নিয়ম না মানলে অবশ্যই অনিয়ম হয়। তাই, নিয়ম মেনে কাজ না করা গেলে অনিয়মেই কাজ করা যায়। কিন্তু, অনিয়মটাই অপরাধ। অপরাধ কখনো মহৎ হতে পারে না। অপরাধ মহৎ হলে মহৎ হতে হবে অপরাধ। বাস্তবে কি তা সম্ভব? তাই, অনিয়মে কাজ হলে নিয়মের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে

www.pathagar.com

না এবং তা না থাকলে আইনকানুন ও বিধিবিধানেরো কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। যেখানে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা থাকে না সেখানে সরকার ও রাজনীতিরো প্রয়োজনীয়তা থাকে না এবং আদিমযুগ ও বর্তমান সভ্যযুগের মধ্যে পার্থক্য দূর হয়ে যায়। আমরা সভ্যযুগে বাস করছি। আমাদের সরকার ও রাজনীতি আছে। তাই, আমাদের আইনকানুন, বিধিবিধান ও নিয়মপদ্ধতি আছে। এগুলো পুরোপুরি মেনে চললে ব্যক্তিস্বার্থ ক্ষুণ্ন বা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ব্যক্তিস্বার্থের প্রাধান্যের কারণেই একথা বলা হয় যে, নিয়ম মেনে চললে কাজ হয় না। নিয়মতো কাজের জন্যেই। অনিয়মের কাজ প্রাধান্য ও প্রশংসা পেলে নিয়মমোতাবেক কাজ গৌণ হয়ে পড়ে। সবাই সর্বপর্যায়ে নিয়মানুযায়ী কাজ করলে কোথাও অনিয়ম হবে না বিধায় যেকাজ যখন হয়ার তখনই হবে। অপরদিকে, যতোক্ষণপর্যন্ত কেউ নিয়ম মানবে আর কেউ নিয়ম মানবে না ততোক্ষণপর্যন্ত এ ভুল ধারণা বলবৎ থাকবে যে, নিয়ম মেনে কাজ করা যায় না। তাই, রাজনীতিবিদদের, বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের, পবিত্রতম দায়িত্ব হচ্ছে সর্বপর্যায়ে নিয়মানুযায়ী কাজ করা এবং সবার দ্বারা নিয়মানুযায়ী কাজ করানো। তা হলে সবাই এটা বুঝবে ও বলবে যে, নিয়ম ব্যতীত কাজ হয় না। তবে, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে যেখানে নিয়ম পরিবর্তন ও সংশোধন করা প্রয়োজন সেখানে জরুরীভিত্তিতে তা করে নিতে হবে। পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত আইনানুগভাবে কাজ করলে সবাইকে সমভাবে খুশি করা যায় না। পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে বেআইনীভাবে কাজ করেও সবাইকে সমভাবে খুশি করা যায় না। তারপরো সবাইকে খুশি রাখার প্রচেষ্টাতে আইনহীনতা প্রকটভাবে দেখা দেয়। আইনহীনতার ফলে নৈরাজ্যের বা অরাজকতার সৃষ্টি হয়। নৈরাজ্যের মধ্যে দেশপরিচালনায় জনগণের ভোগান্তি চরম আকার ধারণ করে। তাই, পক্ষপাতিত্ব না করে আইনানুগভাবে কর্মসম্পাদনের ফলে যারা সন্তুষ্ট হয় সফলতার জন্যে তাদের সন্তুষ্টিই যথেষ্ট। যেসব দ্রব্যের কর ও শুল্ক বাড়ে সেগুলোর দাম বাড়ে এবং এটা জনসাধারণ মেনে নেয়। কিন্তু, কর ও শুল্ক না বেড়ে কমে গেলে দাম কমতে দেখা যায় না। জনসাধারণ এটা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। তাদের উপায়ান্তর বা অন্যউপায় থাকে না বলে তারা এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়। নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের। নীতিমোতাবেক দাম বাড়লে জনসাধারণ বাড়তি দাম দেয়। তাদের কোন প্রতিবাদ থাকলে তারা তা সরকারের নিকট করে বা করতে পারে। অপরদিকে, নীতিমোতাবেক দাম কমলে কম দাম নেয়ার দায়িত্ব উৎপাদনকারী ও বিক্রেতাদের। কিন্তু, তারা সেনীতি মানে না এবং জনগণো তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। অথচ, জনসাধারণ যেভাবে সরকারী নীতি মানে তাদেরো সেভাবে তা মানা কর্তব্য।

www.pathagar.com

তাদেরকে তা মানতে বাধ্য করানোর দায়িত্ব সরকারের। তাদের কোন প্রতিবাদ থাকলে তারা তা সরকারের নিকট করতে পারে। কিন্তু, জনসাধারণ যেভাবে সরকারী নীতি মানছে তারাও সেভাবে তা না মানলে জনগণের স্বার্থে সরকার তাদেরকে তা মানতে, প্রয়োজনে আইনপ্রয়োগ করে, বাধ্য করতে হয়।

কথাবার্তায় কেউই অনৈতিক কাজ চায় না। তবু, অনৈতিক কাজ হচ্ছে। অনৈতিক কাজ না চায়া সত্ত্বেও হচ্ছে বিধায় তা বন্ধ করার জন্যে ফলপ্রসূ বা সফলদায়ক পদক্ষেপের প্রয়োজন। অনৈতিক কার্যকলাপের কারণেই নানাবিধ অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। এসব অপরাধ দমনের জন্যে আইন যতো বাড়ছে অপরাধের প্রবণতাও ততো বাড়ছে। অপরাধ সামনে ধাবিত হচ্ছে। আইন পেছনে থেকে অপরাধকে ধাবিত করছে। কিন্তু, আইন কিছুতেই অপরাধকে ধরতে পারছে না বা অপরাধের নাগাল পাচ্ছে না। তাই, দেখা যাচ্ছে যে, আইনের বেগ ধীর এবং অপরাধের বেগ দ্রুত। এমন আইনের প্রয়োজন যেআইনের বেগ অপরাধের চেয়েও দ্রুত হবে। এআইনে অপরাধ পেছনে পড়বে, অর্থাৎ দৌড়ে পরাজিত হবে বা হেরে যাবে। এআইন রয়েছে আল্লাহপ্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ইসলামের মধ্যে। ইসলামী অনুশাসনে এআইন সমানে এগিয়ে আসবে এবং অনৈতিক কার্যকলাপের পথ অবরুদ্ধ হবে। কিন্তু, যারা একদিকে মুখে অনৈতিক কার্যকলাপের ঘোর বিরোধিতা করছে এবং অপরদিকে ইসলামী অনুশাসনের পক্ষে নয় তারা 'ইসলাম' রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালননীতি হতে বিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। জনগণের স্বার্থে সরকার নিয়ম করে, আদেশ জারি করে ও আইনপ্রণয়ন করে। বাস্তবে নিয়ম, আদেশ ও আইন তাদের স্বস্ব জায়গায় থেকে যায় এবং যারা এগুলো মেনে চললে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় তারা এগুলোকে গণায়ই আনে না। দু'একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করছি। সময়সময় সরকার বাসভাড়া নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু, বাসমালিকেরা এনির্ধারিত ভাড়ার প্রতি অঙ্গুষ্ঠ বা বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে স্বয়ং তাদের দ্বারা নির্ধারিত ভাড়া নিয়ে থাকে। এতে যাত্রীদের প্রতিবাদে তাদের কিছু যায়আসে না। কেউকেউ মন্তব্য করে যে, যাত্রীরা ঐক্যবদ্ধ হলে মালিকেরা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়া নিতে বাধ্য হবে। যাত্রীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কি করবে? তারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া দেবে না। এ নিয়ে ঝগড়াঝাটি ও মারামারিও হতে পারে। এঘটনাকে কেন্দ্র করে মামলামকদ্দমা ও হরতাল হতে পারে। পরিণামে বা অবস্থান্তরপ্রাপ্তিতে জনগণের ভোগান্তি বাড়ে এবং মালিকদের দ্বারা নির্ধারিত ভাড়াই প্রদান করতে হয়। তেলের মূল্য, যন্ত্রাংশের মূল্য, আমদানি শুল্ক ইত্যাদি হ্রাস করা হয়। কিন্তু, ভাড়াও কমে না, দামো কমে না, বরং

www.pathagar.com

বেড়েই চলে। যানবাহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা আছে। এআইন জেনেও শিক্ষিত লোকও দিব্যি সিগারেট টানতে থাকে। কিছু বললে মানইজ্জত হারানোর সম্ভাবনা থাকে। তাই, জনগণের স্বার্থে নিয়ম, আদেশ ও আইন কার্যকর করার চরম ও পরম দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। কার্যকর করতে না পারলে এগুলো করে এগুলোর অকার্যকারিতার সাথেসাথে সরকারকেও হেলাফেলার বা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের পাত্র বানানোটা কোন যুক্তির নিরিখেই সঠিক নয়। জনগণ এগুলোর কার্যকারিতার জন্যে পদক্ষেপ নিতে গেলে আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়া হয়। কিন্তু, আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার অধিকার কারো নেই। আইন কার্যকর করার এখতিয়ার সরকারের। তাই, সরকার যে নিয়ম, আদেশ ও আইন কার্যকর করতে পারবে না সেনিয়ম, আদেশ ও আইন করে জনগণকে দেখানোর চেয়ে না করাটাই ভালো।

জনগণ আইন মান্য করবে আর সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আইন অমান্য করবে – এটা হয় না ও হতে পারে না। আইনের চোখে সবাই সমান ও আইন সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োজ্য। আইনের এসমানাধিকার ও প্রযোজ্যতা বলবৎ থাকলে সবাই ভেদাভেদহীনভাবে তা মানতে বাধ্য থাকে। বাস্তবে আইনের উক্ত সমানাধিকার ও প্রযোজ্যতা বলবৎ নেই। কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আইনপ্রয়োগ করে এবং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে আইনানুযায়ী জনগণের কাজ করা। তারা যথাসময়ে আইনানুযায়ী কাজ করলেই আইন তার নিজগতিতে চলতে পারে এবং জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধশীল হয়। আইন হচ্ছে অশরীরী বা দেহহীন। এটার পা নেই যে এটা এটার নিজগতিতে চলবে। এটা এটার নিজগতিতে চলার অর্থই হচ্ছে এটা অনুযায়ী, কোনপ্রকার গড়িমসি ও বিরতি ব্যতীত, প্রতিটি কাজ নিষ্পাদন বা সম্পাদন করা। না চললেই হয় গতিহীন। আইন তখনই গতিহীন হয় সেটা অনুযায়ী যখন, গড়িমসি ও বিরতির কারণে, প্রতিটি কাজ নিষ্পাদিত বা সম্পাদিত হয় না। তাই, আইনের গতিহীনতার জন্যে আইন স্বয়ং দায়ী নয়। তার গতিহীনতার জন্যে দায়ী হচ্ছে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যারা তাকে প্রয়োগের কাজে আজ্ঞপ্ত বা আদিষ্ট। গড়িমসি ও বিরতির দ্বারা আইনের গতিরুদ্ধ করাটা আইন অমান্য করার শামিল বা তুল্য। এঅমান্যতা সবকিছু ঘোরালো, জটিল ও ঘোলাটে করে তোলে। ফলে, আইন তার নিজগতি হারিয়ে ফেলে। আইনের গতিরোধ আইন অমান্যতার চেয়েও দুর্দান্ত ও ভয়াল। আইনের গতি শুধু সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা রুদ্ধ হয় না, রাজনীতিবিদদের দ্বারাও হয়ে থাকে। উক্ত পন্থায় যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং রাজনীতিবিদ আইনের গতিরোধ করে তাদেরকে স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে যথাবিহিত বা নিয়মানুযায়ী শাস্তি প্রদান করলে জনসাধারণের মধ্যে আইন

www.pathagar.com

অমান্যতার বা লংঘনের প্রবণতা বহুলাংশে উবে যাবে বা বাতাসে মিলে যাবে। এজন্যে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে সর্বতোভাবে আইন মেনে চলতে হয় এবং আইনের গতি অবরুদ্ধ বা প্রতিরুদ্ধ না হয়ার নিমিত্ত অতন্দ্র ও অনলস প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হয়। যা আইনসিদ্ধ নয় তা-ই বেআইনী। বেআইনী কোনকিছু সংঘটন করাটাই অপরাধ আর অপরাধের বিভিন্ন ধরন আছে। বিভিন্ন অপরাধী বিভিন্নধরনের অপরাধ সংঘটন করে। অপরাধগুলোর চুলচেরা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণ করলে অর্থসামর্থ ও যৌনস্পৃহা অপরাধ সংঘটন করার দু'টি প্রধান কারণ হিসেবে উদ্ভাসিত ও প্রদীপ্ত হয়। এ দু' প্রধান কারণকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য কারণগুলো আবর্তিত ও গুণিত বা পূরিত। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, মারামারি, হানাহানি, খুনযখম, রক্তারক্তি, ক্ষমতার জন্যে দ্বন্দ্ব, লড়াই, ঘুষ, দুর্নীতি, ছিনতাই, মস্তানি ইত্যাদি অপরাধের পেছনে ক্রিয়া করে অর্থসামর্থের প্রয়োজনীয়তা, লোভলালসা ও মোহাবিষ্টতা। নারীবিরক্তি, অপহরণ, হত্যা, নির্যাতন ও বলাৎকার বা ধর্ষণ এবং অস্বাভাবিক যৌনাচার সংক্রান্ত অপরাধগুলোর পেছনে যৌনস্পৃহা ক্রিয়া করে। এ দু'কারণ বিদূরিত বা দূরীভূত করার জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে সুষম বণ্টন এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে যেসীমারেখা আছে তা লংঘন না করার পদ্ধতিগুলোর বাস্তবায়ন। যেসব রাজনীতিবিদ সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করতে এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে নির্ধারিত সীমারেখার পদ্ধতিগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে তাদের রাজনীতিই সার্থক রাজনীতি। তাই, রাজনীতিবিদদের রাজনীতির মুখ্য অভীপ্সা বা অভিপ্রায় হতে হবে রাজনীতিকে সার্থকতাতে রূপান্তরিত করা। এটার জন্যে অপরিহার্য হচ্ছে সুষম বণ্টন এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমারেখা অলংঘনীয়তাসম্বলিত একটি ম্যানিফেস্টো যা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদদেরকে হতে হবে দৃঢ়প্রত্যয়ী।

যাতে কেউ তার খেয়ালখুশি মতো কোনকিছু না করতে পারে সেজন্যেই নিয়মকানুন। নিয়মকানুন না থাকলে শুধু নিজের সুবিধার দিকে দেখেই কার্যসম্পাদন করাটা স্বাভাবিক। এস্বাভাবিকতা বাস্তবে অস্বাভাবিকতা। অস্বাভাবিকতা পরিহার করে স্বাভাবিকতার পরিবেশের জন্যে নিয়মকানুন। তারপরো যারা ক্ষমতার বা অন্যকোন কারণে নিয়মকানুনের ধার না ধেরে কাজকর্মসম্পাদন করে তাদের অনেকেই নিয়মকানুনকে ব্যঙ্গ করে 'পোকাবাছা' বা 'ব্যাকরণের রীতিমানা' বলে। তাদের মতে 'পোকা বেছে' বা 'ব্যাকরণের রীতি মেনে' কোন কাজ করা যায় না। বাস্তবে নিয়মকানুন মানলে তারা যেভাবে তাদের স্বার্থে কাজ করতে চায় সেভাবে তা করা যায় না। কেউ নিয়মকানুনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা তাকে ধমকের সুরে বলে, "রাখুন আপনার নিয়মকানুন। পোকা বাছা বাদ দিন। লিখতে পারলে লেখাই ব্যাকরণে পড়বে।" এসব কথা সাধারণত ক্ষমতাসীনদের মুখ দিয়ে বের হয়। নিয়মকানুন পোকাবাছাও নয়,

www.pathagar.com

ব্যাকরণো নয়। কর্মসম্পাদনে নিয়মকানুনের সাথে পোকাবাছার ও ব্যাকরণের কোন সম্পর্ক নেই। একদিকে ক্ষমতার অহংকারে বা সুবিধার কারণে নিয়মকানুন না মানা এবং অপরদিকে এগুলোকে নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করা বা রসাত্মক কথা বলা কোন বিবেকবান লোকের পক্ষে অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয়। যারা বিভিন্ন অজুহাতে ও ছলছুতায় নিয়মকানুন মানে না তারা যে তাদের নিজস্ব স্বার্থে তা করে তাতে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, কেননা নিরপেক্ষতার ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের একমাত্র উপায় হচ্ছে নিয়মকানুন। তাই, নিয়মকানুন অক্ষরেঅক্ষরে মানার ও এগুলোর ব্যাপারে কোনধরনের ব্যঙ্গ না করার প্রতি সবাইকে, বিশেষতঃ ক্ষমতাসীনদেরকে, সুদৃঢ় সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। ওপরের দিকে প্রয়সব গুরুত্বপূর্ণ কাজই আকস্মিক ও জরুরীভাবে চায়া হয় এবং করানো হয়। এতে যে অনেক সময় বিধিবিধান ও নিয়মকানুন উপেক্ষিত হয় তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেকাজে নিয়মকানুন উপেক্ষিত তাকে বাস্তবমুখী কাজ বলা যায় না। আমাদের প্রতিটি কাজ হতে হবে বাস্তবমুখী। কাজেই, কাজ আকস্মিক বা জরুরী যা-ই হয়-না-কেন তা অবশ্যম্ভাবীরূপে নিয়মকানুনমোতাবেক করতে হবে। তা না হলে যথেচ্ছাচার বিদ্যমান থাকবে ও দুর্নীতি চলবে।

আইন ও নিয়ম মানুষের উপকারের জন্যে, অপকারের জন্যে নয়। একটি আইনে বা নিয়মে বহুলোক উপকৃত হতে পারে। কোন লোক কোন আইনে বা নিয়মে উপকৃত হলে সেআইনে বা নিয়মে, দৃষ্টান্ত হিসেবে, আরো লোক উপকৃত হবে বিধায় তাতে ওলোককে উপকৃত হতে না দিলে আইনের বা নিয়মের প্রতি চরম অবমাননা হয় এবং মানুষ আইন ও নিয়মের প্রতি আস্থা হারিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়। মানুষকে আইনের উপকারিতা না দিয়ে সেটার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও হতাশাগ্রস্ত করা কোন কর্তৃপক্ষের উচিত নয়। তাছাড়া, আইনে বা নিয়মে প্রাপ্য উপকারিতা না দিলে আইনপ্রণয়ন বা নিয়মনির্ধারণ না করে কর্তৃপক্ষ যখন যেটা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী করবে তখন সেটাই আইন বা নিয়মরূপে পরিগণিত হবে। কোন ভুল বানান বা বাক্য ব্যবহৃত হতেহতে তা শুদ্ধই মনে হয় এবং কেউ শুদ্ধটি বললে সেটাকেই অশুদ্ধ মনে হয় এবং সেটাই যে শুদ্ধ তা প্রমাণ করতে তাকে বইপুস্তক, ব্যাকরণ ও অভিধানের আশ্রয় নিতে হয়। বর্তমানে, ওল্টাপাল্টা কাজকর্ম করতেকরতে ওল্টাপাল্টা কাজকর্মই একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, কেউই ওল্টাপাল্টা না করলে সবকিছুই সঠিক হতে বাধ্য এবং সঠিক হয়াটাকেই নিয়মে পরিণত করতে হবে। কোনকোন সময় কোনকোন অপরাধ ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে না হয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে বা অজ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। তাই, অপরাধের উপাদান ও উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখতে বা বিবেচনা করতে হয়। ফলে,সৎব্যক্তি এবং দুর্নীনিমুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অহেতুক ঝামেলা ও অস্থিরতা

www.pathagar.com

হতে মুক্ত থেকে উদ্দীপনার সাথে জাতীয় স্বার্থে কাজ করে যেতে পারে। এমনকোন কাজ নেই যেটার নিয়ম ও পদ্ধতি নেই। প্রত্যেক কাজের জন্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োজিত আছে। তাই, যার যেকাজ সে নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী তা করে গেলে কোথাও কোন সমস্যার উদ্ভব হতে বা কোন সমস্যা থাকতে পারে না। যেকোন কারণেই হোক-না-কেন প্রায়সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী যথাসময়ে কাজকর্ম নিয়ম ও পদ্ধতিমোতাবেক করছে না বিধায় সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্ট হচ্ছে আর আমরা পুরো জাতি সমস্যার আবর্তে ঘোরপাক খাচ্ছি। আদিম সমাজে কোন সরকার ছিলো না। তাদের মধ্যে রেওয়াজ বা প্রথা ছিলো। তারা আপনাআপনি রেওয়াজ মেনে চলতো। বর্তমানে, আমাদের সরকার ও আইনকানুন আছে। তবু, আমাদের সমাজব্যবস্থা অব্যবস্থার দিক দিয়ে আদিম সমাজকে করুণভাবে হারিয়ে দিয়েছে। তাই, এটাও বলা যাচ্ছে না যে, আমরা আদিম সমাজের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আমরা এমন একপর্যায়ে পৌছেছি যা আদিম সমাজের লোক দেখতোতো আঁতকে ওঠতো। সাধারণত নিজেদের সুবিধার্থে নিয়মের এদিকওদিক করা হয়। এতে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ হয় এবং জাতীয় স্বার্থ বিসর্জিত হয়। এমনো নিয়ম আছে যেটার একটু এদিকওদিক করলে সেটার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অসুবিধা না হয়ে দেশ ও সরকারেরই সুবিধা হয়। এক্ষেত্রে যে নিয়মটির এদিকওদিক করতে চায় তার কাজের পথে নানা ঝামেলা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় এবং নিয়মের অপলাপ বা খেলাপ করা যাবে না বলে সব মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এককথায়, সেনিয়মেরই এদিকওদিক করা হয় যেনিয়মে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ হয় ও দেশের ক্ষতি হয় এবং ওনিয়মেরই এদিকওদিক করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় যেটার এদিকওদিক করলে ব্যক্তিস্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় না ও সরকারের বেশ সুবিধা হয়। তাই, যার নিয়মের এদিকওদিক করাতে কাজ ভালো হয় ও সরকারের কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়ে সাশ্রয় বা ব্যয়লাঘব হয় তাকেই নিয়মের এদিকওদিক করতে দিতে হবে এবং তার নিয়মের এদিকওদিক করাটা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। সে যেনিয়মটির এদিকওদিক করবে পরবর্তীতে তা তার প্রয়োজনে এদিকওদিক করা অনুযায়ী সংশোধন করে নিতে হবে। যেকোন প্রতিকার বিলম্বিত হয়াটা ঠিক নয়। প্রতিকার প্রদান করতে বিলম্ব বা দেরি করলে ন্যায্যতা নষ্ট হয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিচারক এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে হলেও প্রতিকার সাথেসাথে প্রদান করলে জনগণ আইন ও নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং অন্যায়অবিচার বেশ বা যথেষ্ট কমে যাবে। আইনের কলাকৌশল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের হাতে। তারা তাদের সুবিধার জন্যে কোন্ সময় কোন্ আইনে বা নিয়মে কোন্ কৌশল কোন্ দিকে কিভাবে খাটাবে তা ভালোভাবে বুঝে ও জানে। তাই, তাদের বেআইনী বা অনিয়মতান্ত্রিক কাজে তাদের মুখোমুখি হয়ে আইনের

www.pathagar.com

মারপ্যাঁচে পড়ে কষ্টের ভয় আছে। আইনের যথাসময়ে যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এভয় দূরীভূত করার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে অন্যান্য রাজনীতিবিদের সহযোগিতায় ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের।

কোনকোন সময় সদাশয় ও সহানুভূতিশীল হয়ে ছোটমোট অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়। বাস্তবে বহু ছোটমোট অপরাধ হয়ে থাকে। ছোটমোট অপরাধ থেকেই বড়বড় অপরাধের জন্ম হয়। তাই,কাকেও তার অপরাধের শাস্তি হতে অব্যাহতি দেয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে না। কেউই কোন নিয়ম মানছে না। যারা নিয়ম ভঙ্গ করে তাদের কিছু যায়আসে না, বরং সুবিধাই হয়। নিয়ম না মানাতে জনগণরেই ভোগান্তি হয়। বিভিন্ন এলাকাতে, নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ব্যতীত, যখনতখন বিদ্যুপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। কোনকোন অসহায় ও প্রতিবাদে অক্ষম এলাকায় প্রতিরাত, প্রতিদিনতো আছেই, তিনচারবার, প্রতিবারে কমপক্ষে একঘণ্টা করে, বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ রাখা হয়। অথচ, কখন কোন্ এলাকায় কত সময়ের জন্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ থাকবে তা পত্রিকায়, রেডিওতে ও টেলিভিশনে আগেভাগে জানিয়ে দেয়াটাই পরিষ্কার নিয়ম। কিন্তু, তা করা হচ্ছে না। এব্যাপারে জনগণের কিছুই করার নেই, কেননা তারা কোথাও কোন প্রতিকার পায় না। তাদের মধ্যে কেউকেউ প্রতিকারের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে গিয়ে নানাভাবে জব্দ হয় এবং এজব্দতাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পুরো সমর্থন তাদের জানা কারণেই থেকে থাকে। এভাবে একটিএকটি করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বাস্তবে নিয়মরীতির প্রতি সংশ্লিষ্ট সবাই বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করছে। বড়বড় কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে খরচসংক্রান্ত কাজগুলো জরুরীভিত্তিতে সম্পাদন করতে হয়। এতে অনেক নিয়ম উপেক্ষিত হয়। তারা যে এটা বুঝে না বা জানে না তা নয়। কিন্তু, তারা এটাকে কিছুই মনে করে না। একারণে অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সুযোগে নিয়মবহির্ভূত পন্থায় কাজকর্ম করতে ও করিয়ে নিতে ইতস্তত করে না বা দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। এতে শৃঙখলা বিঘ্নিত হয়, ভুলবুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং সরকারের ক্ষতি হয়। কোন বেআইনী কাজই না হয়ার কথা। কিন্তু, বাস্তবে অনেক বেআইনী কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এবং অনেক আইনসিদ্ধ কাজ হতেও যথেষ্ট সময় লাগে ও যাদের এসব আইনসিদ্ধ কাজ তাদেরকে অনেক হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। এতে এটা পরিষ্কার যে, টাকাপয়সা খরচ করলে বেআইনী কাজো হয়ে যায় আর তা না করলে আইনানুগ কাজো সহজে হয় না। তাই, আইনানুগ কাজ পেতে হলেও প্রায়ক্ষেত্রেই টাকপয়সা খরচ না করে পারা যায় না। আইনানুগভাবে কাজ পায়ার জন্যে প্রতিবাদ করে শত্রু হতে হয়। যার সাথে প্রতিবাদ করার হয় সে একভাবে–না–একভাবে জব্দ করার জন্যে ফাঁক বের করার কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। আমরা আধুনিক সভ্যজগতে বসবাস করছি। সভ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে আইনানুগভাবে প্রতিটি কাজ নিষ্পন্ন হয়া এবং কেউ কারো নিকট ধর্না না দেয়া

www.pathagar.com

ও হয়রান না হয়া। কিন্তু, আমাদের দেশে আমাদেরকে আমাদের আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক কাজ পেতে হয়রানির শিকার হতে হয় এবং প্রায়সব কাজই তাদের নিজেদের গতিতে সম্পাদিত হতে পারে না। এটাকে সভ্যতার সংকট ব্যতীত আর কি বলতে পারি। তাই, আমরা আমাদেরকে সভ্য দাবি করেও সভ্যতার সংকটে নিমজ্জিত আছি। সেদিনই আমরা এসংকট উত্তরণ করতে পারবো যেদিন প্রতিটি কাজ তার নিজগতিতে আইনানুগভাবে ও নিয়মমোতাবেক সম্পাদিত হতে পারবে এবং কেউ কারো কাছে ধর্না দিতে ও হয়রান হতে হবে না।

শান্তি ও সাম্য হচ্ছে মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য। এদুটো ছাড়া সব উন্নতি ও প্রগতি নিরর্থক বা অর্থহীন। তাই, উন্নতি ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শান্তি ও সাম্য। অশান্তি ও অসাম্যের পথ খোলা রেখে শান্তি ও সাম্য আশা করা যায় না। এগুলোর জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে আইনের অনুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থা। ভালো করার জন্যে নিয়মের একটু এদিকওদিক হলেও ধরা হয় ও তিরস্কার করা হয়। কিন্তু, নিয়ম ঠিক রেখে রাতকে দিন করলেও কোন অসুবিধা হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করছি। ঠিকাদারকে দিয়ে দ্রব্যসামগ্রী কেনালে সাধারণত সেগুলোর গুণগতমান ভালো হয় না এবং দামো অনেকবেশি দেখানো হয়। অপরদিকে, এগুলো নিজেরা কেনলে গুণগতমান ভালো হয় এবং সরকারের বহু টাকা সাশ্রয় হয়। অথচ, বিল পাসের সময় নিজেরা কেনাকাটার ক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গের কারণ দেখিয়ে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়। কাজেই এনিয়ম নির্ধারণ করতে হবে যে, যেনিয়মের এদিকওদিক করলে সরকারের স্বার্থসিদ্ধি হবে সেটার এদিকওদিক করাটা ব্যতিক্রম হিসেবে গৃহীত হবে। দিবালোকে প্রকাশ্যভাবে খুন করেও খুনীরা রেহাই পেয়ে যায়। এসব খুনীরা বুক ফুলিয়ে বলতে শুনা যায় যে, টাকার জোর থাকলে হত্যা করেও রক্ষা পায়া যায়। তাই, শুধু আইনের ফাঁকে হত্যাকারীরা রক্ষা পায় না, টাকার জোরে আইনে ফাঁক সৃষ্টি করেও তারা রক্ষা পেয়ে যায়। আইনের আশ্রয় নিয়ে সহজে কোন প্রতিকার পায়া যায় না। বেআইনী কাজ ও দুর্নীতি এতো প্রকট ও পরিব্যাপ্ত যে, কোন লোক আইনানুগভাবে জীবনযাপন করতে চেলে তাকে প্রায়ক্ষেত্রে ও ব্যাপারে আইনের আশ্রয় নিতে হয়। যেহেতু আইনে যথাসময়ে কোন প্রতিকার ও নিরাপত্তা পায়া যায় না সেহেতু সব কাজকর্ম বন্ধ রেখে তাকে কোর্টকাচারিতে ও আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পেছনে ছুটাছুটি করে জীবন সাঙ্গ করতে হয়। তার জীবনই সাঙ্গ হয়; কিন্তু সে তেমনকোন প্রতিকার রেখে যেতে পারে না। অপরদিকে, সে মামলাবাজ ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়, কেননা সমাজের লোকজন আইনকানুনের দিকে না ঝুঁকে দুর্নীতি ও বেআইনী কার্যকলাপের সাথে তাল মিলিয়ে জীবনযাপন করে। এমনো দেখা যায় যে, দুর্নীতির প্রত্যক্ষ ঘটনা নিয়ে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন কোর্টকাচারিতে

www.pathagar.com

ও আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রতিকার পায়া যায় না এবং যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সার্বিক স্বার্থে অগ্রসর হয় তারাই নানাভাবে নাজেহাল বা নাস্তানাবুদ হয়। অপরদিকে, যারা দুর্নীতিতে জড়িত তারা কোর্টকাচারিতে ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার নিকট ভালোই থেকে যায় এবং তাদের অবস্থান থেকে তাদেরকে কেউই টলাতে পারে না। এতে জনগণের এটা বদ্ধমূল ধারণা যে, যারা দুর্নীতি দমন করবে তারা, কোর্টকাচারি ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা দুর্নীতিপরায়ণ। দেশ ও জনগণ আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ার জন্যে প্রত্যেকেই যথাসময়ে আইনের আশ্রয়ে প্রতিকার পায়াটা সরকার সুনিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না এবং দুর্নীতি ও আইনবিরোধী কার্যকলাপ লাগামহীনভাবে চলতে থাকবে। এতে সব দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারী, হাকিমবিচারক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী এবং ব্যক্তি যথেচ্ছাচার চালিয়ে যাবে এবং সাধারণ লোক দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে থাকবে। আইনপ্রয়োগের দায়িত্ব সরকারের। সরকারের পক্ষে কোর্টকাচারি, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এটা প্রয়োগ করে থাকে। এটার অপপ্রয়োগের জন্যে তারাই দায়ী। এটা অপপ্রয়োগ করলে আইনশৃঙখলা পরিস্থিতি পর্যুদস্ত হয়, দুর্নীতি চলতে থাকে, অপরাধের পর অপরাধ সংঘটিত হয়, বিভিন্নধরনের অপকর্ম বা কুকর্ম চলতে থাকে ও সন্ত্রাসি তৎপরতা বিস্তৃতিলাভ করে। এসব প্রতিহত করার জন্যে আইনপ্রয়োগের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদেরকে সরকার কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এজন্যে সরকারকে জনগণ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে সাথেসাথে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে কোন নমনীয়তা বা শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না। এককথায়, যারা আইনপ্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট তারা দুর্নীতিমুক্ত থাকলে ও ন্যায়নিষ্ঠ হলে উক্তধরনের অপরাধগুলো খুবকমই সংঘটিত হবে। তাই, বাস্তবতার নিরিখে দেখলে দেখা যাবে যে, শেষপর্যন্ত সব অপরাধ ও অশান্তির জন্যে সরকার ও যারা আইনপ্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট তারাই দায়ী।

আইন হচ্ছে বাধ্যবাধকতার অদ্বিতীয় হাতিয়ার। বাধ্যবাধকতাই প্রত্যেককে তার গতিপথে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে সক্ষম। বাধ্যবাধকতা অতিক্রান্ত হলে শাস্তি পেতে হয়। যেনিয়ম ও পদ্ধতি অনুবর্তন বা অনুসরণ করে শাস্তি দিতে হয় তাই আইন। তাই, স্বভাবত মানুষ আইনকে ভয় করে না। তারা শাস্তিকে ভয় করে। আইনানুযায়ী শাস্তি না হলে আইন উপেক্ষিত হয় এবং বাধ্যবাধকতা অকার্যকর হয়ার কারণে কাগজেকলমে ও কথায় নিয়ন্ত্রণ থাকলেও বাস্তবতায় তা দৃষ্টিগোচর হয় না। সুষম বণ্টনের কার্যকারিতার অবিদ্যমানতার কারণে, বাধ্যবাধকতা লংঘিত হয়া সত্ত্বেও আইনানুযায়ী শাস্তি এড়িয়ে যায়ার সুযোগ থাকায়, নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা, উদাসীনতা, অনাগ্রহ, অবহেলা, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা, দীর্ঘসূত্রতা, খামখেয়াল ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। সব

www.pathagar.com

স্থবিরতা ও নিষ্ক্রিয়তার উর্ধ্বে সুষম বণ্টন প্রণালীসম্মতভাবে প্রাণবন্ত থাকলে নিয়ন্ত্রণে কোনপ্রকার অসাধুতা ও অনান্তরিকতা থাকতে পারে না বলে বাধ্যবাধকতা লংঘিত হলে আইনানুযায়ী শাস্তি এড়িয়ে যায়ার কোন সুযোগই থাকে না। তাই, তখনই আইনকে ভয় পায় যখন দেখে যে, বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণের দ্বারা আইনানুযায়ী সুষম বণ্টনের ধারায় ও পদ্ধতিতে সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। অধিকন্তু, আইন ও নিয়ম অনুযায়ী সবকিছু চলতে থাকলে প্রত্যেকের কাজের ও চলার গতি অক্ষুণ্ণ থাকে বিধায় কারো বড়ভাব ও কারো ছোটভাব, অর্থাৎ যেকোনধরণের ভাব, থাকতে পারে না এবং যে যেস্তরে বা পর্যায়েই থাকে-না-কেন তার মানসম্মান ঠিকই থাকে, অর্থাৎ কারোরই ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না। প্রকৃতপক্ষে, কোন মানুষই চায় না যে, তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হোক। নিয়ম, বিধি ও পদ্ধতি পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত হতেহতে এতোবেশি জটিল হয়ে আছে যে, এগুলো যার যেভাবে সুবিধা সে সেভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। এতে সহজে ও নিরাপদে দুর্নীতি করা যাচ্ছে। এগুলো হতে হয় সহজসরল। কিন্তু, এগুলোর সরলীকরণ নেই। এগুলোর জটিলতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন কোথাও তেমনকোন প্রতিকার পায় না এবং যারা ক্ষতি করে তারা দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষতি হতে রক্ষা পায়ার জন্যে আবেদনকারীদের আবেদননিবেদনকে দলিতমথিত করিয়ে বিজয়ীর বেশে বুক ফুলিয়ে ও মাথা উঁচু করে গর্বের ও দাম্ভিকতার সাথে চলে। আইনের সাথে এগুলোর সমন্বয় থাকলে, অর্থাৎ এগুলোমোতাবেক কর্ম নিষ্পাদিত না হলে এগুলোর আওতায় কার্যক্রম গৃহীত না হয়ে আইনমোতাবেক কার্যক্রমগ্রহণের ব্যবস্থা থাকলে, এগুলোর উদ্দেশ্য সফল হবে। এগুলোর সাথে আইনের সরাসরি সম্পর্ক না থাকার কারণে বিভিন্নভাবে কোটিকোটি টাকা আত্মসাৎ করেও উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তমোতাবেক এগুলোর আওতায় থেকে গিয়ে এসব আত্মসাৎকৃত টাকা নিজেদের করে রাখতে সক্ষম হয় এবং মুচকি হাসি দিয়ে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে। সুবিচারের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্যে এগুলোর সরলীকরণ ও এগুলোর সাথে আইনের প্রত্যক্ষ ও সরাসরি সমন্বয়সাধনের গুরুত্ব অপরিসীম।

কেউকেউ রাজনীতিতে ইসলাম আছে কি নেই তা বুঝতে চায় না। তারা চায় যে, ঘুষ ও দুর্নীতি থাকবে না, ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজরা নিশ্চিহ্ন হবে, যখন যেকাজ যেনিয়মে ও যেপদ্ধতিতে হয়ার হয়ে যাবে, সুবিচার সুনিশ্চিত থাকবে, কোনক্রমেই বিচার প্রহসনে বা অসারতায় পরিণত হতে পারবে না, সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত থাকবে, অত্যাচার ও ব্যভিচারের লেশমাত্র বা নামমাত্র থাকতে পারবে না, বেকারত্ব থাকতে পারবে না, শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনপ্রকার বৈষম্য চলবে না, নারীদের শালীনতা ক্ষুণ্ন হতে পারবে না, সন্ত্রাস ও মস্তানি থাকবে না, কোন ব্যক্তির কোন কাজ

কোথাও নানা অজুহাতে আটকে থাকতে পারবে না, নৈতিকতা ধ্বংস হতে পারবে না, অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটবে না, কারো ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগবে না, যেশিক্ষা দ্বারা নৈতিকতা, দেশপ্রেম, সহমর্মিতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবিকতা বৃদ্ধি পায় তা জোরদার হবে এবং ভালো কোনকিছুই শুধু কথা, লেখা ও বক্তৃতাতে সীমাবদ্ধ না রেখে কার্যকারিতায় রাখতে হবে। তবে, তারা স্থিরচিত্তে কোরআন ও হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখবে যে, এসব ইসলামের মধ্যেই নিহিত বা রক্ষিত আছে। কালাকানুনের বিরুদ্ধে প্রায়সবাই সোচ্চার। কালাকানুন হচ্ছে এমন একটি অন্যায় আইন যেটার আওতায় সরকার রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপে নিয়োজিত দেখিয়ে যেকোন লোকের বিরুদ্ধে কার্যক্রমগ্রহণ করতে পারে। ফলে, এআইনের আওতায় মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। সাধারণত সরকারই কালাকানুন প্রয়োগ করে থাকে এবং বিরোধী দলগুলো এটার বিরোধিতা করে থাকে। কিন্তু, বাস্তবে যখন যে বিরোধী দল ক্ষমতায় আসে তখন তারা বিরোধী দল থাকা অবস্থায় তাদের একানুনের বিরোধিতার কথা ভুলে গিয়ে এটা প্রয়োগ করতে কোনপ্রকার ইতস্তত করে না। তাই, এটা অস্বীকার করার কোন জো বা সুযোগ নেই যে, একানুন ক্ষমতাসীন দলের একটি অনন্য ও মোক্ষম হাতিয়ার এবং বিরোধী দলগুলোর জন্যে মরণফাঁদ। এককথায়, যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগে দেখা যাচ্ছে যে, একানুন মঙ্গলজনক নয়। অথচ, ক্ষমতাসীন দল একানুন পরিহার করে চলতে পারে না। এসব কারণে এমন একটি বিকল্প কানুনের প্রয়োজন যেটাতে ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতাপ্রয়োগে কোন অসুবিধা হবে না, বিরোধী দলগুলোর জন্যে কোন মরণফাঁদ থাকবে না এবং জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো ক্ষুণ্ন হবে না। একানুনটি হচ্ছে আল্লাহ্‌প্রদত্ত কানুন। ক্ষমতার অপব্যবহার স্বয়ং একটি আইন হতে পারে না। যারা ক্ষমতায় থাকে তারা তা অপব্যবহার করলে স্বজনপ্রীতি ও নানাপ্রকার অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যেও ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে। অপরাধের আকার বড়ও হতে পারে, ছোটও হতে পারে। অপরাধের আকার ও প্রকৃতি অনুযায়ীই অপরাধের নামকরণ করা ও শাস্তি নির্ধারিত আছে। কারো ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে তার দ্বারা যেঅপরাধটি সংঘটিত হয় তার বিরুদ্ধে সেঅপরাধের ধারা অনুযায়ী আইনত অগ্রসর হতে হয়। কারো ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে তার দ্বারা কোন নিয়ম লঙ্ঘিত হলে সেনিয়ম অনুযায়ীই তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হয়। সর্বোপরি, ক্ষমতার অপব্যবহার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যেকোন কারণে হতে পারে। তবে, কারণটি জ্ঞাত কি অজ্ঞাত তা নির্ভর করে প্রথা বা প্রচলিত নিয়ম ও উদ্দেশ্যে বা অভিপ্রায়ের ওপর। নিয়ম লঙ্ঘিত হলে নিয়মমোতাবেক এবং আইন লংঘিত হলে আইনমোতাবেক অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু, দুর্নীতি দমন আইনে "ক্ষমতার অপব্যবহার" ব্যাপকভাবে একটি অপরাধ। ফলে, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কোন

www.pathagar.com

নিয়ম লংঘিত হলেও এঅপরাধের আওতায় ফেলে নাজেহাল করা হয়। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কোনকোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে এটা একটি মোক্ষম সুযোগ। এরকম আরো আইন আছে যেগুলো আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কোনকোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এবং অনেককে অকারণে ঝামেলার জালে আটকিয়ে ফেলে। সৎকর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ব্যক্তিদের জন্যে এসব অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাকর ব্যাপার হয়। তাই, অচিরেই এসব আইন বাতিলপূর্বক এমন আইন প্রণয়ন করা উচিত যেআইনে প্রকৃত অপরাধীরা অব্যাহতি পাবে না এবং সৎকর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং লোকেরা দুঃখজনক ও লজ্জাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে না।

ঝ

মানবরচিত আইনে ফাঁকের সুযোগে সত্য মিথ্যায় ও মিথ্যা সত্যে পরিণত হয়। ফলে, বিচার প্রহসনে পরিণত হয়। এধরনের বিচার মানবজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। কখনোকখনো টাকার বিনিময়ে বা চাপের কারণে অপরাধী খালাস পেলে অপরাধীদের ঔদ্ধত্য বা উদ্ধত আচরণ বেড়ে যায় এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে। বিচারকেরা দেশের কোষাগার থেকে বেতন পায়। বিচারের মাধ্যমে দেশের সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের। মানুষ বিভিন্ন অপকৌশলের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে সরকারের সম্পদ নিজেদের সম্পদ দাবি করে মামলা দায়ের করে। এসব সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা সরকারের পক্ষে কাগজপত্র ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করে প্রতিযোগিতা না করার কারণে সরকারের বিপক্ষে রায়ে সরকার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে বিচারকদের যে কিছু করার নেই তা নয়। তারাও দেশের লোক এবং দেশের কোষাগার হতে বেতন নেয়। তাই, দেশের মঙ্গল ও সম্পদরক্ষার্থে তাদেরও দায়িত্ব আছে। তারা দাবিদারদের দাখিলকৃত কাগজপত্র দেখেও বুঝতে পারে যে, বস্তুত তাদের দাবিকৃত সম্পদের প্রকৃত মালিক কে। কিন্তু, তাদের কেউকেউ সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে সরকারের পক্ষে মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা না করার বিষয়টিকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী, তাদের জানা কারণে, বড় করে দেখে এবং সরকারের বিপক্ষে রায় দেয়। আইনের ফাঁকে এরকম রায়ে তাদের কোন অসুবিধাই হয় না। সরকারের পক্ষে সরকারী সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা বিচারাচারে সঠিকভাবে প্রতিযোগিতা না করলে এবং সরকার তা হতে বঞ্চিত হলে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থার বিধান থাকা সত্ত্বেও তাদের কারো কোন

www.pathagar.com

অসুবিধা হয় না বিধায় তারাও তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের বিনিময়ে সরকারী স্বার্থ বিসর্জন দেয় এবং কোর্টকাচারিতে সরকারী সম্পদ রক্ষার জন্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন সেগুলো করে না। জাতীয় সম্পদরক্ষার্থে রাজনীতিবিদদেরকে এব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আসামীরা বাদীদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করে ও হত্যা করার হুমকিও দিয়ে থাকে। তবে, কোনকোন বিচারকের আল্লাহ্‌ভীতির অভাবে ও বিচারকার্যপরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতার কারণে এসব হয়ে থাকে। মহানবী (সঃ) বলেছেন যে, যেজাতি ন্যায়বিচারকে উপেক্ষা করে তার ভাগ্যে ধ্বংস অনিবার্য। মানবরচিত একচোখো ও পক্ষপাতদুষ্ট আইন ও নিয়মের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়ে মানবতার ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। এআইনের ব্যর্থতাজনিত সমস্যাবলী পূর্বপশ্চিম ও উত্তরদক্ষিণ সবদিককেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই, সঠিক পথের দিশা পেতে হলে সবার দায়িত্ব হচ্ছে সর্বজ্ঞানের অধিকারী মহান আল্লাহ্‌ মহানবীকে মিরাজের রজনীতে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে সর্বকালের মানুষের কল্যাণে যে শাশ্বত বা চিরন্তন বিধান দিয়েছেন সেবিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। দিন যতো যাচ্ছে মানুষ ততো প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠছে। কেন যে প্রতিশোধপরায়ণতা এতো বৃদ্ধি পাচ্ছে তা কমবেশি সবাই বুঝে। প্রত্যেক মানুষের শরীর রক্তমাংসের। একজন চায় না যে অপরজন তার প্রতি অন্যায় করুক। তারপরো তার প্রতি অন্যায় হলে সে সেটার প্রতিকার পেতে চায়। প্রতিকার না পেলে সে নিজেই প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা তার মনের কোঠায় ঠাঁই দিয়ে রাখে এবং সুযোগ পেলেই তা করে। একজন খুন হলে সরকার খুনীকে খোঁজ করে বের করে মৃত্যুদণ্ড না দিতে পারলে যাদের লোক খুন হয় তারা যে খুন করে তাকে না পেলে তার যেকোন লোককে সুযোগ পেলে খুন করে প্রতিশোধ নিতে চায়। এককথায়, মানুষ যতোই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের মধ্যে ততোই প্রতিশোধপরায়ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেউ কাকেও, আইনের যেসব ব্যতিক্রমের কথা বলা আছে সেগুলো ব্যতীত, হত্যা করলে তার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। জায়গায়জায়গায় কিছুকিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসক আছে। তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতাতে যারা বাধার কারণ হয় তারা তাদেরকে সময়সুযোগে নির্মমভাবে হত্যা করতে কিছুই ভাবে না। প্রায়সময়ই সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে তারা মামলা হতে অব্যাহতি বা খালাস পেয়ে যায়, কেননা যারা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ দেবে তাদের গ্যাং-এর সদস্যরা তাদেরকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবে। হত্যাকারীকে, ইসলামের দৃষ্টিতে, খুঁজে বের করার দায়িত্ব সরকারের। বিচারে একজন হত্যাকারী প্রমাণিত না হলে অন্যকেউ-না-কেউ হত্যাকারী প্রমাণিত হবে এবং তাকে রাষ্ট্রই খোঁজ করে বের করতে হবে। তা না হলে খুনীর ও তার গ্যাং-এর সদস্যদের ভয়ে তার বিরুদ্ধে কেউই সাক্ষ্য দেবে না বিধায় সে খালাস পাবে এবং গর্বের সাথে খুন করতে থাকবে। তাই, যারা সন্ত্রাসী তৎপরতায় খুনী হিসেবে চিহ্নিত তাদেরকে এবং তাদের

www.pathagar.com

গ্যাং-এর অন্যান্য সদস্যকে খোঁজ করে বের করে, দেশে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা ও শান্তিশৃঙ্খলার প্রয়োজনে, ইসলামী আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দিলে সন্ত্রাসী তৎপরতা ও সন্ত্রাসীদের দ্বারা নিরীহ লোকজন হত্যা বন্ধ হবে।

প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, ধোঁকাবাজি, জালিয়াতি, ঘুষ, দুর্নীতি, অনৈতিকতা ইত্যাদি এমন প্রকট যে কেউ কাকেও বিশ্বাস করতে পারছে না, অর্থাৎ বিশ্বাসহীনতার মধ্যে কাজকর্ম চলছে। এবিশ্বাসহীনতার মধ্যে জীবন, ইজ্জত, সম্পদ ও শালীনতা রক্ষার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই, বিশ্বাসহীনতার সাথে সংযুক্ত হয়েছে নিশ্চয়তাহীনতা। বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা গেলে নিশ্চয়তাও পুনরুদ্ধার হবে। তবে, ন্যায়বিচার ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে কথিত অন্যায় কাজগুলো না হতে থাকলে বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা পুনরুদ্ধার হবে। যারা সত্যিকারের বিচারপ্রার্থী প্রয়োজনে পুলিশ তাদের নিরাপত্তাবিধান করতে হয়। কিন্তু, বাস্তবে কোথাকোথাও দেখা যায় যে, কোনকোন পুলিশ প্রত্যক্ষভাবে অন্যায়কারী ও অপরাধীদেরকে পাহারা দিয়ে রেখে তাদের অন্যায় ও অপরাধের ভিত মজবুত করে তারা যে অপরাধী নয়, বরং নির্দোষ, তা প্রমাণ করে দিতে চায়। এতে সাধারণ লোক হতভম্ব ও হতোদ্যম হয় এবং অন্যায়কারী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে নিরুৎসাহবোধ করে। এসব অন্যায়কারী ও অপরাধীদের অজস্র টাকাপয়সা থাকে। তাই, তারা তাদের ভিত ঠিক রাখার জন্যে অজস্র টাকাপয়সা খরচ করে। এরকম খরচের দ্বারা তারা কোনকোন কর্তৃপক্ষ থেকে লেখার মারপ্যাঁচের মাধ্যমে তাদের পক্ষে প্রতিবেদন দেয়াতে পারে। যাদের নিকট প্রতিবেদন দেয়া হয় তারা এমারপ্যাঁচ বুঝে। তবুও, তাদের কেউকেউ এমারপ্যাঁচটাই গ্রহণ করে নেয়। ফলে, অন্যায়কারী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগভাবেও বিচার পায়াটা একটি দুষ্কর ব্যাপারে পরিণত হয়। বলতে কেউই খারাপ বলে না। সবাই ভালো বলে। অথচ, বাস্তবে খারাপ দিকটাই দেশ ও সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যারা খারাপ করছে তারা তাদের খারাপ দিকটাকে আড়ালে রাখার জন্যে ভালো বলছে। একদিকে ভালো বলে অপরদিকে খারাপ করার প্রবণতাটা বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। খারাপ করে টিকে থাকতে পারার কারণেই উক্ত প্রবণতাটা বেশি। খারাপ লোক যথাসময়ে যথোচিত শাস্তি পেতে থাকলে এপ্রবণতা হ্রাস পাবে এবং যারা ভালো বলে তারা খারাপ কোন কাজে পা বাড়াতে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করবে। সত্যকথা বলতে কি, সে-ই ততো শ্রেষ্ঠ আইনজীবী যে সত্যকে যতোবেশি মিথ্যা ও মিথ্যাকে যতোবেশি সত্য বানাতে পারে। আইনজীবীদের থেকে হয় বিচারক ও বিচারপতি। আইনজীবীরা আবার বুদ্ধিজীবীও। তারা আইনের মাধ্যমে বুদ্ধি বিক্রি করে। তারাই রাজনীতিতে,

www.pathagar.com

বলতে গেলে, মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রতিকার ও বিচারের জন্যে একআইন ও নিয়মের পর আরেকআইন ও নিয়ম প্রণয়ন ও নির্ধারণ করা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে একটাকিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার ও জনগণকে বুঝ দেয়ার ব্যবস্থা। প্রতিকার ও বিচারের জন্যে বাস্তবে অতো আইন ও নিয়মের প্রয়োজন নেই। আইনপ্রয়োগকারীরা, পুলিশ হোক বা বিচারক হোক, ও নিয়মবাস্তবায়নকারীরা, কর্মকর্তা ও কর্মচারী হোক বা প্রতিনিধি হোক, যথাসময়ে নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্তভাবে আইনপ্রয়োগ ও নিয়মবাস্তবায়ন করলে প্রতিকার ও সুবিচার সুনিশ্চিত হয়ই। অনিয়মে চললে কোন অসুবিধা নেই। এতে কোন অসুবিধা হলে অনিয়মের মাধ্যমেই তা দূর করা যায়। যতোসব বিপদ নিয়ম মেনে চললে। নিয়ম মেনে চলে অনিয়মে কোনছিুই করা যায় না বলে কোন কারণে কোন নিয়মমান্যকারী কোন অসুবিধায় পড়লে তাকে তাতে হাবুডুবু খেতে হয়। অনেকেরই মন অন্যায় প্রতিহত করার জন্যে স্পৃহয়াল বা স্পৃহাযুক্ত। কিন্তু, তারা বাস্তবে তাদের এস্পৃহার প্রতিবিম্বন বা প্রতিফলন ঘটাতে পারছে না, কেননা সর্বত্র অন্যায় ও অবিচারের প্রবলতা বিদ্যমান। এপ্রবলতার মুখোমুখি হয়ে ন্যায় ও সুবিচারের জন্যে সংগ্রাম করাটা দুঃসাহসিক ব্যাপার। এদুঃসাহসিকতার দৃষ্টান্ত বিরল। ন্যায় ও সুবিচার কায়েম হতে থাকলে এবিরলতা বিলীন হয়ে যাবে বা লুপ্ত হবে। তাছাড়া, মানুষ যখন দেখবে যে, ন্যায় ও সুবিচারের জন্যে আগুয়ান বা অগ্রসর হয়ে নানাভাবে অন্যায় ও অবিচারের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত না হয়ে যথাযথভাবে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করা যায় তাদের মধ্যে তখনই অন্যায় ও অবিচার প্রতিহত করার স্পৃহা তেজোময় হবে। কোর্টে বাদী ও বিবাদী স্বয়ং তাদের মামলা ঠিকঠাকভাবে তুলে ধরতে পারে না বিধায় তারা উকিল নিয়োজিত করে। বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের উকিলই জিততে চায়। এতে কোনকোন মামলায় উকিলদের আইনের ফাঁক ধরে যুক্তিতর্কের কারণে সত্য মিথ্যা এবং মিথ্যা সত্য হয়ে যায়। বাদী ও বিবাদী তাদের স্বস্ব উকিলের নিকট প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করে থাকে। তাই, উকিলেরা জেনেশুনেই সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বানায়। প্রকৃতপক্ষে, উকিলদের কাজ হচ্ছে তাদের মক্কেলদের সবকিছু কোর্টে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে তুলে ধরা এবং কোর্টকে ন্যায়বিচার করতে সততার সাথে সহযোগিতা করা। উকিলেরাও তাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী। এককথায়, আমরা সবাই ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী। উকিলেরা শিক্ষিত, জ্ঞানীগুণী, আইনে পারদর্শী ও বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্ভুক্ত। তারা কোর্টে সত্য উদ্ভাসিত হয়ার জন্যে কাজ করলে এবং তা উদ্ভাসন ও উদ্দীপনে কোর্টকে সততা ও আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করলে লোকজনের মধ্যে অন্যায়অবিচার ও অপরাধ করার প্রবণতা বিদূরিত হবে। তাই,

www.pathagar.com

উকিলেরা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য না বানানোটাই সুবিচার কায়েম করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা অপরাধীদেরকে আটক করে এবং কোর্ট–আদালতে তাদের বিচার হয়। যেহারে অপরাধীদেরকে ধরা হয় সেহারে তাদের শাস্তি হলে সমাজে খুবকমসংখ্যক অপরাধী পায়া যাবে। কিন্তু, দিনদিন অপরাধীদের সংখ্যা বাড়ছে। এটার কারণ হচ্ছে যে, একদিকে অপরাধীরা ধৃত হচ্ছে এবং অপরদিকে তারা বের হয়ে আসছে। ধৃত হয়ে বের হয়ে আসা পর্যন্ত তাদের অনেক টাকা খরচ হয়। এখরচ ওঠানোর জন্যে তারা অপরাধসংঘটনে আরো দুর্ধর্ষ বা প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে এবং এটা তাদের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, টাকা দিয়ে সবকিছু করা যায় এবং বেশিবেশি টাকার জন্যে তাদেরকে মারাত্মকমারাত্মক অপরাধ সংঘটন করতে হয়। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা বলে যে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে অপরাধীদেরকে ধরে কোর্টে পাঠানো। তাই, তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও অপরাধীদেরকে ধরে ও কোর্টে পাঠায়। অথচ, তারা কোর্ট থেকে ছাড়া পেয়ে চলে আসে এবং পুনরায় অপরাধসংঘটনে প্রবৃত্ত বা নিযুক্ত হয়। এটা বলে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা বুঝাতে চাচ্ছে যে, তারা যেখানে অপরাধীদেরকে ধরে দেয় কোর্ট–আদালতে বিচারকেরা বিচারের মাধ্যমে সেখানে তাদেরকে শাস্তি দিলে অপরাধ সংঘটিত হতে পারে না। তাই, অপরাধসংঘটন বৃদ্ধিতে তাদের কোন দোষ নেই এবং এটার জন্যে বিচারকেরাই দায়ী। বিচারকদের কথা হচ্ছে যে, তারা আইনের ভিত্তিতে বিচার করে এবং অলীক ও মনগড়া কিছুই করতে পারে না। প্রথমতঃ, আইনে আসামীরা জামিন পায় বিধায় তারা তাদেরকে জামিন দেয়। দ্বিতীয়তঃ, সরকারের পক্ষে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলাপরিচালনা করতে পারে না বিধায় তারা আসামীদেরকে আইনানুযায়ী খালাস বা অব্যাহতি দেয়। এখন দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা বলছে যে, তারা আইনানুযায়ী অপরাধীদেরকে ধরে ও তাদের বিরুদ্ধে কোর্ট–আদালতে মামলা রুজু করে এবং অপরদিকে হাকিমবিচারকেরা বলছে যে, তারা আইনের উর্ধ্বে না গিয়ে আইনের ভেতরেই আসামীদেরকে জামিনে মুক্তি ও বিচার শেষে খালাস দিতে হয়। উভয় পক্ষের কথা থেকে এটা বের হয়ে আসে যে, অপরাধীরা শাস্তি না পায়ার ব্যাপারে কোন পক্ষই দায়ী নয়, আইনই দায়ী। তাই, বলতে হয় যে, যেআইন দিয়ে অপরাধীর অপরাধ প্রমাণ করা যায় না সেআইন বলবৎ রেখে দেশ ও জনগণের কোন লাভ নেই। বাস্তবে ব্যাপারটি হচ্ছে অন্যরকম। সত্যিকথা বলতে কি, দুর্নীতির কারণেই ব্যাপারটি অন্যরকম হচ্ছে। শুনা যাচ্ছে যে, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা অপরাধীদেরকে ঠিকই ধরে; কিন্তু তারা জামিন

www.pathagar.com

ও বিচারে খালাস পাবার মতো ফাঁক রেখেই তাদের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা রুজু করে। তাই, প্রথমতঃ আসামীরা জামিন পেয়ে যায় এবং দ্বিতীয়তঃ সরকারের পক্ষে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলাপরিচালনা করতে ব্যর্থ হয় বিধায় তারা অব্যাহতি বা খালাস পেয়ে যায়। অপরদিকে, কোনকোন হাকিমবিচারক টাকার বিনিময়ে জামিন দিতে ও রায় বিক্রি করতেও শুনা যায়। তাই, অপরাধীদের শাস্তি না হয়ার ক্ষেত্রে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও কোনকোন হাকিমবিচারক দায়ী হচ্ছে, আইন নয়। আইন কথা বলতে পারে না। আইনের হয়ে কথা বলতে হয়। আইন স্বয়ং কথা বলতে পারতোতো আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা শুধু অপরাধীদেরকে ধরতো এবং হাকিমবিচারকেরা তাদেরকে শুধু শাস্তি দিতো। তবে, ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যদর্শী হলে আইনকে দিয়েও কথা বলানো যায়। একবার একপথিক একবাড়িতে একরাতে মেহমান হয়। সেবাড়িতে সেরাতে পাশের একবাড়ির একলোক ঢুকে একটি বাক্স চুরি করে নিয়ে যেতে থাকে। মেহমানটি ওলোকটিকে আটক করে। লোকটিকে সে ছেড়ে দিচ্ছিলো না বলে লোকটি 'চোর চোর' বলে চিৎকার দেয়। এতে বাড়ির লোকজন বের হয়ে আসে এবং মেহমানটিকে ধরে ফেলে। মেহমানটি বলে যে, লোকটিই চোর। কিন্তু, বাড়ির লোকজন তা শুনেনি। কোর্টে মামলা ওঠে। তারা দু'জনই দু'জনকে নিরপরাধ বা নির্দোষ বলে দাবি করে। বিচারক রায়ের দিন একব্যক্তিকে কিছুদূরে মরার ভানে একথা বলে রেখে আসে যে, দু'জন লোক তাকে একটি খাটে করে কোর্টে নিয়ে আসবে। সে যাতে কোন কথা না বলে মরার মতো থেকে খাটবহনকারী দু'জনকে শুনে কে প্রকৃত চোর তা জেনে নেয়। হাকিমের নির্দেশে তারা দু'জন তাকে আনতে যায়। তারা তাকে খাটে ওঠিয়ে আনার সময় কথাকাটাকাটি করে। ওলোকটি মেহমানটিকে বলে যে, সে তাকে না ধরতোতো সে চলে যেতে পারতো এবং আজ কোর্টে চোর সাবস্ত্য হয়ে তাকে শাস্তি পেতে হতো না। মেহমানটি বলে যে, সে নিমকহারামি করেনি। তাই, আল্লাহ্ যা করেন তা হবে। এসব কথাবার্তার মধ্যে তারা তাকে হাকিমের সামনে এনে হাজির করে। লোকটি খাট হতে লাফ দিয়ে ওঠে ওলোকটিই যে চোর তা বলে দেয়। ফলে, ওলোকটির শাস্তি হয় ও মেহমানটি সসম্মানে খালাস পেয়ে যায়। অনুরূপভাবে, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারকেরা আইনকে দিয়ে কথা বলালে কোন অপরাধীই শাস্তি এড়াতে পারে না। এখন কথা হচ্ছে যে, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও হাকিমবিচারকদের আইনকে কেন্দ্র করে মৌন ঠেলাঠেলিতে অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য কায়েম হচ্ছে ও জনগণ তাদের জানমালের নিরাপত্তা হারাচ্ছে।

www.pathagar.com

এমনকী শুনা যাচ্ছে যে, অপরাধীরা অস্ত্রসহ ধরা পড়লেও মামলায় অস্ত্রের কথা বাদ পড়ে যায় এবং তাদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় চালান দেয়া হয় বিধায় তারা জামিনে মুক্তিলাভ করে এবং পরবর্তীতে মামলা হতে অব্যাহতি বা খালাস পায়। অপরদিকে, এটাও শুনা যায় যে, অস্ত্রসহ ধরার কথা উল্লেখ করে আসামীদেরকে কোর্টে পাঠানোর পর তারা জামিনে মুক্তিলাভ করে এবং যাবতীয় সাক্ষ্যের দ্বারা তাদের অপরাধ প্রমাণ করলেও তারা খালাস পেয়ে যায়, অর্থাৎ রায় বেচা হয়। এ ক্ষুদ্র পরিসরের আলোচনাতে এটা প্রতিভাত যে, আইনপ্রয়োকারী সংস্থার ও হাকিমবিচারকদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, সদিচ্ছা ও দেশপ্রেমই অপরাধীদেরকে শায়েস্তা করাতে ন্যায্য ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা প্রকৃত অপরাধীদেরকে ধরে তাদের বিরুদ্ধে নিখুঁতভাবে যথোচিত আইনের আওতায় মামলা রুজু করবে। তারা সাক্ষীদেরকে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা দিয়ে কোর্ট-আদালতে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করবে। তা হলে অপরাধীরা ও তাদের গ্যাং-এর সদস্যরা দেখবে যে, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাই সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করে এবং সাক্ষ্য না দিয়ে তাদের গত্যন্তর থাকে না। হাকিমবিচারকেরা আইনকে দিয়ে কথা বলাবে এবং আইনের সাথে পরিবেশেপরিস্থিতির আলোকে তাদের আন্দাজঅনুমান করার ক্ষমতাপ্রয়োগ করে বিচারকার্যপরিচালনা করবে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও হাকিমবিচারকদের বিচারের জন্যে সুস্পষ্ট আইন থাকতে হবে এবং তা প্রয়োগের পদ্ধতি জটিল না হয়ে সহজসরল হতে হবে। বাস্তবে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের, বিশেষতঃ হাকিমবিচারকদের, বিচার হতে খুবকমই শুনা যাচ্ছে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিচার না হয় হাকিমবিচারকেরাই করছে বা করবে। কিন্তু, হাকিমবিচারকদের বিচার কে কিভাবে করছে বা করবে। তাদের বিচারের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু, সাধারণ লোক তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারছে না। তার কারণ হচ্ছে যে, তারা, বলতে গেলে, বিচারকদের বিচার হতে দেখছে ও শুনছে না। জনগণ আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সমালোচনা করতে ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে কিছুটা সাহস পাচ্ছে, কেননা তারা আর-যাই-করুক কারাদণ্ডপ্রদান করতে পারছে না। কিন্তু, তারা হাকিমবিচারকদের সমালোচনা করতে ও তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে আদৌ কোন সাহস পাচ্ছে না, কেননা তারা তাদের ইজ্জতের খাতিরে আদালত অবমাননা দেখিয়ে নিজেরাই মামলা করবে এবং কারাদণ্ডপ্রদানের ব্যবস্থা করবে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, কোনকোন হাকিমবিচারক তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে আইনের নিরপেক্ষতার কথা ভুলে গিয়ে আইনকে তাদের ইজ্জতের খাতিরে তাদের পক্ষে প্রয়োগ করতে পারে। এপ্রসঙ্গে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা এসে যায়। উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা বের হয়ে আসছে যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে

www.pathagar.com

বিচারকদের পূর্ণ স্বাধীনতাই বুঝায়। বাস্তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বিচারকদের বিচারকার্যে কারো কোন নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ না থাকাটাই বুঝায়। এটা সত্যকথা যে, বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত হলে ও বিচারে হস্তক্ষেপ করলে সুবিচার সুনিশ্চিত করা যায় না। তাই, সুবিচার সুনিশ্চিত করার স্বার্থে বিচারকার্যে কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ একান্তভাবে বর্জনীয়। এটার অর্থ এ নয় যে, বিচারকের প্রতি কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। বিচার ও বিচারক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিচারক বিচারকার্যপরিচালনা করে। বিচার স্বয়ং ত্রুটিপূর্ণ হয় না। তা কোনকোন বিচারকের কারণেই হয়ে থাকে। বিচারকার্যনিয়ন্ত্রণ ও বিচারে হস্তক্ষেপ না করার অর্থ এটা দাঁড়াবে না যে, বিচারকেরা নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকবে। বিচারকেরাও মানুষ। মানুষ যেকোন সময় শয়তান দ্বারা প্ররোচিত হতে পারে এবং নিজেদের স্বার্থে যেকোন কাজে এদিকওদিক করতে পারে। তাই, মানুষ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতে হয় বলে বিচারকদেরকেও সুবিচার সুনিশ্চিত করার স্বার্থে নিয়ন্ত্রণে রাখা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু, আমাদের দেশে বর্তমানে বিচারকার্য নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা ও বিচারে হস্তক্ষেপ না করা বলতে বিচারকেরা নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকা বুঝাচ্ছে এবং তারা নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে যাচ্ছে। তাদের কারোকারো দোষত্রুটির সমালোচনাকে বিচারে হস্তক্ষেপ করাতে ও আদালত অবমাননাতে ফেলে সমালোচকদেরকে আইনের আওতায় এনে নাজেহাল করা যেতে পারে। সুবিচারের স্বার্থে এটা সম্পূর্ণভাবে অনভিপ্রেত। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ও সব হাকিমবিচারকের সদিচ্ছা ব্যতীত আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ সম্ভব হবে না। তাদের সদিচ্ছার অভাব থাকলে তারা, কিছুসংখ্যক ব্যতীত, লাভজনক অবস্থানে থাকবে, অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য বিদ্যমান থাকবে, নিরীহ জনগণ ভোগতে থাকবে এবং দেশে সুবিচারের ও আইশৃঙখলা পরিস্থিতির উন্নতির আশা দুরাশা হয়ে থাকবে। তাই, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও হাকিমবিচারকদের ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগের মাধ্যমে বিচারপ্রার্থী হয়ার পরিষ্কার ও নিরাপত্তামূলক বিধান থাকা অত্যাবশ্যক। এজন্যে সৎ, মহৎ, যোগ্য ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে খোঁজ করে বের করে তাদের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র আদালত গঠন করতে হবে। এ আদালতে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও হাকিমবিচারকদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হয়া যাবে। তা হলে আমরা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে যা চাচ্ছি তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং সুবিচারের ও আইনশৃঙখলার ব্যাপারে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় অবস্থান নিতে সক্ষম হবো। সর্বোপরি, সুবিচার সুনিশ্চিত করার স্বার্থে কোর্ট বা আদালতে যেমামলা শুরু হবে তা একটানাভাবে শেষ করতে হবে। প্রতিদিন একজন বিচারকের কোর্ট বা আদালতে অনেকগুলো মামলা থাকতে পারবে না। প্রতিদিন একজন বিচারকের কোর্ট বা আদালতে অনেকগুলো মামলা থাকে বিধায় প্রকৃতপক্ষে কোন মামলাতেই সে সুষ্ঠুভাবে মনোনিবেশ করতে পারে না। সুষ্ঠু ও

www.pathagar.com

নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে একজন পুলিস কর্মকর্তাও একই সময় একাধিক মামলা তদন্ত করতে পারবে না। একজন পুলিস কর্মকর্তা একটানাভাবে একটি মামলা তদন্ত করবে এবং কোর্ট বা আদালতে মামলাটি একটানাভাবে বিচারকার্যে সে তার সব দায়িত্ব পুঙখানুপুঙখরূপে পালন করবে। সুবিচার সুনিশ্চিত করার পথে উল্লেখিত অসুবিধা ও বাধাগুলো বিচারবিশ্লেষণপূর্বক বিচারক ও পুলিস কর্মকর্তাদের সংখ্যা প্রয়োজনানুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে বাড়াতে হবে।

৫৩

সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা দুটোই অপরাধের কারণ। যেভাবেই হোক স্বার্থের তাড়নায় সব অপরাধ সংঘটিত হয়। যেসব অপরাধ সমাজে অশান্তি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সেগুলো দেশের ও জাতির জন্যে শোচনীয় পরিণতি ডেকে আনে। এসব অপরাধ সাধারণ মানুষকে অসহায় করে তোলে এবং পুরো দেশকে একটি তামাসার বস্তুতে পরিণত করে। বিভিন্ন দলের মধ্যে সাংঘর্ষিক ও অপরাধজনিত কারণে দেশে সাধারণ মানুষ অসহায় হলে এবং পুরো দেশ একটি তামাসার বস্তুতে পরিণত হলে সরকার নীরব ভূমিকা পালন করতে পারে না। এরকম পরিস্থিতিতে সরকারের নীরব ভূমিকা পালন তাদের দুর্বলতার লক্ষণ। সরকারেরই দায়িত্ব হচ্ছে যেকোন অপরাধ দমন করা ও অপরাধীদেরকে বের করে আইনানুগ শাস্তি দেয়া। অপরাধীরা অপরাধ করলে এবং সরকার সেদিকে খেয়ালই না করলে সরকার ও অপরাধীদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না এবং জনগণ বুঝে নেয় যে, তারা সবাই একই ধ্যানধারণার মানুষ। এরকম অবস্থা হতে মুক্ত করতে পারে ইসলামী সরকার। যারা অপরাধ দমনের দায়িত্বে নিয়োজিত তারা একটি অপরাধ দমন করার কাজে অন্য একটি অপরাধ করলে একই সময় দু'টি অপরাধ সংঘটিত হয়। অপরাধ দমন করার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির ঘুষের বা পক্ষপাতিত্বের বা ওপর চাপের কারণে অপরাধের ওপর অপরাধ সংঘটিত হয়। তার এঅপরাধের ফলে সে যেঅপরাধ দমনের কাজে নিয়োজিত সেঅপরাধে অপরাধীর কোন শাস্তি বা অসুবিধা হয় না বিধায় সে অপরাধ করেই চলে। অবৈধ পন্থায় অর্থ রোজগারের পথ উন্মুক্ত থাকায় একদিকে শোষণের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অপরদিকে সমাজে মানুষের জীবনে দরিদ্রতা ও ভিক্ষাবৃত্তির অভিশাপ নেমে আসছে। এতে ক্ষুদ্র একশ্রেণীর লোক অজস্র ও অঢেল অর্থসম্পদের মালিক হচ্ছে এবং বিরাট একশ্রেণীর লোক নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হচ্ছে। তারা অর্ধাহারেঅনাহারে, সব সুযোগসুবিধা হতে বঞ্চিত হয়ে, দিনপাত করে এবং তাদের অনেককেই মৃত্যুর পর ভিক্ষার মাধ্যমে টাকাসংগ্রহ করে দাফনকাফন বা সমাহিত করতে হয়। মানুষের জীবনে এর চেয়ে আর্ত বা করুণ চিত্র

www.pathagar.com

আরকিছু নেই। রাষ্ট্রপরিচালকদের নিকট এজন্যে ভিক্ষা চেতে যেতে পারছে না বিধায় তারা তা প্রত্যক্ষ করতে পারছে না। কাজ ও বাসস্থানের অভাবে ভাসমান ও ছিন্নমূল লোকের সংখ্যা বাড়ছে। অন্ধ ও বিকলাঙ্গদের সংখ্যাও কম নয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের জন্মগত অধিকার। অথচ, বিপুলসংখ্যক লোক এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত। যাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকে না তারা বাঁচার তাগিদে রাস্তায় নামে। তাদের থেকেই জন্ম নেয় চরমপন্থী এবং বৃদ্ধি পায় অসামাজিক কার্যকলাপ ও বিভিন্নধরনের অপরাধ। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রে অবৈধ উপার্জনের সব ছিদ্রপথ বন্ধ থাকে এবং যারা দীনহীন ও নিঃসম্বল তাদের ব্যবস্থা করা হয়। তাদের ব্যবস্থা না হয়া পর্যন্ত পরিচালকেরা ভালো খাবার পর্যন্ত খায় না এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে আরামআয়েশ পর্যন্ত বিসর্জন দেয় বা ত্যাগ করে।

মানুষ নিজেদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করলে এবং কোন বড় সত্তার নিকট তাদের কাজের জবাবদিহির বা কৈফিয়তের মনোভাব না থাকলে তারা যা খুশি তা করতে পারে। কিন্তু, আল্লাহ্‌র ওপর সচেতন ও সজ্ঞান ঈমান বা দৃঢ় আস্থা এমনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। অপরাধদমনের জন্যে যতো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হচ্ছে–না–কেন অপরাধপ্রবণতা বেড়েই চলছে, কেননা এসব ব্যবস্থা আসল ও যথার্থ ব্যবস্থা নয়। আল্লাহ্‌প্রদত্ত ব্যবস্থাই আসল ও খাঁটি ব্যবস্থা। এব্যবস্থা ব্যতীত অপরাধপ্রবণতা বন্ধ করা যেতে পারে না। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যেচিকিৎসক রোগমুক্ত করবে তাকেই প্রথমে সুস্থ ও রোগমুক্ত হতে হয়। অনুরূপভাবে, যারা অপরাধদমনের ব্যবস্থা দিচ্ছে তারা সবধরনের অপরাধ হতে মুক্ত থাকতে হয়। কোথাও কোন গণ্ডগোল বা বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হলে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সেখানে কখনোকখনো তীব্রবেগে বা তাড়াহুড়ো করে ছুটে যায় এবং কখনোকখনো অনেক সময় পরে যায়। সাধারণত বা সচরাচর দেখা যায় যে, যারা ঘটনায় জড়িত ও ব্যাপৃত থাকে তারা সরে পড়ে। ফলে, নিরীহ লোকজন, যারা ঘটনায় জড়িত থাকে না বিধায় সরে পড়ে না, শায়েস্তার শিকার হয়। গণ্ডগোল বা বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীদেরকে কর্তৃপক্ষ ভালোভাবেই জানে। এটা সত্ত্বেও তাদেরকে শায়েস্তা করা হয় না। এর কারণ হচ্ছে হয়তো তারা ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকে নয়তো তারা কর্তৃপক্ষ দ্বারা লালিতপালিত। এটাও হতে পারে যে, তারা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্য। কিন্তু, তাদেরকে শায়েস্তা করতে হলে তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতাসীন দলের তাদেরকেও শায়েস্তা করতে হয়। তাই, যারা ক্ষমতাসীন দলের তাদেরকে শায়েস্তা করা হতে অব্যাহতি দিতে গিয়ে যারা অন্যান্য দলের তাদেরকেও অব্যাহতি দিতে হয়। কারা অপরাধী, অর্থাৎ চোরডাকাত, সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী, মস্তান ইত্যাদি, ক্ষমতাসীনদের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ভালোভাবেই জানে। তাদের সংখ্যা তুচ্ছ ও নগণ্য। অথচ, তাদের অবাধ বিচরণের ফলে

www.pathagar.com

এসব অপরাধ সংঘটিত হয়েই চলছে। তাদেরকে খোঁজ করে বের করে একত্রে দেশ ও আপামর জনসাধারণের স্বার্থে শাস্তিপ্রদান করলে এসব অপরাধ আপনাআপনি প্রতিহত হয়। একাজটি অত্যন্ত সহজ এবং আপামর জনসাধারণ মনেপ্রাণে চায় যে, যারা একাজটি করার দায়িত্বে আছে তারা এটা করুক। কিন্তু, তারা এটা করছে না। তারা স্বেচ্ছায় বা নিজেদের ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে এটা না করলে তারা অপরাধী হয় এবং তাদেরকেও শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু, তাদেরকে অপরাধী করে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তা হলে বুঝা যাচ্ছে যে, তারা স্বেচ্ছায় এটা করা থেকে নিরস্ত ও বিরত থাকছে না। তারা তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের, অর্থাৎ সরকারের, নির্দেশেই বিরত থাকছে। ফলে, ক্ষমতাসীনদের স্বার্থেই অপরাধীরা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তারা ন্যায়সংগতভাবে শায়েস্তা না হয়ে জনসাধারণ অন্যায় ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে শায়েস্তা হচ্ছে।

মানুষের জন্যে যেটা ক্ষতিকর বা হানিকর মহান আল্লাহ্ সেটাই নিষিদ্ধ করেছেন। আমাদের সীমিত ও স্বল্প জ্ঞান দিয়েও আমরা অনুধাবন ও খেয়াল করলে এটা বুঝতে পারি। বর্তমানে বিজ্ঞানের জয়ভেরী ও জয়যাত্রা এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। মাদকদ্রব্যের ব্যবহার মানুষের জন্যে অনষ্টিকর ও ক্ষতিকর বিধায় আল্লাহ্ এটা নিবারিত ও নিষিদ্ধ করেছেন। একদিকে এটা নিবারিত ও নিষিদ্ধ রেখে অপরদিকে এটার ব্যবহার চলতে দিলে এটার নিষিদ্ধতা কার্যকর হয়ার কথা নয়। এ হারাম জিনিসটি নিলামে বিক্রি করাটাও ন্যায়সংগত নয়। এটা ধ্বংস করে দেয়াটাই বা বিনাশ করে ফেলটাই শ্রেয়স্কর বা হিতকর। এটার উৎপাদন ও আমদানি এবং যেকোন ছিদ্রপথে এটার আগমন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা আবশ্যক। বিদেশীরা এটা না পেলে বাংলাদেশে পর্যটক হিসেবে আসবে না বিধায় পর্যটন খাতে আয় অত্যল্প বা কম হয়ার কথাটি আসে। তবে, যেটা নিষিদ্ধ সেটাকে উপলক্ষ করে আয়ও নিষিদ্ধ। যেপাপ শারীরিক, নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ইত্যাদি দিক দিয়ে মানুষের জন্যে ক্ষতিকর তা আনুষংগিক অনেক পাপের কারণ হয় এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্বল করে এবং সামাজিক অনাচারের ও দুর্নীতির পথ প্রশস্ত বা বিস্তৃত করে। মাদকাসক্তি এমন একটি পাপ। মদ মাদকতাসক্তিবহির্ভূত নয়। উঁচুপর্যায়ে অবস্থানকারীদের এটা আপ্যায়নের একটি আইটেম। বিত্তবানদের অনেকের এটা শ্রান্তিলাঘবের ও বিনোদনের একটি উপকরণ। ব্যভিচারের পথেও এটা সম্পৃক্ত। হতাশাগ্রস্তরা এটার দ্বারা নৈরাশ ও হতাশা ভুলে থাকতে চায়। মোগল সম্রাট বাবরের শাসনামলে এক যুদ্ধে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মোগল সেনারা জয়যুক্ত হতে বা জয়লাভ করতে পারছিলো না বিধায় তাদের মধ্যে স্থবিরতা এসেছিলো। সম্রাট বাবর সৈন্যদেরকে একত্রিত করে বলেন যে, কোন নৈতিক দুর্বলতার কারণেই তারা যুদ্ধে আশানুরূপ সফলতা দেখাতে পারছে না। তিনি বলেন যে, তাঁর মধ্যে মদ্যপানের যে বদাভ্যাসটুকু আছে তিনি তা বর্জন করলেন এবং

www.pathagar.com

কারো মধ্যে ওবদাভ্যাস থেকে থাকলে সে যাতে তা বর্জন করে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করে। পর ক্ষণেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং তারা জয়লাভ করে। মাদকদ্রব্য বর্জনের জন্যে প্রচারাভিযান চলছে। মাদকতার বিরুদ্ধে সরকারো সোচ্চার। তবু, মাদকাসক্তি হ্রাস পাচ্ছে না। একদিকে মাদ্রকদ্রব্য আমদানির জন্যে লাইসেন্স দিয়ে ও 'বার' চালু রেখে অপরদিকে মাদকদ্রব্য বর্জনের জন্যে প্রচারাভিযান ও মাদকতা দূর করার জন্যে মুখর ও সোচ্চার হয়া একটি বাস্তবতাবিবর্জিত ও প্রহসনমূলক কাজ। এধরনের প্রহসনমূলক কাজের কুফল খুবই ভয়াবহ। এতে একদিকে সরকারের প্রতি জনগণের বিরূপ প্রতিক্রয়ার সৃষ্টি হয়, অপরদিকে মাদকাসক্তদের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পেয়ে সমাজকে আবিল ও কলুষিত করে ফেলে ও অনৈতিকতার চক্রে হতাশাগ্রস্ত ও অপরাধী ব্যক্তিরা চক্কর খেতে থাকে।

দেশ অগণিত সমস্যায় জর্জরিত। এসব সমস্যার কারণ, ধরন ও প্রকৃতি সবার জানা। জাতিও এসব সমস্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও দিশেহারা। এগুলোর মূল কারণ হচ্ছে দুর্নীতি, দায়িত্বহীনতা, আইনের যথার্থ প্রয়োগের ও কার্যকারিতার অভাব ও ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টিতে আড়ষ্টতা ও অনুভূতিহীনতা। অগ্রগতির জন্যে অর্থনৈতিক স্বকীয়তার প্রয়োজন। এটার জন্যে উৎপাদক বা উৎপাদনকারী ও ভোক্তা বা ব্যবহারকারী উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। ভোক্তাদের দেশীয় উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু, দেশে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি বন্ধ করলে উৎপাদনকারীরা অসাধুতা ও মন্দতা অবলম্বন করে তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য এসুযোগে বাড়িয়ে দেয় এবং এপণ্যের গুণগতমানো হ্রাস পায়। উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন করা এবং সেটার দাম বিদেশী পণ্যের তুলনায় বৃদ্ধি না করা প্রয়োজন এবং ভোক্তারাও দেশের স্বার্থে সেটা ব্যবহার করা উচিত। আমাদের অর্থনীতি অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতামূলক ও সাংঘর্ষিক। তাই, আমাদেরকে অর্থনৈতিক স্বকীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উৎপাদনকারীরা অসাধুতা পরিহার করতে হবে ও ভোক্তারা দেশীয় পণ্য ব্যবহারের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশীয় শিল্পের প্রতি সহযোগিতাপ্রদান ও সদিচ্ছাপ্রকাশ করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী দেশগুলো মনের দিক থেকে কখনো আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন চায় না। তাই, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসব দেশের ষড়যন্ত্র ও প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা আমাদের জন্যে আবশ্যক। এক্ষেত্রে রাজনীতিবিদের ঐকমত্য একটি অনন্য ও একাগ্র ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ জনগণকে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা প্রদানের জন্যে তাদের থেকে কর গ্রহণ করছে। বাস্তবে তারা জনগণকে সুযোগসুবিধা দিচ্ছে কি? ঢাকা সিটি কর্পোরেশান

www.pathagar.com

করের সাথে বাতি ও ময়লাদি নিষ্কাশনের রেট নিচ্ছে। কিন্তু, অনুন্নত এলাকাগুলোর ভেতরের জীর্ণশীর্ণ রাস্তাগুলোতে কদাচিৎ বাতি জ্বলে এবং ময়লাদি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। অভিযোগের পর অভিযোগ করলে দু'চার দিন বাতি জ্বলে এবং ময়লাদি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থাই করা হয় না। তাছাড়া, এসব রাস্তা উন্নয়ন ও সংস্কারের ব্যাপারে নানা কারসাজি কাজ করে। যেসব রাস্তা উন্নয়ন ও সংস্কারের এবং যেসব সিউঅ্যার বা ময়লানিষ্কাশনের পয়ঃপ্রণালী বা ড্রেন নির্মাণের প্ল্যান অনুমোদিত হয় সেগুলোর মধ্যে সাধারণত ওগুলোই উন্নয়ন ও সংস্কার এবং নির্মাণ করা হয় যেগুলোর জন্যে চাঁদার আকারে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও কর্মচারীদেরকে প্রীত ও তৃপ্ত করে উৎকোচ বা ঘুষ দেয়া হয়। কোনকোন রাস্তা উন্নয়ন ও সংস্কারের এবং কোনকোন ড্রেন নির্মাণের প্ল্যান উৎকোচ দিয়েই অনুমোদন করানো হয়। বিভিন্ন অদৃষ্ট ও দৈব করের বা হস্তের থাবার কারণে কাজ খুব নিম্নমানের হয়ে থাকে। তাছাড়া, চেষ্টাতদবির ও ঘুষপ্রদানের অভাবে কোনকোন জনবহুল এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে বছরের পর বছর পড়ে আছে এবং ড্রেন নির্মাণ না করায় লোকজনকে নোংরা ও স্বাস্থ্যহানিকর পরিবেশে বসবাস করতে হচ্ছে। তাই, যেসব সুযোগসুবিধা প্রদানের জন্যে কর ও চার্জ নেয়া হয় সেগুলো প্রদান সুনিশ্চিত করতে না পারলে সামাজিক সুবিচারের স্বার্থে সেগুলো না নেয়াটাই মঙ্গলজনক ও আইনসিদ্ধ হবে। এতদ্ব্যতীত, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাস্তা উন্নয়ন ও সংস্কারের এবং ড্রেন নির্মাণের এলাকাওয়ারী পরিকল্পনা অনুমোদিত থাকতে হবে যেটাতে কারোরই কোন অবস্থাতেই হস্তক্ষেপ করার কোনপ্রকার অধিকার ও ক্ষমতা থাকবে না এবং যে বা যারা এটা অমান্য করবে সে বা তারা অবধারিতভাবে শাস্তিভোগ করতে হবে। আমরা সমস্যাসমাধানের জন্যে যতো উদ্যোগই নিচ্ছি না কেন সমস্যা দিনদিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এতে সমস্যা আমাদের অগ্রে বা আগে থেকে যাচ্ছে এবং আমরা সমস্যার পশ্চাতে বা পেছনে পড়ে যাচ্ছি। যতোদিন সমস্যা আমাদের অগ্রে থাকবে এবং আমরা সমস্যার পশ্চাতে থাকবো ততোদিন আমরা সমস্যার আবর্তে ঘোরপাক খেতে থাকবো এবং দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে অক্ষমতাতেই থেকে যাবো। তাই, আমাদেরকে সমস্যাকে পশ্চাতে ফেলতে হবে। তবে, দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থা, দেশোপ্রেম ও আইনের নিরপেক্ষ ও অবাধ গতি ছাড়া এটা সম্ভব নয়। এটাকে সম্ভবপর করতে হলে রাজনীতিবিদদেরকে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে দেশোপ্রেমের সাথে এবং আইনের নিরপেক্ষ ও অবাধ গতিতে রাজনীতি করে যেতে হবে।

যুবকেরা দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাদের পেছনে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। অথচ, তারা কর্ণধার হবার জ্ঞান ও গুণাবলী অর্জন না করে বিভ্রান্ত ও অধঃপতিত হচ্ছে। তারা দেখছে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, গণপ্রতিনিধি ও মন্ত্রী

www.pathagar.com

হয়ার সাথে জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই এবং বড় রাজনৈতিক দলের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক রেখে চলতে পারলে ভালো সুযোগসুবিধা পায়া যায়। তারা এটাও দেখছে যে, জ্ঞানী ও উপযুক্ত লোক উপেক্ষিত ও অবহেলিত এবং সমাজে তাদের তেমনকোন কদর ও মূল্য নেই। জ্ঞানার্জন করে স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনযাপনের কোন নিশ্চয়তা ও সংশয়হীনতা তাদের নেই। ফলে, তারা তাদের পছন্দসই রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তাদের এরাজনীতি দেশগড়ার রাজনীতি নয়। অনিশ্চিত ও সংশয়াকুল ভবিষ্যতের কারণে তাদের এরাজনীতি ভাগ্যগড়ার জন্যে লোভলালসার রাজনীতি, কেননা তাদের চোখের সামনে যারা ক্ষমতায় আসে তারা অঢেল সম্পদ ও ঐশ্বর্যের মালিক হয় এবং এমালিকানার জন্যে কেউ কখনো দায়ীও হয় না, শাস্তিও ভোগ করে না। তারা এটা বুঝে যে, এটা রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সমঝোতার বিষয়। যেকোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হয়েই ভারী গলায় বলতে থাকে যে, পূর্ববর্তী সরকার সেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে দেশটাকে অন্তঃসারশূন্য বা ফাঁপা করে রেখে গেছে এবং তারা রিক্ত ও শূন্যহস্তে দেশগড়ার কাজ আরম্ভ করেছে। তবে, কথা হচ্ছে যে, দেশকে অন্তঃসারশূন্য করার অধিকার কারো নেই। তাই, ক্ষমতাসীনদের পবিত্রতম দায়িত্ব হচ্ছে পূর্বের সরকারের রাষ্ট্রপরিচালনার সময় কারা কিভাবে দেশকে অন্তঃসারশূন্য করেছে তা বিশদ ও বিস্তারিত তদন্তের মাধ্যমে নির্ধারণ ও নিরূপণ করা এবং যারা, যে যেপর্যায়ের বা স্তরেরই হোক-না-কেন, দায়ী সাব্যস্ত হয় তাদেরকে দেশ ও আপামর জনসাধারণের স্বার্থে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা ও যেকোন মূল্যে তাদের থেকে তারা রাষ্ট্রের যেসব সম্পদ কুক্ষিগত করেছে সেগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়া। বস্তুত বা প্রকৃতপক্ষে, কোন সরকারই তা করে না। যে ক্ষমতাসীন দল ঐকান্তিকভাবে বা মনেপ্রাণে দেশকে ভালোবাসে এবং দেশের কারণে নিজেদের জীবনকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করে তারা অনায়াসে নির্ভীকতার সাথে তা করতে পারে। তারা প্রয়োজনে মহান আল্লাহ্‌র হুকুম হলে, যিনি আমাদের জীবনের মালিক, আততায়ীর গুলিতে শাহদাতবরণ করতে পারে; কিন্তু যারা নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দেশকে অন্তঃসারশূন্য করে তার ঘোর শত্রুতে পরিণত হয় তাদেরকে নিস্তার দিতে পারে না। বাস্তবিকই ও সত্যসত্যই, আমরা কোন ক্ষমতাসীন দল বা সরকারের মধ্যে এতেজস্বিতা দেখতে পাচ্ছি না। ভাগ্যগড়ার রাজনীতিতে প্রয়োজন গলাবাজি, মারামারি, হানাহানি, ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া, শোভাযাত্রা ও দলগত ধ্বনি (শ্লোগান), সভাসমিতি, বক্তৃতা, কর্মী হিসেবে কর্মসম্পাদন, বোমাবাজি, গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি, গোপন পরামর্শ, প্রকাশ্যে ও গোপনে হত্যা, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, মতাদর্শপ্রচার ইত্যাদি। এসবের পর জ্ঞানার্জনের কোন সময় তাদের হাতে না থাকারই কথা। কিছু সময় থাকলেও তা তারা বিভিন্নধরনের গান শুনে, নাটক ও সিনেমা দেখে এবং সাময়িক পত্রিকা

www.pathagar.com

(ম্যাগাজিন) পড়ে কাটায়। তারা এমন রাজনীতিবিদ হয় যে, খাওয়াদাওয়া ও ঘুমের কোন নিয়মানুবর্তিতাও তাদের থাকে না। যেসব ছাত্র লেখাপড়ায় একটু মনোযোগী থাকে তাদেরকে তারা অথর্ব ও আনকালচার্ড বলে। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ক্ষমতাসীন হয় ও রাষ্ট্রপরিচালনা করে এবং তারা সর্বত্র জ্ঞানের যথার্থ মূল্য পায় দেখলে তারা অবশ্যই জ্ঞানার্জনে ব্রতী হবে এবং তারা তাদেরকে দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার হিসেবে প্রস্তুত করতে পারবে। এককথায়, যেখানে জ্ঞানার্জন ছাড়া কর্ণধার হয়া যায় সেখানে জ্ঞানার্জন করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এরকম সামাজিক অবস্থায় যারা জ্ঞানার্জন করে তারা অথর্ব ও আনাকালচার্ডই থাকতে হয়, কেননা তারা সামনেও বাড়তে পারে না, পেছনেও সরতে পারে না।

যুবকদের লেখাপড়ার ও জ্ঞানার্জনের প্রতি চরম অনাসক্তি ও উদাসীনতা। তারা দেখছে যে, নেতা, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী ও সংসদসদস্য হতে এবং রাজনৈতিক পদ পেতে তেমন লেখাপড়ার ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তারা এটাও দেখছে যে, ক্ষমতাসীনদের মদদ থাকলে সবকিছুই করা যায়। এসব পেতে হলে লাঠিয়াল হিসেবে যেসব কাজের দরকার তারা বিভিন্ন দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সেগুলো রপ্ত করে বা সেগুলোতে অভ্যস্ত হয়। রাজনীতিবিদেরা, ভেবে দেখুন যে, যুবকেরা কিভাবে উচ্ছন্নে যাচ্ছে। তাদের এউচ্ছন্নতার জন্যে আপনারাই দায়ী। সত্যিকারার্থে দেশকে ভালোবাসলে যুবকদেরকে ভালোবাসুন এবং তাদের উচ্ছন্নতার কথিত পথগুলো বন্ধ করুন। আমাদের দেশে বর্তমানে বেকার যুবকের সংখ্যা এক কোটি আটত্রিশ লাখ। এসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুবকদের থাকতে হয় কাজ। আমরা যে যা-ই বলি-না-কেন তাদেরো কিছু-না-কিছু টাকাপয়সার প্রয়োজন। তাছাড়া, একটাকিছু করতে না পারলে সময় কাটানোটাও বিরক্তিকর ব্যাপার হয়। রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীর প্রয়োজন। তাই, বেকার যুবকেরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী হয়ে কিছু কর্মের ও সর্বসময় না হলেও মাঝেমধ্যে কিছু টাকাপয়সার সংস্থান করে নেয়। তাদের একর্ম হচ্ছে আন্দোলন করা, হরতাল করা, মারামারি করা, গোলাগুলি করা, বোমাবাজি করা ইত্যাদি। এককথায়, তাদের কাজ হলো পেশীশক্তি প্রদর্শন করা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। আমার মতে, বেকার যুবকদেরকে বেকারত্বের অভিশাপ হতে রক্ষা করতে পারলে তারা রাজনৈতিক দলের কর্মী হয়ে পেশীশক্তি প্রদর্শন ও সন্ত্রাসী কর্ম গ্রহণ করবে না।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশোন্নয়নের নামে মহিলাদেরকে বিভিন্ন চাকরিবাকরিতে বহাল ও কর্মে নিযুক্ত করা হচ্ছে। পুরুষেরা বেকার থাকতে মহিলাদের এবহালতা ও নিযুক্তি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনক্রমেই যথোচিত ও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এটার মানে এ নয় যে, কোন মহিলাই চাকরিবাকরি করতে পারবে না। যেসব মহিলার একটাকিছু

www.pathagar.com

না করলে চলে না তারা অবশ্যই চাকরিবাকরি করবে এবং সরকার আবশ্যিকভাবে তাদের কর্মসংস্থান করবে। মহিলারা চাকরিবাকরি করবে না বলে তাদের যে শিক্ষাদীক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার আবশ্যকতা নেই তা নয়। তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তারা শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হলে তাদের সন্তানসন্ততিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম হবে এবং পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে সুখী ও স্বচ্ছন্দ পরিবার রচনা করতে পারবে। তাছাড়া, তারা পারদর্শিতার সাথে গৃহপরিচালনার দ্বারা সুখৈশ্বর্য ভোগ করতে পারবে। তবে, যেদেশে চাকরিবাকরির ও কর্মের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা স্বল্প সেদেশ অন্যদেশের পুরুষ গ্রহণ না করে সেদেশের সার্বিক স্বার্থে সেদেশের মহিলাদেরকে বিভিন্ন চাকরিবাকরিতে ও কর্মে নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশে বাস্তবে অসংখ্য যুবক বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত হয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে। তাদের মধ্যে হতাশা ও নৈরাশ্য অবর্ণনীয়ভাবে ক্রিয়া করছে। মাদকাসক্তির অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে এটাও যে একটি তা উপেক্ষা করার ও দেখেও না দেখার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। সন্ত্রাস ও মস্তানিসহ বিভিন্ন অপরাধের এবং সমাজে বিদ্যমান উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিশৃঙ্খলার জন্যে বেকার যুবকদের হতাশা ও নৈরাশ্য যে দায়ী নয় তা বলতে পারার মতো কেউ আছে কিনা অন্তত ও ন্যূনকল্পে আমি জানি না। যুবকযুবতীদের সময়মতো বিয়ে না হয়া বা আদৌ বিয়ে না হয়া, বৈবাহিকসম্পর্ক সুদৃঢ় ও শান্তিময় না হয়া, সন্তানসন্ততি অবাধ্য ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়া, পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়া, নারীনির্যাতন, যৌতুকের প্রচলন, পৈশাচিকতা ও ধর্ষণ, মেয়ে ও মহিলাদেরকে উত্ত্যক্তকরণ ও বিরক্তকরণ ইত্যাদি যুবকদের বেকারত্বের ফলশ্রুতির স্বরূপ। মহিলাদের কোটাভিত্তিক নিয়োগের ফলে অনেক মেধাবী যুবক চাকরিবাকরি থেকে বঞ্চিত হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন ও মেধাকে নিরর্থক মনে করে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার জিগির তুলে মেধাকে অবহেলা করে দেশোন্নয়ন সহজ নয়। পুরুষেরা তাদের ব্যক্তিগত মানের নিচের মানের মহিলাদেরকে সচারচর বিয়ে করে থাকে। কিন্তু, উচ্চমানের মহিলারা সাধারণত তাদের চেয়ে নিম্নমানের পুরুষদেরকে বিয়ে করতে চায় না। তাই, কোনকোন চাকরিজীবী মহিলাকে অবিবাহিতা অবস্থায় জীবন সাঙ্গ বা শেষ করতে হয়। অধিকাংশ কর্মজীবী মহিলাদের স্বামীরাও কর্মজীবী। আয়রোজগার বৃদ্ধি করে, বিত্তশালীদের স্তরের দিকে তাকিয়ে, নিজেদের মান উঁচু করার তাগিদে এব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তবে, মহিলাদের জন্যে যেসব পদ রাখা হয়েছে সেগুলোতে শিক্ষাগতযোগ্যতা অনুসারে বেকার যুবকেরা নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তাদের বিয়েশাদির বা পরিণয়ের ফলে একজন পুরুষ ও একজন মহিলার সমন্বয়ে একটি পরিবার গড়ে ওঠলে যুবকদের বেকারসমস্যা হ্রাস পায় এবং অনেক সমস্যার স্বতঃপ্রবৃত্ত সমাধান হয়। পোশাক শিল্পগুলোতে প্রায়

www.pathagar.com

একচেটিয়াভাবে মহিলাদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে। এটার কারণ হচ্ছে যে, এদেরকে যেভাবে শোষণ করছে ও দাবিয়ে রাখছে পুরুষদেরকে সেভাবে পারবে না। এসব মহিলার অধিকাংশেরই বিয়ে হচ্ছে না, কেননা তারা বেকার যুবকদেরকে বিয়ে করতে চাচ্ছে না এবং বেকার যুবকেরাও তাদেরকে বিয়ে করতে সাহসী হচ্ছে না। তাছাড়া, স্ত্রী চাকরিজীবী ও স্বামী বেকার হলে পারিবারিক জীবনে যেসব অঘটন বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে স্বামী চাকরিজীবী ও স্ত্রী গৃহিণী হলে সাধারণত সেগুলো ঘটে না। পোশাক শিল্পগুলোতে লক্ষলক্ষ মহিলার পরিবর্তে লক্ষলক্ষ পুরুষ নিয়োগ করা হলে বেকার যুবকদের বেকারত্বের প্রকোপ অনেকাংশে লাঘব হবে এবং উল্লিখিত বহু সমস্যার সমাধান হবে। নিরপেক্ষভাবে একটু খেয়াল করলেই রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রপরিচালকদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, আমার এসব কথা ও প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে বাস্তবসম্মত। অফিসআদালতে সাধারণত নিচের দিকেই কাজকর্ম হয়ে থাকে। ওপরের দিকে যারা আছে তারা নিচের দিকে সম্পাদিত কাজকর্মের ওপর ভিত্তি করেই কাজ করে। অপরদিকে, বেকারসমস্যা প্রকট। তাই, অফিসারের পদ কমিয়ে করণিকের পদ বাড়ালে কর্মসম্পাদনের গতি বাড়বে এবং বেকারসমস্যাও বহুলাংশে ঘুচবে বা লাঘব হবে। করণিকদের উচ্চতর শিক্ষাগতযোগ্যতা থাকলে এতে কোন অসুবিধা হবে না বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গরূপে কর্মসংস্থানের ও নিঃস্বদের ব্যবস্থা হয় না। এপদ্ধতি জনগণকে ধোঁকা দেয়ার ও তাদের সাথে প্রবঞ্চনা করার একটি মোক্ষম ব্যবস্থা। একটি সুনির্দিষ্ট সঠিক পদ্ধতিই কর্মসংস্থানের ও নিঃস্বদের ব্যবস্থা করতে পারে। কিছু লোকের কর্মসংস্থান ও কিছুকিছু নিঃস্ব ব্যক্তির ব্যবস্থা করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। কিন্তু, সমস্যা থেকেই যায়। কর্মসংস্থানের ও নিঃস্বদের ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকারের। সরকার নিঃস্বার্থভাবে বাস্তবধর্মী সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলে এসব সমস্যার সঠিক সমাধান হয়। এধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দলমতনির্বিশেষে সব রাজনীতিবিদকে উন্মুক্ত ও খোলা মনে কাজ করে যেতে হয়।

ট

যেসব ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ সরকারের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকে তাদের ও আমলাদের মধ্যে সরকারী কাজকর্মে কোন পার্থক্য থাকে না। আমলারা রাজনৈতিক বক্তৃতাবিবৃতির সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও রাজনীতি বুঝে ও জানে এবং ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতাহীন রাজনীতিবিদদেরকে কিভাবে কি করতে হয় তা বিচক্ষণভাবে জানে। দু'জন

www.pathagar.com

একই ক্ষেত্রে থেকে একজন জানলে এবং অপরজন না জানলে দু'জনের মধ্যে অমিল থাকে এবং যে জানে না সে দুর্বল থাকে এবং যে জানে সে যে জানে না তার দুর্বলতার সুযোগ না নিয়ে চুপ করে বসে থাকে না। এজন্যে আমলারা যেভাবে রাজনীতি বুঝে ও জানে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকেও সেভাবে আমলাতন্ত্র এবং আমলাতন্ত্রের স্বরূপ, আদর্শউদ্দেশ্য, পরিধিক্ষেত্র, কর্মপদ্ধতি, আকারপ্রকৃতি, বিধিবিধান কার্যকর করার পন্থা ও অন্যান্য বিষয় সম্যকভাবে বুঝতে ও জানতে হয়। ফলে, আমালাতন্ত্রের ওপর ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রসূ হয়। তাছাড়া, আমলাদের রাজনীতির প্রয়োজন নেই; কিন্তু ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা আমলাতন্ত্র বুঝে ও জেনে আমলাদেরকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সঠিক কল্যাণের সব উদ্যোগ ও প্রয়াস বর্থতায় পর্যবসিত হয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আমলারা ক্ষমতাসীনদের আদেশনির্দেশ কার্যকর করে। তারা চায় না যে, ক্ষমতাসীনেরা অসন্তুষ্ট হোক। ক্ষমতাসীনদেরকে অসন্তুষ্ট করে তারা নিজেদের সুযোগসুবিধা নষ্ট করতে চায় না। ক্ষমতাসীনদের আদেশনির্দেশ বেআইনী হলে সেটার মাশুল একদিন–না–একদিন স্বয়ং তাদেরকেই দিতে হয়। এতে আমলাদের কিছুই আসেযায় না। অপরদিকে, আমলারা ক্ষমতাসীনদের বেআইনী আদেশনির্দেশ মানলে নিজেরাও নিজেদের স্বার্থে বেআইনী কাজ করতে পারে এবং তাদের এ বেআইনী কাজে হস্তক্ষেপের সাহস ক্ষমতাসীনেরা, তাদের নিজস্ব দুর্বলতার কারণে, হারিয়ে ফেলে। ক্ষমতাসীনেরা আমলাদেরকে যেদিকে পরিচালনা করে তারা সেদিকে পরিচালিত হয়। এরকম একটা গল্প শুনা যাচ্ছে যে, একবার নাকি কোনএক ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলীয় কোনএক জাদরেল নেতার বিরুদ্ধে একজন আমলাকে, যেভাবে পারে, একটি মামলা সাজাতে বলে। সেআমলা যথারীতি একটি মামলা সাজিয়ে দেয় এবং মামলাটি কোর্টে রুজু হয় ও ওজাদরেল নেতাটির শাস্তি হয়ে যায়। পরবর্তীতে ওবিরোধী দল ক্ষমতাসীন হয় এবং ওজাদরেল নেতাটি ছাড়া পায়। সে ক্ষমতায় এসেই ওআমলাকে ডাকে এবং তার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলাটি সাজানোর কথা ওঠায়। সেআমলা নাকি ওজাদরেল নেতাটিকে জানায় যে, যারা ক্ষমতায় ছিলো তাদের নির্দেশে সে তা করেছে এবং এখন তার নির্দেশ পেলে সে ক্ষমতাচ্যুত যেকোন জাদরেল নেতার বিরুদ্ধে অনুরূপ মামলা সাজাতে পারবে এবং তাতে তার শাস্তিও হবে। আমলারা আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী সবই পারে, কেননা তাদের আছে সর্বোচ্চ শিক্ষাগতযোগ্যতা, নানাধরনের প্রশিক্ষণ ও সুদীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাই, আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্যে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরো থাকতে হয় আমলাদের মতো সর্বোচ্চ শিক্ষাগতযোগ্যতা, নানাধরনের প্রশিক্ষণ ও সুদীর্ঘ বাস্তব

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা। এসবের সাথেসাথে তাদের আরো থাকতে হয় সততা, ন্যায়পরায়ণতা, অনুরাগ ও নিষ্ঠা।

সরকার কর্মচারী নিয়োগ করে এবং জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। সরকার বলতে প্রতিনিধিদেরকেই বুঝায়। কর্মচারীরা সরকার থেকে আলাদা, কেননা কর্মচারীদেরকে সরকারী কর্মচারী বলা হয়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীও জনগণের প্রতিনিধি। প্রতিনিধিরাই আইনপ্রণয়ন করে এবং বিধান, পদ্ধতি ও নিয়ম তৈরি করে। এসব কারণে প্রতিনিধিরা সরকার হিসেবে সর্বসময় কর্মচারীদের ওপরে এবং তারাই কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। বাস্তবে প্রতিনিধিরাই কর্মচারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এর দু'টি কারণ আছে। একটি হচ্ছে যে,সব প্রতিনিধি সর্বসময় জ্ঞানগরিমায় কর্মচারীদের চেয়ে উত্তম নয় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কর্মচারীদেরকে দিয়ে বেআইনী কাজ করিয়ে নেয়ার প্রবণতা। এসুবাদে কর্মচারীরাও লাগামহীনভাবে বেআইনী ও নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে। তাই, রাজনীতিবিদদের জ্ঞানগরিমা কর্মচারীদের চেয়ে বেশি হতে হয় এবং তাদেরকে কর্মচারীদেরকে দিয়ে বেআইনীভাবে কাজ করিয়ে নেয়ার প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলতে হয়। যারা রাষ্ট্রের বড়াকারের ক্ষতি করেও নির্বাহীপ্রধানের প্রিয়ভাজন বা প্রিয়পাত্র হয়ে থাকতে পারে তারা যে কোন-না-কোন বিশেষ গুণে পারদর্শী তা তারা ও নির্বাহীপ্রধানই জানার কথা। এধরনের গুণে গুণান্বিত রাজনীতিবিদদের দ্বারা শেষপর্যন্ত রাষ্ট্র ও জনগণের কোন উন্নতি হয় না। এপ্রসঙ্গে কর্মকর্তাদের এলোপাতাড়ি বা এলোমেলো পদোন্নতির দৃষ্টান্তটি দিচ্ছি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে বাস্তবে কোন তথ্য সংগ্রহ না করে কিছুসংখ্যক সুবিধাবাদী জুনিয়র কর্মকর্তার যোগসাজশে এলোপাতাড়ি পদোন্নতি দেয়াতে অনেক দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তা যে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং আগামীতে যে তাদের পদোন্নতির পথ বন্ধ হয়ে গেছে সেকথা নাইবা উল্লেখ করলাম। এপদোন্নতি খালি পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যশীল নয় বিধায় বহুসংখ্যক পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদের চেয়ে নিম্নপদে নিয়োজিত আছে। অথচ, এরা সবাই পদোন্নতিপ্রাপ্ত স্কেলে বেতন নিচ্ছে। এতে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় সংযোজিত হয়েছে ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের থেকে কোন কর্ম পায়া যাচ্ছে না। এজন্যে জোড়াতালি দিয়ে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার জন্যে নিম্নপদ উন্নীত করার চিন্তাভাবনা কাজ করছে। অপরদিকে, যেসব সৎ ও যোগ্য সিনিয়র অফিসার এলোপাতাড়ি পদোন্নতি পায়নি তারা এসব কারণে সম্ভবতঃ কোন পদোন্নতি ছাড়াই অবসরগ্রহণ করতে হবে, কেননা যে সীমিত সংখ্যক কর্মকতা পদোন্নতি পায়ার

www.pathagar.com

কথা সেসংখ্যার চেয়ে অনেকবেশি সংখ্যক জুনিয়র কর্মকর্তা পদোন্নতি পায়ায় তারা ভবিষ্যতে সমন্বিত হতে থাকবে এবং পরবর্তী পদোন্নতির ক্ষেত্রে সিনিয়র হয়ে আছে। এভাবে যারা সিনিয়র অফিসারদের ভবিষ্যৎ রুদ্ধ করে দেয়, কর্মকর্তাদেরকে কর্মহীন করে রাখে এবং দেশের অজস্র অর্থের অপচয় করায় তারা কি করে ক্ষমতায় ও চাকরিতে থাকতে পারে তা জনগণকে ভাবিয়ে তোলে। এতে নির্বাহীপ্রধানের প্রতি জনগণের আস্থাহীনতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।

সরকারী কর্মচারীরা সরকারের, অর্থাৎ দেশের, কাজসম্পাদন করার জন্যে। সরকার বলতে বাস্তবে ক্ষমতাসীন দল বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদেরকে বুঝায়। তাই বলে কি সরকারী কর্মচারীরা ক্ষমতাসীন দলের বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত কাজ করবে? সরকারী কর্মচারীরা কারো ব্যক্তিগত কাজের জন্যে নয়। অথচ, ক্ষেত্রবিশেষে সরকারী কর্মচারীদেরকে তাদের ব্যক্তিগত সাহচর্যে থাকতে হয় এবং তাদের সেবাযত্নে ব্যতিব্যস্ত থাকতে ও হন্তদন্ত বা উৎকণ্ঠিত হয়ে ছুটোছুটি করতে হয়। মাঠপর্যায়ে এটা বেশি পরিলক্ষিত হয়। এতে সত্যিকারার্থে সরকারী কাজকর্ম ব্যাহত হয়। ক্ষমতাসীন দল বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা সরকারী কর্মচারীদেরকে তাদের ব্যক্তিগত কাজের সংস্পর্শে আসতে না দিয়ে সরকারী কাজে মনোনিবেশ করালে সরকারী কর্মচারীদের প্রতি তাদের কোন দুর্বলতা থাকবে না বিধায় সরকারী কর্মচারীদের থেকে সঠিকভাবে কাজ আদায় করে নিতে তাদের মধ্যে কোন ইতস্ততভাব বা সংকোচভাব থাকবে না। শুধু মুখে কাজ কাজ করলে কাজ হয় না। কাজ করলেই কাজ হয়। কাজ না হলে বিভিন্ন কারণে হয় না। তবে, দু'টি প্রধান কারণ হচ্ছে নিজস্ব স্বার্থ না থাকলে বা নিজে কোন সুবিধা না পেলে না করা এবং আলস্য করে না করা। সাধারণত যারা কাজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে তারা কর্মকর্তা ও কর্মচারী। কাজ করার জন্যে তাদেরকে বেতনাদি দেয়া হয়। তাই, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে একটিএকটি করে সব কাজ করে যায়া। যেকোন কারণে বা আলস্য করে কাজ না করাটা একটি মারাত্মক অপরাধ। সময়ের কাজ সময়ে না হলে জনগণের ভোগান্তি বাড়ে, দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং দীর্ঘসূত্রতার কারণে নানা জটিলতা দেখা দেয় ও জাতীয় অগ্রগতিতে স্থবিরতা আসে। এমনো দেখা যায় যে, লোকজন ন্যায়সংগত কাজের জন্যে জায়গায়জায়গায় ধর্না দিতেদিতে নিস্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তবু, তাদের কাজ হয় না এবং তারা কোথাও কোন প্রতিকারো পায় না। ফলে, যারা কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত তারা যাদের কাজ তাদেরকে আমলেই আনে না বা গ্রাহ্যই করে না। যাদের কাজ তাদের মধ্যে যারা এব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে যায় তারা চরম দুরবস্থায় নিপতিত হয়। এতে জনসাধারণ

www.pathagar.com

ভাবে যে, ক্ষমতাসীনদের সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুসম্পর্ক না থাকবেতো এমনটি হবে কেন। এধরনের ভাবনা ক্ষমতাসীনদের বিপক্ষে কাজ করে। জনগণকে স্বপক্ষে রাখাইতো রাজনীতিবদদের অন্যতম কাজ, কেননা জনগণ বিপক্ষে গেলে পতন ঠেকানো যায় না এবং তা একদিন-না-একদিন আসেই। তাই, সেসব রাজনীতিবিদই ক্ষমতায় সফলকাম হতে পারে যারা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা দ্বারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে দিয়ে প্রতিটি কাজ ন্যায্যভাবে যথাসময়ে নিষ্পাদন বা সম্পাদন করাতে পারে এবং তাদের মধ্যে যারা অলস ও দুর্নীতিপরায়ণ, তাদের ন্যায়পরায়ণতার এবং তাদের পক্ষে বলিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ জনমতের স্বার্থে, তাদের বিরুদ্ধে যথোচিত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থাগ্রহণ করতে কোনপ্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে না ও কারো দ্বারা প্রভাবিত হয় না, কেননা ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে কোনপ্রকার প্রভাবের প্রয়োজন হয় না।

কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত না হয়ার পেছনে কর্তব্যে অবহেলা কাজ করছে। অধস্তনেরা কর্তব্যে অবহেলা করলে উর্ধ্বতনেরা তাদের বিরুদ্ধে নিয়মানুযায়ী নিরপেক্ষভাবে সব অন্যায়ের উর্ধ্বে থেকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অধস্তনেরা কর্তব্যে অবহেলা করার দুঃসাহস বা অনুচিত সাহস হারিয়ে ফেলে। তবে, বাস্তবে নিয়মানুযায়ী নিরপেক্ষভাবে সব অন্যায়ের উর্ধ্বে থেকে কার্যকর ব্যবস্থা খুবকমই গ্রহণ করা হয়, কেননা উর্ধ্বতনেরাও অহরহ বা নিত্য বিভিন্ন অজুহাতে কর্তব্যে অবহেলাপ্রদর্শন করছে। সরকার বলতে যেসব ক্ষমতাসীন লোককে বুঝি তারাও উর্ধ্বতনদের কর্তব্যে অবহেলার বিরুদ্ধে তেমনকোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে না, কেননা তাদেরো কর্তব্যে অবহেলার অন্ত নেই। তাই, কর্তব্যে অবহেলা পারস্পরিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের এ পারস্পরিক ব্যাপারে সাধারণ লোক ভোগান্তির শিকার হচ্ছে এবং উন্নতি ও অগ্রগতি দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অনেক কর্মকর্তা তাদের স্বস্ব ক্ষেত্রে কোন সাধারণ প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়। তাদের যুক্তি হচ্ছে যে, তারা তাদের স্বস্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ এবং সাধারণ প্রশাসকদের এদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নেই। তাই, এসব প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণ তাদের কর্মে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এপ্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজিয়ে রাখলে সেটার অনিবার্য ফল স্বেচ্ছাচারিতাতে রূপান্তরিত হয় যা দেশ ও জনগণের জন্যে খুবই ক্ষতিকর। তাই, স্বেচ্ছাচারিতা দমনের জন্যে তৃতীয় একটি কর্তৃপক্ষ, যে-ই হোক-না-কেন, থাকতেই হয়। তা না হলে স্বেচ্ছাচারিতা দমন করা যায় না, কেননা এমনকোন লোক নেই যার মনমগজে কিছু-না-কিছু স্বেচ্ছাচারিতার ছাপ নেই। অফিসআদালতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার চেয়েও ভয়াবহ ও মারাত্মক। যেখানে যেভাবে চলছে সেখানে

www.pathagar.com

সেভাবটাতে এজন্যে হাত দেয়া হচ্ছে না যে, তাতে হাত দিতে গেলে নানা সমস্যার উদ্ভব হবে এবং সেগুলো সমাধান করতে অনেক ঝামেলা হবে। এঝামেলার ভয়ে সেভাবটাতে হাত না দিয়ে সেটাকে এড়িয়ে যায়া হচ্ছে। এটা দেশের জন্যে খুবই ক্ষতিকর। কাজেই, যেখানে যেভাবে চলছে সেখানে সেভাবটাতে চলাতে দেশের ক্ষতি হলে যেকোন মূল্যে, দেশের স্বার্থে, তাতে পরিবর্তন আনতে হয়।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা অনুযায়ী সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ করা হয়। একবার নিয়োগের পর বারবার বিভিন্নভাবে মেধাপরীক্ষা, বিভাগীয় পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যতীত, একটি প্রহসন এবং কোনকোন মহলের যথেষ্ট সুযোগসুবিধা ব্যতীত অন্যকিছু নয়। বারবার পরীক্ষার কারণে অফিসারদেরকে সর্বদা ছাত্র হয়ে বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে, সর্বপর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়, কেননা এতে কাজকর্ম যথারীতি সম্পাদিত হয় না এবং দীর্ঘসূত্রতা চলতেই থাকে। যেসব অফিসার সততার সাথে আন্তরিকভাবে কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকে তাদের পক্ষে এভাবে ছাত্র বনা সম্ভব নয়। অফিসাররা তাদের কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করতে না পারায় যে চরম প্রশাসনিক অব্যবস্থা বিরাজমান থাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। উক্ত পরীক্ষা অফিসারদেরকে তোষামোদকারী হতে শিখায় এবং তারা বাস্তবে সঠিকভাবে কার্যসম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে তোষামোদকে গুরুত্ব দেয়। বিচক্ষণ দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে, এটা দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথে একটি বিরাট বাধা ও অন্তরায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মেধাতালিকাতে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে, পরবর্তীতে বারবার পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার ব্যতীত, পদোন্নতির বিধান বলবৎ থাকলে কোনপ্রকার জটিলতা, সমস্যা ও অনিয়ম হবে না, কেননা, যে যা-ই বলুক-না-কেন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেই মেধাযাচাই হয়ে যায়। পরবর্তীতে বারবার পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নিয়ম মেধা, অভিজ্ঞতা, সততা ও সদাচার পরীক্ষার কোন বাস্তব মাপকাঠি হতে পারে না। চাকরিতে ঢুকার সময়ই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে মেধা নির্ধারিত হয়ে যায়। তাই, চাকরিতে ঢুকার পর বারবার মেধাযাচাই সম্পূর্ণরূপে অবান্তর ও অবাস্তব। তাছাড়া, এনিয়মে জুনিয়র অফিসাররা সিনিয়র অফিসারদেরকে অতিক্রান্ত করে। যার যতোবেশি চাকরি তার ততোবেশি অভিজ্ঞতা। পিতার যেঅভিজ্ঞতা ছেলেপেলের সেঅভিজ্ঞতা নেই। আমাদের এদেশে সৎ ও সদাচারী অফিসারদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন বেশি খারাপ হয়। তাছাড়া, তারা সম্মান ও ব্যক্তিত্বকে বেশি মূল্য দেয় বিধায় তোষামোদ, মোসাহেবি ও স্তাবকতা অপছন্দ করে এবং দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জন করতে ও যেখানে যেভাবে প্রদান করার প্রয়োজন সেখানে সেভাবে প্রদান করতে পারে না। এসব এবং আরো অনেক কারণে তারা অযোগ্যই বিবেচিত হয়। এটা সিনিয়র অফিসারদের প্রতি চরম

www.pathagar.com

অবমাননা এবং প্রশাসনিক কর্মসম্পাদনে বিক্ষিপ্ততা যা রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে এক মারাত্মক অব্যবস্থা। এঅব্যবস্থা যে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যাহত করে তাতে কোন সন্দেহ নেই ও থাকার কথা নয়। তাই, অফিসারদের সিনিয়রিটি তাদের চাকরিতে ঢুকার সময় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে নির্ধারিত মেধা অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বহাল রেখে তাদেরকে পর্যায়ক্রমে, সিনিয়র স্কেলে চাকরির মেয়াদের কোন শর্ত না জুড়ে, পদোন্নতি দেয়াটা সার্বিক স্বার্থে একান্ত অপরিহার্য। এসিনিয়রিটি ঠিক রাখারো পন্থা আছে। যে যখনই, আগে হোক বা পরে হোক, যেস্কেলে এসে যায় সেস্কেলে সে তার মেধাতালিকায় সিনিয়রিটি অনুযায়ী সিনিয়রিটি পেয়ে যাবে। ফলে, মেধাতালিকা অনুযায়ী তার কোন জুনিয়র অফিসার তার আগে যেস্কেলেই যায়–না–কেন সেস্কেলে সে তার জুনিয়রই থাকবে। এটা সিনিয়র স্কেল থেকেই কার্যকর থাকতে হবে, কেননা এস্কেলে আসতে হলে অনেক পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। এসব পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের কারণেই কেউ আগে সিনিয়র স্কেল পেয়ে যায় ও কেউ তা পরে পায়। তাই, যারা সিনিয়র স্কেলে থাকে তাদের কে আগে বা কে পরে তা পায় সে নিয়ম না রেখে তাতে তাদের মেধাতালিকায় সিনিয়রিটির নিয়ম রাখতে হবে। তা হলেই সিনিয়রিটি নষ্ট হবে না। এনিয়ম ব্যতীত অন্য যেনিয়মই করা হবে–না–কেন সিনিয়রিটি নষ্ট হবেই। চাকরিতে ঢুকার পর বিভিন্ন কারণে জুনিয়র অফিসাররাও সিনিয়র অফিসারদের আগে সিনিয়র স্কেল পেতে পারে ও পায়ও। কিন্তু, সিনিয়রিটির বিধানকে উপেক্ষা করে যখন এস্কেলে প্রশাসন কয়েক বছর চাকরি করার শর্ত লাগিয়ে দেয় তখনই সিনিয়রিটি নষ্ট হয়, কেননা যেসব জুনিয়র অফিসার আগেই এস্কেল পায় তারা আগেই এশর্ত পূরণ করে। কোনকোন অফিসার যে অপরাধী হয় না তা নয়। অপরাধী অফিসার নিয়মমোতাবেক তার অপরাধের শাস্তি পাবে। কিন্তু, একবার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা নির্ধারিত হলে সেমেধা অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি হলে কোন অফিসারের প্রতি অবিচার হবে না। ফলে, তোষামোদ, মোসাহেবি ও স্তাবকতা থাকবে না, সৎ ও নিষ্ঠাবান অফিসাররা সততা ও নিষ্ঠার সাথে যথাযথভাবে কর্মসম্পাদন করতে পারবে, দীর্ঘসূত্রতা থাকবে না, রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে অব্যবস্থা থাকবে না, সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করা যাবে, অনিয়মিত ও বেআইনী সুযোগসুবিধার সৃষ্টি হবে না, পদোন্নতির নিয়মবিধি বারবার পরিবর্তিত হবে না এবং পদোন্নতিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সূচিত হবে। এনীতির বাইরে যে যতো যুক্তিই দেখাবে–না–কেন বুঝতে হবে যে, সে তার ব্যক্তিগত স্বার্থেই তা দেখাচ্ছে, দেশের ও জাতির স্বার্থে নয়।

www.pathagar.com

অফিসারদের পোস্টিং-এর ক্ষেত্রে কোন নিয়মরীতি অনুসরণ করা হয় না। গুরুত্বপূর্ণ এবং ঢাকা ও তার আশেপাশের জেলা ও থানার পদগুলোতে সচিবপর্যায়ের কর্মকর্তা ও ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের আত্মীয়স্বজনকে পোস্টিং দেয়া হয়। এসব পদে তাদেরকেও পোস্টিং দেয়া হয় যারা ব্যাকিং লাগাতে ও প্রচুর টাকা খরচ করতে পারে। সাধারণত, নীতিবান ও সৎ অফিসাররা এসব পছন্দ করে না। ফলে, তারা স্বপ্নেও এসব পদে পোস্টিং পায়ার কথা ভাবতে পারে না। এতে করে দুর্নীতিপরায়ণ অফিসাররা এসব পদে পোস্টিং পেয়ে যায় এবং তারা নির্ভীকতার সাথে লাগামহীনভাবে দুর্নীতি করতে থাকে। তারা একভাবে-না-একভাবে সর্বসময় এসব পদেই পোস্টিং পেতে থাকে। তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও কোন লাভ হয় না, কেননা যাদের নিকট অভিযোগ করা হয় তাদের মদদেই তারা এসব পদে পোস্টিং পেয়ে থাকে। অথচ, এসব পদে পোস্টিং পেতে হয় সৎ ও নীতিবান অফিসাররা। বদলির ক্ষেত্রেও কোন নিয়মরীতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। ফলে, যেসব অফিসারের সচিবপর্যায়ের আত্মীয়স্বজন ও রাজনৈতিক ব্যাকিং আছে তাদের বদলি তাদের পছন্দানুযায়ী এবং তারা চেলে ঢাকায় বা ঢাকার আশেপাশে হয়। তাছাড়া, যারা প্রচুর টাকা খরচ করতে পারে তারাও তাদের পছন্দানুযায়ী বদলি নিতে পারে। সৎ ও নীতিবান কর্মকর্তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে পোস্টিং দিয়ে দুর্নীতি দমনের প্রচেষ্টা চালাতে হলে পোস্টিং ও বদলির ক্ষেত্রে এসব মারাত্মক অনিয়ম দূর করতে হবে। শুধুশুধু আদেশ জারি করে এটাতে সফলতা অর্জন করা যাবে না। এটাতে সফলতা অর্জনের জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকতে হবে এবং যে-ই এনিয়ম লংঘন করবে, সে যে-ই হোক, তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। সিনিয়রিটিমোতাবেক এসব পদে পোস্টিং ও বদলির ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে। দেখা যাচ্ছে যে, অনেক অফিসার, বেশ সিনিয়র হয়া সত্ত্বেও, সচিবপর্যায়ে আত্মীয়স্বজন ও রাজনৈতিক ব্যাকিং না থাকার কারণে ও প্রচুর টাকাপয়সা খরচ করতে পারে না বিধায় সর্বসময় অনগ্রসর ও দূরবর্তী জায়গাতে পোস্টিং পেয়ে থাকে। তাদের কোন আবেদননিবেদন কোন কাজে আসে না। অপরদিকে, অনেক জুনিয়র অফিসার, সচিবপর্যায়ে আত্মীয়স্বজন ও রাজনৈতক ব্যাকিং থাকার কারণে ও প্রচুর টাকাপয়সা খরচ করতে পারে বিধায়, ঢাকায় ও তার আশেপাশে ও তাদের পছন্দসই জায়গাতে একের-পর-এক পোস্টিং পেয়ে থাকে। এসব অনিয়মের মাধ্যমে সংঘটিত দুর্নীতি দূর করার জন্যেও একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকবে এবং যারা এনিয়ম ভঙ্গ করবে তারাও তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ শাস্তি পায়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। যেসব অফিসার যতোবেশি সিনিয়র হতে থাকবে তারা তাদের সিনিয়রিটিমোতাবেক ঢাকায় ও তার আশেপাশে পোস্টিং ও বদলি পেতে থাকবে। ফলে, অফিসারদের প্রতি সুবিচার

www.pathagar.com

সুনিশ্চিত হবে ও তারা সুচারুরূপে দায়িত্বপালনে উৎসাহবোধ করবে এবং দুর্নীতি অনেকাংশে লোপ পাবে। তবে, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা পক্ষপাতিত্বহীন ও নিরপেক্ষ থাকতে না পারলে এবং নিয়মরীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে এটা সম্ভব হবে না। এটা যতোদিন সম্ভব না হবে এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতি ততোদিন মাতা উঁচু করে চলতে থাকবে এবং প্রশাসনিক উৎকর্ষসাধনের আশা দুরাশায় পর্যবসিত হবে।

বিভিন্ন সরকারের সময় সরকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এদেশের নাগরিক। তাদের ভোটাধিকার আছে এবং নির্বাচনের সময় তারা তাদের এঅধিকার প্রয়োগ করে থাকে। তারা সবাই কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক নয়। তাদের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন থাকাটা স্বাভাবিক। তাই, তারা তাদের পছন্দানুয়ায়ী বিভিন্ন দলের বিভিন্ন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে থাকে। তাদেরকে কোন একটি দলের সমর্থক বলা যায় না। তবে, যে যেদলের সমর্থকই থাকে–না–কেন, সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের নির্ধারিত নিয়মরীতিমোতাবেক সরকারী কার্য সম্পাদন করা। তাদের এ সম্পাদিত কাজে ন্যায়ের সমর্থকেরা লাভবান এবং অন্যায়ের সমর্থকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এসব লোকজন বিভিন্ন দলের সমর্থক। এখন কথা হচ্ছে যে, ন্যায়সংগতভাবে কোন একদলের একজন ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অন্যকোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক বলাটা সমীচীন হবে না। তাছাড়া, একসরকারের সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত ও নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে সেসরকারের সমর্থক বললে বিভিন্ন সরকারের সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত ও নিয়োজিত বিভিন্ন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন সরকারের সমর্থক বলতে হয়। বাস্তবে এটা কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। রাজনীতিবিদেরা এরকম ভেদাভেদ সৃষ্টি করলে কর্মকর্তারা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে তাদের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায়, সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ন্যায়সংগতভাবে সম্পাদিত হয় কিনা তা দেখা এবং তাদের কারো দায়িত্ব ন্যায়সংগতভাবে সম্পাদিত না হলে তার বিরুদ্ধে যথাসময়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কতকগুলো শর্তসাপেক্ষে চাকরিতে যোগদান করতে হয়। কর্মচারীরা শর্ত লংঘন করলে যেশাস্তি পায়ার তা পাবে। তাতে আন্দোলন করার কিছুই থাকতে পারে না। তবু, কর্মচারীদের আন্দোলনে বিশঙখলা দেখা দেয়, কাজকর্মের পরিবেশ নষ্ট হয় এবং জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের বা সরকারের দুর্বলতার কারণেই এসব হয়। এদুর্বলতা হচ্ছে যেকোনভাবে সবাইকে প্রীত ও তুষ্ট রেখে ক্ষমতায় টিকে থাকা। তাই, তাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, তাদের দুর্বলতা ছাড়া কোন বেআইনী কার্যকলাপ পরিচালিত হতে পারে না। নিখুঁত ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের জন্যেই

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ। এতে সরকারের বিপুল অর্থ খরচ হয়। বাস্তবে প্রশিক্ষণ হচ্ছে বিশ্রাম এবং যারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় তাদের পূর্বের ও পরের কর্মসম্পাদনে তেমনকোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাই, যেপ্রশিক্ষণের কোন সুফল ফলিত হয় না সেটা জাতীয় অপচয় ব্যতীত অন্যকিছু নয়। সব অব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে যোগ্য ব্যক্তিদেরকে যোগ্য স্থান দিতে হবে এবং যার মধ্যে আগে বাড়ার যোগ্যতা পরিলক্ষিত হয় তাকে আগে বাড়তে উৎসাহিত করতে হবে। যার আগে বাড়ার যোগ্যতা নেই সে জাতীয় স্বার্থে নিজেকে সামলিয়ে নিতে হবে এবং যে আগে বাড়ার তাকে আগে বাড়তে দিলে সে পেছনে সরে যেতে হবে বলে তার পথে কাঁটা হয়ার কুমতলব ও দুরভিসন্ধি পরিহার করতে হবে।

অনেক অসৎ কর্মচারীর মধ্যে একজন সৎ কর্মচারী সৎভাবে কাজ করাতে সহযোগিতা পায়াটা বড় দুষ্কর হয়। তার অধীনস্থরা তার কথা শুনতেই চায় না। তারা তার কাজের গতি নানাভাবে স্তব্ধ করে তাকে সংশ্লিষ্ট সবার নিকট অকর্মণ্য, কলহপ্রিয়, কাজের গতিবিনষ্টকারী, ঝামেলাসৃষ্টিকারী, বদমেজাজী ইত্যাদি প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে না বিধায় এমনভাবে প্রতিটি কাজ করে যাতে সে কাজটি ধরতে গেলেই তা আটক পড়ে এবং সম্পাদনের অভাবে নানা সমস্যা দেখা দেয়। তাই, সে বাধ্য হয়ে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজটি ছেড়ে দিতে হয়। তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে সমর্থন দিলে সে সহজে তার যেসব অধস্তন দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে কাজ করে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সে তার অধস্তনদের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ ধরে দিলে তার উর্ধ্বতনেরা সাথেসাথে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ করবে এবং সে যেখানে কাজ করে সেখানে তার অবস্থান সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ করবে। একটি কাজ শুরু করে তা শেষ করার পূর্বপর্যন্ত দেখা যেতে পারে যে, গতানুগতিকভাবে তা শেষ করলে সরকারী সম্পদ ও অর্থের যথেষ্ট অপচয় হতে পারে। এঅপচয় রোধ করতে চেলে গতানুগতিকতাতে পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এতে সমস্যা ও বাধার সৃষ্টি হয়। কর্মকর্তাদেরকে তাদের কাজের গতিতে সব বাধা অপসারণ করতে ও সব সমস্যার সমাধান দিতে পারতে হয়। এজন্যে কর্মকর্তাদের সৃজনশীল প্রতিভার প্রয়োজন। অথচ, সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী কর্মকর্তারা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় ও প্রায়সময় সমস্যার সমাধান দিতে উর্ধ্বতনদের সহযোগিতা ও সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়, কেননা সাধারণত উর্ধ্বতনেরা চায় না যে, অধস্তন কর্মকর্তাদের সৃজনশীল প্রতিভাবিকাশের ফলে তাদের অসুবিধা হোক ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হোক। বলার সাথেসাথে করতেই হবে — এটা গণতন্ত্রের বা ন্যায্যতার স্বরূপ নয়, স্বৈরাচারের বা একনায়কত্বের স্বরূপ। নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিটি কাজ হলে বলার

www.pathagar.com

সাথেসাথে করার প্রশ্ন ওঠে না। নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ না হলেই বলার সাথেসাথে করার প্রশ্ন ওঠে। বলার সাথেসাথে করতে গেলে খারাপো হতে পারে। যাতে খারাপ না হয় সেজন্যেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে করতে হয়। কিন্তু, খারাপ হলেও ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা ও উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা বললেই করতে হয়। সরকার নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করিয়ে নিতে পারলে সাথেসাথে কোন কাজ করার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। ফলে, কোন খারাপ কাজ হবে না। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা এপ্রক্রিয়া কার্যকর করতে পারলে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারাও মুহূর্তের মধ্যে কোন কাজ চেতে সাহসী হতে পারবে না। উর্ধ্বতন ও অধস্তন সবাইকে কাজ বুঝতে হয়। তা হলে সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে তা সম্পাদন করা যায়। কোনকোন ক্ষেত্রে উর্ধ্বতনেরা এবং কোনকোন ক্ষেত্রে অধস্তনেরা কাজ বুঝে না। তবে, উর্ধ্বতনেরা সব কাজ বুঝতে হয়। কিন্তু, তারা মনে করে যে, উর্ধ্বতন হলে কাজ বুঝার দরকার হয় না এবং অধস্তনেরা সবকিছু ঠিক করে দিলে তারা শুধু দস্তখত করবে। তবে, উর্ধ্বতনেরা বুঝা দরকার যে, তারা কাজ না বুঝলে অধস্তনেরা সঠিকভাবে কাজ করে কিনা তারা তা বুঝতে পারবে না। শান্তি ও অগ্রগতির জন্যে প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে হয়। যে যেকাজের উপযুক্ত তাকে দিয়েই সেকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করানো যায়। কোন অনুপযুক্ত লোককে দিয়ে কোন উপযুক্ত কাজ সম্পাদন করানো সম্ভব নয়। কিন্তু, ব্যক্তিস্বার্থ, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির কারণে উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততার মধ্যে ভেদাভেদ লোপ পেয়েছে। ফলে, উপযুক্ত ব্যক্তিরা অবহেলিত হয়ে অনুপযুক্ত ব্যক্তিরাই সমাদৃত হচ্ছে। তাদের কথাবার্তাতে ও চালচলনে তারা বুঝায় যে, তারা অত্যন্ত উপযুক্ত এবং তাদের উপযুক্ততার কারণেই তারা উপযুক্ত পদগুলোতে পোস্টিং পেয়ে থাকে। উক্ত ভেদাভেদ লোপ পায়াতে প্রশাসনিক উৎকর্ষও ব্যাহত হচ্ছে। প্রশাসনিক উৎকর্ষের সাথে সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রশাসনিক উৎকর্ষের জন্যে যে যেকাজের উপযুক্ত তাকে সেকাজে নিয়াজিত করলে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

অনেক দায়িত্ব আছে যেগুলো পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলির ও একজন অপরজনের স্কন্ধে চাপানোর প্রবণতার কারণে সম্পন্ন না হয়ে চাপা পড়ে থাকে এবং জনাসধারণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। নিয়মের ও পদ্ধতির ফাঁকফুঁকের কারণেই এঠেলাঠেলি ও চাপাচাপি সম্ভব হচ্ছে। কাজেই, প্রতিটি দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। এজন্যে নিয়ম ও পদ্ধতি এমনভাবে রচিত হতে হবে যাতে সেগুলোতে কোনপ্রকার ফাঁকফুঁক না থাকে। অফিসআদালতে নিয়ম ও শৃঙখলামোতাবেক একে অপরের সাথে আচরণ করবে। প্রত্যেকের আচরণ সুন্দর, শোভনীয় ও মার্জিত হবে। এটার অর্থ এ নয় যে, একে অপরকে ভয় করবে ও অতিভক্তি দেখাবে। সুষ্ঠুভাবে কাজকর্মসম্পাদনে অধস্তনেরা

www.pathagar.com

উর্ধ্বতনদের সাথে মুক্ত মনে কথা বলবে। এক্ষেত্রে অধস্তনেরা উর্ধ্বতনদেরকে ভয় করতে গেলে অধস্তন ও উর্ধ্বতনদের মধ্যে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হবে যা সঠিকভাবে কর্মসম্পাদনের পথে একটি বড় অন্তরায় হিসেবে থেকে যাবে। অধস্তনেরা উর্ধ্বতনদেরকে অতিভক্তি দেখানোর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু, বাস্তবে এমনো অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে যারা উর্ধ্বতনদেরকে অতিভক্তি দেখিয়ে তাদের মনজয় করে চলে। এঅতিভক্তি দ্বারা তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধার করে নেয়। অপরদিকে, তাদের এঅতিভক্তি সৎ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মকর্তাদের জন্যে ক্ষতিকর হয় এবং তারা তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে যোগ্য দায়িত্ব হতে বঞ্চিত হয়। তাই, এধরনের অতিভক্তি সুষ্ঠু প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ব্যাহড করে। সংকীর্ণ মনমানসিকতা অগ্রগতির পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। কর্মকর্তারাই দেশের কাজ ও উন্নয়নের অগ্রভাগে। তাই, তাদের মনমানসিকতায় কোনপ্রকার সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। মনমানসিকতাকে তখনই উদার বলা যায় সেটার মধ্যে যখন কোন লোভলালসা, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দুর্নীতি স্থান না পায়। কিন্তু, বাংলার মাটিতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রায়সব কর্মকর্তা সংকীর্ণমনা। কাজেই, আমাদেরকে এমন সব কর্মকর্তা সৃষ্টি করতে হবে যাদের মনমানসিকতাতে কোনপ্রকার সংকীর্ণতার লেশ থাকবে না। এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে সরকারের সদিচ্ছার ওপর। কর্তৃপক্ষ যার সাথে যতোটুকু দূরত্ব বজিয়ে রাখা প্রয়োজন তা রাখতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের এধরনের দূরত্বের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অপরদিকে, কর্তৃপক্ষের সাথে কেউ কথা বলতে পারবে না এবং কর্তৃপক্ষ কাকেও ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে শুনবে না তা--ও ঠিক নয়। যার কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন সে তাদের সাথে শালীনভাবে তা বলবে এবং তারাও তাকে গুরুত্বসহকারে শুনবে। এটা কোনপ্রকার বেআদবি নয়। অপরদিকে, কর্তৃপক্ষকে কেউ তার ন্যায়সংগত কোন কথা তারা শুনতে না চেলেও যেভাবেই হোক শুনালে তা তাদেরকে ভয় না করা নয়। কাজকর্মের সম্পর্ক পারস্পরিক। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে সুসম্পর্ক রেখে কাজ করাতে বেআদবির ও ভয়ের কিছু থাকতে পারে না। পারস্পরিক কাজকর্মে ভয় বলে কিছু থাকতে পারে না। ভয় না করাটা বেআদবি নয়। ভয় হলো কাজকর্মে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। ভয় না করে দৃঢ়চিত্তে সঠিক কথা বলা ও কাজ করা অভদ্রতা বা বেআদবি হতে পারে না। অভদ্রতা বা বেআদবি হবে বলে দৃঢ়চিত্তে কাজ না করাটাই ও কথা না বলাটাই ভয়। সবাইকে এভয় পরিহার ও নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সম্প্রীতি ও স্নেহের মাধ্যমে কাজ করে যেতে হবে। তা হলে ভয়ের ও বেআদবির প্রশ্ন আসবে না এবং জাতীয় অগ্রগতিতে প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে। বর্তমানে সরকারী ব্যবস্থা এমন যে, ওপরদিক থেকে কোন নির্দেশ আসলে নিচেরদিক নীতিগত কথা বলার সাহসো হারিয়ে ফেলে। ওপরদিকের সব

www.pathagar.com

নির্দেশই যে সঠিক এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। ওপরদিকের একটি ভুল নির্দেশে দেশের অনেক ক্ষতি হতে পারে, কেননা এনির্দেশের সাথে শুধু দেশের ব্যাপারই নয় বিদেশের ব্যাপারো জড়িত থাকতে পারে। তাই, ওপরদিক থেকে প্রদত্ত নির্দেশে কোনপ্রকার অসামঞ্জস্য থাকলে নিচেরদিক তা ধরিয়ে দেয়ার সুযোগটাকে জাতীয় স্বার্থে অবাধ রাখা উচিত।

নিয়মনীতি ঠিক রেখে সুষ্ঠুভাবে কাজ আদায় করতে গেলে প্রায়সব দিক থেকে অসহযোগিতা আসে। এঅসহযোগিতাকে প্রতিহত করতে গেলে যারা অসহযোগিতা করে তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রমগ্রহণ করতে হয়। এতে দেখা যায় যে, সবাই একদিকে চলে যায় এবং নিজে একাকী অপরদিকে থাকতে হয়। এতে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। এআকারটাকে প্রতিহত করতে পারলে সবকিছুই স্বাভাবিক হয় এবং স্বাভাবিক উপায়ে সব কাজকর্ম আদায় করা যায়। এসময়টা বড় কঠিন। এসময় কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন। কিন্তু, কর্তৃপক্ষ এসময় কোনপ্রকার সহযোগিতা না করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজকর্ম আদায়ে সোচ্চার তাকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়। কর্তৃপক্ষ এজন্যেই একাজ করে যে, চলমান পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপের ফলে জটিলতা ও ঝামেলার সৃষ্টি হয়। সেজন্যে তাদের নিজেদেরকে অকৌশলী হিসেবে পরিগণিত বা বিবেচিত হতে হয়। তারা এধরনের অকৌশলী হয়ে তাদের সুনাম ও সুবিধাদি ক্ষুণ্ন করতে চায় না। এপ্রবণতার কারণে সর্বস্তরে যে আমূল পরিবর্তনের দরকার তা সাধিত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার কথাটি এসে যায়। বিড়াল ইঁদুরের শত্রু। এটা ইঁদুর কেন, আমরাও জানি। বিড়াল এবং ইঁদুর দু'টি আলাদা প্রাণী ও বিড়াল ইঁদুরের চেয়ে এমন সবল যে, কোন ইঁদুরের পক্ষেই তার গলায় ঘণ্টা বাঁধা সম্ভব নয়। কিন্তু, আমরা সবাই মানুষ। আমাদের বিবেকবুদ্ধি আছে এবং আমরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এনির্ভরশীলতার কারণে আমরা একেক জন একেক দায়িত্বে নিয়োজিত। এসব দায়িত্ব বিধি ও নিয়মমোতাবেক সম্পাদন করতে হয়। সর্বপর্যায়ে সবাই বিধি ও নিয়ম সঠিকভাবে অনুসরণ করছে না বিধায় বর্তমান অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশপরিস্থিতি বিরাজ করছে। একদিকে আমরা সবাই এটার অবসান চাচ্ছি, অপরদিকে এটাতে হাত বাড়াতে গিয়ে অকৌশলী হতে চাচ্ছি না। এঅবস্থায় আমরা কখনো দেশে একটা সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের মঙ্গলের ও অগ্রগতির কথা ভাবতে পারি না। তাই, যারা বিধি ও নিয়ম অনুযায়ী কাজ আদায় করতে গিয়ে বিরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেটাকে রুখে দাঁড়িয়ে, তাদেরকে সর্বতোভাবে বা সবদিক দিয়ে সহযোগিতাপ্রদান করে একটা আমূল পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে সবাইকে সুশৃঙ্খল পরিবেশের আওতায় এনে দেশের অগ্রগতির স্বার্থে কাজ করে যেতে হবে।

www.pathagar.com

কাজের প্রতি অনীহার বা অনুৎসাহের কারণে সময়ের কাজ সময়ে সম্পাদিত হয় না বিধায় জনগণের ভোগান্তি হচ্ছে। কোনকোন কাজ বিভিন্ন কারণে বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে এবং কোনকোন কাজ ঘুষ খেয়ে করছে। যেসব কাজে বাধ্য হচ্ছে না ও ঘুষ পাচ্ছে না সেগুলোতেই অনীহা বেশি। এতে কাজ জমতে থাকে, ঝামেলা বাড়ে এবং যাদের কাজ তারা নানাভাবে ভোগতে থাকে। কর্মকর্তারা ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের নিকট অনুমোদনের জন্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পাঠায়। তারা যথাযথভাবে বর্ণিত নয় এমনকোন সিদ্ধান্ত অনুমোদন না করাটাই হবে যথার্থ। তাদেরকে বুঝতে হবে যে, যেকর্মকর্তার সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বর্ণিত হয় না হয়তো সে কাজ বুঝে না ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না নয়তো তাতে তার কোন নিজস্ব স্বার্থ জড়িত আছে এবং এদুটোর কোনটিই জাতির জন্যে মঙ্গলজনক ও সুফলদায়ক নয়। তবে, যেরাজনীতিবিদ কাজ বুঝে ও নিজেই সিদ্ধান্ত দিতে জানে কোন কর্মকর্তাই তার নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা না করে কোন সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্যে পাঠাবে না। তাই, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে প্রতিটি কাজ বুঝতে হবে এবং সিদ্ধান্ত দেয়ার ধীশক্তির অধিকারী হতে হবে। তাদের নিকট কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য না হলে তারা হয়তো নিজেরাই সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে নয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপনের নির্দেশাবলী দিয়ে দেবে। কিন্তু, কোনকিছুই সিদ্ধান্তহীনভাবে ফেলে রাখা ঠিক হবে না এবং সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনক্রমেই দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করা যাবে না। কখনোকখনো কর্মকর্তাদের কার্যক্রম পছন্দসই হয় না। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করার মতো জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হবে। কখনোকখনো কর্মকর্তাদের লেখা থেকে বিষয়বস্তু উদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে বিষয়বস্তু সহজসরল ও বোধগম্য করে লিখার ব্যুৎপত্তির অধিকারী হতে হবে। তা হলেই কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা প্রতিটি বিষয়ে সতর্ক থাকবে এবং কাজকর্মে কোনপ্রকার ফাঁক বের করে ফাঁকি দিতে পারবে না।

বর্তমানে যারা কৌশলী তারাই ভালো করছে আর যারা অকৌশলী তারা পদেপদে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ছে ও সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে না। তারাই কৌশলী যারা অন্যান্যের মনমেজাজ বুঝে তাদের সাথে আচারব্যবহার করার ও চলার দক্ষতা ও ক্ষমতা রাখে। তারা অবস্থা অনুযায়ী কি করা বা বলা উচিত তা বুঝতে পারার সূক্ষ্মশক্তি বা কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ের শক্তি রাখে। এককথায়, তারা মন বুঝে চলাতে বা অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে শক্তিসম্পন্ন। অকৌশলী ব্যক্তিরা পরের মন বুঝে চলাতে ক্ষমতাহীন বা অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে শক্তিবিহীন। পরের মনমেজাজ বুঝে কাজ করা এবং বিধিবিধান ও আইনকানুন বুঝে কাজ করা একবিষয় নয়, দু'টি পৃথক

www.pathagar.com

বিষয়। পরের মনমেজাজ আইনকানুনের অনুকূলে না-ও হতে পারে। তাই, পরের মনমেজাজ বুঝে কাজ করলে আইনকানুনের প্রতিকূলেও কাজ করতে হয় এবং যারা এটা করতে পারে তাদেরই নামডাক ও হাঁকডাক আছে এবং যারা এটা করতে পারে না তারাই অপদার্থ, অযোগ্য ও অবাঞ্ছিত। যেদেশে যাদের নামডাক ও হাঁকডাক থাকবে তারা অপদার্থ, অযোগ্য, অবাঞ্ছিত, এককথায় কৌশলশূন্য, বিবেচিত হয় এবং যারা অপদার্থ, অযোগ্য ও অবাঞ্ছিত বিবেচিত হয়ার কথা তাদের নামডাক ও হাঁকডাক থাকে সেদেশ যে রাজনীতিতে অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয়ভাবে পশ্চাৎপদ তা বিশ্লেষণ করে লিখার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। অফিসআদালতসহ সর্বত্র কৌশল (ট্যাক্ট) ও অকৌশল (ট্যাক্টলেসনেস) শব্দ দু'টির বেশ প্রচলন আছে। যে কৌশলী সে আইন ও নিয়মঅমান্যকারী এবং যে অকৌশলী সে আইন ও নিয়মমান্যকারী। কর্তাব্যক্তিদের মনমেজাজ ঠিক রাখতে গিয়ে আইন ও নিয়মঅমান্যকারী হলেও কিছু যায়আসে না এবং আইন ও নিয়মমান্যকারী হয়ে কর্তাব্যক্তিদের মনমেজাজ ঠিক না রাখতে পারলে বহুকিছু যায়আসে। ফলে, কর্তাব্যক্তিদের মনমেজাজটাই আইন ও নিয়মের উর্ধ্বে স্থান পেয়ে যায় এবং আইন ও নিয়মঅমান্যকারীরাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয় ও এগুলো মান্যকারীরা ব্যক্তিত্বহীন হয়। রাজনীতিবিদেরাই ক্ষমতাসীন ও সরকার হয়। তাদের নিয়ন্ত্রণেই অফিসআদালতসহ সবকিছু চলে। তাই, ন্যায়বিচার, ন্যায়কর্ম ও নির্ভেজাল সামাজিক পরিবেশের জন্যে যারা মনমেজাজের পরিবর্তে আইনকানুনমোতাবেক কাজ করে তাদেরকে সামনে টেনে আনা এবং যারা আইনকানুনের প্রতি তোয়াক্কা না করে নিজেদের হীনস্বার্থে মনমেজাজ বুঝে কাজ করে ও যারা আইনকানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে নিজেদের মনমেজাজ অনুযায়ী কাজকর্ম চায় তাদের সবাইকে সরকারী কর্মকাণ্ড হতে আইনানুগভাবে সরিয়ে দেয়া ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের বিচার্য ও করণীয় বিষয় হয়াটা অতীব জরুরী। যারা নীতিবান ও ন্যায়ানুগ তারা ব্যক্তিত্ববহির্ভূত কোন কাজ করতে পারে না। তারা তেল মাখতে এবং অবৈধভাবে অর্থোপার্জন করতে ও কাকেও অবৈধভাবে অর্থপ্রদান করতে পারে না। অথচ, বর্তমানে বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ববহির্ভূত কাজ, তেলমাখা এবং অবৈধভাবে অর্থোপার্জন করতে ও কাকেও অবৈধভাবে অর্থপ্রদান করতে পারাটাই হচ্ছে যোগ্যতার মাপকাঠি। এগুলোর ফলে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ভালো হয়, জঘন্যতম দুর্নীতিতে ডুবে থেকেও অপরাধী সাব্যস্ত হয় না, জ্ঞানগরিমা না থাকলেও জ্ঞানী বলে বিবেচিত হয় এবং কাজকর্ম না বুঝলে ও না করতে পারলেও অভিজ্ঞ ও পটু বলে আখ্যাত হয়। একারণে প্রশাসন দুর্বল থাকে ও এটার রন্ধ্রেরন্ধ্রে দুর্নীতি চলতে থাকে।

www.pathagar.com

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার জন্যে মুখেমুখে নির্দেশ দেয়। তাদের এ মৌখিক নির্দেশ অমান্য করলে বিপদে পড়তে হয়। পরবর্তীতে কোন বিপদ আসলে তারা তাদের মৌখিক নির্দেশের কথা সরাসরি অস্বীকার করে। কাজেই, এটা বাধ্যতামূলক হতে হবে যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রতিটি নির্দেশ লিখিতভাবে দেবে এবং তাদের লিখিত নির্দেশ ব্যতীত কোন কাজ হলে সেজন্যে তারাই এককভাবে দায়ী হবে। এটার অন্যথা হবে না। এমনএমন কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে যারা সরকার ও কাজের ক্ষতি করেও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে খুশি করে আনন্দ পায়। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও এদেরকে কর্মঠ মনে করে ও ভালো জানে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কোন একটি বিষয় তৈরি করতে যতো না মাথা ঘামায় অর্থখরচের ক্ষেত্রে সেটার একাংশও ঘামায় না। ওপরের দিক নিচের দিককে দিয়েই কর্মসম্পাদন করিয়ে নেয়। ফলে, ওপরের দিক নিচের দিকের ওপর নির্ভরশীল। এনির্ভরশীলতার কারণে কখনোকখনো প্রকৃত বিষয় ঢাকা পড়ে যায় যা অত্যন্ত ক্ষতিকর। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে মন্ত্রীদের ফরমাশ খাটতে হয়। এতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রকৃত কাজে সঠিকভাবে মনোনিবেশ করতে পারে না। নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজ করলে মনোনিবেশসহকারে কাজ করার পরিবেশ বিরাজমান থাকে। কর্মকর্তাদের দেশবিদেশে বিভিন্নধরনের প্রশিক্ষণ হচ্ছে। সেসব কর্মকর্তাই বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ পায় যারা যোগাযোগরক্ষা ও ধরাধরি করে। সুনির্দিষ্ট নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে যোগাযোগরক্ষা ও ধরাধরির মাধ্যমে যেসে কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগগ্রহণ করতে পারে না। সেসব কর্মকর্তাই এসব করে যাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদেশভ্রমণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। বাস্তবে যেসব কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশক্ষিণ পেলে দেশে কিছুটা হলেও অবদান রাখতে পারবে তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও সততার কারণে বিদেশে প্রশিক্ষন ও অন্যকোনকিছুর জন্যে যোগাযোগরক্ষা ও ধরাধরি করতে পারে না। সত্যিকারার্থে এসব কর্মকর্তাই আন্তরিকতার সাথে কাজ করে এবং ওসব কর্মকর্তা বিভিন্নধরনের সুযোগের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে ও একটির পর আরেকটি সুযোগ লাভ করে।

অফিসআদালতে এখনো মান্ধাতার আমলের অনেক নিয়ম চালু আছে যেগুলো কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করছে। নৈমিত্তিক ছুটি বলে একটা ছুটি আছে। বছরে যতোদিন এছুটি পানা থাকে ততোদিন মাঝেমধ্যে তা নেয়া যায়। সত্যিকথা বলে এছুটি পায়া মুস্কিল হয়। তাই, সাধারণত মিথ্যার মাধ্যমে এছুটি নিতে হয়। যেহেতু এছুটি উপভোগ করার নিয়ম আছে সেহেতু বছরে যতোদিন এছুটি ধার্য করা আছে

www.pathagar.com

ততোদিন তা সহজভাবে উপভোগ করতে দিলে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় না। মাঠপর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তারা একস্থান হতে অন্যস্থানে বদলি হয়। এজন্যে তারা ভ্রমণভাতা (টি, এ,) ও মহার্ঘভাতা) ডি, এ, পেয়ে থাকে। কিন্তু, এ টি, এ, এবং ডি, এ, -র হার মান্ধাতার আমলের। সত্যিকথা বলে বিল করে টি, এ, এবং ডি, এ, নিলে প্রকৃত খরচ পায়া যায় না। তাই, প্রকৃত খরচ ওঠানোর জন্যে বিলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দীর্ঘ রাস্তার বর্ণনা দিতে হয়। মালপত্র ট্রাকেই আনানেয়া করতে হয়। অথচ, ট্রাকভাড়া নেয়ার কোন নিয়ম নেই। হাউস বিল্ডিং, মোটরকার ও বাইসিকল লোন হিসেবে সরকার কর্তৃক বহু বছর পূর্বে নির্ধারিত টাকা দেয়া হয়। এটাকা দিয়ে তেমনকোন কাজ হয় না। এটাকা নিতে গিয়ে নানা জটিলতার কারণে মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে কোন উপায় থাকে না। বেতন দ্রব্যমূল্যের সাথে আদৌ সামঞ্জস্যশীল নয়। বেতন দ্রব্যমূল্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল রেখে সোনার মানে বাড়াতে হয়। বাস্তবে বিভিন্ন কারণে তা হচ্ছে না। এজন্যে প্রায়সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী সুযোগ পেলে অন্যায় করে বা অন্যায়ের জন্যে যেকোনভাবে সুযোগ সৃষ্টি করে। আইনানুগতভাবে কাজ না করলে সরকারের বা যেকোন ব্যক্তির উৎকট বা দারুণ ক্ষতি হয়। যারা এরকম কাজ করে তাদের কারোকারো বিরুদ্ধে আইনানুগ বা নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু, তারা ঠিকঠাকভাবে পর্যায়মতো যোগাযোগরক্ষা করতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হয় না। তাছাড়া, বেআইনী কাজো এযোগাযোগের দ্বারা হয়ে যায়। অপরদিক, কারোকোরো বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে গৃহীত যেকোন ব্যবস্থাও কার্যকর হয়ে থাকে এবং তারা অন্যায়ের আশ্রয় নেয় না বিধায় তাদের ন্যায়সংগত কাজো করা হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একজন লোকের খেয়াল যে সে ব্যাংক হতে একটি শিল্প স্থাপনের জন্যে কয়েক কোটি টাকা লোন নিয়ে শিল্পটি স্থাপন না করে টাকাটা অন্যকাজে খাটাবে। তাই, সে এটাকা পায়ার জন্যে যেখানে যতোটাকা খরচ করার দরকার করবে। অপরদিকে, অন্যএকজন লোক অবশ্যই একটি শিল্প স্থাপন করবে। তাই, সে যেখানে যতোটাকার প্রয়োজন সেখানে ততোটাকা খরচ করবে না। ফলে, সে লোন পাবে না বা পেলেও তাকে অনেক পোহাতে বা ভোগতে হবে। এসব কারণে সত্যিকারের শিল্পোদ্যোক্তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ বা ভিত দুর্বল থাকে। ব্যবস্থাগ্রহণের পদ্ধতি অনেক ঘোরালো, লম্বা ও জটিল। কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক কোন সরকারী সম্পদ বা অর্থ আত্মসাতের বা তাদের কারো কারণে সরকারী সম্পদ বা অর্থ বেহাত হয়ার তথ্য বা খবর পায়া গেলে তাকে সাথে রেখে যেকর্মকর্তাকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হবে সে বাস্তবে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও পরিবেশপরিস্থিতি পর্যালোচনা করে, প্রয়োজনে সাক্ষ্যগ্রহণ করে, তার বিরুদ্ধে যেব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন তা উল্লেখ করবে এবং সাথেসাথে তার বিরুদ্ধে সেব্যবস্থা গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে হবে। তবে, যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে সে যার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে সে অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে পারবে। এআবেদন পরীক্ষায় তার প্রতি অন্যায় প্রমাণিত হলে সে অব্যাহতি পাবে এবং যে অন্যায় করেছে সে শাস্তি পাবে। তবে, কোন অন্যায় করা হয়নি প্রমাণিত হলে সে আরো শাস্তি পাবে। এপদ্ধতি কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হতে বা আটকে পড়তে পারবে না। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ওপর এপদ্ধতির বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা পুরোপুরি নির্ভর করবে।

রাজনীতিবিদেরা চায় যে, লোকজন তাদের নিকট যাতায়াত করুক।এতে তাদের সুবিধা আছে। তারা তাদের সাথে পরিচিত হতে পারে এবং নির্বাচনে এপরিচিতি তাদের জন্যে সুফলদায়ক হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও চায় যে, যাদের তাদের নিকট কাজকর্ম আছে তারা তাদের নিকট যাক। এটা এজন্যে বলছি যে, যাদের তাদের নিকট কার্জকর্ম আছে তারা তাদের নিকট না গেলে তাদের কাজ হয় না। তাই, তারা বাধ্য হয়ে তাদের নিকট যায়। এতে তাদের কিছুটা সুবিধাও হয় এবং তারা একধরনের তৃপ্তিও পায়। এককর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট অপরকর্মকর্তা বা কর্মচারীর কোন কাজ থাকলে তাকেও তার কাজ উদ্ধারের জন্যে তার নিকট যেতে হয় বা তাকে টেলিফোনে হলেও অনুরোধ করতে হয়। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যখন যেভাবে যেটা চায় তখন সেভাবে সেটা না করলে আগে হোক বা পরে হোক ঝঞ্ঝাটে ও ঝামেলায় পড়তে হয়। জনগণো এঝামেলা বহির্ভূত নয়। অফিসআদালতে কোন লোকের কোন কাজ থাকলে তাকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যেভাবে অগ্রসর হতে বলে সে, তাদের কথা অনুযায়ী, সেভাবে অগ্রসর না হলে তারো ঝামেলার ও বিপদের অন্ত থাকে না। বাজারে ক্রেতাদের ও বাসে যাত্রীদের মতো জনগণ ও সরকারের কাজকর্মেও একমন্ত্রণালয় ও অফিসের সাথে অপরমন্ত্রণালয় ও অফিসের ঠেলাঠেলি বা ধাক্কাধাক্কি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে দেশ ও জনগণের ক্ষতি হচ্ছে। যারা দেশ ও জনগণের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হয়েও ঠেলাঠেলিতে দেশ ও জনগণের ক্ষতি করে তারা দেশ ও জনগণের সাথে শত্রুতাই পোষণ করে। এধরনের শত্রুদের শুধু ব্যক্তিস্বার্থের কথা ভাবাটাই স্বাভাবিক আর যারা শুধু ব্যক্তিস্বার্থে কাজ করে তারা দেশ ও জনগণের কল্যাণে কোন অবদান রাখতে পারে না। যে যেখানে যেপর্যায়ে আছে সে সেখানে সেপর্যায়ে রাজা। সে অন্যান্যকে তার নিকট কাজ থাকলে আটকিয়ে যেকোন স্বার্থ সিদ্ধি করবেই। যাদের কাজ তারা তার কথায় না পড়লে অসুবিধার সম্মুখীন হবেই। যে যেখানে আছে সে সেখানে ক্ষমতার খুঁটা। তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে সে তাকে একহাত দেখিয়ে দেবে ভাব দেখায় এবং সুযোগ পেলে তা দেখিয়ে দেয়ও। এটারো কারণ আছে। সাধারণত, যে যেখানকার সে তার কোন অসুবিধাতে কায়দা করে সেখানকার

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু, নীতিগতভাবে তাকে কেউ অন্যায়ের ব্যাপারে সমর্থন দেয়া উচিত নয়। তবু, এজন্যে দেয় যে, অন্যায় করে থাকলেও সে তাদের লোক আর নিজেদের কোন লোক অন্যায় করলেও তাকে নিরপরাধ প্রমাণের মানসিকতাই দলাদলির জন্ম দিয়ে থাকে।

একমন্ত্রণালয় ও অফিসের কর্মচারীরাও তাদের কাজে অন্যমন্ত্রণালয় ও অফিসের কর্মচারীদের নিকট ধরা না দিয়ে তা উদ্ধার করতে পারে না। এঅবস্থা থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা নেই যে, মন্ত্রণালয়ে ও অফিসআদালতে জনসাধারণের কতো দুর্গতি ও ভোগান্তি। এসব প্রতিহত করার জন্যে জনসাধারণের সহযোগিতা থেকে যাচ্ছে। কিন্তু, তাদের এসহযোগিতাকে কাজে লাগানো হচ্ছে না, বরং সহযোগিতা করতে গিয়ে তাদেরকেই ঝামেলায় পড়তে হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ভুলে আছে যে, তারা প্রকৃতপক্ষে জনগণের সেবক ও খাদেম। জনগণের সেবা ও খেদমত করাই তাদের কাজ। অথচ, ওল্টাভাবে তারা জনগণ থেকে সেবা ও খেদমত আদায় করে থাকে এবং কথাবার্তায় ও আচারআচরণে তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতেও ইতস্তত করে না। জনগণ এসবের বিরুদ্ধে তাদের কাছেই প্রতিকারের জন্যে যেতে হয়। ফলে, তারা আরোবেশি নাজেহাল ও শ্রান্তক্লান্ত হয়। এঅবস্থা হচ্ছে শিয়ালের নিকট মুরগি বর্গা ও কুমিরের বাচ্চাকে পড়তে দেয়ার অবস্থা। ন্যায়সংগত কাজে কারো অন্যায় সুপারিশ বা নির্দেশ সবাই রক্ষা করতে বা মানতে পারে না। এরকম সুপারিশ বা নির্দেশ অনেক ওপর থেকেই আসে। কাজেই, যে সুপারিশ রক্ষা করে না বা নির্দেশ মানে না তাকে সাধারণত অন্যকিছু না করলেও অন্যত্র, খারাপ জায়গায় বা তার অপছন্দীয় জায়গায়, শাস্তি হিসেবে বদলি করে দেয়া হয়। যেখানে ভালো কাজ করে মন্দ ফল পায় সেখানে ভালো কাজ সাধারণত ভেস্তে যায় বা পণ্ড হয় এবং ভালো কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিগৃহীত বা নিপীড়িত ও নীতিহীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পুরস্কৃত হতে থাকে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিবেশপরিস্থিতিতে যারা সাশ্রয় করার চেষ্টা করে তারা বিভিন্ন ঝামেলার, বিপাকের ও অসহযোগিতার সম্মুখীন হয় এবং, বলতে গেলে, কোন পর্যায় থেকেই কোনপ্রকার সহযোগিতা পায় না। অপরদিকে, যারা যে যেভাবে চায় তাকে সেভাবে প্রদান করে তারাই ভালো এবং তাদের প্রশংসাও হয়। তাদেরকে কোন ঝামেলার, বিপাকের ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না এবং তারা বীরদর্পে সম্মুখপানে বিনা প্রতিবন্ধকতায় এগিয়ে যেতে পারে। প্রায়ই শুনা যায় যে, কোনকোন কর্মকর্তা কলম চালিয়ে দিতে কোনপ্রকার ইতস্তত করে না এবং এরা বেশ সুনাম ও যশের অধিকারী। খোঁজখবর নিলে জানা যায় যে, এরা দেশের স্বার্থের কথা না ভেবে নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে যে যেভাবে চায় তার স্বার্থে সেভাবেই কাজ করে যায়। এতে নিয়মনীতি, পদ্ধতি ও বিধিবিধান যে উপেক্ষিত হয় তাতে কারো কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।

www.pathagar.com

অপরদিকে, এমনএমন কর্মকর্তা আছে যারা নিজেদের স্বার্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ বা দৃষ্টিপাত না করে জনগণ ও দেশের স্বার্থে নিয়মরীতি, পদ্ধতি ও বিধিবিধানমোতাবেক কাজ করে বিধায় যে যেভাবে চায় তার স্বার্থে সেভাবে কোনকিছু করতে পারে না। ফলে, এদের কোন নাম ও যশ থাকে না এবং এরা অযোগ্য ও অকর্মণ্য বলে বিবেচিত হয়। যেদিন এদের নাম ও যশ হবে এবং যারা নিজেদের স্বার্থে কাজ করে যায় তারা অকর্মণ্য ও অযোগ্য বিবেচিত হবে সেদিনই আমরা আমাদের দেশে শান্তি ও প্রগতির মুখ দেখতে পাবো।

অল্পঅল্প সাশ্রয়ে অনেক সাশ্রয় হয়। এসাশ্রয় দিয়ে অনেক কাজ করা যায়। অথচ, সরকারীপর্যায়ে যেসব সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী সাশ্রয়ের জন্যে চেষ্টা করে তারা অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিকট উপহাসের পাত্র হয়। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়ে থাকে যে, যেখানে সরকারের অজস্র টাকা বিভিন্নভাবে নষ্ট ও অপচয় হয়াতে কিছু যাচ্ছেআসছে না সেখানে তারা সাশ্রয় বা ব্যয়লাঘব করতে গিয়ে শত্রুতা বাড়িয়ে কি লাভ হবে। অপরদিকে, দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে খরচ না করলেও চলে সেখানে প্রচুর পরিমাণে খরচ হচ্ছে আর যেখানে খরচ করা একান্ত দরকার সেখানে চেষ্টা করেও খরচ করানো যায় না। এটারো কারণ আছে। যেখানে খরচ করার দরকার না থাকা সত্ত্বেও খরচ করা হচ্ছে সেখানটা হচ্ছে উঁচুপর্যায়ের হস্তক্ষেপের স্থান এবং সেখানকার কোন আদেশই, নিয়ম ও পদ্ধতিমোতাবেক হোক বা না হোক, অমান্য করা যাচ্ছে না। কেউ সাহস করে অমান্য করলে তাকে বিপাকে ও বিড়ম্বনায় পড়ে হাবুডুবু খেতে হয়। যেখানে খরচ করা দরকার সেখানে খরচ করলে সরকারের অনেক লাভ হয়। কিন্তু, সেখানটা নিচুস্থান বিধায় তা করা হয় না এবং সেখানেই খরচ না করে সাশ্রয় দেখানো হয়। এধরনের সাশ্রয় ক্ষতিকর। তাই, লাভজনক সাশ্রয় গ্রহণ করে ক্ষতিকর সাশ্রয় বর্জন করা জাতীয় স্বার্থে অপরিহার্য। কোনকোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলেই যেকোন কাজ করতে পারে। পক্ষান্তরে, কোনকোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলেও যেসে কাজ যখনতখন করতে পারে না। এ পারা ও না পারার কারণ বিশ্লেষণের দরকার আছে। যারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশের সাথেসাথে পারে তারা এজন্যেই পারে যে, সেপারার সাথে তারা তাদের অনেক ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি করে নেয়। অপরদিকে, যারা পারে না তারা এজন্যেই পারে না যে, তারা তাদের স্বার্থের দিকে না দেখে সরকারের স্বার্থটাকেই বড় করে দেখে। উদাহরণস্বরূপ, কোন কর্তৃপক্ষ কোন কর্মকর্তাকে কিছু সামগ্রী কেনার জন্যে বললে কর্মকর্তাটি নিজে কোন সুবিধা নিতে চেলে যেভাবেই পারে সাথেসাথে সেগুলো কেনবে এবং প্রকৃত মূল্যের সাথে অধিক মূল্য সংযোজন করিয়ে নেবে ও সেগুলোর গুণগতমানো ততোভালো হবে না। অপরদিকে, সে তার নিজের কোন স্বার্থ না চেলে নিয়মানুযায়ী সেগুলো

www.pathagar.com

কেনবে। এতে সেগুলোর মান ভালো হবে এবং দামো কম হবে; কিন্তু সেগুলো কেনাতে তার বেশি সময় লাগবে। অথচ, যেকর্মকর্তা সরকারের স্বার্থে কাজ করে যায় সে-ই বেশি অবহেলিত হয় এবং কাজকর্মে তৎপর ও সক্রিয় নয় বলে বিবেচিত হয়। সরকারী কাজকর্ম সুচারুরূপে সম্পাদিত না হয়ার এটাও একটি বিশেষ কারণ।

অফিসআদালতে এমনো কাজকর্ম হয় যা কোন আইন বা নিয়মের আওতায় পড়ে না। এরকম কাজের ব্যাপারে উর্ধ্বতনদেরকে জানানো হলে তারা ব্যবস্থা করে নেয়ার জন্যে সরাসরি বলে দেয়। তারা সাধারণত এব্যাপারে লিখিতভাবে কিছু বলে না। অথচ, ব্যবস্থা করে নিতে গেলেই তা আইন বা নিয়মবহির্ভূত হয়। বাস্তবে আইন বা নিয়মবহির্ভূত কোনকিছু করলে যেকোন সময় অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। হঠাৎ কখনো অসুবিধায় পড়ে গেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে কোন সহযোগিতা আশা করা যায় না। তাই, নিয়ম বা আইনবহির্ভূত কোন কাজ করতে হলে তা করার পন্থা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ স্বয়ং লিখিতভাবে নির্ধারণ করে দেয়ার নিয়ম থাকতে হবে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, কোন কাজে একজন কর্মকর্তা ন্যায়ের পক্ষে থাকলে এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী অন্যায়ের পক্ষে থাকলে ওকর্মকর্তার কিছুই করার থাকে না, কেননা অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী একত্রে অন্যায়ের পক্ষে থাকলে অন্যায় কাজটিই হয়ে যায়। একজন অন্যান্যের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সময়ের ও পরিস্থিতির সাথে তাল রেখে চলতে পারে না বলে সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং যেকোন কাজ সফলভাবে নিষ্পাদন বা সম্পাদন করার সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকাদার থেকে কোন একটি জিনিসের সরবরাহগ্রহণ করার জন্যে টেণ্ডার আহ্বান করা হলো। টেণ্ডারে দেখা গেলো যে, জিনিসটির গুণগতমান খুব খারাপ এবং দামো অত্যধিক। যেসব কর্মকর্তা এটেণ্ডার কমিটিতে আছে তাদের একজন প্রস্তাব করলো যে, অনুমোদনের মাধ্যমে জিনিসটি খোলাবাজার থেকে কিনে নিলে সেটার মূল্য তুলনামূলকভাবে কম হবে ও মানো উন্নত হবে এবং সরকারের অনেক টাকা সাশ্রয় হবে। অপরদিকে, অন্যান্য কর্মকর্তারা নিজেদের সুবিধার্থে বললো যে, এতে নিয়ম লংঘিত হবে এবং বিল পাস হবে না। তাই, নিয়ম ঠিক রেখে বিল পাসের জন্যে নিম্নমানের হয়া সত্ত্বেও জিনিসটি বেশি মূল্যে ঠিকাদার থেকে নেয়ার সিদ্ধান্ত হলো। এভাবে একটিএকটি করে সব নিয়ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যেসব কর্মকর্তা দেশের মঙ্গল চায় তারা নিয়মের মারপ্যাঁচে কোন মঙ্গলজনক কাজ করার সুযোগ পায় না এবং দুর্নীত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের নিজেদের স্বার্থে সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে থাকে। নিয়মমোতাবেক কাজ করে সাশ্রয় করতে চেলে যারা দুর্নীতি করতে পারে না তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে। ফলে, কাজের গতি ব্যাহত হয়। কিন্তু, কাজের গতি ঠিক রাখতে গিয়ে জেনেশুনে দুর্নীতি করতে দিলে সরকারের ক্ষতি

www.pathagar.com

হয়। এভাবে কাজের গতি ঠিক রাখতে গিয়ে সরকারের ক্ষতি করাটা কোনভাবেই সমীচীন নয়। তাই, যারা দুর্নীতি করতে পারে না বিধায় কাজের গতিতে বাধার সৃষ্টি করে তাদেরকে, সময়িকভাবে সব অসুবিধা স্বীকার করে নিয়ে হলেও, যথোচিত শিক্ষা দিতে হবে। তা না হলে এরকম দুর্নীতি চলতেই থাকবে এবং সরকারের ক্ষতি হতেই থাকবে। ভালো বনতে হলে যে যেভাবে যেকাজ চায় তাকে সেভাবে সেকাজ করে দিতে হয়। সব কর্মকর্তা এটা পারে না। যেসব কর্মকর্তা কে খুশি হবে এবং কে বেজার হবে সেদিকে না তাকিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করে তারা সাধারণত ভালো কর্মকর্তা বলে বিবেচিত হয় না। এটার অবসানকল্পে যেসে যেসেভাবে কাজ চেয়ে করিয়ে নেয়ার প্রচলিত নিয়মটি ভেঙে ফেলতে হবে এবং যারা যেসেভাবে কাজ চাবে তাদের ব্যাপারে সরকার সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চাকরিজীবীরাও এদেশের মানুষ। তাদেরো নিজস্ব কাজ আছে। একঅফিসের একজন চাকরিজীবীর অন্যঅফিসে কাজ থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু, একজন চাকরিজীবী হয়েও অন্যকোন অফিসে তার কোন কাজ থাকলে তা করিয়ে নিতে তাকে অনেক পোহাতে হয়। এমনকি একই অফিসে চাকরি করেও একজন চাকরিজীবী অপরএকজন চাকরিজীবীর নিকট তার কোন কাজ থাকলে তা করিয়ে নিতে কম পোহাতে হয় না। তাছাড়া, একজন কর্মচারী অপরএকজন কর্মচারীকে সর্বসময় সহজসরল ও সাধারণভাবে গ্রহণ করে না। এটা একজন কর্মচারী অপরএকজন কর্মচারীকে অনেকটা খাটো করে বা হীনভাবে দেখার মতো। তবে, কর্মচারীরা কেউ কাকেও খাটো করে না দেখে পরস্পরের কাজ নীতিগতভাবে সম্পাদন করার মনমানসিকতা সৃষ্টি করাটা একান্ত প্রয়োজন, কেননা তারা পরস্পরের কর্মসম্পাদন করতে সংকীর্ণতা পরিহার করতে পারলে জনসাধারণের কাজো তারা সংকীর্ণতা ও দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে যথাসময়ে সম্পাদন করাতে মনোযোগী হতে পারবে। সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সুষ্ঠু পরিবেশের জন্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুষ্ঠু বিন্যাসের বা সুবিন্যস্ততার প্রয়োজন। এটার অভাবে একদিকে যেখানে বেশি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রয়োজন সেখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারী কম এবং অপরদিকে যেখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারী কম হলে চলে সেখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারী বেশি। যেখানে বেশি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রয়োজন সেখানে তাদের সংখ্যা কম হয়ার কারণে কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না। এতে উভয় সরকার ও জনগণের ক্ষতি হয়। এধরনের ক্ষতি হতে রেহাই পায়ার জন্যে বাস্তবে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুষ্ঠু বিন্যাস একান্ত প্রয়োজন। এবিন্যাসে একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে শুধু একটি বিষয়সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত করতে হবে। এতে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার দায়িত্ব পালনে

www.pathagar.com

গড়িমসি বা দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করতে পারবে না, প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে, কোন কাজ বাকি থাকতে পারবে না, দুর্নীতি করার তেমনকোন সুযোগ থাকবে না, বেকারসমস্যা অনেকাংশে লাঘব হবে, সরকারের ক্ষতি হবে না এবং জনগণকে ভোগান্তিতে বা দুরবস্থায় নিপতিত হতে হবে না।

বাস্তবে প্রত্যেক অফিসআদালত স্বাধীন ও হস্তক্ষেপমুক্ত। কোন অফিসআদালত অন্যায় করলেও তাদের ক্ষমতাতে অন্যকেউ হাত দিতে বা হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাই, প্রত্যেক অফিসআদালতের ক্ষমতার দর্পোদ্ধতায় বা দাপটে জনগণ দিশেহারা। এব্যাপারে দু'একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। নির্দিষ্ট তারিখের পর বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে প্রতিমাসে শতকরা দু'টাকা হারে সুদপ্রদানের কথা তাতে উল্লেখ করা থাকে। কেউ কোন কারণে নির্দিষ্ট তারিখের পর তা পরিশোধ করতে গেলে ব্যাংক নিয়মমোতাবেক সুদযোগ করে তা গ্রহণ না করে বিদ্যুৎ অফিস হতে তাতে তা যোগ করিয়ে আনতে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে বিলদাতা বাড়াবাড়ি করতে গেলে তার নানা অসুবিধা হয়। কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই যখনতখন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এটা বিদ্যুৎ বিভাগের স্বাধীনতা, কেননা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত তৃতীয় অফিস বা কর্তৃপক্ষ নেই। এভাবে একটিএকটি করে সব বিষয় আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক অফিসআদালত কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত তৃতীয় অফিস বা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার ও যথেচ্ছাচারের দ্বারা জনগণকে ভোগান্তিতে নিমজ্জিত রাখছে। কোথাও একটুআধটু নিয়ন্ত্রণ থেকে থাকলে তা–ও যারা সংশ্লিষ্ট তারা মুছে ফেলার সংগ্রামে লিপ্ত আছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে বিভিন্ন অফিসআদালতকে একেক সময় একেক সরকার একেকভাবে যেকোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত তৃতীয় অফিস বা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে তাদের স্বস্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়ে তাদেরকে স্বেচ্ছাচারী বানানোটা জনগণের স্বার্থের পুরোপুরি পরিপন্থী। তাই, জনগণের স্বার্থে আইনানুগ ও ন্যায়সংগত কাজের জন্যে সব অফিসআদালতকে একটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত তৃতীয় অফিস বা কর্তৃপক্ষের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে রাখাটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে একান্ত অপরিহার্য। যেহেতু রাজনীতিবিদেরা ক্ষমতাসীন হয়ে সরকার গঠন করে সেহেতু তাদেরকে দেশ ও জনগণের স্বার্থে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এব্যবস্থা প্রবর্তন করতে ও তা ধারাবাহিকভাবে বলবৎ রাখতে হবে।

৯

সিভিল সার্ভিসে বিভিন্ন ক্যাডারের স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীলতা বা বিদ্যমানতা তাদের মধ্যে একটি আজন্ম রেষারেষির কারণ, জাতীয় কার্যাবলীতে একটি বড়াকারের জটিলতা এবং নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে মেধার প্রাধান্যে বা শ্রেষ্ঠতাতে একটি বড়

www.pathagar.com

প্রতিবন্ধ। বি, সি, এস, পরীক্ষায় পাবলিক সার্ভিস কমিশন মেধানির্ধারণ করে থাকে। সব ক্যাডারে পদের সংখ্যা সমান নয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্যাডারের কোটা বা আনুপাতিক অংশ আছে। ক্যাডারভিত্তিক কোটার ফলে মেধাতালিকায় জুনিয়র হয়েও বিভিন্ন ক্যাডার হতে অনেক কর্মকর্তা প্রশাসন ও অন্যান্য ক্যাডারে মেধাতালিকায় তাদের সিনিয়র কর্মকর্তাদেরকে অতিক্রম করে বা ডিঙিয়ে প্রশাসন ক্যাডারে পদোন্নতিলাভ করে। এসব পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আহ্লাদে আটখানা হলেও যেসব কর্মকর্তা মেধাতালিকায় সিনিয়র হয়া সত্ত্বেও অতিক্রান্ত হয় তারা যে বীতশ্রদ্ধ ও ব্যথিত হয় তা অভিব্যক্ত করার প্রয়োজন নেই। অকারণে কোন যুক্তিতর্ক ও বাদানুবাদে না জড়িয়ে মেধাকে প্রাধান্য দিয়ে সব ক্যাডারের মধ্যে সমন্বয়সাধনের দ্বারা কর্মকর্তাদের থেকে অকৃত্রিম ও আন্তরিক সার্ভিস পায়ার জন্যে তাদেরকে, যে যে ক্যাডারেই থাকে–না–কেন, অর্থাৎ বিভিন্ন ক্যাডারনির্বিশেষে, বি, সি, এস, পরীক্ষায় পাবলিক সার্ভিস কর্তৃক মেধাতালিকাতে নির্ধারিত সিনিয়রিটির ভিত্তিতে প্রশাসন ক্যাডারে পদোন্নতি দেয়াটা, সার্বিক বিবেচনায়, অপরিহার্য। উল্লেখ্য, এমনকোন কর্মকর্তা না থাকারই কথা যে মেধাতালিকায় নির্ধারিত সিনিয়রিটিকে অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়ন করতে পারে। উল্লেখিত পদ্ধতিতে প্রশাসন ক্যাডারে পদোন্নতি হতে থাকলে স্বতন্ত্র ক্যাডার হতে ওক্যাডারে পদোন্নতিতে কোটাবৃদ্ধির জন্যে আন্দোলন ও সংগ্রাম, ক্যাডারে ক্যাডারে মনোমালিন্য ও কোন্দল, যেভাবেই হোক প্রশাসন ক্যাডারে পদোন্নতির জন্যে ব্যতিব্যস্ততা ও গোপন প্রভাব প্রসারণের প্রচেষ্টা এবং কর্মসম্পাদনের সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট করার প্রবণতা ও মনমানসিকতা বিদূরিত হতে বাধ্য। বর্তমানে যারা প্রশাসক, ডাক্তার, প্রকৌশলী ও কৃষিবিদ ভবিষ্যতে তাদের ছেলেমেয়েরা যে প্রশাসক, ডাক্তার, প্রকৌশলী ও কৃষিবিদই হবে সেটার কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রশাসকের ছেলে ডাক্তার, ডাক্তারের ছেলে প্রকৌশলী ও প্রকৌশলীর ছেলে প্রশাসক হতে পারে। তাই, বর্তমানে যারা প্রশাসক, ডাক্তার, প্রকৌশলী ও কৃষিবিদ তারা তাদেরকে দেশপ্রেমিক বলে দাবি করলে এবং দেশের সার্বিক মঙ্গল কামনা করলে তাদের দায়িত্ব হবে শুধু নিজেদের সাময়িক স্বার্থের পেছনে ধাবিত না হয়ে দেশের স্বার্থে কাজ করা। সত্যিকারার্থে দেশের স্বার্থের জন্যে কাজ করলে তারা দেখতে পাবে যে, প্রশাসক, ডাক্তার, প্রকৌশলী ও কৃষিবিদদের কাজের ধরন কোনভাবেই এক নয়। ডাক্তারের কাজ হচ্ছে চিকিৎসা, প্রকোশলীর কাজ হচ্ছে গঠন ও নির্মাণ, কৃষিবিদের কাজ হচ্ছে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং প্রশাসনের কাজ হচ্ছে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা। এরা সবাই এদের স্বস্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। একপেশার বা বৃত্তির বা শ্রেণীর বিশেষজ্ঞরা অপরপেশায় বা বৃত্তিতে বা শ্রেণীতে কাজ করতে গেলে বা করলে সেটাতে তারা তাদের বিশেষজ্ঞতার মান ঠিক রাখতে পারে না বললে অত্যুক্তি হয় না। তাই, সিভিল সার্ভিসের অন্যান্য ক্যাডার হতে

www.pathagar.com

এসার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারে উচ্চপদগুলোতে কোটার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেয়াটা দেশ ও জনগণের জন্যে কোনভাবেই মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। এতে শুধু রেষারেষি বা পরস্পর বিদ্বেষ চলে ও সাময়িকভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ কৃতার্থ হয়। এধরনের কৃতার্থতাকে দেশ ও জনগণের স্বার্থের প্রতিকূলে ও বিপরীতে বিশেষজ্ঞদের, যাদের থেকে দেশ ও জনগণ বহুকিছু প্রত্যাশা করে, হীনম্মন্যতা বলতে হয়। জেলাভিত্তিক কোটা অনুযায়ী চাকরিতে নিয়োগ করা হচ্ছে। একোটা মেধাবিধ্বংসী বা মেধাবিনাশকারী। যেখানে মেধাসৃষ্টির জন্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এতোসব উদ্যোগ সেখানে মেধাবিনাশ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ও নৈরাশ্যজনক। একোটার ফলে মেধাতালিকায় ওপরে থেকেও চাকরি পায় না এবং এতালিকায় অনেক নিচে থেকেও চাকরি পেয়ে যায়। এতে পূর্বের তুলনায় অফিসআদালতে, কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুন, কাজকর্মের মান দিনদিন অনুন্নত হচ্ছে। নিম্নমানে অবস্থান করে কোন দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে না। উন্নতির জন্যে আবশ্যক হচ্ছে উচ্চমান। তাছাড়া, একোটাব্যবস্থা প্রতিযোগিতাকে নিরুৎসাহিত করছে। অথচ, প্রতিযোগিতাই মানুষকে অধ্যবসায়ী, কর্মচঞ্চল, অনুপ্রাণিত, সৃজনশীল ও আগ্রহশীল করে তোলে। প্রতিযোগিতার অভাবে অধ্যবসায়, কর্মচঞ্চলতা, অনুপ্রেরণা, সৃজনশীলতা ও আগ্রহান্বিততা দমে যায়। যাদের দেশপ্রেম আছে তাদের কেউই মেধার অপচয় চাবে না বা চেতে পারে না। তাই, দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকল্পে কালাতিপাত না করে চাকরিতে কোটাব্যবস্থা রহিত করে সম্পূর্ণভাবে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের নিয়ম পুনরায় চালু করাটা অতীব জরুরী।

সমাজে ন্যায়কারীরা সমর্থন না পেয়ে অন্যায়কারীরা সমর্থন পায়ার কারণ রয়েছে। যারা ন্যায়কারী তারা আদর্শবাদী। তারা তাদের আদর্শবাদিতার কারণে ঘুষপ্রদান করতে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবান্তর কথা বরদাস্ত করতে পারে না। তাছাড়া, তারা চায় যে, প্রতিটি কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে ন্যায্যতার ভিত্তিতে কোনপ্রকার গড়িমসি ও টালবাহানা ছাড়া যথাসময়ে সম্পাদিত হোক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেছনে লেগে থাকার মতো সময় তাদের থাকে না। এটার বিপরীতে অন্যায়কারীরা ঘুষপ্রদান করতে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পশ্চাতে লেগে থাকতে পারে। ফলে, ন্যায় বরবাদ হয়ে অন্যায় টিকে যায়। সাধারণ মানুষ যখন দেখে যে, অন্যায়কারীদের অন্যায়ই টিকে যায় তারা তখন ন্যায়কারীদেরকে সমর্থন না দিয়ে অন্যায়কারীদেরকে সমর্থন দিতে থাকে, কেননা তারা ন্যায়কারীদেরকে, ন্যায়প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়া সত্ত্বেও, সমর্থন দিয়ে অন্যায়কারীদের খড়গহস্ত মেজাজের শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে নারাজ। যেদিন ন্যায়কারীরা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা ন্যায়প্রতিষ্ঠা করাতে সক্ষম হবে সেদিন জনগণ ন্যায়কারীদেরকে সমর্থন দেবে এবং

www.pathagar.com

অন্যায়কারীদেরকে ঘৃণা করবে। এতে অন্যায়কারীরা ঘৃণার পাত্র হিসেবে চিহ্নিত না হয়ার জন্যে অন্যায় পরিহার করে চলতে বাধ্য হবে। মাঝেমধ্যে কোনকোন ন্যায়সংগত কাজের জন্যে আলোড়ন সৃষ্ট হয়। এআলোড়নের সময় ওসব কাজের পক্ষে জনমত প্রকাশিত হয়। তবে, এআলোড়ন ও জনমতের প্রভাব বেশি দিন টেকে না। আলোড়নের সময় মনে হয় যে, ওসব কাজ না হয়ে পারবে না। কিন্তু, আলোড়ন আস্তেআস্তে স্তিমিত হয়ে যায় এবং কোন একসময়ে দেখা যায় যে, ওসব কাজ না হয়ে অসংগত কাজগুলোই হতে থাকে। শুধু তা নয়, যারা আলোড়নের নেতৃত্বে থাকে তারাও নানাভাবে নাজেহাল হয়। এজন্যে সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাই দায়ী। আলোড়নের সময় সরকার আলোড়নকারীদেরকে সমর্থন দেয় এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে শাসায়। পরবর্তীতে, সময় অতিবাহিত হয়ার সাথেসাথে তা সরকারের বিস্মরণে বা বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আলোড়িত ন্যায়কাজগুলো না করে অন্যায়কাজগুলোই করতে থাকে। সরকারের এরকমের আচরণের ফলে ন্যায়প্রতিষ্ঠার কাজে জনগণ আলোড়ন সৃষ্টি করতে উদ্যম ও উদ্দীপনাহীন থাকে। ফলে, অন্যায়কাজগুলো অবিরাম গতিতে চলে। জনগণ উর্ধ্বতনদেরকে সম্বোধন করেই তাদের প্রয়োজনীয় কাজ ও প্রতিকার চায়। কিন্তু, উর্ধ্বতনদের কাছ থেকে এটা অধস্তনদের নিকট সবকিছু ঠিকঠাক করে পেশ করার জন্যে প্রেরণ করা হয়। অধস্তনেরা এটা উর্ধ্বতনদের নিকট সবকিছু ঠিকঠাক করে পেশ করে কিনা সেসম্পর্কে তাদের অনেকেই খেয়াল রাখে না। তদুপরি, অধস্তনেরা উর্ধ্বতনদের নিকট এটা পেশ করলে উর্ধ্বতনেরা ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে এটা আদ্যপান্ত বা পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে দেখে না। অধস্তনদের এপেশ বা সম্মুখে স্থাপনটাই হয় আদ্যন্ত বা প্রথম ও শেষ। এসুযোগে অনেক সত্য মিথ্যা ও অনেক মিথ্যা সত্য হয়ে যায়। ফলে, দুর্নীতির প্রসার ঘটে এবং সত্য প্রত্যাখ্যাত হতে থাকে ও অসত্যের প্রাবল্য দেখা দেয়। এসবের জন্যে উর্ধ্বতনেরাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী হয়ে যায়। কথায় বলে যে, মাথায় পচন ধরলে দেহরক্ষা করা যায় না। তাই, দেহকে ঠিক রাখার জন্যে মাথা ঠিক থাকতে হয়। তাছাড়া, শরীর খারাপ হলে পাগল হয় না, মাথা খারাপ হলেই পাগল হয়। তাই, উর্ধ্বতনদের আদ্যকৃত্য বা প্রথম করণীয় কাজ হচ্ছে যে, তারা ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে তাদের নিকট যা দাখিল করা হয় তা আদ্যপান্ত বিশ্লেষণ করবে এবং তাদের কাছ থেকে অধস্তনদের নিকট যতোকিছু পাঠানো হয় সেগুলো তারাও তাদের রোজনামচায় বা ডাইঅ্যারিতে লিপিবদ্ধ করে রাখবে ও সেগুলো যাতে তাদের নিকট যথার্থভাবে যথাসময়ে উপস্থাপন করা হয় সেদিকে তারা তাদের রোজনামচাতে লেখা অনুযায়ী

www.pathagar.com

কড়াদৃষ্টি রাখবে। তাহলে সত্যের জয় সূচিত হবে, দুর্নীতি নিরুৎসাহিত হবে, সুবিচারের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে ও উন্নতি সাধিত হবে।

বিভিন্ন অফিসে ওপরের দিক থেকে নিচের দিকে প্রায়সব কাজ সম্পাদনের জন্যে প্রেরণ করা হয়। ওপরের দিকে কর্মকর্তারা সভা, সেমিনার, আলোচনা ইত্যাদিতে অতিশয় ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া, তারা, নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকার কারণে, নিজেরা নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে। এসব কারণে তারা অফিসে বিভিন্ন কাজকর্মে গভীরভাবে মনোনিবেশ করে না। নিচের দিকেই প্রায়সব কর্ম সম্পাদিত হয়। অথচ, ওপরের দিকের কর্মকর্তারা বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন এবং তারা বেশি বেতন ও সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকে। যারা কাজ করে তারা বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন হলে ও সুযোগসুবিধা বেশি পেলে তাদের কাজের মান উন্নত না হয়ে পারে না। অথচ, নিচের দিকের কর্মচারীরা তেমন যোগ্যতাসম্পন্ন নয় ও তাদের সুযোগসুবিধা বলতে তেমনকিছু নেই। ওপরের দিক ও নিচের দিকের মধ্যে এদূরত্ব ও ব্যবধানের কারণে সর্বদা সব কাজ যথার্থ ও ন্যায়ানুগভাবে সম্পাদিত হয় না। জনগণের প্রয়োজন হচ্ছে যথার্থ ও ন্যায়ানুগ কাজ। যেহেতু নিচের দিকেই কাজ সম্পাদিত হয় সেহেতু নিচের দিকের কর্মচারীরা ওপরের দিকের কর্মচারীদের চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে এবং তাদের বেতন ও সুযোগসুবিধা ওপরের দিকের কর্মকর্তাদের চেয়ে বেশি হতে হবে। কখনোকখনো অনেক আগের কাজকর্মের অনেক পরে খোঁজখবর হয়। অনেক পূর্বের কাজকর্মে কোন হেরফের থাকলে সেজন্যে অনেক পরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করাটা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। এতে এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিব্রতবোধ করে। এটা তাদের চলতি কাজকর্মের গতিরোধ করে। তাছাড়া, ওসব কাজকর্মের নথিপত্র বর্তমানে প্রাপ্তিসাধ্য বা সহজলভ্য হয় না বিধায় ওগুলোর একেবারে নির্ভুল ও ঠিকঠাক অবস্থা তুলে ধরাটা সম্ভবপর হয় না। তাই, কিছুটা জটিল হলেও, পূর্বের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খোঁজ করে বের করে তাদের থেকেই তাদের সময়ে সম্পাদিত কাজের নির্ভুল ও ঠিকঠাক হিসেব বের করে নিতে হবে এবং তাতে কোন হেরফের ধরা পড়লে তাদেরকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, তারা সময়মতো কাজ করে নেই প্রমাণিত হলে সেজন্যেও তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পূর্বের কাজের হিসেবনিকেশের ক্ষেত্রে এপদ্ধতি চালু হলে ও বলবৎ থাকলে প্রত্যেক কর্মকর্তা সময়ের কাজ সময়ে করতে বাধ্য থাকবে। যেহেতু বাধ্যবাধকতা ব্যতীত কোন কাজ এমনিএমনি সম্পাদিত হয় না সেহেতু সময়ের কাজ সময়ে সম্পাদনের ক্ষেত্রে এপদ্ধতির ভূমিকা অত্যন্ত সুফলদায়ক

www.pathagar.com

হবে। নিচের দিকে প্রায়সব কর্মচারী সরকারী বাসাবাড়ি পাচ্ছে না ও সংগতির অভাবে পরিবার সাথে রাখতে অক্ষম। তারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে তাদের সন্তানসসন্ততি নিয়ন্ত্রণহীন থাকে। এনিয়ন্ত্রণহীনতার কারণে তাদের অনেকের অনেক ছেলে পথভ্রষ্ট হয়। এসব পথভ্রষ্ট ছেলে মস্তানি, সন্ত্রাস ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হয়। নিচের দিকের সব কর্মচারী তাদের পরিবার সাথে রাখতে পারলে তারা তাদের ছেলেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করতে পারবে। ফলে, তাদের ছেলেরা পথভ্রান্ত বা বিপথগামী হবে না। এতে মস্তানি, সন্ত্রাস ইত্যাদির মাত্রা হ্রাস পাবে। তাই, নিচের দিকের সব কর্মচারী যাতে তাদের পরিবার সাথে রাখতে পারে সেজন্যে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে।

ক্ষমতাসীন ব্যক্তি এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতির কারণেই কোনকিছুরই গতি স্বয়ংক্রিয় নয় এবং সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নতি নেই। উচ্চপর্যায়ের ক্ষমতাসীন ব্যক্তি, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক জানাশুনা ও সুসম্পর্কের কারণে তাদের বড়বড় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন একশান হয় না। এব্যাপারে তারা একজন অপরজনকে সারিয়ে নেয়। যেকোন সিদ্ধান্তের জন্যে একস্তরে কাজ শুরু হয়ে কয়েক স্তর অতিক্রম করে এবং আইন, নিয়ম ও পদ্ধতির জটিলতা ও মারপ্যাঁচের কারণে একেক স্তরে একেক রকম মনোভাব প্রকাশিত হয় এবং দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়ার পরো তা যথার্থ ও সঠিকভাবে পায়াটা কঠিন হয়। এতে ন্যায্যতা শূন্যে বিলীন হয়ে যায় এবং বিদেশীরা আস্থা হারিয়ে ফেলে, বিতৃষ্ণ বা নিস্পৃহ হয়, পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায় না ও বিনিয়োজিত পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয়। একস্তর অপরস্তরকে বিশ্বাস করতে পারে না বিধায় পর্যায়ক্রমে ওপরের স্তর নিচের স্তরকে পাহারা দেয়ার কাজটিই করে থাকে। এ পাহারা দেয়ার কাজটি এমনিভাবে হয়ে থাকে যাতে নিচের স্তর ওপরের স্তরকে ধাপ্পা দিয়ে কোন স্বার্থ সিদ্ধি করতে না পারে। এতে এটা সুস্পষ্ট যে, কাজের মাধ্যমে ন্যায্যতাপ্রতিষ্ঠা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যেভাবেই হোক স্বার্থসিদ্ধি। এরকম ভয়াবহ অবস্থা হতে পরিত্রাণ পায়ার জন্যে যেকোন কাজে কেবলমাত্র ন্যায্যতা দেখতে হয় এবং প্রথম স্তরই বিভিন্ন স্তর থেকে সেটার পক্ষে দ্রুতগতিতে কাজ করিয়ে নিতে হয়। এভাবে ন্যায্যতার কাজে যাকেই দুর্নীতিপরায়ণ পায়া যায় তাৎক্ষণিকভাবে তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাই সব অনগ্রসরতা ও অন্যায্যতার জন্যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী। তারা নিজেরা ন্যায্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে প্রত্যেকটি কাজ তার নিজগতিতে দুর্নীতিমুক্তভাবে

www.pathagar.com

নিষ্পাদিত হবে। এতে শান্তিশৃঙ্খলা বলবৎ থাকবে ও অগ্রসরতার পদচুম্বন করা যাবে। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আইন, নিয়ম ও পদ্ধতি অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্যে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সাধারণত শাস্তিভোগ করতে হয় না। ফলে, তারা নির্ভয়ে তাদের স্বার্থে এগুলো অমান্য করে থাকে। পুরোনো আইন, নিয়ম ও পদ্ধতি বাতিল, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হচ্ছে। নতুন আইন, নিয়ম ও পদ্ধতি রচিত হচ্ছে। এতে এগুলোতে যথেষ্ট ছিদ্র থেকে যাচ্ছে। ন্যায্যতাকে এড়িয়ে অন্যায্যতাকে সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে এসব ছিদ্র তারা সহজে কাজে লাগিয়ে থাকে। একপর্যায়ে ন্যায্যতা পায়া না গেলে অন্যপর্যায়ে তা পায়ার জন্যে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু, দেখা যায় যে, সেখানেও তা পায়া যায় না। এর কারণ হচ্ছে যে, যে অন্যায্যতা চায় সে উৎকোচ দিয়ে বা অন্যভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে তার পক্ষে নিয়ে নেয়। তারা কথিত ছিদ্রপথে তার পক্ষে, অর্থাৎ অন্যায্যতার পক্ষে, কাজ করে। তাছাড়া, একপর্যায়ে ন্যায্যতা সমর্থিত হলে সচরাচর অন্যপর্যায়ে তা কার্যকর করার আদেশ হয়। কিন্তু, সেপর্যায়েও তা কার্যকর না হয়ে অন্যায্যতাই বিরাজমান থাকে। এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উক্ত ছিদ্রপথে কাজ করে থাকে। অপরদিকে, একপর্যায়ে ন্যায্যতা সমর্থিত হলে যে অন্যায্যতা চায় সে অন্যপর্যায়ে গিয়ে উক্ত ছিদ্রপথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা অন্যায্যতাকেই ন্যায্যতা হিসেবে সমর্থন করায়। এককথায়, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নানা ছিদ্রপথে ও অজুহাতে অন্যায্যতার পক্ষে কাজ করার কারণে ন্যায্যতা স্বাভাবিক গতিতে সর্বস্তরে সুদৃঢ় হতে পারছে না। যারা ন্যায্য কাজ চাচ্ছে তাদের কেউ আইন, নিয়ম ও পদ্ধতিতে ছিদ্রের সুযোগ নিয়ে যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী এগুলো অমান্য করে তাদের কারো প্রতি চড়াও হলে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাজে বাধাপ্রদান করার ও আরোঅনেক কারণে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়। এবিষয়ে জনগণ বলতে শুনা যাচ্ছে যে, আইন, নিয়ম ও পদ্ধতি, এগুলোতে ছিদ্রপথের সুযোগ নিয়ে,অমান্যতার কারণে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাস্তি না হলে তারা তাদেরকে এগুলো মান্যতার জন্যে বাধ্য করতে গিয়ে তাদের প্রতি বেআইনী কিছু করলে তাদেরকেও কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। তাদের কথা হচ্ছে যে, যেখানে আইন, নিয়ম ও পদ্ধতির দ্বারা ন্যায্যতালাভ স্বপ্নের বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং অন্যায্যতার প্রাবল্যে সাধারণ মানুষ দিশেহারা সেখানে এগুলোর মাধ্যমে ন্যায্যতাকে সমর্থন ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তারা সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মে দেশব্যাপী সুপরিকল্পিতভাবে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে বেআইনী কাজ করার উদ্যোগ নেয়ার চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের আরো কথা হচ্ছে যে, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বেআইনীভাবে

www.pathagar.com

অন্যায্য কাজ করলে ও তাদের কোন শাস্তি না হলে তারা তাদের বেআইনী হস্তক্ষেপের দ্বারা তাদেরকে ন্যায্য কাজ করতে বাধ্য করলে তা বেআইনী হতে পারবে না ও তাদেরকে আইনের আওতায় এনে কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। তাদের এসব কথার সাথে তারা তাদের তীক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখছে যে, সরকার, অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দল, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে তাদের অন্যায্য কর্মে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়ে থাকে। তাই, একসময় পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী জনসাধারণ সরকারের এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে , অর্থাৎ তাদের সাথে বেআইনী কাজ করে, ন্যায্যতার প্রাবল্য বলবৎ করবে। এটা সরকারের এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্যে আনন্দদায়ক ও সুখকর হবে বলে মনে হয় না। তাই, কালক্ষেপ না করে তাদের প্রত্যেকের বোধোদয় হয়াটা অত্যাবশ্যক।

বাস্তবক্ষেত্রে মনে হচ্ছে যে, ক্ষমতাসীন ব্যক্তি এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা একপক্ষ এবং জনসাধারণ অপরপক্ষ। যে যা-ই বলছে-না-কেন আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি হচ্ছে যে, ক্ষমতাসীন ব্যক্তি এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিজেদেরকে জনগণ থেকে স্বতন্ত্র মনে করে এবং জনগণকে তাদের সেবাদাস ও হুকুমবরদার হিসেবে গণ্য করে। এতে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জনসাধারণ তাদের দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছে, ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যায়অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে গিয়ে নানাভাবে জব্দ হচ্ছে, সামাজিক পরিবর্তনসাধনে অপারগতার শিকার হচ্ছে এবং দেশের অগ্রগতিসাধনকল্পে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে ও অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এসব কারণে দেশ ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হচ্ছে না এবং অন্যায্যতা ও দুর্নীতির জাল সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে আছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কি উপলব্ধি করছে না যে, তাদের ভুলভ্রান্তি, অপরাধ, অন্যায্যতা, দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে পুরো দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জনসাধারণকে এগুলোর মাসুল সম্মিলিতভাবে দিতে হয়। তাই, তাদের নৈতিক, মানবিক ও জাতীয় দায়িত্ব হচ্ছে নিজেদেরকে এগুলো হতে সতত মুক্ত রাখা। তারা এগুলো হতে মুক্ত থাকলে সুবিচার ও ন্যায্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং দেশ ও জনগণের অগ্রগতির পথে যেকোন অন্তরায় আপসে অপসারিত হবে। সরকার হচ্ছে জনগণ, জনগণের ও জনগণের জন্যে। তাই, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা হচ্ছে জনগণের কর্মকর্তা ও কর্মচারী। তারা জনগণের কাজের জন্যে। তারা তাদের অন্তরে সর্বক্ষণ এভাব জাগ্রত রাখতে হবে। অপরদিকে, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা হচ্ছে জনসাধারণের প্রতিনিধি। জনসাধারণ তাদের পক্ষে তাদের কাজ করার জন্যে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদেরকে দায়িত্ব অর্পণ করে থাকে। তাদের নিকট জনসাধারণের এটা একটি পবিত্র আমানত। এআমানত খেয়ানত করার এখতিয়ার তাদের নেই। তারা এআমানত খেয়ানত

www.pathagar.com

না করলে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অবিচার, অন্যায্যতা ও দুর্নীতি হতে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হবে। তাই, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা তাদের হৃদয়ে সর্বদা এঅনুভূতির ক্রিয়া বিদ্যমান রাখতে হবে যে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের ওপর জনগণের অর্পিত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করা, সেটার অপব্যবহারের দ্বারা অবিচার, অন্যায্যতা ও দুর্নীতির জাল বিস্তৃত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দেশ ও জনগণের ক্ষতিসাধন করা নয়।

ড

নীতি বলতে আমরা সুনীতি বুঝি। একজন লোকের নীতি ভালো না হলে আমরা কথায় বলি যে, লোকটির নীতি নেই। অপরদিকে, একজন লোকের নীতি ভালো হলে আমরা বলি যে, লোকটির নীতি আছে। তাই, নীতি বলতেই সুনীতিকে বুঝানো হয়, দুর্নীতিকে নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে নীতি বলতেই দুর্নীতির কথা এসে যায়। এদেশে দুর্নীতি এমন প্রকট ও বিহ্বল হয়েছে যে, সুনীতি মিলাটাই ভার ও দুষ্কর। তাই, এদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে নীতি বলতে সুনীতির পরিবর্তে দুর্নীতিকেই বুঝে নিতে হয়। সত্যাসত্যের ভিত্তিতে সবকিছু হলে দুনীতি, ব্যভিচার, খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, চুরিচামারি, আত্মসাৎ ইত্যাদির প্রাবল্য থাকতে পারে না। সত্যের প্রতি দমননীতি চললে এগুলো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। সত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দমননীতি চলছে বলে এসব হচ্ছে। দুর্নীতির প্রতিই চলতে হয় দমননীতি। তাই, এটাকে বলা হয় দুর্নীতিদমন। দুর্নীতিদমনের স্থান সত্যদমন দখল করে নিলে জাতি সবকিছু হারিয়ে ফেলে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কেউ সত্যকথা বললে এবং সৎসাহসের সাথে সত্যের জন্যে এগিয়ে আসলে তার জীবন দুর্বিষহ হয়। অথচ, যারা অসত্যের ধ্বজাধারী তাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। এটা কোন জাতির অগ্রগতির শুভ সংকেত নয়, কেননা এতে তার প্রায় লোক হতাশাগ্রস্ত থাকে। তাই, রাজনীতিবিদদেরকেই সর্বাগ্রে সত্যনীতির ধ্বজাধারী হতে হয়, কেননা তারা শুধু রাজনৈতিক নেতা নয়, সামাজিক নেতাও। যারা দুর্নীতি দমনের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের কেউই আইন ও নিয়মের ধারাবাহিকতা লংঘন না করতে পারলে এবং তা করলে সাথেসাথে শাস্তি পেলে দুর্নীতি এমনিতেই হ্রাস পাবে। দুর্নীতি দমনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা কারো স্বপক্ষে বা বিপক্ষে তাদের স্বার্থে আইনের অপব্যাখ্যা না করলেও দুর্নীতি অনেকাংশে কমে যাবে, কেননা এতে নির্দোষ ব্যক্তি জড়িয়ে পড়বে না এবং দোষী ব্যক্তি অব্যাহতি পাবে না। দুর্নীতি দমনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদেরকে এব্যাপারে গভীরভাবে সতর্ক হতে হবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। 'ক' 'খ'–এর মারাত্মক দুর্নীতি প্রতিহত করার জন্যে এগিয়ে আসলো।

www.pathagar.com

'ক'–এর এ এগিয়ে আসাতে 'খ'–কে 'গ', 'ঘ' ইত্যাদিরা সমর্থন দেয়ায় 'ক' 'খ'– এর দুর্নীতি প্রতিহত করতে পারলো না। পরবর্তীতে 'গ', 'ঘ' ইত্যাদিরা 'খ'–এর দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। এসময় 'ক' 'খ'–কে সমর্থন দেয়, কেননা 'ক' যখন 'খ' এর দুর্নীতির বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিলো 'গ', 'ঘ' ইত্যাদিরা তখন 'ক'–কে সহযোগিতা না করে 'খ'–কে সমর্থন দিয়েছিলো। এদৃষ্টান্তটি দিয়ে এটাই বলতে চাচ্ছি যে, যেসব রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে তারা যাতে এমনকোন প্রত্যুত্তরে না যায় যেটাতে তাদের অন্যায় সমর্থন এসে যেতে পারে। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সুনীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কাজকর্মে প্রভেদের ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। একজন সুনীতিপরায়ণ কর্মকর্তার অধীনে দুর্নীতিপরায়ণ অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দুর্নীতি করার সুযোগ না পেলে তার আদেশনিষেধ অমান্য করতে আদৌ চিন্তাভাবনা করে না। তারা বিভিন্ন অপকৌশলের মাধ্যমে তাকে অদক্ষ, কাজের অনুপযুক্ত ও ঝামেলাসৃষ্টিকারী হিসেবে প্রমাণ করতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। তারা তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দুর্নীতিপরায়ণ হলে তাদের সাথে তার বিরুদ্ধে যোগাযোগরক্ষা করে তার ক্ষতি করতে পিছপা হয় না। কিন্তু, সে সুনীতিতে থাকার কারণে তার অধস্তনদেরকে দুর্নীতি না করতে দিতে গিয়ে কাজকর্মে নানা ঝামেলা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং অযাচিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট কারো ব্যাপারে মুখ না খুলে নিজের কাজ নিজে চালিয়ে যাবার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। অপরদিকে, এমনো কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে যারা দুর্নীতি করে না। কিন্তু, তাদেরকে দুর্নীতিমূলক কাজ করতে বাধ্য করা হয়। তারা দুর্নীতিমূলক কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ভোগান্তিতে নিপতিত হয় এবং পদোন্নতি তাদের নিকট দুষ্পাপ্য বস্তুর মতো মনে হয়। তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে ভালো নম্বর আসে না এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিভাগীয় মামলায় তারা বিভিন্নপ্রকারের শাস্তিও কম পায় না। এমনকি তাদের কারোকারো বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন বিভাগে মামলা জুড়ে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। ক্ষমতাসীন রাজনীতবিদেরা সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্যে দুর্নীতিমুক্ত ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে নিজেদের উদ্যোগে আহ্বান করে শুনতে হয়, তারা যাতে যথাযোগ্য মর্যাদা পায় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় এবং তাদের জীবনের গতিতে যেকোন মিথ্যাদাগকে তাদের জন্যে আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য করতে হয়। দুর্নীতি কখনো উন্নতি দিতে পারে না। এটা স্থবিরতা আনে। সুনীতি ও সততা প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান অগ্রসরতা আনতে পারে। ফলে, মানুষ দায় না হয়ে সম্পদে রূপান্তরিত হয় এবং তাদের সবধরনের সংকট দূর হয়ে যায়। আজ আমাদের সব সংকট ও সমস্যা দূরীকরণের জন্যে সুনীতি ও সততা অত্যাবশ্যক। দুর্নীতি যে অত্যন্ত খারাপ তা সবাই বুঝে। তবু, দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে না। জীবনধারণের অনিশ্চয়তাই দুর্নীতির অন্যতম কারণ।

www.pathagar.com

আর্থিক সচ্ছলতা ও ধনসম্পদ না থাকলে জীবনে দুঃখকষ্টের সীমাপরিসীমা থাকে না। এঅনিশ্চয়তার কারণেই প্রত্যেকেই নিজের ও বংশধরদের জন্যে যেকোনভাবে বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হতে চায়। তাছাড়া, একজন মনে করে যে, অন্যান্যরা দুর্নীতি না করলে তার একজনের দুর্নীতিতে কোন সমস্যা বা অসুবিধা হবে না। এভাবে একজন একজন করে প্রায়সবাই এটা মনে করে। ফলে, দুর্নীতিকে খারাপ জেনেও সেটার সুযোগ হলে প্রায়সবাই সেটা হতে মুক্ত থাকছে না। জীবনধারণের নিশ্চয়তাবিধান করতে পারলে দুর্নীতির ভয়াবহতা থাকবে না এবং এটা কঠোর হস্তে দমন করাটা সহজতর হবে। জীবনধারণের নিশ্চয়তাবিধান করে দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমনের জন্যে সুষম বণ্টন অপরিহার্য এবং ইসলামী নীতিই এঅপরিহার্যতা সংরক্ষণ করে।

কে দুর্নীতিপরায়ণ ও কে দুর্নীতিপরায়ণ নয় জনগণ তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। সরকারো দুর্নীতিপরায়ণ হলে জনগণ সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। নিজেরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে অন্যান্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এগিয়ে গেলে বিপাকে ও বিপত্তিতে পড়তে হয়। ফলে, অন্যান্যকেও দুর্নীতি করতে দিতে হয়। ক্ষমতাসীনেরা নিজেদেরকে যতো চালাকই মনে করে–না–কেন অন্যান্যরা তাদেরকে দুর্নীতিপরায়ণ দেখতে পেয়ে দুর্নীতি করতে শুরু করলে সর্বত্র নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং জাতীয় কর্মকাণ্ডে দুর্নীতির ঢল নামে। দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোটিকোটি টাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। নির্মাণকাজে, শিল্পোন্নয়নে, খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধিতে, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে, স্বাস্থ্যরক্ষায় ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে। অথচ, দুর্নীতি, অপচয়, অনিয়ম, দীর্ঘসূত্রিতা ও অদক্ষতার কারণে এঅর্থের একটি বিরাট অংশ এসব কাজে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের হাতে চলে যাচ্ছে। কোনকোন কাজ বা প্রকল্প শুরু করার আগেই বিপুল অর্থের অপচয় ঘটে। কোন প্রকল্পের জন্যে যেটাকা বরাদ্দ করা হয় এবং যেসময়সীমার মধ্যে যেমানে প্রকল্প শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয় সেটাকায় সেসময়ে ও সেমানে প্রকল্পটি শেষ হয় না। নির্ধারিত সময়ের পরো সময় লাগে ও বাড়তি বরাদ্দ দিতে হয়। অথচ, প্রত্যেকটি সরকারী প্রকল্পে প্রয়োজনের চেয়ে অনেকবেশি বরাদ্দ দেয়া হয়। কোনকোন প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ হলেও তা নিম্নমানের হয় বিধায় সেগুলো বেশি দিন টিকার সম্ভাবনা থাকে না। কোনকোন চালু প্রকল্প, সংস্থা, বোর্ড ইত্যাদি হঠাৎ বন্ধ করে ও ভেঙে দেয়া হয়। এতে ব্যাপক দুর্নীতি হয় ও চাপা পড়ে যায় এবং সরকারের অজস্র ক্ষতি হয়। তাই, এধরনের কোন প্রকল্প, সংস্থা, বোর্ড ইত্যাদি বন্ধ করে ও ভেঙে দেয়ার পূর্বে সেটার চুলচেরা হিসেবনিকেশ, দলিলদস্তাবেজ, নথিপত্র, কাগজপত্র ইত্যাদি সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে হালনাগাদ করে নেয়াটা অপরিহার্য ও অকাট্য। উৎপাদনবৃদ্ধির ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ দেয়া হয়। কিন্তু, সাধারণভাবে যেসময় যেকাজে যেভাবে ঋণ

www.pathagar.com

পায়ার সেসময় সেকাজে সেভাবে তা পায়া যায় না। একদিকে, যেপরিমাণ ঋণ পায়ার কথা নানা কারণে সেপরিমাণ পায় না। অপরদিকে, যেকাজে লাগবে এক কোটি টাকা সেকাজে দেখানো হয় পাঁচ কোটি টাকা। যাহোক, বিভিন্ন চড়াইউতরাই পার হয়ে ঋণ পেলেও তা সময়মতো ফেরত দেয়া হয় না। ফলে, ঋণের মূল লক্ষ্য ব্যাহত হয়। তাছাড়া, নানা উদ্দেশ্যে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ঋণ পেতে অনেক পোহাতে হয় ও প্রয়োজনীয় খরচের চেয়ে অনেকবেশি খরচ হয়। প্রকল্পের নামে কোটিকোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা তাতে খাটানো হয় না। ব্যাংকগুলোর সাথে সব কাজকারবারে দুর্নীতি সম্পৃক্ত। হাউজ বিল্ডিং ফাইনেন্স কর্পোরেশনেও ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি চলে। সাধারণত, দুর্নীতির জালে আবদ্ধ না হয়ে এঋণ পায়াটা ও কাজে লাগানোটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এককথায়, সবধরনের ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতির ঘোড়া একবারে লাগামহীন। এসব কারণে কিছু লোকের অকল্পনীয়ভাবে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে এবং সাধারণ লোকের, যারা এঐশ্বর্যের প্রকৃত মালিক, দুঃখদুর্দশা বাড়তেই থাকে।

আমরা জনসংখ্যা সমস্যাকে ১ নং জাতীয় সমস্যা বলে আখ্যাত করছি। সবদিক নিরপেক্ষভাবে বিচারবিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বর্তমানে বাংলাদেশে দুর্নীতিই হচ্ছে ১ নং জাতীয় সমস্যা। যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত তারাও প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে নানাপ্রকার দুর্নীতিতে ডুবে আছে। দুর্নীতির কারণে সামাজিক সুবিচার ও সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত হচ্ছে না, ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে ও গরীবেরা আরো গরীব হচ্ছে, কালো টাকার পাহাড় গড়ে ওঠছে, এটাকা অলস হয়ে আছে ও বিলাসিতায় ব্যয়িত হচ্ছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, অনৈতিকতার পাগলা গোড়া লাগামহীনভাবে ছুটছে, অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ দিনদিন জোরদার হচ্ছে, নতুন আইন প্রণয়ন এবং পুরোনো আইন পরিবর্তন ও সংশোধন সত্ত্বেও নানাধরনের অপরাধ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আত্মসাৎ ও জালিয়াতির কাজ সাহসিকতার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে, টাকা দ্বারা অসম্ভবো সম্ভব হচ্ছে ও টাকার অভাবে সম্ভবো অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে, শিক্ষাঙ্গন কলুষিত হচ্ছে, মস্তানি ও অস্ত্রের ঝনঝনানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, 'যোর যার মুল্লুক তার' প্রবাদটি বাস্তবরূপ লাভ করছে, মানইজ্জতের অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা ও আন্তরিকতা ওঠে যাচ্ছে, বেঈমানি ও মোনাফেকি জোরদার হচ্ছে, প্রতারক ও প্রবঞ্চকেরা নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, গাদ্দাররা আস্ফালন করছে, ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের প্রতি বিতৃষ্ণা বাড়ছে, যারা ব্যক্তিস্বার্থে আইনানুযায়ী কাজ করছে না জনগণ না বুঝে তাদের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল না হয়ে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হচ্ছে, বাজেট অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ ও প্রকল্পে সরকারী ব্যয়ের সিংহভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ব্যক্তিদের হস্তগত হচ্ছে, মানুষ ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য ভুলে যাচ্ছে, অন্যায়ের প্রতি সমর্থন জোরদার হচ্ছে, বিভিন্নভাবে নিরীহ ও অসহায়

www.pathagar.com

লোকজনের হয়রানির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, নির্বাচনে টাকার খেলা চলছে, রাজনীতিবিদদের কথা ও কাজ এক হচ্ছে না, রাজনীতির নামে প্রহসন চলছে ইত্যাদি ইত্যাদি। দুর্নীতির অবসান ঘটলে দেখা যাবে যে, জনগণের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হচ্ছে এবং সুষম বণ্টনের পথ প্রশস্ত হচ্ছে। ফলে, জনসংখ্যা সুনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং এটা সমস্যা হিসেবে বিরাজমান থাকছে না।

একেবারে যে কিছুকিছু সৎকর্মকর্তা ও কর্মচারী নেই তা নয়। এরা সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খায় এবং দুর্নীতি করে না বিধায় সৎমনে কাজ করতে গিয়ে দুর্নীতির নীতিতে আটকে পড়ে উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা হারিয়ে ফেলে। কিছুকিছু ভালো লোক থাকাতেই দেশ ও দুনিয়া টিকে আছে। ন্যায়সংগতভাবে কাজ করতে গেলে নানাধরনের জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সৎকর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কষ্ট সহ্য করেও এসব জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা খণ্ডন করতে হবে। এগুলোকে ভয় করলে দুর্নীতি ও অপকর্ম প্রশ্রয় পেতেপেতে সব ধ্বংস হয়ে যাবার উপক্রম হবে। অন্যায়ের সাথে আপস করাটা জায়েজ হবে না। কষ্ট সহ্য করে এবং জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা খণ্ডন করে দেশকে ধ্বংস থেকে কিছুটা রক্ষা করতে পারা অনেক শ্রেয়। তবে, ক্ষমতাসীন সৎ ও মহৎ রাজনীতিবিদেরাই এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মনোবল অটুট রেখে দুর্নীতিকে রুখে দাঁড়াতে পারে। থানার অভ্যন্তরে কি চলছে তা দূর থেকে বুঝা কঠিন। একটি কাজকে কয়েকটি কাজ দেখিয়ে একটি কাজ করে বাকি কাজগুলোর সব টাকা বা দ্রব্য আত্মসাৎ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, গম দিয়ে যেকাজ করানো হয় টাকা দিয়েও সেকাজটি করানো দেখানো হয়। মাটির কাজের ও টাকার কাজের দুটি পৃথক কর্তৃপক্ষ। যখন যেকর্তৃপক্ষ সরেজমিনে যায় তখন তাদেরকে কাজটি দেখানো হয়। তারা বুঝতেই পারে না যে, একই কাজ অন্যকর্তৃপক্ষকেও দেখানো হয়েছে বা হবে। ভালো রাস্তার সংস্কার দেখিয়ে টাকা বা দ্রব্য আত্মসাৎ করা হচ্ছে। থানায় অবস্থিত অফিস ও বাড়িঘর সংরক্ষণের জন্যে যে নির্দিষ্ট টাকা আছে সেটাকা, প্রতিবছর মেরামত বা গঠনসংক্রান্ত কোন কাজের প্রয়োজন হয় না বিধায়, ভুয়ো প্রাক্কলন ও কাজ দেখিয়ে পুরোটাই আত্মসাৎ করা হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের গম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ব্যক্তিরা মিলেমিশে প্রায় ৫০/৬০ ভাগ আত্মসাৎ করে থাকে। যারা এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলে তারা নানাভাবে জব্দ হয় এবং এব্যাপারে কোথাও কোন প্রতিকার পায়াটা খুবই দুষ্কর হয়।

প্রায়ক্ষেত্রেই যারা রক্ষক হিসেবে সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকে তারাই ভক্ষক হয়ে ভক্ষণ করে। এভক্ষণ হচ্ছে সরকারী অর্থ, মালামাল ও সম্পদ আত্মসাৎ করা। আত্মসাৎ

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ এবং তা এমনিতেই ধরা পড়ে। আত্মসাতের অনেক চাঞ্চল্যকর খবর শুনা যায় এবং খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টালে নজরে পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত এসব আত্মসাৎকারীদের কিছু হতে দেখা যায় না। এতে জনগণ বুঝে যে, রাজনৈতিক কারণে ও ক্ষমতাসীনদের হস্তক্ষেপের ফলেই এরকমটি হয়ে থাকে। অথচ, আত্মসাৎ অবদমিত হলে সরকারের অর্থনৈতিক সংকট যে অনেকটা কেটে যাবে তা নিঃসন্দেহে বা সংশয়হীনভাবে বলা যায়। খাজনা দিতে খুশি করতে হয়। টেক্স দিতে খুশি করতে হয়। বৈদ্যুতিক বিল পরিশোধের তারিখ পরিবর্তন করতে খুশি করতে হয়। পিয়ন থেকে একটি চিঠি নিতেও খুশি করতে হয়। এককথায়, যেকোন ক্ষুদ্রতম কাজেও ঘুষ দিতে হয়। কথায় বলে যে, দেয়ালেরো কান আছে। তাই, বলতে হয় যে, বাংলাদেশের সর্বত্র শুনা যাচ্ছে যে, খুশি কর ও ঘুষ দাও, তা না হয় জাহান্নামে যাও, তাতে কার কি। প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দালাল দ্বারা বেষ্টিত। তবে, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরাই দালালদের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং দালালদের পরামর্শেই তারা তাদের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী খারাপ কাজ করে থাকে। প্রায়ক্ষেত্রেই ঘুষ ও দুর্নীতির কাজ দালালদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। দালালিতে অনেক রূপসী মহিলার জড়িত থাকার কথাও শুনা যায়। প্রায় লোকই যেকোনভাবে তাদের সবকিছু হয়াটা চায়। এমোহ তাদেরকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে এবং তারা সবদিকে সবকিছু করতে পারে। তাই, এচায়া ও পায়ার মধ্যে কাজ করে সবরকমের দুর্নীতি।

সম্পদশালীরাই সহজে সরকারী সম্পদ হস্তগত করছে। সরকারী সম্পদ হস্তগত করতে হলে প্রচুর টাকা খরচ করে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মুখ বন্ধ করতে হয়। সম্পদশালীদের টাকার অভাব নেই বিধায় তাদের পক্ষে এটা সম্ভব হয়। তারা যখন দেখে যে, এক কোটি টাকার সম্পদ দশ লাখ টাকা খরচ করলে হস্তগত করা যায় তারা তখন তা করতে আগপাছ ভাবে না। পরবর্তীতে কোন অসুবিধা হলে তারা তা–ও টাকার বিনিময়ে কেটে ওঠতে পারে। তাই, সরকারী সম্পদ খোঁজ করে বের করার জন্যে তারা দালাল লাগিয়ে রাখে। দালালরাও বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে সরকারী সম্পদ হস্তগত করে হঠাৎ বিপুল পরিমাণ টাকার মালিক হয়ে যায়। এসব কাজ ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ, পদস্থ কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদেরকে হাত করেই করা হয়। সাংবাদিকেরা নানাধরনের তথ্যসংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। তারা সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে অনেক গভীরে প্রবেশ করে। এসব তথ্য তারা পত্রপত্রিকায় তুলে ধরে। বিভিন্ন পত্রিকা হতে দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্যগুলো যথাযথভাবে সংগ্রহের মাধ্যমে জরুরীভিত্তিতে সরেজমিনে তদন্ত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করতে চিন্তাভাবনা করবে। এতে দুর্নীতির মাত্রা হ্রাস পাবে। দুর্নীতি

www.pathagar.com

এমন প্রকট হয়েছে যে, ন্যায়সংগত কাজেও ঘুষ দিতে হয়। ঘুষ না দিলে কাজটিতে বিভিন্ন কায়দায় প্যাঁচ লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে বাগে আনার চেষ্টা করা হয় এবং সত্যকে মিথ্যায় রূপান্তরিত করে কাজটিকে বেঠিক দেখাতেও ইতস্তত করা হয় না। এসব দুর্নীতিপরায়ণ ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অনেক ওপর পর্যন্ত হাত ও যোগাযোগ থাকে। ফলে, যারা তাদের ন্যায়সংগত ও সঠিক কাজে ঘুষপ্রদানে রাজি হয় না তাদের হয়রানি ও নাকালের অন্ত থাকে না এবং তারা কোথাও খুবসহজে তেমনকোন প্রতিকার পায় না। যথাসময়ে যথাযথ প্রতিকারের অভাবো দুর্নীতিবাজদেরকে তাদের দুর্নীতিতে সাহস যুগিয়ে চলছে। এটা একটি জাতির অধঃপতনের চরম পর্যায় ছাড়া আর কি হতে পারে।

বিরোধী দলগুলোকে যেসব ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্রদল, সংঘ, সমিতি ইত্যাদি সর্মথন দেয় সরকারী দল সেগুলোর মধ্যে ভাঙন ধরায়। অনুরূপভাবে, সরকারী দলকে যেসব ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্রদল, সংঘ, সমিতি ইত্যাদি সমর্থন দেয় বিরোধী দলগুলো সেগুলোর মধ্যে ভাঙন ধরায়। এতে এটা পরিষ্কার যে, কোন সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে এসব ইউনিয়ন, ছাত্রদল, সংঘ ও সমিতি প্রতিষ্ঠিত নয়। এগুলোর সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যেকোনভাবে স্বার্থসিদ্ধি করা। তাই, তারা যেদিকে যেভাবে যেস্বার্থ পায় সেদিকে সেভাবে সেস্বার্থের পেছনে ধাবিত হয়। এটা হচ্ছে বিভক্ত করে শাসন করার নীতি। এনীতি দুর্নীতি। এদুর্নীতির পরিণতিও একটি জাতির জন্যে ভয়াবহ ও বিভীষিকাময়। এনীতির কারণেই অসন্তোষ, অশান্তি, উত্তেজনা, বিক্ষোভ, গোলমাল ও চাঞ্চল্য বিরাজমান। এমনএমন নীতি রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে কাজে সহজে দুর্নীতি করা যায়। দুর্নীত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এসব নীতির মাধ্যমে দুর্নীতি করছে। তাদের এসব দুর্নীতিতে তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। তাদের এসব দুর্নীতি বন্ধ করার জন্যে এসব নীতি বাতিলপূর্বক সময়োপযোগী নতুন নীতি প্রবর্তন করাটা একান্ত প্রয়োজন।

দুর্নীতি দমন বিভাগে কোনকোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কোন অভিযোগ পেলে সেটাকে কেন্দ্র করে কি করে অধিক লোককে সেটাতে টেনে এনে অধিক পরিমাণে ঘুষ আদায় করা যায় সেকাজে লেগে যায়। ফলে, তারা অভিযোগের বিষয়বস্তুর বাইরে সেটার সাথে আরোঅনেক অবান্তর বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট দেখিয়ে সেগুলোর সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদেরকে নিয়ে টানাটানি করে। অথচ, এটা সম্পূর্ণরূপে অনভিপ্রেত। তবু, তারা এটা এউদ্দেশ্যে করে যে, তাদের থেকে ঘুষ নিয়ে তাদেরকে অব্যাহতি দিলে কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে না এবং আইনেও কোনপ্রকার অসুবিধা হয় না। কিন্তু, যে নীতিতে অটল এবং দুর্নীতির সাথে কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয় সে ঘুষ না দিয়ে যতোভাবেই দেখায় না

www.pathagar.com

যে, সে দুর্নীতিতে কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয় তাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিক থেকে টেনে এনে তাতে সম্পৃক্ত করে নানা সমস্যার দিকে ঠেলে দেয়া হয় এবং তার মানইজ্জত ক্ষুণ্ন করা হয়। অপরদিকে, যারা দুর্নীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত তাদের মধ্যে যারা ঘুষপ্রদান করে তাদেরকে অযৌক্তিকভাবে হলেও, নানা যুক্তি প্রদর্শন করে, অব্যাহতি দেয়া হয় এবং প্রকৃত দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করার সুযোগ পেতে থাকে। তাই , দুর্নীতি দমিত না হয়ে প্রকট হচ্ছে এবং এটার জন্যে দুর্নীতি দমন বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থেকে যাচ্ছে। কেউ টাকাপয়সা খরচ করতে বা ঘুষ না দিতে চেলে তার প্রকৃত কাজের সাথে প্যাঁচ দিয়ে অনেককিছু টেনে আনা হয়। ফলে, সে ঘুষ দিতে বাধ্য হয় এবং ঘুষ না দিলে বিপাকে পড়ে। একটি কাজের সাথে প্যাঁচ দিয়ে অন্যকিছু জড়িত করা যাবে না এবং কাজটি যেনিয়মে হয়ার সেনিয়মের সাথে অন্যকোন নিয়ম সম্পৃক্ত করা যাবে না। তা হলে যখনতখন ঘুষআদায়ের অপকৌশল প্রয়োগ করা যাবে না এবং সব লোক না হলেও অন্তত বিবেকবান লোকেরা সাহসিকতার সাথে বিভিন্ন অফিসআদালত হতে তাদের কাজ, দুর্নীতির ফাঁদে না পড়ে, আদায় করে নিতে সক্ষম হবে।

এমনকোন অফিস নেই যেখানে দুর্নীতি নেই। অথচ, সবাই দুর্নীতি অপছন্দ করে এবং এটা দমনের পক্ষপাতী। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু উল্লেখ করছি। যথেষ্ট অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। বৈদ্যুতিক মিটারে অনেকঅনেক ইউনিট ওঠলে তা নষ্ট করা বা ঘুরিয়ে দেয়া হয়। প্রথমে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব নয় বলে প্রচুর টাকা নিয়ে পরে তা দেয়া হয়। সুদসহ বকেয়া বিলের টাকা কাঠপেন্সিল দিয়ে রেজিস্টারে লিখে রাখা হয় এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাহক সমঝোতায় আসলে তা ঘষে তুলে ফেলে যা লিখার তা কলম দিয়ে লিখা হয়। এতে যে সরকারের কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। কোনকোন শিল্পের মালিক ও উৎপাদনকারীর সাথে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেআইনী সংযোগসম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। 'ওয়াসা' মাঝখান দিয়ে কিছু এলাকা বাদ দিয়ে এ–সে অজুহাত দেখিয়ে সেএলাকার লোকজনকে বোকা বানিয়ে সেটার দু'দিক দিয়ে ঘুষ পেয়ে সিউআর বা ড্রেন নির্মাণ করে। সিটি কর্পোরেশনো তা করে থাকে। বিদ্যুৎ বিভাগ, গ্যাস কোম্পানি, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, টেলিফোন বিভাগ, পৌরসভা ইত্যাদি একই ধরনের কাজ করে থাকে। তাদের একাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘুষআদায় করা। যেকোন অফিসে টাকা দিলে অবৈধ কাজো বৈধ হয়ে যায় এবং টাকা না দিলে বৈধ কাজো হয় না। পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন না করেও মিথ্যেভাবে ভ্রমণভাতা গ্রহণ করে। হাসপাতালে ডাক্তাররা রোগীদেরকে ওষুধ না দিয়েও দেয়া হয়েছে দেখায়। অনেক ডাক্তার অনেক প্রাইভেট ক্লিনিকের সাথে জড়িত। তাদের পরামর্শে অনেক রোগী প্রাইভেট ক্লিনিকে

www.pathagar.com

চিকিৎসাগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তাই, হাসপাতালগুলোতে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পায়া যায় না। এগুলোতে চিকিৎসা পেতে হলেও ডাক্তারদেরকে পরোক্ষভাবে ফী দিতে হয় এবং রোগীর জন্যে ওষুধাদি বাইর থেকে কিনতে হয়। মানুষের জীবন নিয়ে ডাক্তারদের বিভিন্ন পরোক্ষ দুনীতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বা সংস্কার ও উন্নয়নমূলক বিভাগ কাজ যতোটুকু করে তার অধিক প্রাক্কলনে দেখায়। যেঠিকাদারকে কাজ দেয়া হয় প্রকৌশলীরা তাকে এটা দেখিয়ে তার থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে নেয়। তদুপরি, প্রকৌশলীদেরকে সে শতকরা হারে ঘুষ দিতে হয়। এতে কাজের মান ভালো হয় না। সরকারের বিভিন্ন অফিসে এপদ্ধতিতেই ঠিকাদারদের দ্বারা কাজকর্ম করানো হচ্ছে। কোথাওকোথাও নানা অজুহাতে নিম্নদরদাতাকে কাজ না দিয়ে উচ্চদরদাতাকে দিয়ে তার থেকে নিম্ন ও উচ্চ দরের মধ্যে টাকার যেপার্থক্য হয় তা যারা সংশ্লিষ্ট তারা নিয়ে নেয়। টাকা দিলে সহজে টেলিফোন সেট পায়া যায়। টেলিফোন যতো না ব্যবহার করা হয় বিলে তার চেয়ে অনেকানেক বেশি ব্যবহার দেখানো হয়। তবে টাকা দিলে তা ঠিক হয়ে যায়। গ্যাসের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। একদিকে বিদেশ থেকে ক্রয়কৃত খারাপ মিটার বসানো আছে, অপরদিকে চুলাভিত্তিক বিল নিচ্ছে। এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ফাঁক সৃষ্টি করে রেখেছে। ঠিকাদারদের মাধ্যমে গ্যাসের সংযোগ পেতে হয়। কিন্তু, তাদের কাজে কোন রেট ধার্য করা নেই। তাই, তারা তাদের খেয়ালখুশিমতো শোষণ করে। তাছাড়া, সংযোগ পেতে ও যেকোন কাজ আদায় করতে বারবার ধর্না দিয়ে ঘুষ দিতে হয়। কোন প্রতিকার পায়া যায় না। প্রতিকার চেতে গিয়ে নানারকম ঝামেলায় নিপতিত হতে হয়। সরকারী যানবাহন পুলে সরকারী যানবাহন মেরামতের সময় ভালো যন্ত্রাংশ খুলে রেখে খারাপ যন্ত্রাংশ লাগিয়ে দেয়া হয়। তাছাড়া, যন্ত্রাংশ কেনার ক্যাশ মেমো নিয়ে সেগুলো না নিয়ে বা সেগুলোর কিছু অংশ নিয়ে বিক্রেতা থেকে আনুপাতিক হারে সেগুলোর দাম নিয়ে নেয় এবং ক্যাশ মেমোর পুরো টাকাটাই যেঅফিসের সাথে সংযুক্ত যানবাহন মেরামত করা হয় সেঅফিসের নিকট পরিশোধের জন্যে প্রেরিত বিলে দেখানো হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাঁধনির্মাণের ক্ষেত্রে মাটিকাটাসহ বিভিন্ন কাজে ঠিকাদারদের মাধ্যমে অজস্র টাকা মেরে দেয়া হয়। ভূমি হুকুম দখলের ক্ষেত্রে টাকা দিলে জমির দাম বেড়ে যায় এবং টাকা না দিলে জমির দাম কমে যায়। শতকরাহারে ঘুষ না দিলে ক্ষতিপূরণের টাকা তোলার ক্ষেত্রে অবৈধভাবে নানা প্যাঁচ লাগিয়ে দেয়া হয়। বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন কারসাজির মাধ্যমে খাস জমি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও অর্পিত সম্পত্তি ব্যক্তিমালিকানায় দেখিয়ে ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়া হয়। সাধারণত শহর, নগর ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সম্পদশালীরাই এজমি ও সম্পত্তির বন্দোবস্ত পেয়ে থাকে। গম দিয়ে যেকাজ করানো হয় তা ষোল আনার মধ্যে গড়ে ছয় আনা হয় কিনা সন্দেহ

www.pathagar.com

আছে। একাজে গণপ্রতিনিধিরাও প্রত্যক্ষভাবে শতকরাহার নেয়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে গম দিয়ে কাজের বড়বড় প্রকল্পে ব্যাপকহারে দুর্নীতি চলে। তাদের একাজে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ নেই বললেও চলে। এসব প্রকল্পে যতোকাজ দেখানো হয় বাস্তবে ততোকাজ থাকে না। তাছাড়া, এসব প্রকল্প সম্পর্কে জনগণ তেমনকিছু বুঝে ওঠতে পারে না। ফলে, এগুলোতে ইচ্ছা অনুযায়ী দুর্নীতি করা হয় এবং যেকোন পরিস্থিতিতে তা সামলিয়ে নেয়া হয়। এজাতীয় দুর্নীতি জাতীয় অগ্রগতিতে একটি বড় অন্তরায়। টাকা না দিলে সহজে দলিলপত্রের নকল ও নন–জুডিশল স্ট্যাম্প পায়া যায় না। দলিল রেজিষ্ট্রির সময় বাধ্য হয়ে চাহিদামোতাবেক অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। বড়বড় জলমহল নিলামের ক্ষেত্রে বড়াকারের কারচুপি চলে। এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি অফিসে বিভিন্নধরনের দুর্নীতি আছে। এমনকি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি আছে। টাকা দিলে কখনোকখনো মিথ্যেখবরো প্রকাশিত হয় এবং টাকা না দিলে সত্যিখবরো প্রকাশিত হয় না। গণপূর্ত বিভাগ এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগে ঠিকাদারদের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজে ব্যাপক দুর্নীতি চলে। রেলওয়েতে বহু যাত্রীকে বিনা টিকেটে ভ্রমণ করতে দিয়ে তাদের থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা আনুপাতিক হারে টাকা নিয়ে সরকারের বিপুল ক্ষতি করে থাকে। রেলওয়েতে আরো নানাধরনের ব্যাপক দুর্নীতি আছে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ছোটবড় অনেক দুর্নীতি আছে যেগুলো সাধারণত জনসমক্ষে প্রকাশ পায় না। এন, জি, ও,–গুলোও দুর্নীতিমুক্ত নয়। এগুলোতে নানাধরনের দুর্নীতি আছে। এসব দুর্নীতি সম্পর্কে সাধারণ লোক ওয়াকেফহাল নয়। এমনকোন মন্ত্রণালয় ও অফিসআদালত নেই যেটাতে ছোটবড় নানাধরনের দুর্নীতি নেই। এসব দুর্নীতির কারণে সাধারণ লোক ও দেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং একশ্রেণীর কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আমদানিরপ্তানিকারক, কালোকারবারি চোরাচালানি, মাতব্বর, সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী, শিক্ষক, ছাত্র, অপরাধী, নেতা, গণপ্রতিনিধি ও রাজনীতিবিদ ফুলেফেঁপে ওঠছে।

মজুতদারিও একধরনের মারাত্মক দুর্নীতি। মজুতদারেরা মালামাল, জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্য মজুত করে রাখে এবং ক্রেতাদের নিকট চড়া দামে বেচে। তারা সময় ও সুযোগ বুঝে কম দামে মালামাল, জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্য কিনে মজুত করে ফেলে এবং বেশি দামে বেচে নিরীহ জনসাধারণকে অকল্পনীয়ভাবে শোষণ করে। এ মারাত্মক দুর্নীতির দ্বারা তারা টাকার পাহারা গড়ে তোলে এবং সামাজিক কলুষতা তীব্রাকার ধারণ করে। পুঁজিপতি, শিল্পপতি ও বড়বড় ব্যবসায়ীরা বলতে শুনা যায় যে, তারা লোকসান দিচ্ছে এবং বিভিন্ন সংকট কেটে ওঠতে পারছে না। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, তাদের বাড়িগাড়ির, জাঁকজমকের ও সম্পদের অভাব নেই। বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুর্নীতির মাধ্যমেই তারা এসব অর্জন করছে। বিভিন্ন করনিরূপণ কর্তৃপক্ষ যারা

www.pathagar.com

টাকাপয়সা খরচ করে তাদের যেকর হয় তার চেয়ে অনেক কম কর নিরূপণ করে। অন্যদিকে যারা টাকাপয়সা দিতে রাজী হয় না তাদের প্রতি গোসা করে প্রকৃতপক্ষে তাদের কর যা হয় সেটার চেয়ে বেশি কর ধার্য করে। এসবের কোন প্রতিকার হয় না বিধায় সবাই তাদের নিকট সমর্পণ করে এবং তাদের রামরাজত্ব চলে। তাছাড়া, নিয়মমোতাবেক যেসব ক্ষেত্রে কর ধার্য হয় না সেগুলোতে অবৈধভাবে টাকাপয়সার জন্যে নানাধরনের অসুবিধা ও সমস্যা দেখানো হয়। যারা অবৈধভাবে টাকাপয়সা দিয়ে দেয় সেগুলোতে তাদের কোন কর ধার্য হয় না। কিন্তু, যারা অবৈধভাবে টাকাপয়সা দিতে রাজী হয় না তাদেরকে অবৈধভাবে বিভিন্ন ফাঁক দেখিয়ে বিভিন্ন অসুবিধায় ফেলে হেস্তনেস্ত ও নাজেহাল করতে থাকে। এটার বিরুদ্ধে কোথাও কোন প্রতিকার পায়া যায় না এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অবৈধভাবে টাকা আদায়ের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ। অপরদিকে, বড়বড় শিল্পপতি, পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী ও আরো অনেকের আয়ের হিসেব নেয়াটা বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। করনিরূপণকারীরা যার ক্ষেত্রে কর নিরূপণ করতে জটিলতার সম্মুখীন হয় তার ব্যাপারটি দেখিয়ে বলে যে, তারা সরকারের সহযোগিতা ও নিরাপত্তার অভাবে কর সঠিকভাবে নিরূপণ ও আদায় করতে পারে না। কিন্তু, তারা যাদের কাছ থেকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঘুষ পেয়ে যায় তাদের সম্বন্ধে কোনপ্রকার উচ্চবাচ্য করে না। কর বেশি আরোপ করলেই যে সরকারী আয় বেশি হয় তা নয়। কর বেশি আরোপ করলে করদাতারা কর কম দেয়ার বা না দিয়ে সারতে পারার জন্যে করনিরূপণ ও আদায়কারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঘুষ নিয়ে কর কম নিরূপণ করে বা না দেয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। এতে করনিরূপণ ও আদায়কারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অজস্র টাকার মালিক হয় এবং সকারের বিপুল ক্ষতি হয়। অপরদিকে, যারা ঘুষপ্রদান করে না ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের কর কঠোরভাবে নিরূপণ করে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। তাই, বিভিন্নধরনের কর যতোকম আরোপ করা যায় ততোই ভালো। এতে করদাতারা করপ্রদানে উৎসাহী হবে এবং তারা করনিরূপণ ও আদায়কারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে ঘুষপ্রদান করতে আগ্রহী হয়ে এগিয়ে যাবে না বিধায় তারা যত্রতত্র যেসেভাবে ঘুষগ্রহণ করে অবৈধভাবে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়াতে বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং সরকার ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তুলনামূলকভাবে কর বেশি পাবে।

উন্নয়নমূলক কাজের নামে কোটিকোটি টাকা আত্মসাৎ হয় এবং একই কাজকে বিভিন্নভাবে কয়েক কাজ দেখানো হয়। কোনটাতেই কোন অসুবিধাও হয় না, শাস্তিও হয় না। যে প্রতিবাদ করবে সে অসুবিধায় পড়বে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা যেসব ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা দিচ্ছে না সেসব ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রেট নিচ্ছে। এটা সম্পূর্ণভাবে

www.pathagar.com

অনভিপ্রেত ও বেআইনী। শুনা যাচ্ছে যে, তাদের জানা কারণে, কোনকোন ক্ষেত্রে উন্নত এলাকার চেয়ে অনুন্নত এলাকাতে তারা কর বেশি ধার্য করছে। ঢাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ উন্নয়নের নামে কোটিকোটি টাকার মালিক হয় এবং গরীবদেরকে আরো গরীব ও ধনীদেরকে আরো ধনী করে। শহর উন্নয়নের নামে নামমাত্র মূল্য দিয়ে ভূমি হুকুম দখল করায়। এভূমি অত্যধিক উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে সেটাকা বিভিন্ন পরিকল্পনার ও কাজের মাধ্যমে খরচ দেখানো হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাতে কোটিকোটি টাকা লোপাট হয়। যাদের ভূমি হুকুম দখল করানো হয় তাদেরকে, বাস্তবে ন্যায্যতার খাতিরে, যেমূল্যে তাদের হুকুম দখলকৃত ভূমি বিক্রি হয়, বিভিন্ন খরচ বাদ দিয়ে, তা প্রদান করাটাই প্রয়োজন, কেননা তা তাদেরই হক এবং, বলতে গেলে, পরিকল্পিতভাবে শহর উন্নয়নের জন্যেই তাদের ভূমি হুকুম দখল করানো হয়, তাদেরকে তাদের ন্যায্য হক থেকে বঞ্চিত করে তাদের মাথার ওপর দিয়ে ব্যবসার মাধ্যমে কেউকেউ বিপুল সম্পদের মালিক হয়ার জন্যে নয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে খুশি করে টাকা দিলে যেসে প্ল্যান পাস হয়ে যায় এবং টাকা না দিলে সঠিক প্ল্যান পাস করাতেও হয়রানির অন্ত থাকে না। তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম নেই বা তারা শাস্তি পাচ্ছে না। প্রতিবাদ করলে বিপাকে পড়তে হয়। তাই, কোন প্রতিবাদ নেই এবং যে যেভাবে পারছে সারছে। কার্যক্ষম রাজনৈতিক তৎপরতার অভাবেই এসব হচ্ছে। তাই, রাজনীতিবিদদের কার্যক্ষম রাজনৈতিক তৎপরতার একান্ত প্রয়োজন। বাস্তবে মনে হয় যে, অফিসআদালতে কর্মকর্তারা কর্মচারীদেরকে ভয় ও সমীহ করে। এটার প্রকৃত কারণ এ'যে, দুর্নীত কর্মকর্তারা দুর্নীত কর্মচারীদের মাধ্যমেই দুর্নীতি ও অন্যায় করে থাকে। অধস্তনদের থেকে উর্ধ্বতনদের নিকট যতোকাজ আসে উর্ধ্বতনেরা সাধারণত সেগুলোর গভীরে যায় না। ফলে, সঠিকভাবে কাজ সম্পাদিত হয় না এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি বিস্তারলাভ করে। সময়ের কাজ সময়ে না করলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। এসব জটিলতার কারণে নানা ফাঁকের সৃষ্টি হয়। দুর্নীত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এসব ফাঁকে দুর্নীতি করার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। উদাহরণ দিয়ে বলছি। একজন ঠিকাদার একটি বিল যেসময় পেশ করার সেসময় না করে অনেক পরে করলো। এসময় যেসৎকর্মকর্তাটি দায়িত্বে ছিলো সে অন্যত্র বদলি হয়ে গেলো এবং অপরএকজন কর্মকর্তা আসলো। বিলটি সম্পর্কে তার কোন পূর্বধারণা না থাকায় সে তা পাস করে দিলো। অথচ, বিলটিতে ঘাপলার কারণে সরকারের অনেক টাকা গচ্চা গেলো।

যারা দুর্নীতি করে না তারা ঘুষ দিতে পারে না বিধায় অন্যায়ভাবে আটকে যায় আর যারা দুনীতি করে তারা ঘুষ দিয়ে দুর্নীতি হতে রক্ষা পায়। এর অর্থ এটা দাঁড়ায় যে, যারা দুর্নীতি দমনের দায়িত্বে নিয়োজিত তারাই প্রকারান্তরে দুর্নীতি করতে বাধ্য করে এবং টিকে থাকতে হলে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ার শিক্ষাদান করে। সব লোক সব নিয়ম

www.pathagar.com

ও আইন জানে না এবং এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া, অশিক্ষিত ও সাধারণ লোক, বলতে গেলে, নিয়ম ও আইনের কিছুই জানে না। তাদের বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন অফিসআদালতে ও থানায় বিভিন্ন কাজ থাকে। এসব কাজে তাদেরকে বিভিন্ন নিয়ম ও আইনগত ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের থেকে যথেষ্ট টাকাপয়সা আদায় করা হয় এবং একটি কাজের জন্যে তাদেরকে বিভিন্নভাবে ধর্না দিতে হয়। দুর্নীতির এঅভিশাপো নিরক্ষতার ওপর চাপানো হচ্ছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিরক্ষর নয়। তারা শিক্ষিত। বাস্তবে তারাই দুর্নীতি করছে এবং দুর্নীতির আশ্রয় নিতে জনসাধারণকে বাধ্য করছে। তাছাড়া, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী ও গবেষকরাই দেশ ও জনগণের মুখপাত্র। তবে, যেসব বুদ্ধিজীবী অনভিপ্রেত ও অবাঞ্ছিত কাজে প্ররোচিত ও লিপ্ত হয়, যেসব আইনজীবী আইনের দোহাই দিয়ে সত্যকে মিথ্যাতে ও মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে এবং যেসব গবেষকের গবেষণা সত্য ও ন্যায়ের বাহন হয় না তারা দেশ ও জনগণের শত্রু। তাদের কর্মকাণ্ড দুর্নীতিমুক্ত নয়। তারা শিক্ষিত বলেই বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী ও গবেষক। তাই, দুর্নীতির জন্যে শিক্ষিত লোকই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। তারা দুর্নীতিমুক্ত হলে দুর্নীতির কোন পরিবেশপরিস্থিতি থাকবে না বিধায় দেশ অগ্রগতি ও উন্নতির পথে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। নিম্নপর্যায়ে সাব-রেজিস্ট্রারের, সহকারী কমিশনারের (ভূমি) ও তহসিল অফিসেতো নজরানা ব্যতীত কোন কাজই করানো যায় না। যারা সবকিছু বুঝে তারাও নজরানা না দিয়ে পারে না। নজরানা না দিলে তারা ঘোরপ্যাঁচে ও হয়রানিতে পড়ে যায়। এঘোরপ্যাঁচ ও হয়রানি হতে রক্ষা পায়ার জন্যে যতোখানেই ধর্না দেয়া হয়-না-কেন কোনখান থেকেই সহজে উদ্ধার পায়া যায় না, বরং অবস্থা জটিল হয়ে যায় এবং মানসিক যন্ত্রণার আবর্তে ঘুরপাক খেতে হয়। খাস জমি, অর্পিত সম্পত্তি ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির ফলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে ও সরকারের বিপুল ক্ষতি হচ্ছে।

অফিসআদালতে দুর্নীতির চিহ্ন রেকর্ডপত্রে বা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে থেকে যায়। অফিসআদালতে বিভিন্ন পন্থায় টাকা আত্মসাৎটাই মারাত্মক দুর্নীতি। ঘুষ দেয়া ও নেয়াটা ব্যক্তিগত পর্যায়ের দুর্নীতি। কিন্তু, টাকা আত্মসাতের দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে এদিকসেদিক না করে সংঘটন করতে পারে না। কাগজপত্রে সত্যকে মিথ্যাতে বা মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করা হয়। হিসেবে এদিকসেদিকো কাগজপত্রে করতে হয়। অফিসে প্রায় চুরিচামারি কাগজপত্রের ফাঁকেই করা হয়ে থাকে। তাই, দুর্নীতি ধরার জন্যে সাক্ষ্যপ্রমাণের তেমনকোন প্রয়োজন নেই। দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রই ধরিয়ে দেয়। সাক্ষীরা মুখের কথায় সাক্ষ্যের মাধ্যমে শুধু সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রমাণ করে দিতে হয়। এসব দুর্নীতির মামলা শেষ করতে ও দুর্নীতিবাজদেরকে শায়েস্তা করতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। বেশি সময় না লাগিয়ে কাগজপত্রের, অর্থাৎ দলিলসংক্রান্ত

www.pathagar.com

সাক্ষ্যের, ভিত্তিতে দুর্নীতিবাজদেরকে, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির ওপর দুর্নীতিতে না গিয়ে, শায়েস্তা করলে দুর্নীতি যে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে তাতে বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে, খেয়াল রাখতে হবে যে, যাদের হাত দিয়ে সরাসরি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সৃষ্টি বা তৈরি করা হয় তারাই দায়ী, কেননা অন্যান্যরা এগুলো বুঝে ওঠাটা খুব কঠিন। বিভিন্ন অফিস পরিচালনার ও সংরক্ষণের জন্যে প্রচুর পরিমাণে টাকা ব্যয় হচ্ছে। এব্যয়ের হিসেবনিকেশের বর্তমান পদ্ধতি অত্যন্ত দুর্বল। এ দুর্বল পদ্ধতিতে কাজ না করেও কাজ দেখানো সম্ভব। এসুযোগ যে কর্মচারীরা নিচ্ছে না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে, এ দুর্বল পদ্ধতিতে সরকারের যে অজস্র টাকা ও সম্পদ লোপাট হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এলোপাট বন্ধের জন্যে সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজন। এপদ্ধতির সফলতা নির্ভর করে সব ছিদ্র বন্ধ করে বিভিন্নধরনের রেজিস্টার খোলার এবং সেগুলো প্রতিদিন বাধ্যতামূলকভাবে হালনাগাদ করে সংরক্ষণের ওপর। একজন চলে যায়ার সময় অপরজন এসব রেজিস্টার হালনাগাদ অবস্থায় ব্যয়ের সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ভাউচারাদিসহ বুঝে নেবে। তবে, কাগজপত্র ও ভাউচারের সাথে কাজ ও মালামালের সমন্বয় থাকতে হবে। এটাতে ফাঁক পড়লেই সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। কাজেই, এটাতে যাতে ফাঁক না পড়তে পারে সেজন্যে কড়াদৃষ্টি রাখতে হবে এবং দোষী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিপ্রদান করতে হবে, কেননা এসব দোষ কাগজপত্র ও রেকর্ডপত্রে প্রমাণিত হয়। বাস্তবে সরকারী খরচের এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি উর্ধ্বতনপর্যায়ে তেমনকোন কড়াদৃষ্টি পরিলক্ষিত হয় না। প্রত্যেক অফিসআদালতে অভিযোগ রেজিস্টার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কোন অভিযোগ পায়া গেলে তা রেজিস্টারে কলাম অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করতে হবে। কলামগুলো হবে ক্রমিক নং, অভিযোগপ্রদানের তারিখ, অভিযোগগ্রহণের তারিখ, অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার নাম, পদবী, অফিস ইত্যাদি, অভিযোগের বিষয়বস্তু, তদন্তকারী অফিসারের নাম ও পদবী, কোন তারিখে তাকে তদন্ত করতে দেয়া হয়েছে সে তারিখ, রিপোর্ট প্রাপ্তির তারিখ এবং তারিখসহ গৃহীত একশান। প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী এরেজিস্টার পরীক্ষা করবেন এবং যেসব কর্মকর্তার কারণে যেসব অভিযোগের ওপর কোন একশান হয়নি তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে একশান নেবেন এবং এদায়িত্ব অন্যকারো প্রতি হস্তান্তর করবেন না। এপদ্ধতিটির কার্যকারিতাতে কোনপ্রকার শৈথিল্য ও গাফিলতি বা অবহেলা প্রদর্শিত না হলে জনগণ গণতন্ত্রের সুফল হিসেবে ন্যায়বিচার পেতে থাকবে।

কেউকেউ কোথাও কোন প্রতিকার না পেলে রাষ্ট্রপতির বা প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করে। কিন্তু, তিনি এপ্রার্থনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে নিচের দিকে পাঠিয়ে দেন। ফলে, যাদের বিরুদ্ধে প্রতিকার চায়া হয় প্রকারান্তরে তাদের

www.pathagar.com

সমগোত্রীয় ব্যক্তিদের নিকট এপ্রার্থনা চলে যায় এবং নানা টালবাহানার ও মারপ্যাঁচের কারণে প্রতিকারপ্রার্থীদেরকে, কোন প্রতিকার না পেয়ে, দুর্ভোগ পোহাতে হয় এবং যাদের বিরুদ্ধে প্রতিকার চায়া হয় তাদের দুর্নীতিতে কোনপ্রকার ভাটা না পড়ে জোয়ারের সৃষ্টি হয়। কাজেই, রাষ্ট্রপতির বা প্রধানমন্ত্রীর নিকট কোন প্রতিকার চায়া হলে তিনি স্বয়ং প্রতিকারের ব্যবস্থাগ্রহণ করলে বা তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে তা করালে দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করতে বেশ চিন্তাভাবনা করবে। প্রত্যেক অফিসআদালতে উচ্চতম পর্যায়ের কর্মকর্তারা সেঅফিসআদালতের কাজকর্মে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সেঅফিসআদালতের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদেরকই ভয় করে এবং তাদের কথাই সাধারণত বিনা প্রতিবাদে শুনে থাকে। কাজেই, তারা সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত হলে তাদের অধস্তন সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দুর্নীতি প্রতিরোধ করে কর্মসম্পাদনে অবাধ সুযোগ পায়। তারা অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ হলে অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের নিকট আশ্রয় ও নিরাপত্তা পায় বিধায় সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অসহায় হয়ে পড়ে। তাই, সরকার বলতে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা প্রত্যেক অফিসআদালতে উচ্চতম পর্যায়ে সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত কর্মকর্তাদেরকে পোস্টিং দেয়া প্রয়োজন যাতে সেখানে সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দুর্নীতি প্রতিহত করে কাজ করে যেতে পারে। যেসে যেটাসেটা ঠিক করতে চেলে ঠিক করতে পারে না। একটি অফিসে একজন নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা বা একজন কেরানি চেলেই দুর্নীতি বন্ধ করতে পারে না। সে তখনই দুর্নীতি বন্ধের প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে অফিসের প্রধান যখন তা চায়। অফিসের প্রধান দুর্নীতির সমর্থক হলে কোন অধস্তন কর্মকর্তা বা কোন কেরানি দুর্নীতি বন্ধের পদক্ষেপ নিতে গেলে তাকে অপ্রিয় ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এজন্যে অফিসের প্রধান এমন কর্মকর্তা হতে হয় যে দুর্নীতিমুক্ত। দুর্নীতিবাজরা কাগজপত্রে দুর্নীতি প্রমাণিত হয়ার পরো শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে। কাগজপত্রের প্রমাণ বাস্তব প্রমাণ। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শুধু এগুলো প্রমাণ করে দিতে হয়। মুখের কথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হতে পারে। কিন্তু , কাগজপত্রের কথা সত্যি ও ভিত্তিমূলক। কাজেই, কাগজপত্রে দুর্নীতি প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনভাবেই সময় অতিবাহিত করতে নেই। কাগজপত্রের ক্ষেত্রে সময় অতিবাহিত না করে দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারলে সাথেসাথে প্রাপ্যশাস্তি প্রদান করলে দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে। বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অফিসে স্টেশনারী সরবরাহ করে থাকে। এঅফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত স্টেশনারীর গুণগতমান ততো ভালো নয়। এতে সরকারের কোটিকোটি টাকা অপচয় হয়। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় যেসব স্টেশনারী বিতরণ করে থাকে সেগুলোর গুণগতমানো খুব খারাপ। এতেও সরকারের কোটিকোটি টাকা অপচয় হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন

www.pathagar.com

মন্ত্রণালয় ও অফিসে সরাসরি কেনাকাটাতে অনেক মিথ্যে কেনাকাটা হয় বিধায় সরকারের অজস্র টাকা ক্ষতি হয়। সরবরাহকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগসাজশের ফলে সরকার এ বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারাই দায়ী, কেননা তারা তাদের সবকিছু ঠিকঠাকভাবে পেতে গিয়ে দুর্নীতিতে হস্তক্ষেপের ফলে সাময়িকভাবে হলেও কাজকর্মে যে অসুবিধা হয় তা কোনভাবেই সহ্য করতে চায় না। প্রত্যেক অফিসআদালতে বিভিন্ন সামগ্রী কেনাকাটার জন্যে টাকা বরাদ্দ থাকে। সারাবছর ধরে কেনাকাটা কিভাবে হয় বা না হয় সেকথা নাইবা বললাম। তবে, অর্থবছর শেষ হয়ার পূর্ব মুহূর্তে বরাদ্দকৃত সব টাকা খরচ দেখানোর জন্যে নানাধরনের ভাউচার তৈরি হয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট অফিসে এগুলোর ওপর তৈরী বিলও পাস হয়ে যায়। এতে সরকারের কোটিকোটি টাকা অপচয় হয়। একটি কথা না বলে পারছি না যে, সারাবছর ধরে কেনাকাটা যা–না–হয় বছর শেষ হবার পূর্ব মুহূর্তে তার চেয়ে অনেকবেশি কেনাকাটা একসাথে হয়ে যায়। এটা কোনভাবেই বাস্তবসম্মত নয়। তাই, এনিয়ম নির্ধারণ করাটা একান্ত প্রয়োজন যে, প্রতিমাসে আনুপাতিক হারে কেনাকাটা করতে হবে এবং এঅনুপাতের তুলনায় বছরের শেষদিকে অতিরিক্ত কোন কেনাকাটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

অফিসআদালতে যেকোন ন্যায়সংগত কাজেও নানাভাবে হয়রান করা হয়। এটার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘুষ। ঘুষ না দিলে কাজটিতে নানা সমস্যার, অসুবিধার ও নিয়মের কথা বলা হয়। যেলোকের কাজ সে তার নীতিতে অটল থাকতে গিয়ে কাজটির পেছনে শুধু ঘুরতে হয় ; কিন্তু তা সম্পাদিত হয় না। এব্যাপারে অভিযোগ করেও কোন ফল হয় না। অভিযোগটি চাপা পড়ে থাকে এবং চেষ্টাতদবিরের ফলে তা ঘুরপাক খেতে ও নানাভাবে ব্যাখ্যাত হতে থাকে। কাজটি জটিল থেকে জটিলতর এবং জটিলতর থেকে জটিলতম আকার ধারণ করে। পরিণতিতে ভাগ্যে জোটে সীমাহীন হয়রানি এবং প্রয়োজনের তাগিদে কাজটি আদায় করতে দিতে হয় অধিক পরিমাণে ঘুষ। খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে পরিবহন ঠিকাদারদের যোগাযোগ থাকে। পরিবহন ঠিকাদারেরা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে কখনোকখনো শুধু কাগজপত্রে পরিবহন দেখিয়ে কোটিকোটি টাকা আত্মসাৎ করে। খাদ্যসংগ্রহ অভিযানের সময় কম দামে ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যশস্য ক্রয় করে হিসেবে সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত মূল্য দেখিয়ে কোটিকোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়। খাদ্যগুদামগুলোতে নানাধরনের দুর্নীতি চলে। অধিকাংশ লোকজন এসব দুর্নীতি সমন্ধে ওয়াকেফহাল। কোটিকোটি টাকা জাল হচ্ছে, কোটিকোটি টাকার নন-জুডিশল স্ট্যাম্প জাল হচ্ছে, ঘুষ না দিলে নন–জুডিশল স্ট্যাম্প পায়া যায় না, টাকা না দিলে নানা হেরফের ও ছলছুতা দেখিয়ে এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করে জমাখারিজের ও নামজারির ক্ষেত্রে যথেষ্ট

www.pathagar.com

ভোগান্তিতে নিপতিত করা হয় এবং চাহিদা অনুযায়ী টাকা না দিলে সহজে সার্টিফাইড কপি ও ইনফরমেশন স্লিপ্ পায়া যায় না। তাছাড়া, ভূমি জরিপের সময় নানা ছুতানাতা দেখিয়ে ও অপ্রসাঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সাধারণ মানুষকে নানা ফাঁদে ফেলে দিয়ে তাদের থেকে অজস্র ঘুষ আদায় করে এবং তাদের অনেকের জন্যে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে রেখে যায়। তারা বছরের পর বছর এসব সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে এবং ভূমিসংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হয়। জায়গাজমি রেজিস্ট্রির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রেশন ফী-র চেয়ে, একটা নির্দিষ্ট হারে ফী বলে, বাধ্যতামূলকভাবে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়। রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব হচ্ছে নিয়মমোতাবেক রেজিস্ট্রি করা এবং মূল্যের ব্যাপারে কোন অসমাঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলে তা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা। কিন্তু, সে তা না করে সংশ্লিষ্ট লোকজনকে নানা ভুয়ো কারণ দেখিয়ে ভীতিতে ফেলে বিপুল পরিমাণে ঘুষ আদায় করায়। এভাবে একএক করে খোঁজ করলে দেখা যাবে যে, আমাদের জাতীয় কর্মকাণ্ডের পরতেপরতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুর্নীতির জাল বিস্তৃত আছে।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত তৈরি করে পাঠানোর পূর্বে সেটার ভাষা বারবার কাটাকাটি ও রদবদল করা হয়। এটা একটি ব্যতিব্যস্ত কাজে পরিণত হয়। একাজটির পেছনে যথেষ্ট শ্রম ব্যয় হয় ও অনেক চিন্তাভাবনা করতে হয়। সিদ্ধান্তে প্রয়োগকৃত ভাষা ভালো বা খারাপ হয়াতে রাষ্ট্রের লাভক্ষতির কিছুই নেই। কিন্তু, রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সম্পদের সদ্ব্যবহার না হলে রাষ্ট্রের অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়। অথচ, এক্ষতি রোধকল্পে ব্যতিব্যস্ততা খুবকমই দেখতে পায়া যায়। এটা রোধকল্পেই যথেষ্ট শ্রমের ও চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। বারবার চিন্তাভাবনা করে রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্যে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করতে হয়। এঅর্থ ও সম্পদের ক্ষেত্রে যাতে করে কেউ দুর্নীতির ও আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্যেই প্রতিটি কাজ বারবার পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে সুচারুরূপে সম্পাদনে ব্রতী হতে হয়। কারোকারো চাকরি একই সময় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাদের কেউ দুর্নীতি করলে এবং তা প্রমাণিত হলেও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ঠেলাঠেলিতে তার বিরুদ্ধে কোন একশান হয় না বা হলেও অনেক দেরিতে হয়। কখনোকখনো এককর্তৃপক্ষ নির্দোষ সাব্যস্ত করে ও অন্যকর্তৃপক্ষ দোষী সাব্যস্ত করে এবং এককর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে দোষ উল্লেখ করে ও অন্যকর্তৃপক্ষ কথার মারপ্যাঁচে তা উল্লেখ করে। অপরদিকে, ন্যায়সংগত কাজেও নানা হেরফের ও ছলছুতা দেখানো হয় এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সব লোক সব নিয়ম, পদ্ধতি, বিধান

www.pathagar.com

ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত নয় বিধায় তাদেরকে তাদের কাজে নানা সমস্যা, অসুবিধা ও জটিলতা দেখিয়ে তাদের থেকে ঘুষ আদায় করে শেষপর্যন্ত নিয়ম, পদ্ধতি, বিধান ইত্যাদির আওতায়ই তাদের কাজ করে দেয়া হয়। এসব কারণে দুর্নীতি করেও রক্ষা পায়ার সুযোগ হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এধরনের দুর্নীতিই হয়ে থাকে। এদুর্নীতি বিভীষিকাময়। যারা এধরনের দুর্নীতিতে লিপ্ত তাদেরকে কোনপ্রকার হেরফের না করে যথোচিত ও যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করলে দুর্নীতি আপনাআপনি বহুলাংশে দূর হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক দুর্নীতি চলে এবং এসব দুর্নীতির মূলে কাজ করে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ। তারা হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির প্রতি তোয়াক্কাই করে না। ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি সর্বসময় সবকিছু বুঝে ওঠে না। তাই, প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ তার একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অজস্র টাকার বিভিন্ন কাজ দেখিয়ে আত্মসাতের সুযোগ করে নেয়। তারা কোনকোন সময় যে ফী আদায় করা হয় সেটা রসিদে পুরো না দেখিয়ে না-দেখানো টাকাটা আত্মসাৎ করে এবং কোনকোন সময় ফী আদায়ের কোন রসিদ না দিয়ে সেটার একাংশ আত্মসাৎ করে। করণিকদের সহযোগিতায় তারা এসব করে থাকে। তারা কার্যবিবরণীতে ফাঁকেফুঁকে তাদের সুবিধা হবে এমন কথা লিখে নিতেও ইতস্তত করে না। এমনো দেখা গেছে যে, তাদের কেউকেউ ছাত্রবেতন ও বিভিন্ন ফী আদায়ের জন্যে ম্যানেজিং কমিটির বা গভর্নিং বডির অনুমোদন নিয়ে সংখ্যা উল্লেখ করে 'রসিদবই' ছাপায় না এবং তা সংরক্ষণ ও ব্যবহারসংক্রান্ত কোন রেজিস্টার সংরক্ষণ করে না। এভাবে তারা ছাত্রছাত্রীদের থেকে আদায়কৃত বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করতে থাকে। কোনকোন প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ এমনএমন কৌশল অবলম্বন করে যাতে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি গঠিত না হতে পারে বা হলেও তাদের মনমতো এড-হক হয়। তাদের কেউকেউ যে যেশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকে সে সেটাকে তার জমিদারি এবং অভিভাবকদেরকে তার প্রজা মনে করে। তারা স্থানীয় রাজনীতি করে ও দুষ্টু চরিত্রের লোককে নিজেদের বশে রাখে এবং অভিভাবক ও এলাকাবাসীদেরকে বিভক্ত রেখে বাহাদুরের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের অজস্র টাকা আত্মসাৎ করতে থাকে। তারা কোর্টকাচারিকে পর্যন্ত বশ করে ফেলে। এতে লেখাপড়ার পরিবেশ বিনষ্ট হয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোন উন্নতি হয় না। তারা যখন যেদল ক্ষমতাসীন হয় তখন সেদলের ধ্বজাধারী হয়। অনেক মাদ্রাসার অধ্যক্ষরাও এসব দুর্নীতি করে থাকে। শিক্ষাবিষয়ক অফিসগুলো প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তাদেরকে বিধিবিধানের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। ফলে, তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পেরে ওঠা যায় না। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রবেতন ও বিভিন্ন ফী ব্যাংকের

www.pathagar.com

মাধ্যমে আদায়টা বাধ্যতামূলক হলে তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী টাকা আত্মসাৎ করার সুযোগ হারাবে। রেগুলেশনমোতাবেক ম্যানেজিং কমিটিই বা গভর্নিং বডিই তাদেরকে চাকরি দিতে ও চাকরিচ্যুত করতে পারে। এরেগুলেশনের সুযোগে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি না থাকলে তাদের দুর্নীতির জন্যে তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় না এবং প্রয়োজনে তাদেরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা চাকরিচ্যুত করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে তারা কোর্টকাচারির আশ্রয়ে আইনের ফাঁক গ্রহণ করে। জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে কমিটির বা বডির সভাপতি থাকে। তারা আইনের এফাঁক নেয় যে, কোন কমিটি বা বডি না থাকলে জেলা প্রশাসক তার পদাধিকার বলে সভাপতি থাকে না। যেকোন কারণে কোন কমিটি বা বডি না থাকলে জেলা প্রশাসক বা তার পক্ষে তার মনোনীত যেকোন একজন অফিসার প্রশাসক হিসেবে কাজ করবে এবং রেগুলেশনে কমিটিকে বা বডিকে প্রদত্ত সব ক্ষমতা তার ওপর ন্যস্ত থাকবে। এধরনের ব্যবস্থায় প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ও দুর্নীতি করে টিকে থাকতে পারবে না বিধায় সেটার পরিবেশ সুষ্ঠু থাকবে ও সেটা উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দুর্নীতি চলছে না তা নয়। সেগুলোতেও দুর্নীতি চলছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও দুর্নীতি চলছে। এসব বিদ্যালয়ে উচ্চমূল্যে ভর্তিফর্ম বিক্রি হচ্ছে এবং পরীক্ষাফী অতিরিক্ত নেয়া হচ্ছে। এগুলো যেসব অফিসের নিয়ন্ত্রণে সেগুলোতেও দুর্নীতি চলছে। সেগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। এসব দুর্নীতি প্রত্যক্ষ ও কমবেশি সবাই জানে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন অফিস, বিভাগ ও কর্তৃপক্ষ জড়িত বিধায় সেখানে দুর্নীতির সুযোগ প্রকট। দুর্নীতিপরায়ণ প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ একেক সময় একেক অফিস, বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের আশ্রয়ে চলে যায় এবং এসব অফিস, বিভাগ ও কর্তৃপক্ষ সঠিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ না করে তাদের নিজেদের জানা কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে একে অপরের প্রতি দায়িত্ব হস্তান্তরিত করার মাধ্যমে তাকে দুর্নীতিতে লেগে থাকার সুযোগ করে দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে ও লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট করতে আদৌ কুণ্ঠাবোধ করে না। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বিশেষতঃ যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামডাক আছে, ভর্তিপরীক্ষা একটি প্রহসন। বাস্তবে চাঁদাআদায় ও সুপারিশের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। তাছাড়া, যেশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে চায়া হয় সেটার শিক্ষকদের নিকট, তাদেরকে প্রচুর টাকা দিয়ে, কিছুদিন প্রাইভেট পড়ালে তারা মেধাতে টিকার ব্যবস্থা করে দেয়। এসব দুর্নীতির ফলে যেমেধাকে প্রাধান্য দেয়ার জন্যে এপরীক্ষা নেয়া হয় সেমেধা উপেক্ষিত হয়। ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেণ্টে, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অভাবে, দুর্নীতি এতো বিভীষিকাময় যে এবিভাগ কর্তৃক নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মাণের কিছুদিন পর থেকে ধ্বংস হতে থাকে। এতে সরকারকে কোটিকোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পরীক্ষককে খোঁজ করে বের করে

www.pathagar.com

টাকা দিয়ে খুশি করতে পারলে ফেল করা বিষয়েও পাস করা যায়, গোটা উত্তরপত্র নাকি পাল্টানো যায়, উত্তরপত্রে পরীক্ষকের বাসায় বসে কোনকোন প্রশ্নের উত্তর বই দেখে লিখে দেয়া যায়, মেধাতালিকায় যাবার জন্যে বেশি নম্বর করানো ও অন্যের নম্বর কমানো যায় ইত্যাদি। এসব কাজে পরীক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নাকি দালাল লাগানো থাকে। তাছাড়া, বিভিন্ন পরীক্ষায় পাসের জাল সার্টিফিকেট পায়া যায়। এসব হচ্ছে কোন প্রতিকারবিহীন খোলামেলা দুর্নীতি। এদুর্নীতির পরিণতি খুবই ভয়াবহ। তাই, এসব দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি, ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারী দেশ ও জাতির চরম শত্রু। অথচ, বিভিন্ন কারণে বাস্তবে এদেরই প্রভাবপ্রতিপত্তি খুববেশি। যথাসময়ে আইনের নিরপেক্ষ ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এদেরকে শায়েস্তা করা না হলে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিষক্রিয়া ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে।

'চোরের মার বড় গলা' প্রবাদটি বহুল প্রচলিত। দেশে বিভিন্ন সংঘ ও সমিতি আছে। সেবার, মঙ্গলের ও জনহিতকর কাজের নামে এগুলো প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবে এগুলোর অধিকাংশ উদ্যোক্তা এগুলোকে ব্যক্তিস্বার্থে হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করছে। এগুলোর মধ্যে আছে ব্যবসায়ী সমিতি, বণিক সমিতি, পোশাক শিল্প সমিতি ইত্যাদি। দেশ ও জনগণের স্বার্থ দেখিয়ে সরকারের নিকট এসব সমিতির বহুবিধ দাবিদাওয়া থাকে। এসব দাবিদাওয়া সত্ত্বেও তারা যাতে জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি না দিতে ও দুর্নীতি না করতে পারে সেজন্যে অনেক নিয়ম ও পদ্ধতি চালু করা হয়। তারা যখন দেখে যে, এসব নিয়ম ও পদ্ধতি চালু থাকলে তাদের সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধির ও দুর্নীতির দোহাইতে দুর্নীতি করার পথে বাধার সৃষ্টি হয় তারা তখন তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নীতি ও পদ্ধতির জন্য সোচ্চার হয়। কোন আমদানিকারককে একটি পণ্য যেপরিমাণ আমদানির অনুমতি দেয়া হয় সে সেটার চেয়ে বেশি পরিমাণ পণ্য জাহাজে করে এনে শুল্ক বিভাগকে হাত করে খালাস করে নেয়। এজন্যে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেপরিমাণ পণ্য আমদানি করার অনুমতি দেয়া হয় সেটার চেয়ে বেশি পরিমাণ পণ্য যাতে জাহাজে বোঝাই হতে না পারে সেজন্যে পণ্য যেদেশ থেকে আমদানি করা হয় সেদেশের বন্দরে পরীক্ষা করা হবে। এটা একটি ভালো নিয়ম বা পদ্ধতি। কিন্তু, আমদানিকারকেরা এতে সন্তুষ্ট নয়। তাদের যুক্তি হচ্ছে যে, এতে করে তারা যেসব শিল্পের জন্যে আমদানি করছে সেগুলো মার খাবে। যেআমদানিকারককে যেপরিমাণ পণ্য আমদানি করার অনুমতি দেয়া হয় সে সেপরিমাণ আমদানি করতে পারলেইতো হলো। পণ্যের পরিমাণ জাহাজে বোঝাইর সময় পরীক্ষা করা হবে, না জাহাজ হতে খালাসের সময় পরীক্ষা করা হবে তাতে আমদানিকারকদের মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। তবু, এব্যাপারে তাদের মাথাব্যথা, কেননা পণ্যের পরিমাণ জাহাজে বোঝাই করার সময় পরীক্ষা করা হলে তারা

www.pathagar.com

অতিরিক্ত পণ্য আনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি করতে পরবে না। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগসাজশে লাখলাখ ও কোটিকোটি টাকার কর ও শুল্ক ফাঁকি দিচ্ছে। কোনকোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কারোকারো ন্যায়সংগতভাবে সাথে করে আনা জিনিসপত্র আটকিয়ে তাদেরকে নাজেহাল করে এবং তারা কোন দিক থেকে কোন সহযোগিতা না পেয়ে তাদেরকে ঘুষপ্রদান করে রেহাই পায়। এমনো ঘটনা ঘটে যে, কোনকোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কারোকারো কোনকোন জিনিস রেখে দিলে তাদেরকে তারা রসিদ দিতে বললে তারা নানা যুক্তি দেখিয়ে তা-ও দেয় না। এব্যাপারে সাথেসাথে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন প্রতিকার পায়া যায় না। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাদের সাথে একটা কিছু সুরাহা করতে হয়। কারোকারো কোনকোন জিনিস আবদার করে রেখে দেয়া হয়। কেউই বিদেশ থেকে এসে নিয়মরীতিতে আগাতে গিয়ে ঝামেলায় পড়তে চায় না। তাছাড়া, অনেকেই নিয়মরীতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নয়। আরোঅনেক কারণে বিদেশ থেকে আগত লোকজন তাদের নির্যাতন ও দুর্নীতির শিকার হয়। আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কর বিভাগ ও শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সরাসরি সম্পর্ক থেকে যাচ্ছে। তারা যেজিনেসের শুল্ক বেশি সেজিনিস আমদানি করে সেজাতীয় কম শুল্কের জিনিস কাগজপত্রে দেখাচ্ছে। কাগজপত্রে কম মাল প্রেরণ দেখিয়ে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে অজস্র টাকা ঘুষ দিয়ে বেশি মাল খালাস করে নিচ্ছে। এমনো শুনা যায় যে, কোনকোন সময় কোন শুল্ক না দিয়েই মালামাল খালাস করে নেয়া হয়। পোশাক শিল্পগুলোর ক্ষেত্রে এটা বেশি প্রযোজ্য। এজন্যে দেশীয় উৎপন্ন কাপড় বাজার পাচ্ছে না। এসব শিল্পের মালিকেরা প্রথমে একপ্রকার কাপড় আমদানি করে। তারা পরে আবার দেখায় যে, যেসব বিদেশীর সাথে তাদের পোশাকের চুক্তি হয়েছে তারা সেটার জন্যে অন্যনমুনার কাপড় দিয়েছে। এভাবে তারা আগের কাপড় খোলা বাজারে বিক্রি করে ও পুনরায় নমুনা অনুযায়ী কাপড় আমদানি করে। তারা কখনোকখনো গুদামে রক্ষিত বস্ত্র নষ্ট হয়ে যায়া দেখিয়ে খোলা বাজারে বিক্রি করে। এককথায়, তারা বিভিন্নভাবে সরকারকে ফাঁকি দিয়ে চলে। তারা যে শুধু সরকারকে ফাঁকি দেয় তা নয়, নিরীহ শ্রমিকদেরকেও ফাঁকি দেয়। এসব শ্রমিকেরা অবর্ণনীয়ভাবে শ্রম দেয়। অথচ, তাদের নুন আনতে পান্তা পুরিয়ে যায়। শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পণ্য দেশে ঢুকে যাচ্ছে এবং মূল্যসংযোজন কর ফাঁকি দেয়ার জন্যে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা হিসেবনিকেশে কম পণ্য দেখাচ্ছে। অপরদিকে, মূল্যসংযোজন করের অজুহাতে ক্রেতা ও ভোক্তাদের থেকে

www.pathagar.com

অত্যধিক মূল্য নেয়া হচ্ছে। এতে তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বিধায় অগ্রগতির প্রক্রিয়া অত্যন্ত মন্থর। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের এসব হীন ও জঘন্য ব্যবসাপদ্ধতি সব রাজনীতিবিদের জানা। তাদের সদিচ্ছা থাকলে এসব বন্ধ করা তেমন জটিল কিছু নয়। কিন্তু, তারা তা না পারার কারণ হচ্ছে যে, তাদের কারোকারো লোকজনই ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। তাদের মধ্যে যাদের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি নেই তারা তাদের রাজনীতির জন্যে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের থেকে বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগ করে প্রচুর অর্থ আদায় করে থাকে।

চোরাচালান ও চোরাকারবারের জন্যে সরকারের শুল্ক বিভাগ ও বর্ডারে নিয়োজিত বি, ডি, আর,-এর সদস্যরাই দায়ী। বর্ডারে নিয়োজিত বি, ডি, আর,-এর সদস্যসহ শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সৎ হলে এবং তারা তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে সত্যনিষ্ঠ-তৎপরতা অবলম্বন করলে চোরাচালান ও চোরাকারবার সমধিক বা অত্যধিক হ্রাস পাবে। কিন্তু, তাদের অসততা ও দুর্নীতির কারণে চোরাচালান ও চোরাকারবার দেদার বা প্রচুর পরিমাণে চলছে। চোরাচালানি ও চোরাকারবারিরা ধরা পড়লেও তাদেরকে কোন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয় না। তারা যে কখন কিভাবে অব্যাহতি পেয়ে যায় তা জনগণ টেরই পায় না। বলতে গেলে এটা শুনা যায় না যে, শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কেউকেউ দুর্নীতিতে ধরা পড়ে চাকরি হারিয়েছে ও শাস্তি পেয়েছে। চোরাকারবারি ও চোরাচালানিরা রাঘব বোয়াল। এদের সাথে রাজনীতিবিদ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সংযোগসম্পর্ক থাকে। তাই, কেউই এদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। রাজনীতিবিদেরা এদেরকে প্রশ্রয় না দিলে দুর্নীতি করতে শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অন্তরাত্মা অবশ্যই কেঁপে ওঠবে। বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরে যেসব স্বর্ণ, নিষিদ্ধ পণ্য ও অন্যান্য পণ্য আটক করা হয় শেষপর্যন্ত সেগুলোর পরিণতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। পত্রপত্রিকায় সেগুলো আটকানো সম্পর্কে যেভাবে বলা হয় শেষপর্যন্ত সেগুলোর পরিণতি সম্পর্কে সেভাবে বলা হলে এবং যারা সেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে শাস্তি দেয়া হলে চোরাচালান ও চোরাকারবারসংক্রান্ত দুর্নীতি খুবকমই হবে। শুনা যায় যে, আটককৃত সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের অনেকাংশই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হস্তগত হয়। এতে তারা হঠাৎ আংগুল ফুলে কলা গাছ হয়। তাছাড়া, এটাও শুনা যায় যে, অনেক জিনিস ও মালা পোড়িয়ে ফেলার নামে বিক্রি করে দেয়া হয়। এসব কথাকে একেবারে অবাস্তব বলা যায় না। তাই, চোরাকারবারি ও চোরাচালানিদের মুখ দিয়ে তাদের আটককৃত জিনিসপত্র ও মালামালের পরিমাণ জনগণকে শুনাতে হবে এবং যেসব জিনিস ও মাল পোড়ানোর প্রয়োজন সেগুলো

www.pathagar.com

জনসমক্ষে, তাদেরকে হিসেবনিকেশ বুঝিয়ে দিয়ে, পোড়াতে হবে। ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেণ্টদের কথাও কিছুটা না বললে নয়। তারা পার্টির সাথে ফয়সালা করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা শুল্ক কম ধরিয়ে আনুপাতিক হারে ঘুষ নিয়ে তা ভাগাভাগি করে নেয়। তাই, একদিক দিয়ে এজেণ্ট হচ্ছে নিরাপদ দূরত্বে থেকে দুর্নীতির সুযোগসৃষ্টির উপায়। এজেণ্টদের কমিশনের নিয়ম চালু আছে। তারা বিভিন্ন পার্টি থেকে তাদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে মাত্রাতিরিক্ত কমিশন আদায় করে। এভাবে তারা বিপুল সম্পদের অধিকারী হচ্ছে। যেখানে কাজ করার জন্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে সেখানে এজেণ্ট নিয়োগের নিয়ম রেখে দুর্নীতির পথ প্রশস্ত করার এবং সরকার ও পার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

অনেক ঠিকাদার এবং অনেক লোক ব্যবসাবাণিজ্য, হাউজিং ও বিদেশে লোক পাঠানোর নামে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে কোটিকোটি টাকার মালিক হচ্ছে এবং বহু নিরীহ লোককে নিঃস্ব ও নিঃসম্বল করে ফেলছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে তাদের আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক ব্যতীত এসব হতে পারে না। এমনো লোকজন আছে যারা ক্ষমতাসীনদের আত্মীয়স্বজন হিসেবে ঠিকাদার বনে এমন দু'চারটা কাজ পেয়ে গেছে যেগুলোতে লাখলাখ বা কোটিকোটি টাকার মালিক হয়েছে। এসব কাজ হিসেবে পুরোপুরি পায়া যায় ; কিন্তু বাস্তবে আংশিক পায়াও মুস্কিল। এটা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বা বিভাগের ও ক্ষমতাসীনদের সহযোগিতা ব্যতীত হতে পারে কি? পত্রপত্রিকায় লাখলাখ ও কোটিকোটি টাকার বেআইনী ও নিষিদ্ধ দ্রব্যসহ পাচারকারীদেরকে আটকানোর খবর দেখা যায়। পরবর্তীতে ওসব আটককৃত দ্রব্যের ও পাচারকারীদের যে কি হয় তা জানা যায় না। ফলে, একদিকে ওসব দ্রব্য পাচার হতে থাকে এবং অপরদিকে মাঝেমধ্যে পাচারকারীরা ধরা পড়ে। যারা ধরা পড়ে আইনে তাদের শাস্তি এবং আটককৃত দ্রব্যের কার্যকর ব্যবস্থা জনসমক্ষে হতে থাকলে নিষিদ্ধ ও বেআইনী দ্রব্যের পাচার বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। কাজেই,এটা পরিষ্কার যে, পরবর্তীতে সরকারী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বার্থে এসব চাপা পড়ে যায়। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপ যে এসব ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তা সবাই বুঝে। তাই, তারাই দেশেপ্রেমিক রাজনীতিবিদ যারা ক্ষমতায় থাকতে পাচার, চোরাচালান ও চোরাকারবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ছোটমোট কাজগুলোও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের নিজেদের দায়িত্ববোধে সম্পাদিত হয় না। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। টেলিফোন খারাপ হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানালেও তা সহজে ঠিক হয় না। রাস্তাতে বাতি না থাকলে এবং কারেণ্ট চলে গেলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কষ্ট করতে হয়। খাজনা ও কর পরিশোধ করতে গিয়ে বকশিশ না দিলে সেগুলো আদায়কারীরা অসন্তুষ্ট হয়ে পরবর্তীতে যেকোন সুযোগে ক্ষতি করতে ইতস্তত করে না। যারা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগরক্ষা

www.pathagar.com

করে তাদের কাজকর্ম ঠিকভাবেই হয়। এযোগাযোগকে কর্মচারীরা সৌজন্যমূলক আচরণ বলে। ঢাকাতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দায়িত্ব হচ্ছে কোন রাস্তার কোন জায়গায় বাতি না জ্বললে খোঁজখবর রেখে তা জ্বলার ব্যবস্থা করা। যারা যোগাযোগ করে তাদেরকে যৎসামান্য বকশিশ হলেও দিয়ে আসে বা দেয় তাদের রাস্তায় সর্বদা বাতি জ্বলে আর যারা এরকমটি করে না তাদের রাস্তায় মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর তা জ্বলে না। মূল বৈদ্যুতিক তারে গোলযোগের কারণে কোন বাড়িতে বিদ্যুৎ বন্ধ হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ কর্মচারীদের সাথে সমঝোতায় না আসলে তা সহজে চালু হয় না। তাছাড়া, তাদের সাথে সমঝোতায় আসলে যেলাইনে সর্বসময় কারেণ্ট থাকে তাতে ক্যানেকশন পায়া যায়। তা না হলে এমন লাইনে ক্যানেকশন পায়া যায় যেটা তদবির ও প্রভাবের অভাবে বেশিবেশি বন্ধ হয়। কোনকোন এলাকায় প্রায়ই লোড-শেডিং করা হয় এবং সেসব এলাকার নিকটবর্তী এলাকাগুলোতে তা খুবকমই করা হয়। তাছাড়া, লোড-শেডিং সম্পর্কে এলাকাবাসীদেরকে পূর্বাহ্নে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে অবহিত করতে হয়। কিন্তু তা-ও করা হয় না। যোগাযোগ করলে যেকোন লাইসেন্স পায়া যায় আর যোগাযোগ না করলে আসল লাইসেন্সও সহজে পায়া যায় না। পাসপোর্ট অফিসেও একই অবস্থা। যোগাযোগ করলে অতিসহজে পাসপোর্ট পায়া যায় আর যোগাযোগ না করলে তা পেতে খুব কষ্ট হয়। বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে এ সৌজন্যমূলক আচরণটি সৌজন্যমূলক দুর্নীতি। সবাই এদুর্নীতি বুঝে। সামাজিক ব্যবস্থা বর্তমানে এমন হয়েছে যে, যারা এদুর্নীতি করে না বা এদুর্নীতিকে সমর্থন দেয় না তারা অসামাজিক এবং কথায়কথায় ঝামেলাসৃষ্টিকারী বলে বিবেচিত।

ঠিকাদার ও মালামাল সরবরাহকারীদের বহু মিথ্যে ও ওল্টাপাল্টা বিল থাকে। এসব বিল সাধারণত, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সাথে আলাপপরামর্শের ভিত্তিতে, যথাসময়ে পেশ করা হয় না। যথাসময়ে পেশ করলে কর্মকর্তাদের পরীক্ষানিরীক্ষা করার সময় থাকে এবং তাদের পরীক্ষানিরীক্ষায় এগুলো মিথ্যে ও ওল্টাপাল্টা প্রমাণিত হলে বাতিল হয়ে যায়। অর্থবছর শেষ হবার পূর্ব মুহূর্তে বা এককর্মকর্তার বদলিতে অপরকর্মকর্তা আসলে এগুলো পেশ করা হয়। এসময় অব্যয়িত টাকা তামাদি হবে বিধায় কর্তৃপক্ষ সব বকেয়া বিল পরিশোধের জন্যে চাপ দেয়। ফলে, এজাতীয় বিলগুলো পাস হয়াতে সরকারের কোটিকোটি টাকা গচ্ছা যায় এবং ঠিকাদার ও মালামাল সরবরাহকারীদের সাথে কিছু দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারী লাভবান হয়। বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা তামাদি হলেও দেশেই থাকে, দেশের বাইরে চলে যায় না। কোন বিল দাখিল করলে তা, গুরুত্ব ও পরিমাণানুসারে, পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যে যথেষ্ট সময় নির্ধারিত থাকবে। তবে, কমপক্ষে ১৫ দিন নির্ধারিত থাকবে, কেননা বিলের সম্পর্ক

www.pathagar.com

হচ্ছে টাকার সাথে আর টাকাপয়সাসংক্রান্ত ব্যাপারটি সূক্ষ্ম ও নিরিবিলিভাবে দেখতে সময়ের প্রয়োজন। এ, জি, বি, অবশ্য সময় নির্ধারণ করে দেয়। তাদের এসময় নির্ধারিত থাকে তাদের নিকট দাখিল করার জন্যে। কিন্তু, যেমন্ত্রণালয় বা অফিস এ, জি, বি,-র নিকট দাখিল করবে সেমন্ত্রণালয় বা অফিস এ, জি, বি, কর্তৃক তাদের নিকট দাখিল করার নির্ধারিত সময়ের যথেষ্ট সময় আগে নিরিবিলি পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যে পেতে হবে। তাই, টাকা তামাদি হবে বিধায় কর্তৃপক্ষ অর্থবছর শেষ হয়ার শেষমূহূর্তে দাখিলকৃত বিল পাস করার জন্যে কোনপ্রকার চাপপ্রয়োগ করবে না। অর্থবছর শেষ হয়ার কমপক্ষে একমাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা অফিসে বিল দাখিল করতে হবে। অর্থবছর শেষ হয়ার একমাসের মধ্যে যেসব কাজ ও কেনাকাটা হবে সেগুলোর বিল পরবর্তী অর্থবছরে দাখিল করবে। তাছাড়া, এককর্মকর্তার বদলিতে অন্যকর্মকর্তা আসলে এবং তার নিকট পূর্বের কোন বিল দাখিল করা হলে সে তা নিরিবিলি পুঙখানুপুঙখরূপে পরীক্ষানিরীক্ষা না করে পাস করবে না এবং কর্তৃপক্ষও তাকে তাড়াহুড়ো করে তা পাস করার জন্যে চাপ দেবে না। এতে সরকারের অনেক টাকা সাশ্রয় হবে এবং দুর্নীতিও কিছু-না-কিছু হ্রাস পাবে। এ, জি, বি,-তেও বিভিন্ন কারণে বিভিন্নধরনের বিল পাস হয়ে যায়। অপরদিকে, যারা এ, জি, বি,-র সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করে না তারা তাদের ন্যায়সংগত বিল পাস করিয়ে নিতেও হিমশিম খেতে হয়। তাই, এ, জি, বি,-কে ঢেলে সাজিয়ে সুনিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেও দুর্নীতি হ্রাস পাবে। কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী পেনশনে যেতেও ভোগান্তিমুক্ত থাকতে পারে না। তাকে জায়গায়জায়গায় ধন্না দিতে হয় এবং কাগজপত্র ঠিক করে নিতে হয়। এখন যারা ধন্না দিচ্ছে তাদের নিকট অতীতে অনেকেই একাজের জন্যে ধন্না দিতে হয়েছিলো আর যাদের কাছে এখন ধন্না দিচ্ছে তারাও ভবিষ্যতে এভাবে অন্যান্যের নিকট একাজের জন্যে ধন্না দিতে হবে। যেহেতু এটা সবার ভাগ্য সেহেতু এটাতে সবার খেয়াল রাখা দরকার যাতে কারো কোনপ্রকার ভোগান্তি না হয়। কিন্তু, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।

বাস্তবে ঘুষ, দুর্নীতি, অবিচার ও নানাধরনের অন্যায় কার্যাবলী আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বিরাট অন্তরায়। বিভিন্ন প্রকল্পে যেটাকা বরাদ্দ করা হয় সেটাকার মোটাঅংক প্রকল্পের সাথে জড়িত ঠিকাদার ও কর্মকর্তাদের হস্তগত হয়। একটি প্রকল্পে বা কাজে যেটাকার প্রয়োজন প্রাক্কলনে সেটাকার চেয়ে বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে বহুগুণ বেশি টাকা ধরা হয় এবং সে বেশিধরা টাকা ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হস্তগত হয়। এমনএমন খাতে বহুবহু টাকা ব্যয় দেখানো হয়

www.pathagar.com

যেগুলোতে ব্যয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। ন্যায়সংগত কাজকর্মে নিয়মকানুনের অনেক মারপ্যাঁচ দেখানো হয় এবং বড়বড় অন্যায় কাজকর্মও এমনিতেই হয়ে যায়। নিম্নস্তরে এসব অপচয় ও দুর্নীতি হতে পারে না। এগুলো উচ্চস্তরেই হয়ে থাকে এবং নিম্নস্তরে হলেও উচ্চস্তরের হাত ব্যতীত হতে পারে না। এসব দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে পারলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সরকার বলছে যে, জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঘুষ, দুর্নীতি, অন্যায় ও সামাজিক পংকিলতার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যারা এগুলোর বিরুদ্ধে নীতিগত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তাদেরকে সর্বপ্রথম এগুলো হতে মুক্ত থাকতে হবে। তা হলে এগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের ভূমিকা ও আন্দোলন কার্যকর হবে। একদিকে এগুলোতে লিপ্ত থেকে অপরদিকে যেব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়–না–কেন এগুলো বন্ধ করা যায় না। নিজে অপরাধী হয়ে অন্যএকজনকে অপরাধী বললে তাতে কোন সুফল না হয়ে কুফলই বেশি হয়। তাই, অপরাধীরা পরস্পরকে অপরাধী বলে না এবং এ প্রবাদ দু'টি অক্ষরেঅক্ষরে খাটে যে, চোরেচোরে মাসতুত ভাই এবং একধরনের পালকের পাখি একঝাঁকে চলে। তখনই এগুলি বন্ধ হবে এবং এগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন ও সহযোগিতা কার্যকর হবে যখন রাষ্ট্রপরিচালক ও রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এগুলো হতে মুক্ত থাকবে। তাই, এগুলোর মূলোৎপাটনের মাধ্যমে জনকল্যাণের স্বার্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে রাষ্ট্রপরিচালক ও রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এগুলো হতে সতত মুক্ত থাকতে হবে। কৃষিউন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন খাতে বিভিন্নভাবে প্রচুর টাকা খরচ করা হচ্ছে। বাস্তবে খরচের তুলনায় উন্নয়ন অত্যন্তকম, কেননা উন্নয়নের নামে খরচ দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ব্যক্তিরাই ভালো জানে যে, সেখরচ দিয়ে তারা কি করে। তাছাড়া, মাঠপর্যায়ে কৃষিউন্নয়নসংক্রান্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তেমনকোন জোরালো ভূমিকা পরিলক্ষিত হচ্ছে না এবং সমবায়সমিতিগুলোর নামে যে কি কাণ্ডকারখানা চলছে যারা সেগুলোর ভেতরে না ঢুকছে তারা তা বুঝতে পারবে না। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগরক্ষা করে চলতে পারলে অনেক সুযোগসুবিধা পায়া যায়, বিভিন্নধরনের 'কর' কম দেয়া যায় ও ক্ষেত্রবিশেষে না দিয়েও সারা যায়, লাইসেন্স না করেও কাজকারবার চালানো যায় ইত্যাদি। সৎকর্মকর্তারা সবকিছুই আইন ও বিধিমোতাবেক সম্পাদন করতে চায়। তারা বিশেষতঃ অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে বিধিবিধানকে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এটা দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গাত্রদাহ। তারা ওসব সৎকর্মকর্তাদেরকে কোনভাবেই সহ্য করতে পারে না। তাই, তারা তাদেরকে এসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয় এবং দুর্নীতির চলমান গতি বহাল রাখে। সৎকর্মকর্তাদেরকে অর্থসংক্রান্ত গুরুপূর্ণ দায়িত্বগুলোতে কাজ করতে না দেয়াটাই দুর্নীতি দমনে একটি বড় বাধা। দুর্নীতি

www.pathagar.com

দমনের একটি উল্লেখযোগ্য উপায় হচ্ছে সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তাদেরকে খোঁজ করে বের করে তাদেরকে অর্থসংক্রান্ত দায়িত্বগুলোতে ও দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে নিয়োজিত রাখা।

সরকার পরিবর্তনের সাথেসাথে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর বাসভবনের সবকিছু নতুনভাবে পাল্টাতে হয়। এমনকি একজন মন্ত্রী বাদ পড়ে তার স্থলে অন্যকোন ব্যক্তি মন্ত্রী হলে তার জন্যেও তা করতে হয়। অফিসআদালতেও প্রায় একই অবস্থা। একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পরিবর্তে অপরএকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আসলে তার পছন্দসই নতুন জিনিসপত্র দিতে হয়। এতে সরকারের বিরাটঅংকের টাকা অপচয় হয় এবং বাদপড়া জিনিসপত্রের হিসেব মিলাও ভার হয়। অথচ, আমরা আমাদের স্বস্ব গৃহে মান্ধাতার আমলের জিনিসপত্রও সংরক্ষণ ও ব্যবহার করি। শুধু সরকারের ক্ষেত্রেই আমরা একজনের ব্যবহার করা জিনিস অপরজন ব্যবহার করতে স্বাস্থ্যহানির দোহাই টানি। এসব অপচয় দুর্নীতির পথ সুগম করে এবং এধরনের দুর্নীতি হচ্ছে কৌশলগত দুর্নীতি। ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিবিদেরাই প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকে। এ সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে মন্ত্রিত্ব। সচিব থেকে শুরু করে সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী মন্ত্রীদের অধীনস্থ। তাদেরকে মন্ত্রীদের আদেশ ও নির্দেশমোতাবেক কাজ করতে হয়। বাস্তবে দেখা যায় যে, মন্ত্রীরা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। এনির্ভরশীলতা স্বাভাবিক। তবে, এনির্ভরশীলতা সুষ্ঠুভাবে ন্যায়ানুগ কর্মসম্পাদনের জন্যে হতে হয়। এজন্যে মন্ত্রীদেরকে সর্বতোভাবে ন্যায়ানুগ হতে হয়। তাদের কোন দুর্বলতার সুযোগ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিতে পারলে তাদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারা দুর্নীতিপরায়ণ হতে আদৌ কুণ্ঠাবোধ করে না। কিছুকিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে যারা সৎ এবং তাদের সততার কারণে তারা কারো অন্যায় ও দুর্নীতিযুক্ত আদেশ কার্যকর করে না। ফলে, তারা ওপর থেকে নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয় এবং বিভিন্ন অসুবিধা ও ঝামেলায় নিপতিত হয়। ন্যায়নিষ্ঠ ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ মন্ত্রীদেরকে এসব কঠোর হস্তে দমন করতে হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে দোষী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শাস্তির ব্যবস্থাগ্রহণ করে ন্যায়নিষ্ঠ ও দুর্নীতিমুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতির ও পুরস্কারের ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হয়। সৎ ও মহৎ রাজনীতিবিদ মন্ত্রীদেরকে একাজে শংকিত হতে হয় না। তারা এটা ভাবাটা যথার্থ নয় যে, এধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তারা সচিবপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিরাগভাজন হবে এবং অযোগ্য বিবেচিত হয়ে মন্ত্রিত্ব হারাবে। আমি মনে করি এবং আমার এ মনে করার সাথে সবাই একমত হবে যে, সততা বজিয়ে রেখে এধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তাদের মন্ত্রিত্ব প্রশংসনীয় হবে।

www.pathagar.com

মন্ত্রীদেরকে প্রতিটি প্রশাসনিক কাজ জানতে ও বুঝতে হয়। তারা নথিতে ও যেকোন বিষয়ে সারসংক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলে না। তাদেরকে কাজকর্মে বাস্তবধর্মী ও বাস্তবানুগ হতে হয়। নথিতে ও সারসংক্ষেপে যা থাকে সেটার বিপরীতমুখী ফলাফল কি হতে পারে সেসম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হয়। এজ্ঞান ও ধারণার অভাবে সিদ্ধান্ত বেঠিক হলে প্রশাসনিক দুর্নীতি চলতে থাকে এবং এদুর্নীতির ছোঁয়া সবখানে লাগতে থাকে বিধায় সরকারের ব্যর্থতা আছে। এভাবে একসরকার ব্যর্থ হয় এবং অপরসরকার আসে। কিন্তু, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা, যাদের কর্মকে সমন্বিতভাবে আমলাতন্ত্র ও টেক্নক্র্যাসি বলা হয়, অনুক্ষণ সফলই থেকে যায় এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঘোষিত জেহাদ সুনীতির বিরুদ্ধে চলতে থাকে বিধায় ন্যায়ানুগতা ও সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত হয় না। দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্যে জেহাদের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। তাই, রাজনীতিবিদদেরকে জেহাদের সঠিক অর্থ বুঝতে ও সে অর্থানুযায়ী মরণাপন্ন হয়ে কাজ করে যেতে হয়। সুনীতির বিপরীত হচ্ছে দুর্নীতি। তাই, সুনীতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সর্বপ্রকার প্রতিকূল ও বিপক্ষীয় শক্তির বিরুদ্ধে জানমাল, জ্ঞানবুদ্ধি, শক্তিসামর্থ ও প্রভাবপ্রতিপত্তি দিয়ে অবিরাম সংগ্রাম করাকেই জেহাদ বলে। একদিকে নিজের মাল, শক্তিসামর্থ ও প্রভাবপ্রতিপত্তি বাড়ানোর চেষ্টা এবং অপরদিকে জেহাদের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন সমভাবে চলতে পারে না। তাই, দুর্নীতি দমন করতে হলে নিজের মাল, শক্তিসামর্থ ও প্রভাবপ্রতিপত্তি বাড়ানোর প্রচেষ্টা বাদ দিতে হয়। যেসব রাজনীতিবিদ এপ্রচেষ্টা বাদ দিতে পারছে তারাই সফলকাম রাজনীতিবিদ। তাদেরকে জনগণ মোনাফেক হিসেবে জানে না এবং তারা ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক জনগণ তাদেরকে সর্বসময় শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাদের প্রশংসা করে ও তাদের কথা শুনে আনন্দ পায়। মোনাফেকদের কথা ও কাজ এক হয় না। তারা মুখে ভালো কথা বলে এবং কাজে হয় স্বার্থান্ধ। যেরাজনীতিবিদের মধ্যে মোনাফেকি থাকে সে সত্যিকারার্থে রাজনীতিবিদ নয়। সে-ই সত্যিকারের রাজনীতিবিদ যার মধ্যে মোনাফেকির কোন চিহ্ন বিদ্যমান থাকে না। তাই, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা তখনই সফলকাম হতে পারে তাদের মধ্যে যখন মোনাফেকি, স্বার্থান্ধতা, পক্ষপাতিত্ব ও তোষামোদ পায়ার প্রবণতা থাকে না এবং তারা তাদের বলিষ্ঠ ন্যায়ানুরাগিতা দিয়ে প্রশাসনকে ও সর্বস্তরের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারে।

ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের স্বার্থান্ধতার, পক্ষপাতিত্বের ও তোষামোদ পায়ার প্রবণতার কারণে যেসব পদ ও কাজে দুর্নীতি হয় সেগুলোতে, সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা পোস্টিং ও সুযোগ না পেয়ে, তাদের আপনজন, আত্মীয়স্বজন ও তোষামোদকারীরা পোস্টিং ও সুযোগ পেয়ে যায় এবং দুর্নীতির ঘোড়া লাগামহীনভাবে

www.pathagar.com

ছুটতে থাকে। অপরদিকে, কালেভদ্রে কোন সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী এরকম কোন পদ ও কাজে পোস্টিং ও সুযোগ পেলে তাকে বিভিন্নভাবে নাজেহাল হতে ও বিপাকে পড়তে হয়। একই কারণে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসতে পারে না বলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধিত হয় না। তাই, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের নীতিগত দায়িত্ব হচ্ছে সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের করে যেসব পদ ও কাজে দুর্নীতি হয় সেগুলোতে তাদেরকে পোস্টিং ও সুযোগ দেয়া এবং তাদেরকে যেকোন প্রতিকূলতা থেকে সর্বদা নিরাপদে রাখা। তারাই সফলকাম ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ যারা বুঝতে ও ধরতে পারে যে, কারা কোথায় কিভাবে জাতীয় সম্পদ তাদের নিজেদের স্বার্থে অপচয় করছে এবং এঅপচয় রোধের পথ ও পন্থা বের করতে পারে এবং যারা এঅপচয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে সমাজে ন্যায়পরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক দেশের সবকিছু সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এনিয়ন্ত্রণের জন্যে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে। এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে সরকার বলতে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা। এসব রাজনীতিবিদ দুর্নীতিমুক্ত থাকলে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দুর্নীতি করতে পারে না, কেননা এরা দুর্নীতিমুক্ত থাকার কারণে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরিচ্যুতি ও শাস্তি অবধারিত হয়। এসব রাজনীতিবিদ দুর্নীতিমুক্ত থাকার কারণে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দুর্নীতি না করতে পারলে অন্যকেউ দুর্নীতি করতে পারে না এবং এরা অন্যায়ভাবে কোন কাজ না করলে কেউই এদেরকে আপনাআপনি ঘুষ দেবে না। ফলে, সমাজে দুর্নীতির প্রাবল্য থাকবে না এবং দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে এটাই সহজসরল নীতি।

সরকার নিজেদের সমর্থনে ও পক্ষে রাখার স্বার্থে সরকারী কর্মচারীদের খারাপ কাজেও, কাজটি খারাপ জেনে ও বুঝে, সন্তোষপ্রকাশ করলে এবং তাদের প্রশংসা করলে তারা ভয়ভীতি হারিয়ে নিরুদ্বেগে দুর্নীতি করতে পারে। সরকার নিজেদের দুর্নীতির কারণে তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্যে তাদের দুর্নীতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পায়ার পরো তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের রন্ধ্ররন্ধ্রে দুর্নীতি প্রবেশ করে। পাপ ও মিথ্যা যেমন পাপ ও মিথ্যাই জন্ম দেয় দুর্নীতিও তেমনি দুর্নীতিই জন্ম দেয়। দুর্নীতিকে সুনীতির মাধ্যমে নিরাপত্তা দেয়া যায় না। দুর্নীতিকে দুর্নীতির মাধ্যমেই নিরাপত্তা দিতে হয়। ফলে, দুর্নীতির প্রসারতা ঘটতে থাকে। সুনীতির প্রসারতা থাকলে দুর্নীতির প্রসারতা ঘটতে পারে না। তাই, নীতিপ্রয়োগকারীদেরকে যেকোন মূল্যে সুনীতিপরায়ণ হতে হয় আর সুনীতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা হতে হয় সরকারকে। দেশ, সমাজ ও জনগণ দলমতনির্বিশেষে এমনসব রাজনীতিবিদকে গ্রহণ করা প্রয়োজন যাদের কথা ও কাজ

www.pathagar.com

এক ও অভিন্ন। রাজনীতিবিদেরা তাদের কথাবার্তা ও বক্তৃতায় নিবেদিতপ্রাণ। তারা জনগণের সেবার জন্যেই রাজনীতি করে। যারা প্রকৃতার্থে সেবা করে ও করতে চায় তারা অন্যের বা সমাজের বা দেশের কোনকিছুই নিজেদের করে নিতে পারে না। কিন্তু, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, কোন রাজনীতিবিদ সেবার দোহাই দিয়ে একবার ক্ষমতাসীন হলে সে তখন সেবক না হয়ে মনির সেজে যায় এবং সাধারণ লোকজন ও নিপীড়িত ব্যক্তিরা তার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারে না। তাছাড়া, রাজনীতি করে সহায়সম্বলহীন ব্যক্তিও বিপুল সম্পদের অধিকারী হচ্ছে। এটা কিভাবে হচ্ছে? দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত এটা সম্ভব নয়। নিজে দুর্নীতি করলে অন্যকেও দুর্নীতি করতে দিতে হয়। এজন্যে কথায় বলে যে, রাজা অন্যায়ভাবে প্রজার একটি ডিম খেলে তার পারিষদেরা অন্যায়ভাবে প্রজার মুরগি খায় এবং রাজা অন্যায়ভাবে প্রজার মুরগি খেলে তার পারিষদেরা অন্যায়ভাবে প্রজার খাসী খায়। এভাবে রাজার দুর্নীতিবৃদ্ধির সাথেসাথে তার পারিষদদের দুর্নীতি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ও ব্যাপকতর থেকে ব্যাপকতম হতে থাকে। রাজা দুর্নীতিমুক্ত থাকলে তার পারিষদেরা দুর্নীতির ক্ষেত্রে ভয়ে জড়সড় ও সন্ত্রস্ত থাকে, কেননা তারা জানে যে, দুর্নীতিমুক্ত রাজা দুর্নীতির জন্যে শাস্তি দেবেই। একদিকে নিজেদেরকে দুর্নীতিমুক্ত দাবি করার এবং অপরদিকে দেশের রন্ধ্রেরন্ধ্রে দুর্নীতি বিদ্যমান থাকার থেকে এটা স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণিত হয়ে যে, নিজেদেরকে দুর্নীতিমুক্ত দাবি করে জনগণকে প্রতারিত করা হয়। যারা দুর্নীতিমুক্ত তারা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবে কোন স্বার্থে? অবশ্যই কোন–না–কোন স্বার্থে। তাছাড়া, আর কি হতে পারে? দুর্নীতি না করে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়াটা কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদের কর্ম হতে পারে না। তাই, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া মানেই দুর্নীতির জালে আবদ্ধ থাকা। দুর্নীতি না করে পরোক্ষভাবে কোন আর্থিক সুযোগসুবিধা নেয়াটা হচ্ছে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া। যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী কায়দা করে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের জন্যে আর্থিক সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করে দেয় তারাও নানাভাবে সুযোগসুবিধা নিতে থাকে। অথচ, দুর্নীতি ও অবৈধ সুযোগসুবিধার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই, দুর্নীতিমুক্ত ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা তাদের জন্যে সৃষ্ট কোন অবৈধ সুযোগসুবিধাও নিতে পারে না।

ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের অগোচরে কোন কাজ হতে পারে না। তাই, এটা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, সবধরনের দুর্নীতিও তাদের কারো–না–কারো গোচরে হয়ে থাকে এবং এটা অস্বীকার করার কোন জো নেই যে, কোনকিছুই তাদের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তবে, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা পুরোপুরিভাবে দুর্নীতিমুক্ত থাকতে পারলে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করাটা জটিল কিছু হবে না, কেননা যেদুর্নীতি দমন করবে সে স্বয়ং দুর্নীতিবাজ হলে দুর্নীতির ক্ষেত্র বিস্তৃত হতে থাকবেই। তাই, যে নিজে

www.pathagar.com

একদিকে খারাপ করে এবং অপরদিকে খারাপ প্রতিহত করতে এগিয়ে যায় যতো বিপত্তি তার ক্ষেত্রেই। কিন্তু, যে নিজে খারাপ করে না এবং খারাপ প্রতিহত করতে এগিয়ে যায় সে বিপত্তির সম্মুখীন হলেও শেষপর্যন্ত সফলকাম হয়ই, কেননা কোন ভালো কাজের সুফল নষ্ট হয় না ও হতে পারে না। তাই, যারা সত্যের ধ্বজাধারী রাজনীতিবিদ তাদের ভীত হবার কিছু নেই। তারা বীর। তাদেরকে বীরদর্পে এগিয়ে যেতে হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বড়বড় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের আঞ্চলিক সংস্থার অনুষ্ঠানো আমাদের দেশে হয়ে থাকে। এসব অনুষ্ঠানের জন্যে কোটিকোটি টাকার বাজেট হয়। বাস্তবে খরচের তুলনায় এবাজেটের টাকা অনেকঅনেক বেশি হয়। খরচ যা-ই হয়-না-কেন হিসেবে খরচের মিল ঠিকঠাকভাবেই দেখানো হয়। এসুযোগে কোটিকোটি টাকা লোপাট হয় এবং কিছুকছু রাজনৈতিক নেতার ও সরকারী কর্মকর্তাদের লুটেপুটে খাওয়ার সুযোগ হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অফিসে আপ্যায়নের নামে প্রতিবছর সরকারের কয়েক কোটি টাকা লোপাট হয়। বড়বড় টেণ্ডারে ও কেনাকাটাতে যেঘাপলা চলে তাতে সম্পাদিত কাজ ও আমদানিকৃত বা সরবরাহকৃত মালামাল ভালো মানের হয় না এবং যেঠিকাদার কাজ পায়ার, যেকোন কারণে, তাকে কাজ না দিলে কোটিকোটি টাকার হেরফের হয় এবং কাজ ও মালামাল ভালো মানের হয় না বিধায়, বলতে গেলে, রাষ্ট্রের এসব কাজে ও মালামাল আমদানি বা সরবরাহতে পুরোটাই গচ্ছা যায়। এটা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি ও অগ্রগতিতে অবর্ণনীয় অন্তরায়। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, দফতর ও অধিদপ্তর এবং লিমিটেড কোম্পানিগুলো স্বাধীনচেতা। বাস্তবে তারা মন্ত্রণালয়ের কোন আদেশনিষেধের প্রতি তেমনকোন তোয়াক্কা করে না। তাদের সম্পাদিত কর্মাদির ওপরো মন্ত্রণালয় বা সরকারের তেমনকোন তদারকি নেই বললেই চলে। তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্যাদি করে থাকে। তারা কারো নিকট তেমনকোন জবাবদিহি করতে হয় না। ফলে, এগুলোতে বিভিন্ন প্রকল্প ও কাজের নামে প্রতিবছর কোটিকোটি টাকা লোপাট হচ্ছে। তাছাড়া, এগুলোতে নিয়োজিত কর্মকর্তারা সাধারণত প্রতিয়োগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত নয় এবং তারা প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। তাদের অধিকাংশই রাজনৈতিকভাবে ও ধরাধরির দ্বারা নিয়োজিত। মনে হয় যে, এগুলো বিশেষ লোককে বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্যে।

যার সাথেই আলাপ হয় শুধু অফিসআদালতের রন্ধ্রেরন্ধ্রে দুর্নীতির কথাই শুনা যায়। প্রত্যেকের একই কথা যে, 'দেশটা ওপর দিয়ে আছে, ভেতরে শেষ'। তাই, শুধু মুখের কথার এবং আইন ও নিয়ম পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের দ্বারা দেশ থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা যাবে না। সরকার বলতে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা স্বয়ং দুর্নীতিমুক্ত থেকে দুর্নীতিবাজদেরকে সময়মতো শায়েস্তা করতে পারতে হবে। তা না

www.pathagar.com

হলে চিরাচরিত নিয়মে জনগণ থেকে একই কথা ধ্বনিত হতে থাকবে যে, 'দেশটা ওপর দিয়ে আছে, ভেতরে শেষ'। যেকোন গণতান্ত্রিক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারের শিক্ষার জন্যে এধ্বনির চেয়ে আরবড় কোন ধ্বনির প্রয়োজন নেই বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। যেকোন কাজে বা চাকরিতে ঢুকার পূর্বপর্যন্ত যে যতো সৎউদ্দেশ্যের কথাই বলে–না–কেন ভেতরেভেতরে তার উদ্দেশ্য যে যেকোনভাবে তার স্বার্থসিদ্ধি করা তা সে তাতে ঢুকার পরই বুঝা যায়। তাই, সাধারণত কেউই সৎউদ্দেশ্য নিয়ে কোন কাজে বা চাকরিতে যোগদান করে না। তার উদ্দেশ্য থাকে যে, সে কোনভাবে কোন কাজে বা চাকরিতে ঢুকতে পারলে নিজেকে নিজে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে যাতে তার জীবদ্দশায় তার কোন অসুবিধা না হয় এবং, এমন কি, তার মত্যুর পর তার বংশধরদেরো কোন অসুবিধা না হয়। তাই, মনে অসৎ উদ্দেশ্য রেখে সৎভাবে কিছু করা যায় না। প্রকৃতভাবে সৎউদ্দেশ্য পোষণ করলেই সৎভাবে কিছু করা যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন। এজন্যে তাদের সম্মান ও ব্যক্তিত্ব আছে। অথচ, অনেকেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তোষামোদ, মোসাহেবি ও স্তাবকতার শেষপর্যায়ে পৌঁছে যায়। এসব কাজে তারা ভুলে যায় যে, তাদের সম্মান ও ব্যক্তিত্বের হানি হচ্ছে। বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন জীব হিসেবে সম্মান ও ব্যক্তিত্বের দিকে খেয়াল করতে হয়। এতে তোষামোদ, মোসাহেবি ও স্তাবকতা সম্ভব হয় না। এগুলোর বিলুপ্তি ঘটলে এগুলোর কারণে যেসব অন্যায়অবিচার ও দুর্নীতি হয় সেগুলো হবে না। এজন্যে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রপরিচালকদেরকে এগুলো সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহিত করে চলতে হবে। অনেক চাকরি আছে সেগুলোতে ঘুষ না দিয়ে ঢোকা যায় না। কেউকেউ শুধু নির্দিষ্ট কোন অফিসের চিঠির মাধ্যমেই চাকরি পেয়ে যায়। নীতিগতভাবে কোন পোস্টিং হয় না। গুরুত্বপূর্ণ পোস্টিংগুলো হয়ে থাকে ঘুষ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে। তাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা চাকরিতে ঢোকতেই ও পোস্টিং নিতেই ঘুষ ও দুর্নীতির প্রশিক্ষণ পেয়ে যায়। এটাকে দুর্নীতির উৎসমুখ বলা যায়। এদুর্নীতি উচ্চতম পর্যায়ে হয়ে থাকে। অথচ, এপর্যায়ের ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ ও কর্মকর্তাদেরকেই দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের জন্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। যেদেশের কর্মকাণ্ডের ওপর অন্যান্য দেশের আস্থা থাকে না তার সরকার ও প্রশাসন যে কতো দুর্বল তা কোন বিশ্লেষণ ছাড়াই অনুভব ও উপলব্ধি করা যায়। আমাদের দেশে বহু বেসরকারী সংস্থা বিদ্যমান আছে। বিদেশের সাহায্যসহযোগিতায় বিভিন্ন কাজকর্ম এসব সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। এতে এটা পরিষ্কার যে, বিদেশ থেকে আমরা যেসব সাহায্যসহযোগিতা পাই আমাদের সরকার ও প্রশাসন সেগুলোর সদ্ব্যবহারে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অকপটে বলা যায় যে, এব্যর্থতা প্রকট দুর্নীতিরই ফসল। যেদেশের দুর্নীতি সম্পর্কে অন্যান্য দেশ ওয়াকেফহাল সে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,

www.pathagar.com

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিক দিয়ে কতো অবহেলিত তা বিশ্লেষণ করে লিখার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। যেদিন আমাদের দেশে বেসরকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্যসহযোগিতায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত না হয়ে আমাদের সরকার ও প্রশাসনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে সেদিন বুঝা যাবে যে, আমরা অনেকটা দুর্নীতিমুক্ত হয়েছি। এজন্যে আমাদের সরকার ও প্রশাসনকে দেশ ও জনগণের স্বার্থে সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতিমুক্ত থেকে প্রাণপণে কাজ করে যেতে হবে। মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় আপ্যায়নের ব্যবস্থা আছে। সচিবদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে সদস্য প্রতি ৬/-টাকা হারে এবং মন্ত্রীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে সদস্য প্রতি ১৫/-টাকা হারে আপ্যায়নের জন্যে ব্যয় নির্ধারিত আছে। সদস্য প্রতি উক্ত নির্ধারিত হারে খরচের মাধ্যমে সদস্যদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আপ্যায়ন করা সম্ভব হয় না। তারা তাদের পছন্দানুযায়ী আপ্যায়ন চায়। উক্ত নির্ধারিত হারের বাইরে তৃপ্তি অনুযায়ী আপ্যায়নের জন্যে টাকা খরচের কোন নিয়ম নেই বলে যেভাবেই হোক ব্যবস্থা করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়। এজন্যে সভায় অনুমোদিত সদস্যসংখ্যার চেয়ে বেশি সংখ্যা দেখিয়ে অধিক টাকা উত্তোলন করে তৃপ্তিকর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। এতে সরকারের অজস্র টাকা অপচয় হয়। মন্ত্রীরা এটা ভালোভাবেই জানে। তবু, তারা উক্ত পন্থায় খরচের পক্ষপাতী। তারা তাদের জন্যে নির্ধারিত খরচের চেয়ে অনেকবেশি খরচ করে। তাদের এধরনের বেআইনী কাজে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যে অন্যান্য বেআইনী কাজ করতে উৎসাহিত হয় না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাছাড়া, আপ্যায়ন ভাতা পায়া সত্ত্বেও বিশেষ সভা দেখিয়ে আপ্যায়নের জন্যে টাকাগ্রহণ করানোর প্রবণতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব কারণে জাতীয় স্বার্থে এজাতীয় খরচ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকাটা খুবই মঙ্গলজনক।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের খবর অন্যান্য লোকজন খুবকমই জানে। ওপর্যায়ে বড়বড় প্রজেক্ট অনুমোদিত হয় ও সেগুলোর কাজ হয় এবং বিভিন্নধরনের বড়বড় কেনাকাটা হয়। এসব প্রজেক্ট অনুমোদনে ও কেনাকাটায় ঘাপলার ফলে কোটিকোটি টাকার হেরফের হয় ও দেশের বিরাট ক্ষতি হয়। বিদেশ থেকেও কোটিকোটি টাকার কেনাকাটা হয়ে থাকে। এধরনের কেনাকাটায় বড়ধরনের কারচুপি চলে এবং ক্রয়কৃত জিনিস ও মালামালের গুণগতমানো কোনকোন সময় খারাপ হয়। এজাতীয় দুর্নীতি প্রতিহত না হলে এবং এতে যারা জড়িত থাকে তাদেরকে যথোচিত শাস্তি প্রদান না করলে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি বহুলাংশে ব্যাহত হতে থাকে। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ওপর নির্ভর করেই আমরা চলছি। প্রয়োজনানুযায়ী এসাহায্য ও ঋণের জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতি থাকতে হয়। বাস্তবে আমাদের এনীতির অভাবে আমরা এসাহায্য ও ঋণ যে আমাদের প্রয়োজনানুযায়ী পাচ্ছি না তা সবাই কমবেশি বুঝে।

www.pathagar.com

আমাদের মতো দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্যে বিদেশী বিনিয়োগের অপরিহার্যতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সর্বত্র প্রচণ্ড দুর্নীতির কারণে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আমাদের দেশে শিল্পস্থাপনে আকৃষ্ট হচ্ছে না। তাছাড়া, এ দু'কারণে আমাদের দেশের ওপর অন্যান্য দেশ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে না পারলে আমাদের শান্তি ও অগ্রগতি ব্যাহত হতে থাকবে। এটা পুনরুদ্ধারের জন্যে আমাদেরকে যেকোন মূল্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ও নিরপেক্ষ ভূমিকার মাধ্যমে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হবে। এটা রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেম, সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার ওপর নির্ভর করছে। তারা সত্যিকারার্থে দেশপ্রেমিক, সদিচ্ছুক ও আন্তরিক হলে এটা সম্ভবপর হবে। তাই, রাজনীতিবিদদের পবিত্রতম দায়িত্ব হচ্ছে দেশপ্রেমের, সদিচ্ছার ও আন্তরিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্নীতিমুক্ত থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যায়া।

ট

নিজেদের আশাআকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ বা ক্রিয়াকাণ্ডের জন্যেই প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। প্রতিক্রিয়ার ফলেই পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে, বিপ্লব সাধিত হয়, উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, বিক্ষোভ চলে এবং আন্দোলন উগ্র ও প্রখর আকার ধারণ করে। যেক্রিয়ার জন্যে প্রতিক্রিয়া তা নিষ্পাদিত না হলে পুনরায় প্রতিক্রিয়া চলে। এভাবে প্রতিক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া চলতে থাকলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্ভব হয় না, শান্তিশৃঙ্খলা সুদূরপরাহত হয় এবং দেশে অগ্রগতি ও উন্নতির পরিবর্তে সংকটের পর সংকট সৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে জনগণ এক প্রতিক্রিয়ার পর অভিলষিত বা কাঙ্ক্ষিত ক্রিয়া হতে বঞ্চিত হতে থাকলে অন্য প্রতিক্রিয়ায় পদার্পণ করে। আমাদের সব প্রতিক্রিয়ার একই উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থায় সুষম বণ্টনের পদ্ধতিপ্রবর্তন ও তা বলবৎকরণ এবং ঝামেলামুক্তভাবে দেশের অগ্রগতি ও উন্নতি সাধন। তাই, বারংবার প্রতিক্রিয়া হতে পরিত্রাণের জন্যে যেক্রিয়ার ওপর এককথায় আলোকপাত করা হলো তা দলমতনির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে সম্পাদন করার গুরুত্ব অপরিসীম।

সরকারের যেকোনকিছু বলতেই জনসাধারণের। তাই, সরকারের কোন সম্পদ যাতে বেহাত বা পরহস্তগত না হয় সেদিকে জনসাধারণকে সাবধান ও সানুরাগ হতে হয়। অথচ, সরকারের হলেই যে যেভাবে পারে নিজের করে নেয়ার দুরভিসন্ধিতে রত হয়। একাজে সরকারের উঁচুপর্যায়ের মদদো সহজলভ্য হয়। সরকারের সম্পদ এমন মজবুতভাবে পরহস্তগত হয় যে, তা যে সরকারের তা প্রমাণ করা অত্যন্ত দুরূহ হয়।

www.pathagar.com

নগর ও শহরে সরকারের কোটিকোটি টাকার বহু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বন্দোবস্তের নামে ব্যক্তিমালিকানায় চলে যায়। কোটিকোটি টাকার অর্পিত সম্পত্তি ও পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি সরকারের বেহাত হয়ে আছে ও হচ্ছে। যেদেশে সরকারী সম্পদ বেহাত করা যায় সেদেশে আইনবিরোধী ও নৈতিকতাপরিপন্থী সবকিছু করতে তেমনকোন ভাবনায় পড়তে হয় না। সরকারী সম্পদ বেহাত করাটা সরকারের বিরুদ্ধাচরণের চেয়েও ভয়াল বা ভয়ঙ্কর, কেননা সরকার বলতে ক্ষমতাসীন দল অস্থায়ী এবং সরকারী সম্পদ বলতে সার্বিকভাবে দেশের সম্পদ স্থায়ী। তাই, সরকারের যতো সম্পদ বেহাত হয়েছে সেগুলো যেকোন মূল্যে জাতীয় স্বার্থে পুনরুদ্ধার করা অপরিহার্য। সরকারী সম্পদ সংরক্ষণের জন্যে অনেক আইন ও বিধি আছে। কিন্তু, দুর্নীতির কারণে এগুলো অকার্যকর ও নিস্ক্রিয়। যাদের দরুন এগুলো অকার্যকর ও নিস্ক্রিয় তারা, যারাই হোক-না-কেন, দেশ ও জনগণের শত্রু। দুর্নীতির কারণে এসব শত্রুরা অবাধভাবে বিচরণ করছে এবং কোথাও এদের কোন অসুবিধা হতে দেখা ও শুনা যাচ্ছে না। নিরীহ জনগণ চায় যে, এদের কঠোর ও রূঢ় একটাকিছু হোক। সরকার বলতে ক্ষমতাসীনদের দেশপ্রেম ও ন্যায়নিষ্ঠা থাকলে এটা এমনিতেই সম্ভবপর হয়। তবে, তাদের দেশপ্রেম ও ন্যায়নিষ্ঠা আছে কি নেই তা তাদের নিষ্পাদিত কর্মই জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করে দেয় এবং তারা যতোকিছুই করে-না-কেন তাদের অবয়বে সবকিছু ভেসে ওঠেই।

দলের পক্ষ হতে মন্ত্রীদেরকে একতরফাভাবে বিভিন্ন ব্যাপার বুঝিয়ে বলে সেগুলো নির্বাহের নিমিত্ত তাদের থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বা কর্তৃপক্ষগুলোর নিকট আদেশ বা অনুরোধ করিয়ে নেয়ার বা তাদের দ্বারা তাদেরকে টেলিফোনে সরাসরি বলানোর খোলাখুলি ও প্রত্যক্ষ দস্তুর বা রেওয়াজ বহাল আছে ও পূর্ণোদ্যমে বা পূর্ণমাত্রায় কাজ করছে। এতে অনেক মারাত্মক ও সাংঘাতিক অন্যায় কাজো নিষ্পন্ন বা সম্পন্ন হয়ে যায় এবং ন্যায় কাজের কবর রচিত হয় বিধায় সুবিচার ও কল্যাণের পথ অবরুদ্ধ হয় এবং মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার হেতুতে সর্বত্র অশান্তির দাবাগ্নি বা দাবানল, লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে, দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। অধিকন্তু, মন্ত্রীদের এজাতীয় কর্মকাণ্ডে দুর্নীতি প্রপঞ্চিত হয় বা বিস্তৃতিলাভ করে। তাই, কোন মন্ত্রীর নিকট কেউ কোন প্রতিকারের জন্যে হাজির হলে তিনি নিরপেক্ষতা ও ন্যায্যতার স্বার্থে সময় নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুনে ও প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি পরীক্ষানিরীক্ষা করে লিখিতভাবে এমন একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত দেবেন যা কোন আদালতো অবহেলা বা অগ্রাহ্য করতে পারবে না। মন্ত্রীরা শুধু তাদের দলের সমর্থকদের জন্যে নয়। তারা দলমতনির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে সবার ও ন্যায্যতার জন্যে। মন্ত্রীরা এদৃষ্টিকোণ থেকে কর্মসম্পাদন করলে

www.pathagar.com

দুর্নীতি ও অপকর্ম বহুলাংশে লাঘব হয় এবং সরকারের ওপর জনগণের আস্থা সুদৃঢ় হয়।

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই কমবেশি দেশব্যাপী কর্মী আছে। নিজের খেয়ে পরের মহিমাকীর্তন বা স্তুতি করে এমন কতজন আছে। অথচ, রাজনৈতিক সফলতার জন্যে কর্মীদের স্তুতিবাদ বা প্রশংসাবাক্য অপরিহরণীয়। কর্মীদের পরিতোষ ও সন্তুষ্টি ব্যতীত এটা সম্ভবাতীত বা অসম্ভব। এটাকে সম্ভবপর করার জন্যে কর্মীদের কথা ও আবদার বা বায়না, যেটা অন্যায় ও অদ্ভুত দাবি, রক্ষা করতে হয় এবং তাদেরকে নানাধরনের সুযোগসুবিধা দিতে হয়। তাদের আবদার রক্ষা করতে গিয়ে ন্যায়কে ভূপাতিত করে অন্যায়কে আদৃত করতে বা আশ্রয় দিতে হয়। ফলে, যেঅন্যায় থেকে নিষ্কৃতির ও পরিত্রাণের জন্যে রাজনৈতিক পট ও সরকার পরিবর্তন করা হয় সেঅন্যায়ের দৌরাত্ম্য, দুরন্তপনা, উৎপীড়ন ও পাপাচরণের অস্তিত্বশীলতা ও বিদ্যমানতা জনগণকে বারংবার নিরাশ ও হতাশ করতে থাকে। যারা ন্যায়বান ও ন্যায়সংগত কাজ চায় তারা অন্যায়ত বা অন্যায়ভাবে কাকেও টাকাকড়ি দেয় না। পক্ষান্তরে, যারা অন্যায়াচারী ও অন্যায্য কাজ চায় তারা যথেষ্ট পরিমাণে টাকাকড়ি খরচ করতে মোটেই কুণ্ঠিত হয় না। এতে অন্যায়কারীদের কাছ থেকেই কর্মীদের নিকট টাকাপয়সা আসে এবং কর্মীদের নিরাপত্তায় অন্যায়কারীদের চোটপাট ক্ষুরধার বা ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্মধারবিশিষ্ট হয়। তাছাড়া, কর্মীরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বিজড়িত হয়। তারা টাকাপয়সার জন্যে এসব কর্মকাণ্ডে অনেক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এতে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধাচরণের পরিবর্তে পক্ষাবলম্বন করে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীরা তাদেরকে নিজেদের নিরাপত্তার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে নির্বিবাদে ও নিরুদ্বেগে দুর্নীতি করতে থাকে। তাই, নিজেদের কর্মীদের স্বার্থে ক্ষমতাসীনেরা পরোক্ষভাবে হলেও জেনেশুনে অন্যায় ও দুর্নীতি করে এবং যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতাসীন হয়–না–কেন দেশ ও জনগণের উর্ধ্বে তাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সবকিছু পরিচালনা করে থাকে। তবে, আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী মহানবীর (সঃ) সরকার ও রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিতে উক্তধরনের অন্যায় ও দুর্নীতি কোনভাবেই চলতে পারে না।

হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের এবং স্থানীয় ও রাজস্ব হিসাব অফিসে সরকারী পর্যায়ে সবরকম ব্যয়ের হিসেবনিকেশ নিরীক্ষা করা হয়। এনিরীক্ষাতে প্রাপ্তটাকা ব্যয়ের ক্ষেত্রে কাগজপত্রে হিসেবনিকেশে নানাধরনের অসংগতি, অসামঞ্জস্য ও ভুলভ্রান্তি তুলে ধরা হয়। এগুলোকে বলা হয় নিরীক্ষা–আপত্তি। উত্তরের মাধ্যমে এসব আপত্তি মীমাংসা করা হয়। এতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা ভারসাম্য রক্ষিত হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোটিকোটি টাকার দুর্নীতি যে কতোটুকু দমন করা যায় তা ভেবেচিন্তে দেখা একান্ত

www.pathagar.com

প্রয়োজন। কেনাকাটার ও কর্মের ক্ষেত্রে নিরীক্ষকেরা মালামাল ও কর্ম দেখতে হয় না। তারা দেখে যে, কেনাকাটার ও কর্মের পদ্ধতি, কাগজপত্র, রেজিস্টার ইত্যাদি ঠিকঠাক আছে কিনা। এগুলো ঠিকঠাক না থাকাকে অনিয়ম বলা হয়। নিরীক্ষা-আপত্তির ভিত্তিতে পদ্ধতি, কাগজপত্র, রেজিস্টার ইত্যাদি নিয়মিত করে নেয়াটাকে নিরীক্ষা-আপত্তি মেটানো বলা হয়। এতে যে একেবারে কোন সুফল পায়া যায় না তা নয়। কখনোকখনো কেঁচো বের করতে গিয়ে সাপ বের করার দশা হয়। নিরীক্ষা-আপত্তিতে যেসব রাঘব বোয়াল ধরা পড়ে তারা যে শেষপর্যন্ত কিভাবে ছুটে যায় তা টের পায়া ও বুঝা গেলেও কারো করার মতো কিছুই থাকে না। জাতীয় স্বার্থে এদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে নিরীক্ষা অফিসে সৎ ও মহৎ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উচ্চপর্যায়ে গঠিত বিশেষ আদালত থাকতে হবে। তাছাড়া, বিভিন্ন নির্মাণ ও গঠনমূলক কাজে জাতীয় সম্পদ ও বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণভাবে বা যৎপরোনাস্তিভাবে ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য সৎ ও মহৎ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উচ্চপর্যায়ে গঠিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষ কমিটি থাকতে হবে। এসব কমিটি দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে সার্বক্ষণিকভাবে এসব কাজ সরেজমিন অবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবে এবং তাদের নিকট সম্পদ ও অর্থের অসদ্ব্যবহার ধরা পড়লে তারা কালক্ষেপণ না করে তাৎক্ষণিকভাবে জড়িত ব্যক্তিদেরকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের জন্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সৎকর্মকর্তারা চায় যে প্রতিটি কাজ সৎভাবে নিষ্পন্ন হোক। তারা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনকোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী অসৎভাবে কোন কাজ নিষ্পাদন করলে তাদেরকে নানাভাবে সংশোধন করে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু, তারা সংশোধিত না হলে সৎকর্মকর্তারা তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করে। কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে একশানের জন্যে লিখে সেটার পেছনে লেগে থাকাটা ব্যক্তিগত শত্রুতা উদ্ধারের কাজের মতো মনে হয়। তাই, প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা তা করে না এবং সে তা করতে গেলে কর্তৃপক্ষ ভাববে যে, তার এতো ঐকান্তিকতা ও গুরুত্ব দেখাবার আবশ্যকতা কি। পক্ষান্তরে, যার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন লিখা হয় সে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে সবকিছু ঠিকঠাক করে নেয় এবং তার বিরুদ্ধে কোন একশান হয় না। এতে জনগণ তাকে খুব শক্তিধর মনে করে এবং তার যে গোড়া খুব শক্ত ও ওপরে বড়বড় কর্মকর্তা রয়েছে সেসম্পর্কে কথাবার্তা বলে। এতদ্ব্যতীত, সে বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বেশিবেশি দুর্নীতি করতে থাকে। দুর্নীতি দমন করতে চেলে যার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন লিখা হয় তার ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে সরেজমিনে তদন্ত করে সে দোষী সাবস্ত্য হলে তাকে আবশ্যিকভাবে তার প্রাপ্যশাস্তি প্রদান করতে হবে।

www.pathagar.com

বিভিন্ন কর্মস্থল হতে জনগণ তাদের কর্ম করিয়ে নিতে শুধু কর্মচারীদের পেছনে লেগে থাকলে চলে না, তাদেরকে ঘুষো দিতে হয়। ঘুষ দিয়েও যে সব ন্যায়সংগত কাজ আদায় করা যায় তা নয়। যে ন্যায়সংগতভাবে কাজ চায় অন্যায়কারী তার চেয়ে বেশি ঘুষ দিলে অন্যায়কারীর পক্ষেই কাজ হয়ে যায়। তাই, বেশি ঘুষ দিয়ে অন্যায় কাজো করানো যায় এবং কম ঘুষ দিয়ে ন্যায় কাজো করানো কষ্টসাধ্য হয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতি এমন একপর্যায়ে আছে যে উভয় ন্যায় ও অন্যায় কাজে ঘুষ দিতে হয় এবং দু' কাজের মধ্যে যে কাজে ঘুষ বেশি পায়া যায় সেকাজই হয়ে যায়। ঘুষের ব্যাপকতার কারণে একথাটি সর্বত্র বলাবলি হচ্ছে যে, অফিসআদালতের প্রতিটি ইটো ঘুষের জন্যে হাঁ করে থাকে।

ণ

দেশ নৈরাজ্য ও অরাজকতার চরম পর্যায়ে পৌঁছলেই নিরপরাধ অবুঝ শিশুকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়, শিশুদেরকে টাকার জন্যে অপহরণ করা হয়, দিনদুপুরে সামনাসামনি দু'পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ হয়, মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়, সন্ত্রাস ও মস্তানিকে কোনকোন মহল সন্ত্রাস ও মস্তানিই মনে করে না, সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাস ও অস্ত্রের আখড়ায় পরিণত হয়, সন্ত্রাসের ও চাঁদাবাজির কারণে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসাবাণিজ্য চালানো দুষ্কর হয় এবং রাজনীতিবিদেরা একদিকে কথায় ও বক্তৃতায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকে ও অপরদিকে ভেতরেভেতরে খুব সূক্ষ্মভাবে সন্ত্রাসী তৎপরতাতে মদদ যোগায়। এসব কারণে যেসরকারের নিকট জনসাধারণ পরোক্ষভাবে হলেও জিম্মি হয় সেসরকার কারো কামনাবাসনা নয়। তাছাড়া, রাজনীতিবিদদের রাজনীতি সন্ত্রাসক, মস্তান ও অপরাধীদের স্বর্গরাজ্যের জন্যে নয়, জনগণের শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্যে। তাই, তাদের রাজনীতির গতিধারা হতে হবে এধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করেই। সন্ত্রাসক ও মস্তানদের সন্ত্রাস ও মস্তানি জমিদারদের অবিচারঅত্যাচার ও জোরজুলুম হতেও ভয়াবহ। জমিদারির ক্ষেত্রে জনসাধারণ প্রজা হিসেবে তা সহ্য করতো, কেননা জমিদারদের সরাসরি সম্পর্ক ছিলো সম্রাটদের বা রাজাবাদশাহ্দের সাথে। বর্তমানে জমিদার, প্রজা ও সম্রাট বা রাজাবাদশাহ্ নেই। তবে, স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার মধ্যে বিদ্যমান আছে সেটার বিকল্প ব্যবস্থা বা প্রতিকল্প। জনসাধারণের শান্তির নিরাপত্তার দায়িত্ব

www.pathagar.com

সরকারের। এশান্তির জন্যে সরকার সমাজকে সন্ত্রাসক ও মস্তানমুক্ত রাখতে হয়। সরকারের প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে ভালোভাবেই জানে। তবু, তারা বুক ফুলিয়ে বা উঁচু করে চলে এবং সন্ত্রাস ও মস্তানি চালিয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে যারা কিছু বলে বা যারা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা আপত্তিজ্ঞাপন করে তাদের জীবনরক্ষাটাও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই, এটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, সন্ত্রাসক ও মস্তানরা হচ্ছে দুর্ধর্ষ জমিদার, সরকার বলতে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা হচ্ছে সম্রাট বা রাজাবাদশাহ্ এবং জনসাধারণ হচ্ছে প্রজা। সন্ত্রাসক ও মস্তানরূপ জমিদারেরা যা করবে জনসাধারণ প্রজা হিসেবে সরকাররূপ সম্রাটদের বা রাজাবাদশাহ্দের স্বার্থে তা নিঃশব্দে ও নীরবে মেনে নেবে এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সরকাররূপ সম্রাটদের বা রাজাবাদশাহ্দের নির্দেশের পরিপন্থী কোন কাজ করতে পারবে না। সন্ত্রাস ও মস্তানি সবক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত। ক্ষেত্রানুযায়ী আছে রাজনৈতিক সন্ত্রাসক ও মস্তান, লেখক সন্ত্রাসক ও মস্তান, কলমধারী সন্ত্রাসক ও মস্তান, গলাবাজ সন্ত্রাসক ও মস্তান, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসক ও মস্তান ইত্যাদি। রাজনীতিবিদেরা নিজেদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিয়ে রাজনীতি করে, লেখকরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী লিখে, যারা কলমপরিচালনায় আছে তারা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী কলম চালায়, বক্তারা নিজেদের মর্জি বা খেয়ালখুশিমতো বক্তৃতা করে, যেবক্তৃতাকে গলাবাজি, অর্থাৎ অসার ও নিষ্ফল বক্তৃতা, বলা হয়, এবং সন্ত্রাসসৃষ্টিকারীরা সন্ত্রাসের মাধ্যমে ফায়দা তোলে। এসব সন্ত্রাসের ও মস্তানির শিকার হচ্ছে জনসাধারণ। সন্ত্রাস, মস্তানি, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, গোপন হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি কিছু লোক করে। অথচ, এদের এসব অপরাধের কারণে পুরো দেশের লোক হতাশ হয়ে পড়ে। এদের সঠিক বিচার হলে এবং যে যেধরনের শাস্তি পায়ার তাকে সেশাস্তি দিয়ে দিলে সব লোক এসব অপরাধের কুফল হতে রক্ষা পেতে পারে। বাস্তবে বিভিন্ন কারণে সাজা থেকে অব্যাহতি পায় বিধায় এদের এসব অপরাধের মাত্রা দিনেদিনে বেড়েই চলে। দলমতনির্বিশেষে সব রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক নেতা আন্তরিকতার সাথে স্বস্ব লক্ষ্যাভিমুখিতা ভুলে গিয়ে জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে সন্ত্রাসের ও মস্তানির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। তবে, এটার জন্যে আল্লাহ্র বিধানের বিকল্প নেই।

সন্ত্রাস ও মস্তানি শব্দ দু'টি শুনার সাথেসাথে বোমাবাজি, ছিনতাই, ডাকাতি, প্রকাশ্য ও গুপ্ত হত্যা, রাহাজানি, অপহরণ, জোরপূর্বক চাঁদাআদায়করণ, রাস্তাঘাটে মহিলাদেরকে উত্ত্যক্তকরণ ইত্যাদি অপরাধের কথা স্মরণ হয় এবং আঁতকে ওঠতে হয়। তাই, সন্ত্রাসক ও মস্তান বলতে এসব ও আরোঅনেক অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত

www.pathagar.com

ব্যক্তিদেরকে বুঝায়। এরা বয়সে তরুণ এবং এদের নেতারা বয়সে প্রবীণ। সব নেতাই যে প্রবীণ তা নয়। তরুণ নেতাও আছে। এসব সন্ত্রাসক ও মস্তানকে গুণ্ডাপাণ্ডাও বলা হয়। এদেরকে দুর্বৃত্ত, বদমাশ, জবরদস্তিকারী ইত্যাদিও বলা হয়। সন্ত্রাসক ও মস্তানরা অন্যান্য অপরাধীর চেয়ে ভয়ংকর ও ভয়ানক। চোর চুরি করে, ডাকাত ডাকাতি করে ও পকেটমার পকেট মারে, অর্থাৎ অন্যান্য অপরাধীর মধ্যে একেকধরনের অপরাধী একেকধরনের অপরাধ সংঘটন করে। কিন্তু, সন্ত্রাসক ও মস্তানরা যখন যেঅপরাধ সংঘটন করার প্রয়োজন অনুভব করে তখন তা সংঘটন করে থাকে। তারা একঅপরাধ থেকে রেহাই পায়ার জন্যে অন্যঅপরাধ সংঘটন করে। অন্যান্য অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা করে বাদীকে জানমালের ঝুঁকি নিতে হয় না এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনে তার কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু, সন্ত্রাসক ও মস্তানদের বিরুদ্ধে মামলা করে বাদীকে জানমালের ঝুকি নিতে হয় এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রদান করাটা তার পক্ষে দুরূহ হয়, কেননা সাক্ষীরা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে হাতে ধরে বিপদ ডাকতে চায় না। এমনো দৃষ্টান্ত আছে যে সাক্ষ্য দেয়ার কারণে সাক্ষীকে হাতুড়ি ও লোহার রড দিয়ে জোড়ায়জোড়ায় পিটে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, পুনরায় সাক্ষ্য দিলে তার জীবননাশ করে ফেলবে। অন্যান্য অপরাধী বাদীকে ভয় করে এবং তার সাথে নিষ্পত্তি করতে চেষ্টা করে। কিন্তু, বাদী সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে ভয় করতে হয় এবং তারা বাদীকে মামলা ওঠিয়ে নিতে সর্বাত্মকবাবে বলপ্রয়োগ করে। বাদী মামলা ওঠিয়ে না নিলে তারা বাদীর ও তার লোকজনের নানা পন্থায় ক্ষতি করে। অন্যান্য আসামী সর্বদা পলাতক থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু, সন্ত্রাসক ও মস্তানরা বাদীর আশেপাশে ঘুরঘুর বা ঘোরাঘুরি করে এবং মুক্তভাবে বুক ফুলিয়ে চলে। তবে, যখন গা ঢাকা দেয়ার প্রয়োজন হয় তখন তা করে থাকে। অন্যান্য অপরাধী বাদীর প্রতি অন্যকোন অপরাধ করতে সাহসী হয় না। কিন্তু, সন্ত্রাসক ও মস্তানরা বাদীর প্রতি একের পর এক অপরাধ করতে থাকে। অন্যান্য অপরাধীর ক্ষেত্রে কোন মামলায় তাদের কেউ ধৃত হলে বাকি অপরাধীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয় এবং দূরেদূরে চলে। কিন্তু, কোন মামলায় সন্ত্রাসক ও মস্তানদের কেউকেউ ধৃত হলে অন্যান্য সন্ত্রাসক ও মস্তান গর্জে ওঠে এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা জোরদার করে তাদের শক্তিসামর্থ্য ও নির্ভীকতা জাহির করে। তাছাড়া, অন্যান্য অপরাধীও সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে ভয় ও সমীহ করে চলতে হয়।

প্রত্যেক এলাকায় কমবেশি সন্ত্রাসক ও মস্তান আছে। ধনবান ব্যক্তি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী ও নিরীহ লোক কাকেও সন্ত্রাসক ও মস্তানরা সুযোগ পেলে

www.pathagar.com

ছেড়ে দেয় না। সন্ত্রাসক ও মস্তানদের পেশা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ ও মস্তানি। এপেশায়-পুঁজিপাটার প্রয়োজন নেই। এটার জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে বিভিন্নধরেনের অস্ত্রের ও যাদের সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন তাদের সাথে তা রক্ষা করা। তারা মানুষের জানমাল ও সুষ্ঠু দেহের প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকি। মানুষকে মেরে ফেলা বা তাদের দেহের ক্ষতি করা তাদের নিকট মশামাছিতুল্য। তাদের অধিকাংশ অপরাধই প্রত্যক্ষ। তারা তাদের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী যেখানে যেঅপরাধ সংঘটন করার তা করে ফেলে এবং কেটে পড়ে। তাদের নিকট অস্ত্র, বোমা ও পটকা থাকার কারণে কেউই তাদেরকে, তাদের মুখোমুখি হয়ে বা তাদেরকে ধাওয়া করে, ধরতে সাহসী হয় না। তাদের জীবনের ভয় নেই। তারা তাদেরকে মৃত ধরে নিয়েই অপরাধ সংঘটন করে। তাদের কথা হচ্ছে যে, তারা যতোদিন বাঁচবে সন্ত্রাসবাদী ও অন্যান্যের ভীতি হিসেবেই বাঁচবে, কেননা এটাই তাদের জীবন। তারা অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে যেঅর্থ সংগ্রহ করে তা অসামাজিক কার্যকলাপে, যেমন নিশা করা, জুয়া খেলা, খারাপ মেয়েলোকদের সাথে মেশা ইত্যাদি, লিপ্ত থেকে খরচ করে এবং বুক ফুলিয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্যে যেখানেযেখানে খরচ করার প্রয়োজন যেখানেসেখানে খরচ করে। তাদের মাতাপিতা, ভাইবোন ও আত্নীয়স্বজনো তাদের কোন ব্যাপারে বাধা দিতে বা প্রতিবাদ করতে সাহসী হয় না। তবে, কোনকোন পিতা তাদের ছেলেদের সন্ত্রাসবাদে ও মস্তানিতে গর্ববোধ করে, কেননা লোকজন তাদেরকে দেখলে সালাম দেয় ও ইজ্জত করে। তারা বুঝে না যে, এসালাম ও ইজ্জত মনের থেকে নয়, ভয়ের কারণে। সামাজিক বিচারাচারে এসব পিতাকেও রাখতে হয়। এটা একটি মারাত্মক সামাজিক অবক্ষয়। ধনবান ব্যক্তি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী ও নিরীহ লোকজন সন্ত্রাসক ও মস্তানদের মতো নিজেদেরকে মৃত ধরে নিয়ে তাদের মুখোমুখি হতে পারছে না। তারা তাদের বিবেকবুদ্ধি ও মনুষ্যত্বের কারণে অপ্রাকৃতিকভাবে মরতে পারে না। তাই, তারা সন্ত্রাসক ও মস্তানদের কাছে জিম্মি হয়ে তাদেরকে নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর দিয়ে তাদের সব অসামাজিক কার্যকলাপ ও অপরাধ সহ্য করে অশান্তিতে বসবাস করে। অথচ, অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তার মাধ্যমে জনগণকে শান্তিতে বসবাস করতে দেয়াই সরকারের অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু, বর্তমানে সমাজে সন্ত্রাসক ও মস্তানরাই অশান্তির অন্যতম কারণ। সন্ত্রাসক ও মস্তানদের উৎপীড়ন ও দৌরাত্ম্যে ঠিকাদাররা রাস্তাঘাট ও লোকজন বাড়িঘর নির্মাণের কাজে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এজাতীয় কাজে সন্ত্রাসক ও মস্তানরা মোটাঅংকের চাঁদা দাবি করে। তারা এতো শক্তিধর বা বিপুল ক্ষমতার অধিকারী যে, চাঁদা না দিলে কাজ বন্ধ করে দেয়। সরকারেরো এমনকোন এখতিয়ার নেই যে বিনা কারণে এবং কারণ থাকলেও আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণ না করে হঠাৎ কারো কাজ বন্ধ করে দিতে পারে। এতে মনে

www.pathagar.com

হয় যে, সন্ত্রাসক ও মস্তানরা জনগণের সরকারের ওপর আরেকটি সরকার। তাদের মুখোমুখি হলে তারা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটাতেও দ্বিধাবোধ করে না বা দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। তবে, কোন ঠিকাদার বা বাড়ির মালিক বিভিন্ন কারণে চায় না যে, কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটুক। তাদের এঅপরাধের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিয়েও রক্ষা পায়াটা অত্যন্ত কষ্টকর হয়। থানা বা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা তাদেরকে ধরতে পারে না। তারা হঠাৎ কাজের স্থানে এসে ঝামেলা সৃষ্টি করে ও বারবার কাজ বন্ধ করে দেয়। আনইনপ্রয়োগকারী সংস্থা সর্বসময় কাজের স্থানে পুলিশ মোতায়েন বা পাহারারত রাখতে পারে না। পুলিশের আভাস পেলেই তারা কেটে পড়ে। কোন বাড়ির মালিক বা কোন ঠিকাদার বারবার আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার আশ্রয়প্রার্থী বা শরণাপন্ন হলে তাদের যে বিরক্তির উদ্রেক ও সঞ্চার হয় না তা নয়। একদিকে সন্ত্রাসক ও মস্তানদের উপদ্রব ও উৎপাত, অপরদিকে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার বিরক্তি বা বিরক্ত হয়ার ভাব। বাড়ির মালিক ও ঠিকাদাররা আনুকূল্যহীন ও নিরুপায়। মস্তানরাও ভাবে যে, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার নিকট কতো ছোটবে এবং এসংস্থা বিরক্ত হলে শেষপর্যন্ত বাড়ির মালিক বা ঠিকাদার তাদেরকে চাঁদার নামে টাকা দিতে বাধ্য হবে, নতুবা কাজ বন্ধ করে রাখতে হবে। একদিকে সন্ত্রাসক ও মস্তানদের দৌরাত্ম্য ও অপরদিকে শেষপর্যন্ত আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার বিরক্তি বাড়ির মালিক ও ঠিকাদারদের জন্যে হয় উভয় সংকট। এতে সন্ত্রাসক ও মস্তানরা মনে করে যে, সরকারো তাদের কাছে হার মানতে বাধ্য এবং তারা তাদের ছলাকলা ও হাবভাব দ্বারা বুঝায় যে, তাদেরকে ছাড়া সরকারো অচল, অর্থাৎ সরকার নিজেদের স্বার্থে তাদেরকে প্রতিপালন ও লালন করছে এবং যে যা-ই করুন-না-কেন সরকার তাদেরকে কোনপ্রকার বাধা বা শাস্তি দেবে না।

একএলাকার সন্ত্রাসক ও মস্তানদের সাথে অপরএলাকার সন্ত্রাসক ও মস্তানদের যোগসূত্র থাকে। যেএলাকার সন্ত্রাসক ও মস্তান সেএলাকায় পরিচিত বিধায় তারা তাদের এলাকায় হত্যার মতো কোন জঘন্যতম অপরাধ সংঘটন করতে চেলে তাদের পরিচিত অন্যএলাকার সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে দিয়েই তা করায়। এতে তারা অতিসহজে আইনের আওতায় আসে না, কেননা কেউ দেখে না যে, তারা এঅপরাধ সংঘটন করে। অন্যদিকে যারা এঅপরাধ করতে দেখে তারা অপরাধীদেরকে চিনে না। সন্ত্রাসক ও মস্তানরা এভাবে কৌশলের মাধ্যমে জঘন্যতম অপরাধ সংঘটন করে থাকে। তবে, এসব অপরাধীও যে সন্ত্রাসক ও মস্তান তা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা জানে। তাছাড়া, যেহেতু একএলাকার সাধারণলোক অপরএলাকার সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে চিনে না সেহেতু, তাদের অপরিচিতির কারণে এবং তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রমগ্রহণ না করা গেলে করে না।

www.pathagar.com

একএলাকায় বসবাস করেও সেএলাকায় বসবাসকারী সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে সব লোক চিনে না এবং যারা তাদেরকে চিনে তারা তাদের সবাইকে না–ও চিনতে পারে। যারা হঠাৎ যেসব সন্ত্রাসক ও মস্তানের দ্বারা আক্রান্ত হয় তারা তাদেরকে চিনতে পারে না এবং তাদের নামঠিকানাও জানে না। কোনকোন সময় তারা মুখোশ পরে অপরাধ সংঘটন করে থাকে। অপরাধ সংঘটনের সব কলাকৌশলে তারা সূক্ষ্ম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এসব কারণে জনসাধারণ তাদেরকে না চিনারই কথা। আইনপ্রয়োগকরী সংস্থা যে তাদেরকে চিনে সেটার বাস্তব প্রমাণ আছে। একএলাকায় সন্ত্রাসক ও মস্তানরা কোন মহিলার স্বর্ণালংকার ছিনতাই করলে এবং সেমহিলা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির স্ত্রী বা আপনজন হলে যে এলাকায়ই তার স্বর্ণালংকার গিয়ে থাকে–না– কেন তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এব্যাপারে বহু যুক্তি দেখাতে পারবে। যুক্তি, তা বাস্তবমুখী হয় বা না হয়, কমবেশি সবাই দেখাতে পারে। তবে, এটা, যুক্তির কথা নয়, অত্যন্ত খোলামেলা ও বাস্তব কথা যে, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা সব সন্ত্রাসক ও মস্তানকে চিনে ও জানে। অথচ, আইনের ফাঁকে ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন কাজে ব্যস্ততার কারণে তারা মুক্ত থাকে এবং প্রয়োজনে গা ঢাকা দেয়। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা যে সন্ত্রাসক ও মস্তানদের ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ তা নয়। তারা সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে ধরে এবং আদালতেও সোপর্দ করে। তারা আদালত থেকে আইনের ফাঁকে ও অন্যসব কারণে জামিনে মুক্তি পেয়ে যায় এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে তাদের খুবকমসংখ্যকেরই সাজা হয়। সন্ত্রাসক ও মস্তানদের নিকট বিভিন্নধরনের অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও কৌশলগত অস্ত্র থাকে। তারা নিজেরাই হাতবোমা ও পটকা তৈরি করে। এসব তৈরি করার সময় মাঝেমধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে তাদের কেউকেউ গুরুতরভাবে আহত হয় এবং কেউকেউ মৃত্যুলোকে বা যমপুরীতে গমন করে, অর্থাৎ মারা যায়। এলাকার লোকজন এটা জেনেও নিশ্চুপ বা চুপটি মেরে থাকে। তারা এটাকে কে বা কারা গোপনে তাদেরকে লক্ষ্য করে হাতবোমা মারার কথার বলে চালিয়ে দেয়। তাছাড়া, তারা সন্ত্রাস করার সময় আহত হলেও অন্যভাবে আহত হয়ার কথা বলে চালিয়ে দেয়। এলাকাবাসীরা তাদেরকে ভয় করে এবং মানইজ্জত বজিয়ে রেখে জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে তাদের সব অত্যাচার, নির্যাতন, নিগ্রহ ও অপরাধ নীরবেনিভৃতে সহ্য করে। যারা প্রতিবাদ করে তারা একভাবে–না–একভাবে তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ার সম্ভাবনা থাকে বা এ মানসিক অশান্তিতে থাকে যে, তারা হঠাৎ যেকোন সময় তাদের যেকোন ক্ষতি করতে পারে। এঅবস্থা আদিম যুগের মানুষের অসহায়ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সন্ত্রাসক ও মস্তানদের নেতারা যথেষ্ট অবৈধ সম্পদের অধিকারী থাকে এবং সবদিকে কি করে হাত রাখতে হয় সেসব কলাকৌশল তাদের ভালো জানা থাকে।

www.pathagar.com

এসব নেতাকে মানুষ মনের থেকে ভালো না জানলেও দেখা হলে সালাম দিয়ে থাকে। তারা ভাবে যে, তারাই সমাজের, পাড়ার বা মহল্লার কর্ণধার এবং তাদেরকে হিসেবে না রেখে কারো চলা ভার বা দুষ্কর। তারা রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত থাকে এবং বড়বড় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সংযোগসম্পর্ক বজিয়ে রাখে। যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হয় তখন তারা সেদলের সাথে যেকোনভাবে হাত মিলিয়ে নেয় বা নিতে চেষ্টা করে। এককথায়, তারা অপরাধ সংঘটন করে তা হতে নিষ্কৃতি পায়ার জন্যে সবকিছু করতে পারে। সন্ত্রাসক ও মস্তানরা তাদের নেতাদের নির্দেশেই অপরাধ সংঘটন করে থাকে। নেতারা সরাসরি অপরাধ করে না। তাই, তারা অপরাধের হোতা হয়েও ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে এবং আইনের চোখে ধুলো দিয়ে বহাল তবিয়তে জীবনযাপন করে। তাদের নির্দেশে অপরাধ সংঘটিত হয় বলেও কোন লাভ হয় না, কেননা তারা অপরাধ সংঘটনে থাকে না। এটা সবাই জানে যে, অপরাধ সংঘটন করা ও অপরাধ সংঘটন করানো একই কথা। তবুও কেন যে নেতারা আইন এড়িয়ে চলতে পারে তা বুঝা মুস্কিল। নেতারা অপরাধ সংঘটন করানোর কারণে শাস্তি পেলে সন্ত্রাস ও মস্তানি এমনিতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়ার কথা। কিন্তু, নেতারা মুক্ত থেকে সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে বিপদাপদ হতে উদ্ধারের নিশ্চয়তা হিসেবে কাজ করে। ফলে, তারা যেকোন অপরাধ সংঘটন করতে ইতস্তত করে না। তারা সহজে বিপদে পড়ে না এবং পড়লেও নেতাদের চেষ্টাতদবিরের ফলে উদ্ধার পেয়ে যায়। এটাকে তারা পরাক্রমের ও বাহাদুরির ব্যাপার মনে করে এবং অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তাদের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক তেমন গভীর ও নিবিড় থাকে না। তারা সাধারণত ভাসমান থাকে। তারা একখানে একটা অপরাধ সংঘটন করে অন্যখানে চলে যেতে পারে এবং কোন অপরাধের কারণে তারা ধরা পড়লে বা তাদের কারো কোন শাস্তি হলে তারা বা সে কিছুদিন আগে বা পরে ছাড়া পেয়ে যায়। যেসব লোকের কারণে তারা ধরা পড়ে বা শাস্তি পায় তারা তাদের টার্গেট হয়ে যায়। এলাকার লোকজন ভাসমান নয়। পরিবারপরিজনের সাথে তাদের সম্পর্ক বিদ্যমান। তারা বিভিন্ন কাজে ও পেশায় নিয়োজিত। তারা তাদের পরিবার ও কাজ বা পেশা বাদ দিয়ে ভাসমান হতে পারে না এবং একস্থান ত্যাগ করে অন্যস্থানে আশ্রয় নিতে পারে না। সন্ত্রাসক ও মস্তানরা সর্বসময় সন্ত্রাস ও মস্ত্রানীর চিন্তায় বিভোর ও মগ্ন থাকে। কিন্তু, এলাকাবাসীরা সর্বসময় মস্তানদেরকে প্রতিহত করার চিন্তায় ব্যস্ত থাকতে পারে না। ফলে, সন্ত্রাসক ও মস্তানদের সন্ত্রাস ও অপরাধের বিরুদ্ধে সাধারণ লোক মামলা করতে রাজি বা সম্মত হয় না এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষী পায়াটা দুষ্কর হয়, কেননা যে সাক্ষ্য দেবে সে জানে যে, তারা একদিন আগে বা একদিন পরে খালাস পেয়ে আসবে এবং তাকে টার্গেট করে নেবে। তাছাড়া, তারা সাক্ষীদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয়ার জন্যে

www.pathagar.com

বারণ করে এবং যে সাহস করে সাক্ষ্য দেয় তারা তাকে সুযোগমতো পেলে দিবালোকে জনসমক্ষে গুরুতরভাবে মারধর করে। তাই, সাধারণত সন্ত্রাসক ও মস্তানদের সন্ত্রাস ও মস্তানি চলতেই থাকে এবং তাদের খুবকমসংখ্যকেরই সাজা বা শাস্তি হয়।

কেউকেউ কোথাওকোথাও কোনকোন সন্ত্রাসক ও মস্তানের বিরুদ্ধে মামলা করেও তেমনকোন প্রতিকার পায় না। সন্ত্রাসক ও মস্তান–আসামীরা নানা কারণে ধৃত হয় না। শুনা যায় যে, থানা তাদের সবাইকে খোঁজ করে পায় না। তারা মামলা ওঠিয়ে নেয়ার জন্যে নানা উপায়ে বাদীর ওপর চাপপ্রয়োগ করে এবং তাকে হুমকিও দেয়। এটাও শুনা যায় যে, বাদীকে তাদের হাত হতে বাঁচার জন্যে মামলা ওঠিয়ে নিতে এবং সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিয়ে তাদের টার্গেটে পরিণত না হয়ার জন্যে থানাও বলে থাকে। তাই, যারা মস্তানির শিকার হয় তারা ভাবে যে, মামলা করে একবিপদ হতে অন্যবিপদে না পড়াই শ্রেয়। সন্ত্রাসক ও মস্তানরা ভাড়াও খাটে। যেকোন খারাপ কাজে তাদেরকে ভাড়ায় পায়া যায়। যেসব সন্ত্রাসক ও মস্তানকে ভাড়ায় পায়া যায় তারা ভাড়াটে সন্ত্রাসক ও মস্তান নামে অভিহিত। একজনের সাথে অপরজনের শত্রুতা থাকলে ভাড়াটে সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে দিয়ে সেশত্রুতা উদ্ধার করানো যায়। সন্ত্রাসক ও মস্তানরা টাকার জন্যে উন্মাদ বা পাগল। টাকা দিয়ে তাদের দ্বারা খুন পর্যন্ত করানো যায়।

জাতীয় রাজনীতি, ছাত্ররাজনীতি, ব্যক্তিগত কোন্দল ইত্যাদিতে সন্ত্রাসক ও মস্তানরা ব্যবহৃত হচ্ছে। মনে হচ্ছে সন্ত্রাসক ও মস্তানরাই সবকিছুর গতিশক্তি। অথচ, আমরা আধুনিক সভ্যসামাজে বসবাস করছি। এসভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে শৃঙখলার মাধ্যমে শান্তি। সন্ত্রাসক ও মস্তানরা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বিভিন্নধরনের অপরাধ সংঘটন করে এশান্তি ব্যাহত করছে। তাই, তারা জাতীয় শত্রু। তারা ফাসাদ বা বিশৃঙখলা সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তিবিনষ্টকারী। যাকে কুকুরে দংশন করেনি সে এদংশনের বিষের যন্ত্রণা বুঝতে পারে না। অনুরূপভাবে, যে বা যারা সন্ত্রাস ও মস্তানির শিকার হয়নি সে বা তারা বুঝতে পারছে না যে, সন্ত্রাসক ও মস্তানরা কিভাবে ক্ষতি করে ও শান্তিবিনষ্ট করে। যারা কুকুর ও সাপ ধরে তাদেরকে দেখলে কুকুর ও সাপ পলায়ন করে। তবে, সাধারণত সাপুড়ে সাপের কামড়েই মারা যায়। ক্ষমতায় বা পজিশনে থাকতে অসুবিধা বুঝা যায় না। তা চলে গেলেই বুঝা যায় যে, অসুবিধা অনেকরকমের। যৌবনে বুঝা যায় না যে, ব্যাধি কি। বৃদ্ধাবস্থায় এটার আক্রমণের প্রচণ্ডতা উপলব্ধি করা যায়। সন্ত্রাসক ও মস্তানরা বড়বড় কর্মকর্তা ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা জানতে পারলে তাদের সাথে সন্ত্রাস ও মস্তানি করে না। কিন্তু, যারা এখন আর কর্মকর্তা নয় তারাও সন্ত্রাসের ও মস্তানির শিকার হচ্ছে। কর্মকর্তাদের আপনজন ও আত্মীয়স্বজনো সন্ত্রাসের ও

www.pathagar.com

মস্তানির থাবাতে পড়ে। তবে, তারা তাদের আত্মীয়-কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে তা হতে রক্ষা পায়ার ব্যবস্থাগ্রহণ করে। সবার আপনজন বা আত্মীয়স্বজন বড়বড় কর্মকর্তা নয়। যাদের আপনজন বা আত্মীয়স্বজন বড়বড় কর্মকর্তা নয় তাদেরকে নানাভাবে সন্ত্রাস ও মস্তানি সহ্য করতে হয় এবং তারা শেষপর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট বিচার চায়। যারা সন্ত্রাসক ও মস্তানদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে পারে তারা সন্ত্রাস ও মস্তানি হতে রেহাই পেতে পারে। সন্ত্রাসক ও মস্তানদের সাথে সম্পর্ক রাখা মানেই তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধকে মেনে নেয়া ও তাদেরকে অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করা। জনসাধারণ সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে প্রতিহত করার উদ্যোগগ্রহণ করাটা অত্যন্ত দুরূহ। জনসাধারণের মধ্য হতে যারা মাঝেমধ্যে সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে নিরোধ করার জন্যে উদ্যমী হয়ে উদ্যোগগ্রহণ করে তারা নানাভাবে বিপদাপন্ন ও নিরুৎসাহিত হয়। শুনা যায় যে, সন্ত্রাসক ও মস্তানরা কারোকারো ভালো উপার্জনের উপায় বা উৎস। তাই, তাদের ভালোভালো পরামর্শদাতা থাকে। এসব পরামর্শদাতার পরামর্শে তারা যারা তাদের বিরুদ্ধে উদ্যোগগ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে তাদের মাতাপিতার বা তাদেরকে যারা সহযোগিতাপ্রদান করে তাদের দ্বারা মিথ্যা কেস দায়ের করায় এবং বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে তাদেরকে অপদস্থ ও নাজেহাল বা হয়রান করে, কেননা তারা সন্ত্রাস ও মস্তানির মাধ্যমে তাদের আয়ের একটা অংশ তাদের নিরাপত্তার জন্যে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করে। তাছাড়া, তারা তাদের এআয় সম্পূর্ণভাবে তাদের নিরাপত্তা ও সুবিধার জন্যে ব্যয় করতে পারে, কেননা তাদের এআয় স্বয়ংক্রিয় আয়। অপরদিকে, জনসাধারণের মধ্যে যারা সন্ত্রাস ও মস্তানি প্রতিরোধ করার জন্যে এগিয়ে আসে তারা এভাবে ব্যয় করতে পারে না। ফলে, তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সন্ত্রাস ও মাস্তানি নিবারণ ও রোধ করতে ব্যর্থ হয় এবং তা নিবারণ ও রোধের ব্যাপারে তাদের উদ্যম ও স্পৃহা হারিয়ে ফেলে। কোনকোন সময় এসব উদ্যোক্তাকে উল্টাভাবে সন্ত্রাসক ও মস্তান হিসেবে আখ্যাত করে জব্দ করা হয় এবং সন্ত্রাসক ও মস্তানদের বিরুদ্ধে তাদের অগ্রসর হয়ার উদ্যোগ নস্যাৎ হয়ে যায়। জানা গেছে যে, যেসব সন্ত্রাসক ও মস্তান ধরা পড়ে তাদের স্টেটম্যানট-এ যারা সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে নিবৃত্ত বা প্রতিহত করার জন্যে উদ্যোগী হয় তাদের নাম বড়বড় সন্ত্রাসক ও মস্তান হিসেবে বা তাদেরকে ব্যবহারকারী হিসেবে বলানো হয় এবং তাদের অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়। এসব অসুবিধা হতে রেহাই পায়ার জন্যে তাদেরকে কোথাওকোথাও ধর্না দিতে হয় এবং তাদের কষ্টার্জিত টাকাপয়সাও খরচ করতে হয়। সমাজের যুবকেরাও সংগবদ্ধভাবে সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে প্রতিহত করতে সাহসী হয় না, কেননা তাদেরকে প্রতিহত করতে গিয়ে তারা, সমাজের যুবকেরা, আসামী হয়ে যায় ও ধৃত হয় এবং নানাভাবে নাজেহাল ও হয়রানির সম্মুখীন হয়।

www.pathagar.com

সন্ত্রাসক ও মস্তানদের মধ্যেও সন্ত্রাস ও মস্তানি চলে। সন্ত্রাসের ও মস্তানির মাধ্যমে আয়ের ভাগবণ্টন নিয়ে একসনত্রাসক বা মস্তান অপরসন্ত্রাসক বা মস্তানকে গুলি করে মেরেও ফেলে। তাদের মধ্যে গ্রুপ থাকে। কখনোকখনো একটি গ্রুপ ভেঙে দু'তিনটি গ্রুপের সৃষ্টি হয়। গ্রুপেগ্রুপে হানাহানি হয় এবং আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলে। নিরীহ জনসাধারণ এতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে এবং দোকানপাট ও ঘরদরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকতে হয়। তাদের গোলাগুলি ও বোমাবাজিতে এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে বা কম্পমান হয়। পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। কোনকোন সন্ত্রাসক ও মস্তান হতাহত হয় এবং কোনকোন সন্ত্রাসক ও মস্তান মারাও যায়। এক গ্রুপের সন্ত্রাসক ও মস্তান সুযোগ পেলে অপরগ্রুপের সন্ত্রাসক ও মস্তানকে মারাত্মকভাবে যখম করে এবং পারলে মেরেও ফেলে। এককথায়, গ্রুপেগ্রুপে চ্যালিন্জ–এ হানাহানি হয়। এসব কারণে তাদের মধ্যে মামলামকদ্দমা হচ্ছে। অনেক আসামী গ্রেপ্তার হচ্ছে এবং জামিনেও মুক্তি পাচ্ছে। তবে, এসব আসামীর শাস্তির দৃষ্টান্ত বিরল। সন্ত্রাসক ও মস্তানরা আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও বা অজ্ঞতার যুগকেও হার মানিয়েছে। সেযুগে গোত্রেগোত্রে বংশানুক্রমে প্রতিশোধ চলতো বা অন্যায়কারীর অনিষ্টসাধন করা হতো এবং নিরপরাধ কোন গোত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতো না ও শত্রু আত্মসমর্পণ করলে বা আশ্রয়ে আসলে তার কোন ক্ষতি করা হতো না। আমাদের এযুগ জ্ঞানবিজ্ঞানের ও সভ্যতার যুগ। অথচ, এযুগে সন্ত্রাসকে সন্ত্রাসকে বা মস্তানে মস্তানে গোলাগুলি ও বোমাবাজিতে নিরীহ ও নিরপরাধ লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং একসন্ত্রাসক বা মস্তান অপরসন্ত্রাসক বা মস্তানের নিকট আত্মসমর্পণ করে বা তার আশ্রয়ে এসেও রক্ষা পায় না। যেসন্ত্রাসক বা মস্তান যতোবেশি মারাত্মক অপরাধ করতে পারে সে ততোবড় বাহাদুর ও অসাধ্যসাধনকারী। সন্ত্রাসক ও মস্তানরা তাদের সন্ত্রাস ও মস্তানিকে পৌরুষের ও বাহাদুরির কাজ মনে করে। তাদের বাহাদুরি সাধারণ লোকের উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা। এপ্রসঙ্গে ছেলেদের কূপে ঢিল মারার গল্প মনে পড়ছে। যেকূপে ছেলেরা ঢিল মারছিলো সেকূপে অনেক বেঙ বাস করতো। বেঙেরা ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করলো যে, তারা ঢিল মারছে কেন। ছেলেরা উত্তর করলো যে, তারা খেলছে। বেঙেরা বললো যে, এখেলা তাদের মৃত্যু। অনুরূপভাবে, সন্ত্রাসক ও মস্তানদের বাহাদুরি সাধারণ লোকের ক্ষতি ও আতংক। মনে হচ্ছে যে, সন্ত্রাসক ও মস্তানদের নিকট নিরীহ জনসাধারণ বেঙের মতো বা বেঙের চেয়েও অধম। সন্ত্রাসক ও মস্তানদের এলাকাভিত্তিক তালিকা প্রত্যেক থানায় আছে। তাদেরকে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা জানে। তারপরো তারা, সামাজিক অশান্তির অন্যতম কারণ হয়েও, নায়কের মতো

www.pathagar.com

টিকে আছে এবং কতোদিন এভাবে টিকে থাকবে তা সরকারের আইনপ্রয়োগের পন্থার ওপরই নির্ভর করছে। শান্তিই মানুষের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানে এউদ্দেশ্যের পথে একটি বড় অন্তরায় ও বিঘ্ন হচ্ছে সন্ত্রাসক ও মস্তানরা। তারা স্বাধীন আর সমাজের লোকজন তাদের কাছে পরাধীনতার শৃঙখলে আবদ্ধ। এটা একটি করুণ ও নিদারুণ সামাজিক অবক্ষয় ও অধোগমন। এঅবক্ষয়ের কথা মনে পড়লে মন আঁতকে ওঠে ও শরীরে শিহরণ জাগে। এ যেন এক দুরূহ যন্ত্রণা যেটার কোন ওষুধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি এবং কখনো হবে না। অগত্যা কেউ কোনকোন সন্ত্রাসক ও মস্তানের বিরুদ্ধে মামলাদায়ের করলে তারা তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে বা ক্ষেপে গিয়ে তার আরো ক্ষতি করতে থাকে এবং সেও তাদের বিরুদ্ধে মামলার পর মামলা করতে হয়। এতে থানা অসন্তুষ্ট হয় এবং তাকে মামালাবাজ মনে করে। সে নিরাপত্তা চেয়ে এরকম কথাও শুনতে হয় যে, তাকে নিয়ে বসে থাকা থানার বা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কাজ নয়। এসব কারণেও মানুষ সন্ত্রাসক ও মস্তানদের উপদ্রব ও দৌরাত্ম্য মেনে নিয়ে মামলাদায়ের না করে ইজ্জত বাঁচাতে চায়। সন্ত্রাসক ও মস্তানদের উপদ্রব ও উৎপাত এতো তীব্রতর যে, তাতেও ইজ্জত বাঁচানোটা মুশকিলজনক ও বিপত্তিকর হয়।

বড়বড় সন্ত্রাসক ও মস্তানরা অবৈধভাবে বিপুল টাকার ও অগাধ সম্পদের মালিক হয়। এরা ব্যাংক পর্যন্ত ডাকাতি করায়। এদের ইতিহাস খোঁজ করলে দেখা যায় যে, এরা আন্তঃবাহিনী ডাকাত দলের সদস্য এবং ফেরারী আসামী। এরা কৃত্রিম ও জাল কাগজপত্র সৃষ্টি করে অর্পিত সম্পত্তি এবং অবাঙগালীদের খালি জায়গা ও বাড়ি দখল করে এবং ভুয়ো লোক দাঁড় করিয়ে ভুয়ো ও মেকি দলিল তৈরি করে। এরা সরকারের খাস ও বিভিন্ন সংস্থার খালি জায়গা দখল করে এবং এসব জায়গায় বাজার ও বস্তি বসায়। এরা এসব জায়গা বিক্রি করে এবং বাজারে দোকান থেকে সেলামি নিয়ে ও বস্তিবাসীদের থেকে ভাড়া আদায় করে কালো টাকার পাহাড় গড়ে ও যেখান দিয়ে যেহাত এগিয়ে আসে সেহাত মুঠো করিয়ে পেছনে সরিয়ে দেয়। এরা অবৈধভাবে যতো উপার্জন করে সেউপার্জন এভাবে সব খরচ হলেও এদের কোন লোকসান হয় না, লাভই হয়, কারণ এদের যে টিকে থাকার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আছে তা সবাই দেখে ও জানে। এটাও এদের একধরনের বড় পাওনা। যখন সাধারণলোক দেখে যে, এরা টিকে থাকে তখন তারা এদেরকে সমীহ না করে ও এদের কাছে জিম্মি না হয়ে উপায় থাকে না। অধিকাংশ সন্ত্রাসক ও মস্তান উক্ত বস্তিতে আশ্রয় নেয়। এগুলো হচ্ছে মদ ও জুয়ার আখড়া। এগুলোতে চলে নানাধরনের কুকর্ম, অপকর্ম, দেহব্যবসা ইত্যাদি। এগুলোতে লুক্কায়িত থাকে অনেক অবৈধ অস্ত্র। বস্তিবাসীরা থাকার স্থান পেয়ে সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে তাদের মাবাপ ও ত্রাণকর্তা মনে করে। এসব বস্তিবাসী অশিক্ষিত ও

www.pathagar.com

কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। সন্ত্রাসক ও মস্তানদের নেতারা বস্তিবাসীদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং এদেরেকে দিয়ে বিভিন্ন মারাত্মক অপরাধ সংঘটন করায়। তাছাড়া, নেতাদের জোরে এদের সর্বদা নির্ভীক ও বেপরোয়া ভাব থাকে এবং এদের চুরিচামারি ও অত্যাচারের কারণে বস্তির আশেপাশের বাসিন্দারা অশান্তিতে দিন কাটায়।

একটা ভুল ধারণা চলে আসছে যে, সরকারের সন্ত্রাসক ও মস্তানবাহিনীর প্রয়োজন। অথচ, এ ভুল ধারণা বারবার ভেঙে যাচ্ছে যে, সন্ত্রাসক ও মস্তানবাহিনী কোন দলকে ক্ষমতায় আনতে ও তাতে টিকিয়ে রাখতে পারে না। সন্ত্রাসক ও মস্তানবাহিনী ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে পারতোতো প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদের পতন ঘটতো না। বর্তমানে বি, এন, পি, –কে সন্ত্রাসক ও মস্তানবাহিনী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেনি। জনগণই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদের পতন ঘটিয়েছে এবং তারাই বি, এন, পি,–কে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। জনগণ শান্তিতে বসবাস করতে চায়। সন্ত্রাসক ও মস্তানরা হচ্ছে জনগণের শান্তির পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। যেজনগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে ও ক্ষমতা হতে অপসারণ করে সেজনগণের শান্তি সুনিশ্চিত করার জন্যে সাংবিধানিক ধারামতে সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে নির্মূল ও বিলুপ্ত করাটা সরকারের পবিত্রতম দায়িত্ব। সন্ত্রাসক ও মস্তানরা অবৈধ অস্ত্রধারী, বোমা ও পটকাবাজ, দাঙ্গাবাজ, দুষ্কৃতকারী, খুনী, হত্যাকারী, ছিনতাইকারী, ডাকাত, দস্যু, অপহরণকারী, চোর, লুণ্ঠনকারী, ধর্ষণকারী, মদ্যপ, জুয়াড়ী, অগ্নিসংযোগকারী, আঘাতকারী ইত্যাদি। এরা এদের মতে অবস্থাবিশেষে যখন যেঅপরাধ সংঘটন করা প্রয়োজন তখন তা সংঘটনকারী। তাছাড়া, এরা হচ্ছে অন্যের ও সরকারের বিভিন্নপ্রকার জায়গা জবরদখলকারী, জালদলিলসৃষ্টিকারী, ভুয়োলোকসৃষ্টিকারী, ভীতিপ্রদর্শনকারী, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চরিত্রহরণকারী ইত্যাদি। মামলায় প্রচলিত সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী এদেরকে শাস্তিপ্রদান করাটা খুব কঠিন ও জটিল, কেননা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এদের বিরুদ্ধে মামলা করে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করাটা খুব দুরূহ ব্যাপার। তাই বলে যে, এদের রামরাজত্ব বিরাজমান থাকবে আর জনগণ এদের কাছে জিম্মি হয়ে থাকবে তা হয় না। এটা চলতে থাকাটা সরকারের দুর্বলতা ও আইনের ফাঁক প্রমাণ করে। সরকার অটল ও সবল হলে এবং এদের বিচারের ব্যাপারে আইনে ফাঁক বন্ধ হলে জনগণ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে বলে সরকার যে জনকল্যাণমূলক, মস্তানকল্যাণমূলক নয়, সেটা প্রমাণসিদ্ধ ও প্রতিফলিত হবে।

সন্ত্রাসক ও মস্তানদের ব্যাপার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সামাজিক ব্যাপার। সুনির্দিষ্টভাবে না হলেও সন্ত্রাসক ও মস্তানদের বিরুদ্ধে থানাগুলোতে বিভিন্নধরনের মামলা রুজুকৃত আছে। সব সন্ত্রাসক ও মস্তানের তালিকা থানাগুলোতে আছে।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসক ও মস্তানরাই সন্ত্রাসক ও মস্তান নামে পরিচিত। কোন ভালো ব্যক্তি যে সন্ত্রাসক ও মস্তান নামে পরিচিত নয় এটা সবাই ভালোভাবে জানে। তাই, সন্ত্রাসক ও মস্তানদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকেই মামলা রুজু করতে হবে। এলাকা ভিত্তিক "সন্ত্রাসক ও মস্তান তদন্ত কমিটি" থাকতে হবে। একমিটি ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সজমাকর্মী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং আরো যাদেরকে প্রয়োজন মনে করা হয় তাদের সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে। একমিটি সরেজমিনে সন্ত্রাসক ও মস্তানদের বিভিন্ন অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করবে ও সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে অপরাধভিত্তিক ও অবস্থাগত সাক্ষ্যপ্রমাণ লিপিবদ্ধ করবে এবং থানাতে তাদের বিরুদ্ধে প্রাপ্তরেকর্ডাদি পর্যলোচনা করে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন লিখবে। এসব রেকর্ড ও প্রতিবেদন তাদের বিরুদ্ধে দলিলসংক্রান্ত সাক্ষ্য হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। যারা সন্ত্রাসক ও মস্তানদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে চাবে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অবধারণ ও যাচাইপূর্বক তা লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তারা সন্ত্রাসক ও মস্তানদের দোসর বা সহযোগী প্রমাণিত হলে তাদেরকেও অব্যাহতি বা খালাস দেয়া যাবে না। থানা একমিটির প্রতিবেদন সন্ত্রাসক ও মস্তানদের বিরুদ্ধে এজাহার হিসেবে গ্রহণ করবে। কমিটির সদ্যস্যরা ও তারা, যাদের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে, এমামলায় সাক্ষ্য দেবে এবং কমিটি যেসব প্রমাণ ও তথ্যের কথা উল্লেখ করবে সেগুলো দলিলসংক্রান্ত সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপিত হবে এবং কমিটির প্রতিবেদনও দলিলসংক্রান্ত সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করবে। সাক্ষ্য আইনে এগুলো সন্ত্রাসক ও মস্তানদের বিরুদ্ধে ধারা হতে হবে। কমিটির প্রতিবেদন তাদের বিরুদ্ধে এজাহার হিসেবে গৃহীত হলে তারা শাস্তি হতে উদ্ধার ও নিষ্কৃতি পায়ার সম্ভাবনা খুবকম থাকবে। যারা সবধরনের অপরাধের হোতা এবং যাদের নিকট সমাজের লোকেরা জিম্মি হয়ে থাকতে হয় ও যাদের বিরুদ্ধে মুখ খুললে তাদের শিকারে পরিণত হতে হয় এবং যারা সমাজে শান্তিশৃঙখলা নষ্ট করে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার বা দাবি থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না ও কেউই মনে করার কথা নয়। মানবরচিত বিভিন্ন আইনে হাজারো ফাঁক বের করা যায়। তারপরো বিচারকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কে কতোটুকু দোষী। অপরাধীর অপরাধের ব্যাপারে বিচারকের মন পুরোপুরি সায় বা সাড়া দিলে সে অপরাধীকে যেশাস্তি দেয় তা ব্যতিক্রম ব্যতীত, বলতে গেলে, ১০০ ভাগই সঠিক হয়। সন্ত্রাসক ও মস্তানদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের সুযোগ জনগণই পেতে হবে। সন্ত্রাসক ও মস্তানদের পক্ষে এসুযোগ গেলে তাদের নির্মূলন সম্ভব হবে না বিধায় সমাজে সন্ত্রাসক ও মস্তানদের অপরাধ চলতে থাকবে এবং সমাজের লোকজন অসহায়ভাবে তাদের নিকট জিম্মি হয়ে থাকবে। সন্ত্রাসক ও মস্তানরা সমাজে আগছার মতো। শস্যখেতে আগাছার জোর

www.pathagar.com

বেশি এবং আগাছা দেখতে সতেজও। একারণে আগাছার প্রতি মায়া দেখিয়ে তা উৎপাটন না করলে ফসল ভালো হয় না। অনুরূপভাবে, সরকারের জনকল্যাণমুখী কাজের সফলতার জন্যে সমাজে শান্তিপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে নিশ্চিহ্ন করাটা অত্যাবশ্যক।

ত

স্বেচ্ছাচারপূর্বক অত্যাচার, খেয়ালখুশিমাফিক কর্তৃত্ব, যদৃচ্ছ শাসনক্ষমতা, জনগণপীড়ক শাসকের শাসন, পরপীড়ন ও নিষ্ঠুরতা হচ্ছে স্বৈরাচার। যারা স্বৈরাচারে অধিষ্ঠিত থাকে তাদেরকে বলা হয় স্বৈরাচারী। স্বৈরাচারীদের শাসন হচ্ছে স্বৈরশাসন। স্বৈরশাসনে স্বৈরাচারীদের হাতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কুক্ষিগত থাকে এবং রাষ্ট্রের সব বিভাগ তাদের আদেশ কার্যকর করতে বাধ্য থাকে। তাদের অসীম ক্ষমতা এবং তাদের আদেশ ও কথাই হয় আইন। এতে সংবিধান হয় উপেক্ষিত এবং তাদের আদেশ ও কথা হয় সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ। স্বৈরাচারের স্বরূপ দু'টি। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচার এবং নির্বাচনের মাধ্যমে একদলীয় স্বৈরাচার। দু'টি স্বরূপেরই কর্মপন্থা এক। স্বৈরতন্ত্রে বা স্বৈরাচারে বিরোধী দলগুলোকে কোনঠাসা বা জড়সড় করে রাখা হয় এবং তাদের কথা ও মত জনগণের নিকট পৌঁছতে পারে না। প্রচারমাধ্যমগুলো স্বৈরাচারী দলের মত ও আদর্শ ফলাও বা অতিরঞ্জিত করতে বাধ্য থাকে। এগুলোকে এতো অপরিমিত ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে, এগুলো স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারে না। স্বৈরাচারে নির্বাচন এমনভাবে অনুষ্ঠিত হয় যে, স্বৈরাচারী দলের প্রতি বিপুল গণসমর্থন দেখানো হয়। স্বৈরাচারে আইনপরিষদের কোন মুখ্য ভূমিকা থাকে না এবং স্বৈরপ্রধান ও স্বৈরাচারী দলের খেয়ালকে আইনে পরিণত করাটাই এপরিষদের কাজ।

স্বৈরাচারের পতন বলতে যারা ক্ষমতায় থেকে স্বৈরতন্ত্র বা স্বৈরশাসন চালায় তাদের পতন বুঝায়। কেউ স্বৈরাচারের উত্থান চায় না। কথায় বলে " কয়লা ধুলে ময়লা যায় না"। স্বৈরাচারীরা স্বৈরতন্ত্রের বা স্বৈরশাসনের রসানুভূতি ও স্বাদ কখনো বিস্মৃত হতে বা ভুলতে পারে না। শরীরে কোন রোগের জীবাণু থাকলে সেরোগে এককসময়- না- একসময় আক্রমণ করেই। রোগাক্রান্ত না হয়ার জন্যে শরীরকে রোগের জীবাণু হতে মুক্ত রাখতে হয়। গণতন্ত্র বলতে আমরা যা চাই বা বুঝি তা পেতে হলে দেশকে স্বৈরাচারের জীবাণু হতে মুক্ত রাখতে হয়। শরীরে রোগের জীবাণু আছে জেনেও সেটার প্রতিকার না করলে যেকোনসময় রোগাক্রান্ত হয়াটা প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক। স্বৈরতন্ত্রের

www.pathagar.com

বা স্বৈরশাসনের পতনের পর স্বৈরাচারীদেরকে দমন ও শায়েস্তা না করলে তারা তাদের, দেশ ও জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী অর্জিত, অঢেল অর্থসম্পদ দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে পুনরায় স্বৈরশাসনে অধিষ্ঠিত হবার জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে পারে। রাষ্ট্রীয়ভাবে, দলগতভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে তাদের এপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা যায় না। তাদেরকে তাদের এপ্রচেষ্টার সুযোগ দেয়াটা হচ্ছে তাদের প্রতি সমর্থনের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্র বা স্বৈরশাসনকে সমর্থন দেয়া। মানুষ অতিসহজেই শয়তানের ফাঁদে পড়ে। শয়তানের কলাকৌশল আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ। শয়তানের চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আরকেউ নেই। অথচ, আমরা মানুষ প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তার ফাঁদে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হই। স্বৈরাচারীদের কলাকৌশল আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ, কেননা তাদের থাকে অঢেল অর্থসম্পদ। সার্বিকভাবে দেশ ও দেশের জনগণ তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোরআন ও হাদীস মানুষকে শয়তানের চক্রান্ত ও ফাঁদ হতে রক্ষা করতে পারে। সঠিকার্থে গণতন্ত্রই মানুষকে স্বৈরতন্ত্রের বা স্বৈরশাসনের কবল ও গ্রাস হতে মুক্তি দিতে পারে। শয়তানকে শাস্তি দেয়া আল্লাহ্‌র কাজ। স্বৈরাচারীরা মানুষ। তারা দেশে বাস করে। তাই, তাদেরকে শাস্তি দেয়াটা দেশের সরকারের কাজ। তাদেরকে শুধু কারাগারে নিক্ষিপ্ত করলে তাদের প্রতি শাস্তির কাজ শেষ বা সমাপিত হয় না। জরুরীভিত্তিতে আবশ্যিকভাবে তাদের, দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে গড়া, সম্পদের পাহাড় রাষ্ট্রীয় খাতে বাজেয়াপ্ত করতে হয়। তারা তাদের বনিয়াদ বা ভিত মজবুত করার জন্যে তাদের দোসর ও আত্মীয়স্বজনকেও নির্বিচারে দেশের সম্পদ করায়ত্ত ও কুক্ষিগত করার সুযোগ দিয়ে থাকে। এ কুক্ষিগত সম্পদো বাজেয়াপ্ত করতে হয়। যারা স্বৈরাচারী বলে চিহ্নিত তাদেরকে সুর পাল্টাবার এবং তারা যে ভালো সেসম্পর্কে সাফাই গাবার বা নির্দোষিতা প্রমাণের জন্যে যুক্তি দেখাবার সুযোগ না দেয়াটা অত্যাবশ্যক। স্বৈরতন্ত্র গণতন্ত্রের দুশমন। ঘোড়া ও গাধার মধ্যে পার্থক্য আছে। গাধা ভারবাহী জন্তু। ঘোড়া বহন করে যুদ্ধাস্ত্র। ঘোড়ার পিঠে ভার ওঠিয়ে দিলে আকারে ঘোড়া ও গাধার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও বাস্তবে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এতে ঘোড়ার বৈশিষ্ট্যের অপমৃত্যু বা অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু হয়। আইন ও গণতন্ত্রের অজুহাতে স্বৈরাচারীদের তড়িৎ গতিতে বিচার না হলে, তাদের কুক্ষিগত সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত না হলে, তাদেরকে রাজনীতি করতে দিলে, তাদেরকে তাদের অতীত কর্মের সমর্থনে কথা বলতে দিলে, তাদের পক্ষে জনমতসৃষ্টি করার সুযোগ দিলে এবং তাদের পক্ষে প্রচারাভিযান, শ্লোগান ও প্রসেশন নির্বিবাদে সহ্য করলে গণতান্ত্রিক আদর্শের অপমৃত্যু ঘটে, কেননা গণতন্ত্রের কাজ হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র বা স্বৈরশাসনের ও স্বৈরাচারীদের মূলোৎপাটন করা। স্বৈরাচারী বলে যাদের ক্ষমতার পতন ঘটে পরবর্তীতে তারা

www.pathagar.com

স্বৈরাচারী নয় বলে সাফাই গাবার সুযোগ পেলে এবং তাদেরকে সর্বতোভাবে শায়েস্তা করা না হলে তারা স্বৈরাচারী নয় বলে প্রমাণিত হয়। অপরদিকে, যারা স্বৈরাচারের পতন ঘটায় স্বৈরাচারীরা উল্টাভাবে তাদেরকেই স্বৈরাচারী প্রমাণের কাজে ওঠেপড়ে লাগে। এতে স্বৈরাচার পুনরায় মাথাচাড়া দেয় বা অভ্যুদিত হয় এবং গণতন্ত্রের মর্যাদা ব্যাপকভাবে খর্ব ও ক্ষুণ্ন হয়।

স্বৈরতন্ত্রে স্বৈরাচারীদের প্রকারভেদ থাকে। এদের মধ্যে থাকে বড় স্বৈরাচারী ও ছোট স্বৈরাচারী। ছোট স্বৈরাচারীরা বড় স্বৈরাচারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ছোট স্বৈরাচারীরা বড় স্বৈরাচারীদের চাটুবৃত্তি ও মনোরঞ্জন করে এবং তাদের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ থাকে। স্বৈরাচারের পতনের সাথেসাথে একই প্রক্রিয়ায় সব স্বৈরাচারীর শাস্তি হতে হয় এবং বড় স্বৈরাচারীদের শাস্তি বড়াকারের হতে হয়, কেননা ছোট স্বৈরাচারীদের সমর্থনে কাজ করে বড় স্বৈরাচারীরা। বড় স্বৈরাচারীরা নির্মূল হলে ছোট স্বৈরাচারীরা স্বৈরতন্ত্রে ফিরে যাবার চেষ্টা চালাবার উদ্যম ও সাহস হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে, বড় স্বৈরাচারীরা নিরাপদে ও বিপদমুক্ত থাকলে ছোট স্বৈরাচারীদের মনোবল ও মনোভাব অটুট থাকে এবং তারা মনে করে যে, বড় স্বৈরাচারীরা একদিন-না-একদিন পুনরায় সুযোগ পাবে এবং তারা তাদের জন্যে এসুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারে নানাভাবে কাজ করে যায়। যেসব বড়বড় স্বৈরাচারী গা ঢাকা দিয়ে থাকে তারা নিশ্চুপ ও নিশ্চেষ্ট না থেকে ভেতরেভেতরে নিজেদের জন্যে ক্ষেত্র তৈরি করতে থাকে। তাছাড়া, যেসব স্বৈরাচারী, বড় হোক বা ছোট হোক, বাইরে থাকে তারা অবরুদ্ধ বা আটক স্বৈরাচারীদের মুক্তির দাবি জানাতেও ইতস্তত করে না বা সংশয়াপন্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। তারা মিছিলসমাবেশ করতেও সাহসী হয়ে ওঠে। তারা মিছিলের নামে ক্ষয়ক্ষতিসাধান করে তাদের সাহসিকতা দেখাতেও ভুল করে না। স্বৈরাচারীদেরকে তাদের দোসর ও তাদের দ্বারা সুযোগসুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্যকেউ পছন্দ করে না। তাই, স্বৈরাচারীরা মুক্ত পরিবেশে থাকলে একদিকে অন্যানের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, অপরদিকে আইনের আশ্রয় নেয়। এভাবে তারা সরকারের আশ্রয়ে আসার সুযোগ নেয় এবং তাদের কার্যকলাপ জোরদার ও প্রবল করার মাধ্যমে জনগণকে হতবাক বা হতভম্ব করে তোলে। এতে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। অথচ, শান্তিশৃঙ্খলার জন্যেই স্বৈরাচারের বা স্বৈরাশাসনের পতন ঘটানো হয়। স্বৈরাচারীদের কুক্ষিগত সম্পদ ও কর্ম স্বৈরাচারের বাইরে নয়। আন্দোলনের মাধ্যমে শুধু স্বৈরাচারীদেরকে স্বৈরশাসন থেকে উৎখাত করলেই স্বৈরাচারের পূর্ণাঙ্গ পতন হয় না। তখনই স্বৈরাচারের পুরোপুরি পতন হয় যখন স্বৈরাচারীদের কর্মকাণ্ড চিরতরে ধ্বংস

www.pathagar.com

হয় এবং তাদের কুক্ষিগত সব সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়া হয়, কেননা স্বৈরাচারীরা রাষ্ট্রের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখে এবং তারা তাদের স্বার্থে সবকিছু করতে পারে।

স্বৈরতন্ত্রে মস্তানতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। স্বৈরাচারীরা স্বৈরশাসন টিকিয়ে রাখার জন্যে এলাকাভিত্তিক মস্তান সৃষ্টি করে। মস্তানরাও স্বৈরাচারীদের মতো আইনের উর্ধ্বে থাকে। তারা হয় আগ্নেয়াস্ত্রের ধারক ও বাহক। আইন তাদের ক্ষেত্রে থাকে নিষ্ক্রিয় এবং স্বৈরাচারীরা থাকে তাদের পৃষ্ঠপোষক। জমিদারদেরকে প্রজারা যেমন সমীহ করে চলতে হতো মস্তানদেরকেও এলাকাবাসীরা তেমনি সমীহ করে চলতে হয়, কেননা এলাকাবাসীরা জানে যে, তারা স্বৈরাচারীদের মদদপুষ্ট এবং তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে নানাভাবে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। তাই, স্বৈরতন্ত্র নির্মূল করতে হলে মস্তানতন্ত্র নির্মূল করাটা অনস্বীকার্য। গণতন্ত্রের স্বার্থে স্বৈরতন্ত্রের নির্মূলন বলতে যেমন স্বৈরাচারীদের নির্মূলন বুঝায় স্বৈরাচারীদের দ্বারা সৃষ্ট মস্তানতন্ত্রের নির্মূলন বলতে তেমনি মস্তানদের নির্মূলন বুঝায়। মস্তানতন্ত্র টিকে থাকলে স্বৈরাচারীদেরকে নির্মূল করা কঠিন হয়, কেননা মস্তানদের দ্বারা তারা দ্বন্দ্বসংঘাতে অবতীর্ণ হতে পিছপা হয় না। স্বৈরাচারের পতনের পর স্বৈরাচারীদেরকে শায়েস্তা না করা হলে তারা নির্বিবাদে বা নির্বিরোধে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। একদিকে স্বৈরাচারের পতন ঘটলে, অপরদিকে স্বৈরাচারীরা আস্তেআস্তে সামনে অগ্রসর হয়ার সুযোগ পেলে এবং তারা গণতন্ত্র ও আইনের নামে তাদেরকে জাহির করার ধৃষ্টতা ও প্রগলভতা দেখাতে পারলে প্রকারান্তরে স্বৈরাচারী ব্যবস্থার প্রচলন থেকে যায়। স্বৈরাচারের পতন ঘটায় জনগণ। স্বৈরাচারীদেরকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব সরকারের। জনগণ তাদেরকে শায়েস্তা করতে গেলে আইন তাদের হাতে তুলে নিতে হয়। আইনপ্রয়োগের দায়িত্ব সরকারের। তাই, জনগণ নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে চায় না। তবে, বিলম্বিত বিচারে বিচার অস্বীকৃত হয় এবং আইনের সময়োচিত প্রয়োগ না হলে অপরাধীরা ছাড়া পায়ার সুযোগ পায়। স্বৈরাচারীদের সময়োচিত বিচার না হলে তারা সময়ের ব্যবধানে মুক্ত হয়ে নিজেদেরকে দেশপ্রেমিক বলে অভিমুখে এগিয়ে আসার পথ পরিষ্কারে সচেষ্ট থাকে। জনগণ তাদের এপথ রুদ্ধ করতে গেলে সংঘাত হয়। সরকার এসংঘাতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়। এপদক্ষেপ জনগণের বিরুদ্ধে যায় এবং স্বৈরাচারীরা প্রবল হয়ার সুযোগ পায়। তাই, সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে যথাসময়ে শায়েস্তা করা। যেবিপ্লবের দ্বারা স্বৈরাচারের পতন ঘটে সেটাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা স্বৈরাচারীরা গা ঢাকা অবস্থায় চালিয়ে যায় এবং তাদের যেসব দোসর ছাড়া ও মুক্ত থাকে তাদের মুখেও আদর্শ ও গণতন্ত্রের কথা শুনা যায়। স্বৈরাচারীদেরকে কঠোরভাবে অবদমন করা না হলে তাদের

www.pathagar.com

সমর্থকরা তাদের জন্যে বিপ্লবী নেতার ভূমিকা পালন করে। তাদের এবিপ্লব গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। গণতন্ত্রের ফাঁকে তাদের এবিপ্লব স্বৈরাচার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপ্লব। তাই, স্বৈরাচারীদের পতনের পর সরকার তাদেরকে সর্বতোভাবে শায়েস্তা না করলে যে সামাজিক সুবিচার ও সুষম বণ্টনের জন্যে জনগণ বহু ত্যাগতিতিক্ষার বিনিময়ে স্বৈরাচারের পতন ঘটায় তা যেতিমিরে সেতিমিরেই থেকে যায়।

স্বৈরাচারের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে স্বৈরাচারীদের। তাই, স্বৈরাচারের বা স্বৈরশাসনের পতন বলতে শুধু স্বৈরাচারীদেরকে ক্ষমতা হতে অপসারণ বুঝায় না, তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক সমুচিত শাস্তি প্রদান, তারা দেশকে লুটে অর্থসম্পদের যেপাহাড় গড়েছে সর্বপ্রথমে তা বাজেয়াপ্তকরণ ও তাদেরকে রাজনৈতিক অঙ্গনসহ বিভিন্ন অঙ্গন হতে বহিষ্কারকরণো বুঝায়। স্বাধীনতার সাথেসাথে তার সুফল ঘরেঘরে পৌছলে স্বাধীনতা অর্থবহ ও সার্থক হয়। তা না হলে মানুষ স্বাধীনতাকে নিয়ে অনুশোচনা করে। অনুরূপভাবে, স্বৈরাচারের পতনের সাথেসাথে স্বৈরাচারীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না পেলে, তারা দেশকে নানা কলাকৌশলের মাধ্যমে লুটেপুটে যেঅর্থসম্পদ হস্তগত করেছে তা বাজেয়াপ্ত না করা হলে এবং তাদেরকে রাজনৈতিক অঙ্গনসহ বিভিন্ন অঙ্গন হতে বহিষ্কার না করা হলে স্বৈরাচারের বা স্বৈরশাসনের পতন অর্থবহ ও সফল হয় না। স্বৈরাচারের পতন অর্থবহ ও কৃতার্থ করার নৈতিক ও আইনানুগ দায়িত্ব হচ্ছে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত সরকারের। যেসরকার তা করে না সেসরকারের প্রতি জনগণের সংশয় সৃষ্ট হয়। স্বৈরতন্ত্রের সাথে গণতন্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই। স্বৈরতন্ত্রের সম্পর্ক হচ্ছে দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে একটি গোষ্ঠীর স্বার্থের সাথে এবং গণতন্ত্রের সম্পর্ক হচ্ছে দেশ ও দেশের জনগণের স্বার্থের সাথে। অথচ, স্বৈরাচারীরা স্বৈরশাসন টিকিয়ে রাখার জন্যে গণতন্ত্রকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তারা তাদেরকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলে জাহির করতেও দ্বিধাবোধ করে না। জনগণ যেগণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম করে তারা সেটার ত্রাণকর্তা বা রক্ষক হলে তাদেরকে স্বৈরাচারী বলার কোন প্রশ্নই আসে না। গণতন্ত্রের মানসপুত্রকে জনগণ যেভাবে শ্রদ্ধা করে তাদেরকেও তারা সেভাবে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু, জনগণের দ্বারা তাদের পতন ঘটিত হয়ার অর্থ হচ্ছে যে, তারা গণতন্ত্রকে তাদের স্বৈরশাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সব মানুষ কিছু–না–কিছু বুঝে। গণতন্ত্রে মানুষ তাদের এবুঝের সদ্ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু, স্বৈরশাসনে মানুষ তা পারে না। তাই, স্বৈরাচারীরা স্বৈরতন্ত্রকে গণতন্ত্র বললেও ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তাদের কোন অসুবিধা হয় না। যারা স্বৈরতন্ত্রকে গণতন্ত্রের নামে চালিয়ে দেয় তারা গণদুশমন। এসব গণদুশমনকে সাধারণ মানুষ সহ্য করতে পারে না। তাই, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্যে তাদের সময়োচিত শাস্তি অপরিহার্য। তা না হলে গণতন্ত্রের পথে তারা একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

তাছাড়া, যারা ক্ষমতায় থেকে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে স্বৈরাচারী হয় এবং নির্বিচারে বা বাচবিচার না করে দেশের সম্পদ দুহাতে লুঠ করে দেশদ্রোহী হয় তারা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে অপরাধী। এসব অপরাধীর গণতান্ত্রিক অধিকারের আওয়াজ বা আন্দোলনমূলক ধ্বনি গণতন্ত্রের পরিপন্থী। তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেলে যেকোন মুল্যে নির্বাচিত হয়ার প্রয়াস চালায়। তারা মনে করে যে, তাদের নির্বাচিত হয়াটা তাদের প্রত্যক্ষভাবে কথা বলার সুযোগসৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি হতে ও তাদের কুক্ষিগত ও রাশীকৃত ধনসম্পদ রক্ষা করার একটি অনন্য হাতিয়ার। তারা তাদের সব কুক্ষিগত ও পুঞ্জীকৃত ধনসম্পদ ব্যয় করেও নির্বাচিত হতে চায়। তারা এমন একটি বাহিনী গঠন করে যারা যেকোন ছলছুতায় মারামারিহানাহানিতে লিপ্ত হয়ে যায়। এটা দেশ, জনগণ ও গণতন্ত্রের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এক্ষতি হতে রক্ষা পেতে হলে অধঃপতিত স্বৈরাচারীদেরকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করতে হয়।

স্বৈরাচারীরা স্বাধীনভাবে এগুতে না পারলে যে নিশ্চল ও নিশ্চুপ থাকে তা নয়। তারা যেকোনভাবে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে জড়িত প্রধান দলগুলোর ভেতরে ঢুকে যেতে বা তাদের সহযোগিতা পেতে চায়। কোন স্বৈরাচারবিরোধী দল কোন স্বৈরাচারীকে তাদের দলে স্থান দিলে বা সহযোগিতাপ্রদান করলে সেদলো স্বৈরাচারী হয়ার আলামত বা লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাই, স্বৈরাচারবিরোধী কোন দলই স্বৈরাচারীদেরকে তাদের দলে স্থান না দেয়াটাই বা সহযোগিতাপ্রদান না করাটাই জাতির জন্যে মঙ্গলজনক। এক স্বৈরাচারী দল উচিত শিক্ষা না পেলে অপর স্বৈরাচারী দল গজিয়ে ওঠে। এক স্বৈরাচারী দলের পতনের পর সেটার সদস্যরা কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকে পরে মুক্ত পরিবেশে আসলে দেশের জনগণের প্রতি চরম অবিচার হয় এবং স্বৈরাচারীরা চাংগা হয়ে ওঠতে সাহস পায়। তাই, তাদেরকে সমুচিত শাস্তি বা শিক্ষা দিতে হয় এবং বিলম্ব না করে তাদের কুক্ষিগত ও রাশীকৃত ধনসম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হয়। তাছাড়া, স্বৈরাচারীরা শুধু ক্ষমতা ছেড়ে দিলেই স্বৈরাচারের প্রকৃত পতন হয় না। স্বৈরাচারীদের নির্মূলনই স্বৈরাচারের প্রকৃত পতন।

থ

বাস্তবে সন্ত্রাস, গুণ্ডাপাণ্ডা, তোষমোদ, কর্মীসৃষ্টি ইত্যাদি কোনটিই ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে পারে না। ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার শক্তি হচ্ছে তিনবাহিনী, বি, ডি, আর, এবং পুলিশ। এরা বিভক্ত না হলে এদেরকে দিয়ে ক্ষমতাসীনেরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে। এরা বিভক্তি হলে সংঘর্ষ ও সংঘাতে যারা জয়ী বা জয়যুক্ত হয় তারা ক্ষমতাসীন

www.pathagar.com

হয়। এরা বিভক্ত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকলে বা ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকলে এবং ক্ষমতাসীনদেরকে সমর্থন না দিলে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিরাই ক্ষমতাসীন হয়। এক্ষেত্রেই জনগণই শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হয়। তিনবাহিনী, বি, ডি, আর, এবং পুলিশ ঐক্যবদ্ধ থেকে ক্ষমতাসীনদেরকে দুর্নীতির ও অবিচারের ক্ষেত্রে সমর্থন দিলে বা এরা ক্ষমতা দখল করলে বা এরা বিভক্ত হয়ে সংঘাতের মাধ্যমে বিজয়ী দল ক্ষমতায় গেলে অস্ত্রই হয় শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। প্রশাসন ঐক্যবদ্ধ হয়েও বা সংঘাতে গিয়েও ক্ষমতাসীন হতে পারবে না, কেননা তাদের নিকট অস্ত্র নেই। পুলিশের দায়িত্ব হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা। তিনবাহিনী এবং বি, ডি, আর,-এর দায়িত্ব হচ্ছে বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা এবং সরকারের প্রয়োজন হলে মাঝেমধ্যে সরকারকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সহযোগিতা করা। রাজনৈতিক দলগুলো দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে দেশের জনগণের একাংশ হিসেবে তিনবাহিনী ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে বা নেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একটি বিরাট দায়িত্ব। এদায়িত্ব নির্ভুল ও সঠিকভাবে পালনার্থে প্রাপ্ত হলে কেউ সহজে এরকম একটি দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হয়ার কথা নয়। বাস্তবে দায়িত্বের নামে ব্যক্তিস্বার্থে এদায়িত্ব প্রাপ্ত হয় বিধায় এরকম দায়িত্বের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর আকর্ষণ ও লোভ থাকে। যারা যতোদিন এদায়িত্বে থাকে, তারা যেভাবেই থাকে – না– কেন, তাদের বিদায়ের পর তাদের কাজকর্মের হিসেব নিয়ে তাদের মধ্যে যারা বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী হয় তাদের কোনপ্রকার শাস্তি না হয়ার কারণে এবং তারা ক্ষমতায় থাকওে তাদের অপরাধ ধৃত হয় না ও বিচারে তাদের শাস্তি হয় না বিধায় ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতাসীন হয়াটাকে একটি চান্‌স্‌ ধরে নিয়ে রাজনীতির নামে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় এবং রাজনীতিবিদেরা মুখে দেশ ও জনগণের মঙ্গলের কথা বললেও তাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ। ক্ষমতায় থাকতে চারদিকে জয়ধ্বনি কর্ণগোচর হয় এবং অনেক অভিবাদন ও অভিনন্দন পায়া যায়। কিন্তু, ক্ষমতা চলে গেলে এসব মুছে যায় এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক ব্যতীত কেউ জিজ্ঞেসো করে না। মানুষের পক্ষে এর চেয়ে লজ্জার ও অপমানের ব্যাপার আরকিছু হতে পারে না। তবু, মানুষ বুঝে না। এজন্যে ক্ষমতায় থাকতে এসব গ্রহণ না করে কাজ করে যায়াটাই শ্রেয়। যারা রাজনীতি করে তারা জানে ও বুঝে যে, মানুষ মানুষের কর্মকেই গ্রহণ করে এবং এ গৃহীত কর্মই তাদেরকে শ্রদ্ধাভাজক বা শ্রদ্ধাস্পদ করে বাঁচিয়ে রাখে ও অমরত্ব অর্পণ করে। জয়ধ্বনি, অভিনন্দন ও অভিবাদন–এগুলো কর্ম নয়। এগুলো হচ্ছে প্রথা ও স্তুতি। যেপ্রথা বা স্তুতি কর্ম নয় তা বর্জন করাটাই শ্রেয়। প্রকৃত মানুষ এগুলো বর্জন করে ও শুধু কর্মসম্পাদন করে। দেশকে ভালোবাসার কথা

www.pathagar.com

সবাই বলে। কিন্তু, ক্ষমতায় গেলে ও সুযোগ পেলে এভালোবাসা উবে যায় বা বাতাসে মিলে যায়।

যেদেশে রাজনীতিবিদেরা জনগণ ও দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সেদেশ উন্নত হতে ও সেদেশের লোক সুখী হতে পারে না এবং যারা দেশ ও জনগণের স্বার্থের বিপরীতে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করে তারাও দেশবিদেশে মানসিক অশান্তিতে ভোগে। এধরনের ভোগান্তি অত্যন্ত দুর্বিসহ ও মর্মন্তুদ। যারা ক্ষমতাসীনদের পেছনে ধাবিত হয় তাদের প্রকৃত কাজ এধাবন নয়। তাদের প্রকৃত কাজ হচ্ছে স্বস্ব দায়িত্ব, তা যতোক্ষুদ্রই হোক, পালন করা। এধাবনের পেছনে থাকছে ব্যক্তিগত স্বার্থ। সব ব্যক্তিগত স্বার্থের সমষ্টি আইনের প্রয়োগকে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফল করে ফেলে। ফলে, সাধারণ লোক দারিদ্র, পীড়া, অবিচার, অত্যাচার ও জুলুমের শিকার হয়। এটা ক্ষমতাসীনেরা ভালোভাবেই বুঝে, কেননা তারাও এদেশের মানুষ। মানুষের আইন ও সংবিধান অসমভাবে রচিত। ক্ষমতাসীনেরা এবং তাদের সঙ্গীসাথী ও সমর্থকরা এগুলোর ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। তারা সম্মিলিতভাবে আইনের বাইরে থেকে যাচ্ছে বলেই সুষম বণ্টন ও সুবিচারের অভাবে নৈরাজ্য, অশান্তি, অপরাধপ্রবণতা, ইত্যাদি হ্রাস পাচ্ছে না। যেখানে আলো দেখে সেখানে ঝাঁকেঝাঁকে পঙ্গপাল পড়ে আত্মাহুতি বা জীবনবিসর্জন দেয়। তারা মনে করে যে, ওটাই সবকিছু। সাধারণ মানুষ যখন যেদল ভালো কথা শুনায় তখন সেদলের পেছনে ধাবিত হয়ে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হয়। পঙ্গপাল বুঝে না যে, আগুনে পড়লে তাদের জীবন সাঙ্গ বা নিঃশেষ হবে। আমরাও বুঝি না যে, দলের ভালো কথা ও ওয়াদা আমাদের প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করে। পঙ্গপাল আগুনে না পড়ার জন্যে তা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। তবু, তারা তাতে পড়ে, কেননা তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেক নেই। আল্লাহ্ তাদেরকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। আমরা মানুষ। আমরা সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ্ আমাদেরকে জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমরা এসব কাজে লাগানো প্রয়োজন। আমরা এসব কাজে না লাগাতে পারলে তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য বা প্রভেদ পরিলক্ষিত হবে না।

রাষ্ট্রপরিচালনার জন্যে ক্ষমতার প্রয়োজন। এক্ষমতা শরীরের শক্তি বা ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার নয়। এক্ষমতা হচ্ছে আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আপনপর ভেদাভেদ না করে প্রতিটি কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করার জ্ঞানগম্যতা ও যোগ্যতা। তাই, ক্ষমতার সাথে শারীরিক শক্তি ও ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই। এটার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতির। যারা এগুলোর ছত্রছায়ায় নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে তারা ক্ষমতার অনুপযুক্ত। ক্ষমতার এঅনুপযুক্ততা নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। নৈরাজ্যের কারণে জনগণের মধ্যে দেখা দেয়

www.pathagar.com

নৈরাশ্য যা সরকার ও জনগণের মধ্যে নৈরন্তর্যে বা অবিচ্ছিন্নতায় এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয় জীবনে জেনেশুনে ভুলের পুনরাবৃত্তি জাতিকে পিছু টানে। এককেক সময় এককেক দল ক্ষমতাসীন হয়। সব দলের কর্মসূচী একরকম নয়। কর্মসূচী বিভিন্নরকম না হয়ে একরকম হলে বিভিন্ন দল না হয়ে একটি দলই হতো। তবে, স্বার্থের কোন্দল বেশি হলে দল বেশি হয়। যেদেশে স্বার্থের কোন্দল কম সেদেশে দলো থাকে কম এবং জনকল্যাণের ও অগ্রগতির ধারা অপ্রতিহত ও অব্যাহত থাকে। যেদলই ক্ষমতায় থাকে তারা কি করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় সেদিকে খেয়াল রেখে ও দৃষ্টিনিক্ষেপ করে আইন, বিধান, নিয়ম ও পদ্ধতি প্রণয়ন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে। অপরকোন দল ক্ষমতায় আসলে এবং তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করে জাতীয় স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করলে ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে সঠিক পন্থায় কাজ করতে পারে। কিন্তু, তারাও একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে। তারা যা-ই বলে-না-কেন, জনগণের বুঝতে বাকি থাকে না যে, তারাও স্বার্থপর এবং ক্ষমতায় টিকে থেকে স্বার্থসিদ্ধি করাটা তাদেরও অভিলাষ। ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করা ঠিক নয়। এতে, যে যা-ই বলে-না-কেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় না। ক্ষতাসীনদেরকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সবাই ভয় করে। ফলে, প্রশাসন ও আইনশৃঙখলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাসীনদের প্রতি দুর্বলতা থেকে যায়। তাই, নির্বাচন হতে হয় অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে। এটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের একটি অনন্য পন্থা। এপন্থাবহির্ভূত কোন নির্বাচনই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। ক্ষমতাসীন দল ও অন্যান্য সব দলই বলে যে, জনগণ তাদের সাথে। বাস্তবে জনগণ কার সাথে সেটা অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচালনায় নির্বাচনের মাধ্যমেই জানা যায়। ওটার কোন বিকল্প নেই। পূর্বের কোন দল ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ওপন্থায় নির্বাচন না দিয়ে থাকলে পরবর্তীতে অন্য ক্ষমতাসীন দল, তাদের প্রতি সত্যিকারভাবে জনগণের সমর্থন থাকলে, পূর্বের সেদলকে অনুকরণ করলে এটা বুঝা যায় যে, তারা মুখে বললেও বস্তুত তাদের প্রতি জনগণের সমর্থন নেই এবং তারা ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতার প্রভাবে পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়ার আশাপোষণ করে।

রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী যে-ই শাসনতান্ত্রিকভাবে নির্বাহীপ্রধান সে বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাবান, সৎ, মহৎ, দেশপ্রেমিক এবং অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ও অন্যান্য নীতি সম্পর্কে সম্যক চেতনার ও জ্ঞানের অধিকারী ও দূরদর্শী না হলে দেশে অশান্তি বিরাজ করে এবং জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে ব্যক্তিস্বার্থ স্থান করে নেয়। এসব গুণের অভাবে সে তোষামোদকারীদের দ্বারা বেষ্টিত ও পরিচালিত হয়। তারা তাকে এমনভাবে তোষামোদ করে যে, সে সত্যের ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ বুঝতে বা পার্থক্য নির্ণয়

www.pathagar.com

করতে ব্যর্থ হয় এবং তারা যা বলে সে তা করে আনন্দ পায়। তাদের কারণে সে সর্বদা অন্ধকারে থেকে যায় এবং অন্ধকারটাকেই আলো মনে করে, কেননা তারা তাকে প্রকৃত আলোর অন্বেষণ ও সন্ধান দেয় না। সে খারাপ কাজ করলেও তোষামোদকারীরা বলে যে, সর্বোত্তম কাজ হয়েছে। দেশের কোন অগ্রগতি ও উন্নতি না হলেও তারা দেখায় যে, দেশ অগ্রগতি ও উন্নতির শীর্ষবিন্দুতে পৌছে গেছে এবং বলে যে, শত্রুরা সহ্য না করতে পেরে শত্রুতার কারণে ও ক্ষমতায় যায়ার জন্যে বিরোধিতা ও সমালোচনা করে। এককথায়, তোষামোদকারীরা তাকে তার ভুলত্রুটি ধরে না দিয়ে তার সব ভুলত্রুটিকে মহৎ কাজ বলে তার গুণগান ও প্রশংসা করতে থাকে। তাই, রাজনীতিবিদ হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে বা প্রধানমন্ত্রীকে অপরিহার্যভাবে ও নিশ্চিতরূপে উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হতে হয় এবং তোষামোদ যে কি তা বুঝে সেটার উর্ধ্বে থেকে কাজ করতে হয়। যুদ্ধবিগ্রহ, দ্বন্দ্বকলহ, বেঈমানি ও মোনাফেকির মূলে কাজ করছে ক্ষমতা, মর্যাদা, প্রাচুর্যের মোহ ও লোভলালসা। এগুলো মানুষকে অন্ধ বানায় এবং এগুলোর মোহে তারা নিজেদের দুর্বলতা ও সংকীর্ণতা সম্পর্কে অজ্ঞ ও নির্বোধ হয়ে যায়। তারা তোষামোদকারী ও সুবিধাবাদীদের দ্বারা বেষ্টিত থাকে বিধায় নিজেদের দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পারলেও তোষামোদকারী ও সুবিধাবাদীদের তোষামোদ তাদেরকে তা ভুলিয়ে দেয় এবং অনবধানতার কারণে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে ও অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়।

যারা ক্ষমতাসীন দলের প্রধানকে নিজেদের সবকিছু জানে এবং তার জন্যে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ বা উৎসর্জন করতে প্রস্তুত তাদের কেউই তার চরম ও সংকটাপন্ন সময় থাকে না। এটা বাংলাদেশের রাজনীতির ও ক্ষমতার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দৃশ্যমান ও দৃষ্টিগোচর হয়। যে ক্ষমতাসীন দলের প্রধান থাকে তার অনুভব করা ও বুঝা প্রয়োজন যে, সে যেক্ষমতা ও সম্মানের আষ্টেপৃষ্ঠে বা সর্বাঙ্গে আবদ্ধ থাকে তা তার ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আইনের উর্ধ্বে অবস্থান ও দেশের স্বার্থের উর্ধ্বে নিজের স্বার্থের কারণে হঠাৎ দলিতমথিত বা পদদলিত ও অবসিত হয়। এটার চেয়ে চরম ও সর্বশেষ ব্যর্থতা ও লজ্জা আরকিছুই হতে পারে না। সম্পদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি, নিরাপত্তা, মানসম্মান, প্রভাবপ্রতিপত্তি ও ক্ষমতা। যেসম্পদ লোভী, দুর্নীতিবাজ ও স্বৈরাচারী বানায় ও অন্যান্যের মধ্যে লোভ, দুর্নীতি ও স্বৈরাচার ঢুকিয়ে দেয় এবং কালের চক্রে এসব কারণে মানসম্মান, প্রভাবপ্রতিপত্তি ও ক্ষমতা পদদলিত ও বিনাশিত হয় সেসম্পদ থেকে বেঁচে থাকা যে শ্রেয় এশিক্ষাই রাজনীতি ও ক্ষমতার ইতিহাস দিয়ে থাকে। ক্ষমতায় টিকে থাকার ও সম্পদবৃদ্ধি করার জন্যে গ্রাম পর্যন্ত একটি চেইনে একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করে তাদেরকে সরকারী টাকাপয়সা ও সামগ্রী লুটেপুটে খায়ার সুযোগ দেয়া হয়। এ সুযোগগ্রহণকারী গোষ্ঠী চরম ও বিষম সময় 'টু' শব্দটিও করে না। এটাও ইতিহাসের শিক্ষা যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ

www.pathagar.com

বিসর্জন দিয়ে নিজে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে যেগোষ্ঠী সৃষ্টি করা হয় পতন ও সখলন আসলে তারাও উদ্ধার ও রক্ষা করতে পারে না। তাই, ক্ষমতায় থেকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধি ও গোষ্ঠীসৃষ্টি করাটা নির্বুদ্ধিতা ও বুদ্ধিহীনতার কাজ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ক্ষমতা হতে চলে যাবার সময় ও চলে যাবার পর মানমর্যাদা অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখার উপায় হচ্ছে আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং সুবিচার ও সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করা। সুবিচার ও সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কেউই আইনের উর্ধ্বে থাকতে এবং দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারে না। সামাজিক সুবিচার ও সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত না থাকলে এটা পরিষ্কার ও সহজবোধ্য হয়ে যায় যে, ক্ষমতাসীনেরা আইনের উর্ধ্বে ও দুর্নীতিপরায়ণ। ইসলামী অনুশাসনে ক্ষমতাসীনদের কাজ অত্যন্ত ক্লেশসাধ্য ও কষ্টকর। তারা প্রত্যেকটি ব্যক্তির সুখশান্তি সুনিশ্চিত না করা পর্যন্ত নিজেদের সুখশান্তির কথা কল্পনা ও চিন্তা করতে পারে না এবং প্রত্যেকটি লোকের আহারের সংস্থান না করে নিজেদের খাবারো পুরোপুরি খায় না। ক্ষমতাসীন হয়ে যারা এভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে তারাই জনগণের আস্থাভাজন ও আস্থাশীল হয়ে সামাজিক সুবিচার ও সুষম বণ্টনের জন্যে কাজ করতে পারে। তাদের মানসম্রম পদদলিত হয় না। মানুষ তাদেরকে ভয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা না করে অন্তর থেকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। যখন কোন দলনেতা মানুষকে এনীতির কথা শুনায় তখন মানুষ তাকে সমর্থন দেয়। এসমর্থন হচ্ছে দোয়া। কিন্তু, যখন সেদলনেতা ক্ষমতাসীন হয়ে এনীতি ভুলে যায় তখন মানুষ তাকে বদ্দোয়া দিতে থাকে। এবদ্দোয়া এমন একপর্যায়ে পৌঁছে যে, তখন সে সবদিক থেকে তার প্রতি সমর্থন হারিয়ে ফেলে এবং তার যেপতন হয় তা বড়ই ব্রীড়িত ও লজ্জাকর হয়। হাদীসে আছে যে, লজ্জা বা হ্রী ঈমানের কান্তি ও ভূষণ। লজ্জাহীন ব্যক্তি পশুর চেয়েও অধম। যেব্যক্তির মধ্যে পশুত্ব বা পশুর ভাব থাকে সে কখনো মুনষ্যত্বের বা মনুষ্যোচিত কাজ করতে পারে না। তাই, রাজনীতিবিদদের কাজ হচ্ছে সদা মনুষ্যত্বকে বা মানবোচিত বৈশিষ্ট্যকে জাগ্রত রাখা যাতে কোন পশুত্ব তাদেরকে প্ররোচিত করতে না পারে। ক্ষমতায় থাকতে দেখা যায় যে, ক্ষমতাসীন দলের প্রধানকে সব লোক ভালোবাসে। সভাসমিতিতে ভাষণ দেয়ার সময় সে লোকে লোকারণ্য দেখে। তার চলার পথে দু'ধারে থাকে লোক আর লোক। সে পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে গানের তালেতালে পরমানন্দে ও হৃষ্টচিত্তে সামনে এগিয়ে চলে। তার চারদিকে আইনশৃঙখলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের, সময়েসময়ে সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরো, কড়াবেষ্টনী থাকে। বক্তারা বক্তৃতায় তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। অফিসআদালত, কলকারখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। সবাই উপস্থিত হতে হয় সভাস্থলে, দাঁড়াতে হয় রাস্তার দু'পাশে, আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ বর্ষণ করতে হয় ফুলের, উপহার দিতে হয় ফুলের তোড়া, গলায় দিতে হয় ফুলের মালা ও গেতে হয় প্রশংসার গান। সব

www.pathagar.com

মিলিয়ে সূচনা হয় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের। যোগদান করতে থাকে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের কর্মী ও নেতা তার দলে। দুনিয়া থাকে একদিকে আর তাকে রাখা হয় অপরদিকে। স্বৈরাচার, দুর্নীতি, অবিচার, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব ও আইনের উর্ধ্বে অবস্থানের কারণে যখন পতন ও অপমানের ঘণ্টা বাজতে থাকে তখন এসব আর থাকে না এবং এসব ধ্বজাধারীরা কোনপ্রকার উচ্চবাচ্য ও বাদপ্রতিবাদ না করে ক্ষমতাসীন হতে পারে ওরকম সম্ভাব্য দলে এবং পরে যেদল ক্ষমতাসীন হয় সেদলে ভিড়তে থাকে।

দ

ছাত্র হচ্ছে শিক্ষার্থী এবং রাজনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ার, স্বাধীনতালাভের, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক রাখার, মতবাদপ্রতিষ্ঠার, কর্মসূচিবাস্তবায়নের এবং অন্যায়অবিচার, জোরজুলুম, শোষণনির্যাতন, আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনবাদ প্রতিহত করার কর্ম। রাজনীতি, সন্ত্রাসনীতি ও অস্ত্রনীতি– এ তিন নীতি একধরনের নীতি নয়। রাজনীতি হচ্ছে মহৎ নীতি। এটা হচ্ছে মঙ্গলসাধনের নীতি। সন্ত্রাসনীতি ও অস্ত্রনীতি হচ্ছে হীন নীতি। এ দু'নীতির কাজ হচ্ছে জনগণের অমঙ্গলের দ্বারা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ বা কৃতার্থ করা। রাজনীতি হচ্ছে যুক্তির, জ্ঞানের, প্রজ্ঞার, অভিজ্ঞতার, কলাকৌশলের ও শান্তির নীতি। সন্ত্রাস ও অস্ত্রের নীতি হচ্ছে অশান্তির, অমঙ্গলের এবং 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি। যারা রাজনীতি করে তাদেরকে বলা হয় রাজনীতিবিদ। ছাত্রদেরকে বা শিক্ষার্থীদেরকে রাজনীতিবিদ বলা হয় না। তাই, তাদের রাজনীতিকে বলা হয় ছাত্ররাজনীতি। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় বা নির্বিঘ্নতায় রাজনীতি করে। তাদের মধ্যে যারা নেতৃত্ব দেয় তাদেরকে রাজনৈতিক নেতা না বলে ছাত্রনেতা বলা হয়। তাছাড়া, তারা তাদের সমর্থিত দলের কর্মী হিসেবে কাজ করে। অথচ, তারা ছাত্র। ছাত্রাবস্থা শেষে তারা রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেতা হতে পারে। অধ্যয়ন ও কর্মসম্পাদন এককথা নয়। ছাত্রদের কাজ হচ্ছে অধ্যয়ন। কর্ম করতে গিয়ে অধ্যয়ন ছেড়ে দিলে ছাত্র হিসেবে যেদায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন তা পালিত হয় না। রাজনীতি করে যারা ক্ষমতাসীন হয় তাদেরকে বলা হয় সরকার। সরকারের কাজ হচ্ছে আইনের, বিধির, নিয়মের ও পদ্ধতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে দেশপরিচালনা করে শান্তি ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখা। ছাত্ররা সংসদসদস্য, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী হয় না, অর্থাৎ কোন প্রতিনিধিত্বমূলক পদে থাকে না। এমনকি রাজনৈতিক দলের কোন পদেও তারা থাকে না। অথচ, তারা রাজনীতি করে। তাই, তারা হচ্ছে রাজনৈতিক দলের নেতাদের রাজনীতির বাহন।

www.pathagar.com

ছাত্ররা যুবক। তারা সাংসারিক দায়দায়িত্বমুক্ত ও তেজোময় বা তেজীয়ান। তাদের আছে অনেক স্বপ্ন ও সাধ এবং তারা নিজেদের ও দেশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে। সুশিক্ষাই তাদের চিন্তাভাবনাকে সঠিক পথে পরিচালিত এবং তাদেরকে দেশোপযোগী সুনাগরিকে পরিণত করতে পারে। তাদের বোধ, বিবেক ও বুঝার শক্তি আছে। অধ্যয়নের সাথেসাথে তাদের বোধ, বিবেক ও বুঝ এটা তাদের নিকট পরিষ্কার করে দিতে পারে যে, তারা রাজনৈতিক দলগুলোর বাহনমাত্র এবং তাদের রাজনীতির কোনপ্রকার স্বীকৃতি নেই। স্বীকৃতির প্রমাণ হচ্ছে প্রতিনিধিত্বের পদ, কেননা রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্তিতে ক্ষমতাসীন সব পদই প্রতিনিধিত্বের পদ। এসব পদ পেতে হলে নির্বাচনে অংশ নিতে হয়। সরকারী কর্মচারীরা যেমন এসব পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না ছাত্ররাও তেমনি এগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না। সরকারী কর্মচারীরা যেমন এগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে পদত্যাগ করতে হয় ছাত্ররাও তেমনি এগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ছাত্রনাম কাটা যায়। সরকারী কর্মচারীরা যেমন চাকরিক স্বার্থে এসব অনিশ্চিত পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না ছাত্ররাও তেমনি লেখাপড়ার স্বার্থে ছাত্রাবস্থা শেষ না হয়া পর্যন্ত এগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হয় না। কর্মচারী ও ছাত্র সবাই দেশের নাগরিক। সবাই ভোটাধিকারপ্রয়োগ করে। এঅধিকারের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক থেকে যাচ্ছে। বিভিন্ন দল এবং তাদের কর্মসূচী, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও নেতা সম্পর্কে আলোচনাসমালোচনাও রাজনীতি। এরাজনীতিতে ভোটাধিকারপ্রয়োগের প্রশ্নে সবার অংশগ্রহণ করাটা এসে যায়। কর্মচারীদের কাজ হচ্ছে কর্মসম্পাদন এবং ছাত্রদের কাজ হচ্ছে অধ্যয়ন। তবে, উভয়ই ভোটাধিকারপ্রয়োগ করে। কর্মচারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে চাকরি হারায় এবং ছাত্ররা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ছাত্রাবস্থার পরিসমাপ্তি বা পর্যবসান ঘটে। তাই, রাজনীতির ব্যাপারে কর্মচারী ও ছাত্র একই পর্যায়ে এসে যায়। নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন কর্মচারীর যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন থাকে বিভিন্ন ছাত্রেরও তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন থাকাটা স্বাভাবিক। কর্মচারীরা যেমন কর্ম বাদ দিয়ে সরাসরি রাজনীতিতে আসতে পারে না ছাত্ররাও তেমনি লেখাপড়া জলাঞ্জলি বা বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বাহন হিসেবে সরাসরি রাজনীতিতে না আসাটাই অভিপ্রেত ও শুভদ। কর্মচারীরা যেমন রাজনীতি বুঝে ও জানে ছাত্ররাও তেমনি রাজনীতি বুঝবে ও জানবে। এবুঝা ও জানাকে কেন্দ্র করে কর্মচারীরা যেমন সরাসরি রাজনীতিতে অবতীর্ণ হতে পারে না ছাত্ররাও তেমনি সরাসরি রাজনীতিতে অবতীর্ণ না হয়াটা তাদের এবং দেশের ও জাতির জন্যে মঙ্গলজনক। প্রত্যেক কাজেরই সোপান আছে। একসোপান ডিঙিয়ে বা

www.pathagar.com

উল্লংঘন করে অন্যসোপানে গেলে কাজটি ভুলভাবেই সম্পাদিত হয় এবং এধরনের কাজ কোন কল্যাণ সাধন বা সিদ্ধি করতে পারে না। একাজ সর্বসময় অকল্যাণকর। ছাত্রদের প্রথম সোপান হলো লেখাপড়া এবং দ্বিতীয় সোপান হলো কর্মক্ষেত্র। দু'টি সোপানে একসাথে পা দিলে তা ফসকে দুর্ঘটনা ঘটে। লেখাপড়ার সাথে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্যে প্রস্তুতির সম্পর্ক এবং রাজনীতির সাথে কর্মক্ষেত্রের সম্পর্ক। ছাত্ররা একই সময় তাদের দু'টি সোপানে পা দিয়ে ফসকে পড়লে এবং লেখাপড়ার মাধ্যমে উপযুক্ত জ্ঞানলাভের দ্বারা কর্মক্ষেত্রের জন্যে সঠিক প্রস্তুতির সময় হারিয়ে ফেললে তাদের এবং দেশের ও জাতির ক্ষতি হয়। যেসময় চলে যায় তা ফিরে পায়া যায় না। অনুরূপভাবে, যখনকার কাজ তখন না করলে পরে তা করা হয় না বা করার সময় ও সুযোগ হয় না। তাছাড়া, সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে পরিণামে অনুতাপ ও অনুশোচনা করে বেড়াতে হয়। ছাত্রদের দায়িত্ব হচ্ছে সময়ের সদ্ব্যবহার করা। তাদের সময়ের সদ্ব্যবহার হচ্ছে সময়ের কাজ সময়ে করা বলতে যা বুঝায় তা করা, অর্থাৎ অধ্যবসায়ের সাথে অধ্যয়ন করা। কোন এক মা তাঁর এক বেকার ও ভবঘুরে ছেলেকে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে বলেন। ছেলে উত্তরে বলে যে, সে শিশু থাকতেই তার পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে এবং সে তার পায়ে দাঁড়াতে না শিখে থাকলে সে সোজা হয়ে হাঁটছে কি করে। অথচ, ছেলে ভালোই বুঝেছে যে, মা তাকে পায়ে দাঁড়াতে বলে আত্মনির্ভরশীল হতে বলেছেন। ছাত্ররা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারলে রাজনীতি করবে। তারা বলতে পারে যে তারা পায়ে দাঁড়াতে পারছে বলেইতো দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করে রাজনীতি করছে। এখানেও পায়ে দাঁড়ানো বলতে স্বাবলম্বী হয়াটাকে বুঝাচ্ছে। ছাত্ররা অভিভাবকদের ওপর নির্ভরশীল। অভিভাবকেরা চায় না যে, তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়াকে একদিকে ঠেলে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর, ছাত্ররাজনীতির নামে, হাতিয়ারে পরিণত হোক। মাতাপিতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরের পথ পরিষ্কার করাটা নির্বুদ্ধিতার বা বুদ্ধিহীনতার কাজ। ছাত্রদের এমন নির্বুদ্ধিতার কাজ অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও মর্মন্তুদ।

শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায় এবং পশুত্বকে অবদমিত করে। ছাত্ররা শিক্ষিত এবং তারা শিক্ষিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষিত লোকের ব্যক্তিত্ব আছে। ব্যক্তিত্ব হচ্ছে সচ্চরিত্রতার ও মানসম্মানের আধার। অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হলে এব্যক্তিত্বের অপমৃত্যু বা অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু ঘটে। এতে মনুষ্যত্ব প্রস্ফুটন ও বিকাশের পথ রুদ্ধ হয় এবং পশুত্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বা অভ্যুত্থিত হয় এবং নিজেদের অজ্ঞাতসারে নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যৎকে নিজেরাই অসুন্দর করে তোলে। সব ছাত্র নেতা হয় না।

www.pathagar.com

হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্র নেতা হয়। তবে, রাজনৈতিক নেতা নয়, ছাত্রনেতা। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন লোভে আকৃষ্ট হয়। এসব দল তাদের সবরকম কাজের পেছনে মদদ জোগায় এবং তাদের খুঁটি হিসেবে কাজ করে। তারাও অন্যান্য ছাত্রকে নানাভাবে প্রলোভিত করে। তারা যেসব দলের পেছনে কাজ করে শেষপর্যন্ত সেসব দলের দ্বারা তাদের দু'চারজন ব্যতীত অন্যান্যরা উপকৃত ও লাভবান হয় না। তাই, ছাত্ররা রাজনৈতিক দলগুলোর পেছনে কাজ করার অর্থ হচ্ছে মরীচিকার, অর্থাৎ মরুভূমির বালুকারাশির ওপরে পতিত সূর্যকিরণে জলভ্রমের, পেছনে ধাবিত হয়া। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই কথায় ও কর্মসূচিতে দেশ ও দেশের জনগণের মঙ্গল চায়। যারা দেশ ও দেশের জনগণের মঙ্গল চায় তারা দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধারদেরকে বা কাণ্ডারিদেরকে তাদের কর্ণধারের বা কাণ্ডারির দায়িত্ব নেয়ার জন্যে প্রস্তুতির সময়টা নষ্ট করার মতো কাজ করতে পারে না। অথচ, তারা ছাত্রদের এসময়টা নষ্ট করে দেয়। যারা জাতির ভবিষ্যতের প্রতি কোনপ্রকার স্বার্থ না দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখে দেশ ও দেশের জনগণের মঙ্গলের কথা তাদের মুখে বা কর্মসূচিতে শোভা পায় না ও কান্তিযুক্ত হয় না। রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ছাত্রদেরকে তাদের দলের প্রতি আকৃষ্ট করে। ছাত্রদের ভাবা ও বুঝা প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট তাদের এতো গুরুত্ব ও মূল্য কেন। কিন্তু, তারা নানা প্রলোভনে পড়ে এবং তাদের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর গুরুত্ব দেখে এটা বুঝে ওঠতে পারে না বা বুঝেও বুঝে না। বর্তমানে যারা ছাত্র তারা অতীতের ছাত্রদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত বা দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই পারে। অতীতেও ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলো। সেসব ছাত্র আজ কোথায়? তাদের মধ্যে যেকয়েকজন তাদের নেতা হয়েছিলো তাদের মধ্য হতে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যতীত, বলতে গেলে, অন্যান্য সবাই জীবনসংগ্রামে, রাজনৈতিক সংগ্রামে নয়, নিয়োজিত আছে। সবাই রাজনৈতিক নেতা ও ক্ষমতাসীন হয় না। মুষ্টিমেয় কয়েকজনই রাজনৈতিক নেতা ও ক্ষমতাসীন হয়। অন্যান্য সবাইকে জীবনসংগ্রামে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হতে হয়। ছাত্ররা যেআদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতিতে অংশ নেয় তা বাস্তবে কার্যকর করার জন্যে কোন পদক্ষেপই কোন রাজনৈতিক দল তাদের স্বার্থের বিপরীতে গ্রহণ করে না। ছাত্ররা একটু অন্তর্দৃষ্টি দিলেই ও সূক্ষ্মদর্শনশক্তি প্রয়োগ করলেই এবং অতীতের দিকে তাকালেই এটা বর্তমানে দেখতে পারে। তারা ছাত্রজীবন সমাপনান্তে কর্মজীবনে প্রবেশ করে তাদের ছাত্রজীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্যে আলস্যহীন ও নিরলসভাবে কাজ করে যেতে পারে। একাজের জন্যে উপযুক্ততা অর্জনের উৎকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে ছাত্রজীবন।

www.pathagar.com

অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের দ্বারাই এজীবনটিতে পূর্ণতা আনা যায়। কোনকিছুতে পূর্ণতা আনতে হলে সেটার প্রস্তুতিতে পূর্ণতা প্রয়োজন। ছাত্রদের জন্যে অধ্যয়ন ও জ্ঞানই এপূর্ণতার নির্ভেজাল ও নিরপেক্ষ উপায়। ছাত্রদের কাজ রাজনীতি করা নয়। তাদের কাজ হচ্ছে অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জন করা। একই সময় দু'টি দায়িত্ব পালন করা যায় না। একই সময় দু'টি কাজ করলে বা দু'টি দায়িত্ব পালন করলে কোনটিই সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। ফলে, কোনটিতেই সফলকাম হয়া যায় না। এটা চরম ব্যর্থতা। এব্যর্থতার পরিণাম হচ্ছে সারাজীবন ধরে অনুশোচনা, অনুতাপ ও আত্মগ্লানি।

যারা রাজনীতিবিদ তারা ছাত্র নয়। রাজনীতি রাজনীতিবিদদের পেশা। তাদের এপেশার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতাসীন হয়ে কাজ করা। এপেশায়ও বিভিন্নপ্রকার পুঁজির প্রয়োজন। কর্মী হচ্ছে প্রধান পুঁজি। ছাত্রদেরকে ছাত্ররাজনীতির নামে পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়। পুঁজির নিজস্ব সত্তা নেই। তা পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পুঁজিই পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ের মূলধন। এমূলধনকে যে যতো দক্ষতার সাথে বিনিয়োগ করতে পারে তার ততোই লাভ। রাজনীতিতে দলীয় নেতারা হচ্ছে পুঁজিপতি। তারা ছাত্ররূপ মূলধনকে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগ করে। মূলধনের কোন স্বকীয়তা নেই বিধায় তা হতে যেলাভ আসে তা পুঁজিপতিদেরই। ছাত্ররূপ মূলধনেরো কোন স্বকীয়তা নেই। এটার লাভের মালিক হচ্ছে দলীয় নেতারূপ পুঁজিপতিরা। তাই, ছাত্ররা কারো পুঁজি হিসেবে নিয়ন্ত্রিত ও বিনিযুক্ত হয়াটা কোনভাবেই কাম্য নয়। ছাত্ররা হচ্ছে দেশের ও জাতির আশাপ্রত্যাশা। তারা সুশিক্ষার দ্বারা এআশাপ্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটাবে - তাদের অভিভাবকদের থেকে শুরু করে সবাই এটা চায়। তাই, তাদের কাজ হচ্ছে রাজনীতিবিদদের পুঁজি না হয়ে দেশের ও জাতির আশাপ্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটানো। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে রাজনীতি জানা ও বুঝা যায়। রাজনীতি জানা ও বুঝা এবং করা এককথা নয়। রাজনীতি বুঝা ও জানা পেশা নয়। কিন্তু, করাটা পেশা। যারা রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা রাজনীতিবিদ। ছাত্ররা রাজনীতিবিদ নয়। তাই, রাজনীতি তাদের পেশা নয়। পেশার সম্পর্ক হচ্ছে কর্মজীবনের সাথে। ছাত্রজীবন কর্মজীবন নয়। এজীবন হচ্ছে অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের দ্বারা জানা ও বুঝার জীবন। এজীবনে তারা অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের দ্বারা সবকিছু জানবে ও বুঝবে এবং কর্মজীবনে পেশায় নিয়োজিত হয়ার জন্যে প্রস্তুতিগ্রহণ করবে। নাগরিকে হিসেবে দেশের বিষয়াদি জানার অধিকার সবার আছে। ছাত্ররাও নাগরিক। তারা বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা পড়ে রাজনৈতিক জ্ঞান আহরণ করতে এবং গণযোগাযোগের সব মাধ্যমে রাজনৈতিক অবস্থা ও হালচাল জানতে ও বুঝতে পারে। কর্মজীবনে যারা রাজনীতিবিদ হবে তারা এজ্ঞানকে পুঁজ হিসেবে বিনিয়োগ করতে পারবে এবং যারা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত

www.pathagar.com

হবে তারাও নাগরিক হিসেবে তাদের এজ্ঞানকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদিতে ও জনগণের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যুবক। তাদের যে মনোবল, উদ্দীপনা ও আবেগ আছে অন্যান্যের তা নেই। তাদের স্বপ্ন হচ্ছে একটি সুন্দর দেশ যেটাতে থাকবে না অবিচারঅত্যাচার, শোষণনির্যাতন, অসম বণ্টন, অভাবঅনটন, প্রতারণাপ্রবঞ্চনা, মোনাফেকিগাদ্দারি, বেকারত্ব ও অশান্তি। কিন্তু, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পুঁজি হয়ে তারা এসব দূর করতে পরছে না। এসব দূর করার দায়িত্ব তাদের যারা রাষ্ট্রপরিচালনের দায়িত্বভারগ্রহণ করে। ছাত্ররা এদায়িত্ব প্রাপ্ত হয় না। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে কোন রাজনৈতিক দলের পুঁজি না হয়ে রাষ্ট্রপরিচালনের দায়িত্বভারগ্রহণের জন্যে ছাত্রাবস্থায় অধ্যবসায়ের সাথে অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেদেরকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা।

পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যেসংগ্রাম ও আন্দোলন সেটাকে একটি স্বাধীন দেশে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্যে সংগ্রাম ও আন্দোলনের সাথে এক করে দেখা যায় না। পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে দলমতনির্বিশেষে জাতির সবাইকে এক পতাকাতলে সমবেত হতে হয় এবং সবাই হয়ও। সেক্ষেত্রে যুবক হিসেবে ছাত্রদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়। যুগেযুগে সব পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে যুবকেরা যে দুর্বার ও দুর্দমনীয় ভূমিকা পালন করেছে তা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। যুবকদের এভূমিকা বিজাতীয়দের বিরুদ্ধে। তাদের এভূমিকা আগ্রাসনবাদ, সম্প্রসারণবাদ, উপনিবেশবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে। তাদের এভূমিকা হচ্ছে সংগ্রাম ও আন্দোলন, কেননা এ দু'টি ব্যতীত পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। এসংগ্রাম ও আন্দোলনে একটিই উদ্দেশ্য থাকে। তা হচ্ছে স্বাধীনতা। কিন্তু, একটি স্বাধীন দেশে ছাত্রদের একটি উদ্দেশ্য থাকতে হয়। তা হচ্ছে নিজেদেরকে নিজেদের দেশপরিচালনের দায়িত্বভারগ্রহণের জন্যে শিক্ষাদীক্ষায় ও জ্ঞানার্জনের দ্বারা ছাত্রাবস্থায় পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করা। একটি দেশে রাজনীতি এবং সংগ্রাম ও আন্দোলন এককথা নয়। রাজনীতির সম্পর্ক হচ্ছে নীতির সাথে এবং সংগ্রাম ও আন্দোলনের সম্পর্ক হচ্ছে ধ্বংসের সাথে। অন্যের প্রভুত্বকে ধ্বংস না করে স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। তাই, সেক্ষেত্রে সংগ্রাম ও আন্দোলন প্রয়োজন। একটি স্বাধীন দেশকে গড়তে হয়। সেটাকে অগ্রগতির ও উৎকর্ষের পথে এগিয়ে নিতে হয়। এগুলো ধ্বংসের দ্বারা সম্ভব নয়। কাজেই, একটি স্বাধীন দেশের রাজনীতিতে বিভিন্ন দল তাদের নীতির স্বপক্ষে কাজ করবে এবং জনমত গড়ে তুলবে। জনগণ যেদলের নীতি ও কর্মসূচি ভালো মনে করবে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে সেদলকেই গ্রহণ করবে। এসব না বুঝে ছাত্ররা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রলোভনে পড়ে সংগ্রাম ও আন্দোলন করাটা হচেছ নিজেদের ও দেশের

www.pathagar.com

ক্ষতিসাধন করা। ছাত্ররা শিক্ষিত। তারা শিক্ষার মূল্য বুঝা দরকার। তাদের শিক্ষার যথার্থ মূল্য হচ্ছে তারা কোন রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার না হয়ে দেশকে শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার দ্বারা সংহতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করা। এটাই হতে হবে তাদের সংগ্রাম ও আন্দোলন। তারা এটাতে জয়যুক্ত হলে সব স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ ও মহলকে চিরতরে বিদায় নিতে হবে এবং তারা এচেতনা উজ্জীবিত রাখতে পারলে স্বাধীনতা অর্থবহ ও সার্থক হবে এবং এটার সুফল আপনাআপনি বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘরেঘরে পৌছবে ও বাইরের কোন প্রভাব দেশে পড়তে পারবে না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের আচারআচরণ সাধারণত একরকম নয়। শিক্ষিত লোকের আচারআচরণ অশিক্ষিত লোকের মতো হলে উভয় ধরনের লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না, অর্থাৎ শিক্ষিত লোক অশিক্ষিত লোকের মতো হয়। অশিক্ষিত লোককে সঠিকভাবে পরিচালনের দায়িত্ব শিক্ষিত লোকের। ছাত্ররা শিক্ষিত বিধায় শিক্ষার মর্যাদা রক্ষা করে চলবে এবং এমন কাজ করবে না যাতে অশিক্ষিত ও সাধারণ লোক তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও অসহিষ্ণু হয়। রাজনীতির নামে যখন ছাত্ররা দলাদলি, মারামারি, হানাহানি, গোলাগুলি ও সন্ত্রাস শুরু করে তখন তাদের শিক্ষা ও নীতির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং তাদের প্রতি আশাআকাঙ্ক্ষা নিরাশায় পর্যবসিত হয়।

শিক্ষাঙ্গন শিক্ষার জন্য পবিত্র স্থান। এশিক্ষাঙ্গনে সুশিক্ষাই পারে শিক্ষার মর্যাদা ও নীতি অক্ষুণ্ন রাখতে। এশিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসাঙ্গন, অস্ত্রাঙ্গন এবং হানাহানি, গোলাগুলি, মারামারি ও দলাদলির অঙ্গনে পরিণত হলে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয় এবং নষ্ট পরিবেশে সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ দুরূহ হয়। সুষ্ঠু পরিবেশে সুশিক্ষার মাধ্যমে উন্নত মানসিক বিকাশের জন্যে শিক্ষাঙ্গনকে অন্যকোন অঙ্গনে পরিণত করা যাবে না। ছাত্ররা এটা অনুধাবনের ও উপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনকে পূতপবিত্র রেখে নিজেদের উন্নত মানসিকতার ও চরিত্রের বিকাশ ঘটানোটা অপরিহার্য। শুধু শিক্ষিত লোকের ক্ষেত্রে রাজনীতি সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক সুস্থমস্তিষ্কের অধিকারী নাগরিকের ক্ষেত্রে রাজনীতি উদার ও উন্মুক্ত। তাই, যেসব ছাত্র সরাসরি রাজনীতি করতে চায় তারা শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন দলের হাতিয়ার না হয়ে দলের নেতা বা সদস্য হয়ে স্বাধীনভাবে রাজনীতি করতে পারে। তবু, শিক্ষাঙ্গন ও রাজনীতির অঙ্গনকে একটি অঙ্গনে পরিণত না করাটা শ্রেয় এবং দেশ, জাতি, জনতা ও ছাত্র সবার জন্য হিতকর ও মঙ্গলজনক। এ হিতকর ও মঙ্গলজনক পরিবেশ ও অবস্থা সৃষ্টির জন্যে ক্ষমতাসীন দলসহ বিভিন্ন দলের শুভবুদ্ধির প্রয়োজন। অশুভবুদ্ধির ফলেই শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসাঙ্গন ও অস্ত্রাঙ্গনে পরিণত হয়। অশুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক স্বার্থপর। তারা নিজেদের স্বার্থের জন্যে সবকিছু করতে পারে। কথায় বলে যে, ব্যক্তির চেয়ে দল বড় ও দলের চেয়ে দেশ বড়।

www.pathagar.com

তাদের কাছে দেশের চেয়ে দল বড় ও দলের চেয়ে ব্যক্তি বড়। শুভবুদ্ধি ছাড়া সবকিছুর ঊর্ধ্বে দেশকে স্থান দেয়া যায় না। যাদের শুভবুদ্ধি আছে তারা ছাত্রদেরকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না এবং তারা হয় নিঃস্বার্থ ও সহায়সম্বলহীন। তাদের স্বার্থ ও সহায়সম্বল হয় দেশ ও দেশের আপামর জনসাধারণ। তারা হয় অনন্য বা অদ্বিতীয়। দেশ ও দেশের আপামর জনসাধারণ ব্যতীত তারা অন্যকিছু বুঝে না। তারা দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্রদের মঙ্গল চায়। তারা চায় ছাত্ররা গড়ে ওঠুক। তারা চায় না যে, ছাত্ররা অধঃপাতে যাক। তাই, তারা ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে জড়িত করে না এবং শিক্ষাঙ্গন ও রাজনীতির অঙ্গনের মধ্যে দূরত্ব বজিয়ে রাখে।

যদিও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়াটা রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য তবুও রাজনীতি ও ক্ষমতানীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। যারা দেশকে ভালোবাসে এবং দেশের মানুষের মঙ্গলসাধন করতে চায় তারা রাজনৈতিক ধারায় রাজনীতি করে। যারা শুধু ক্ষমতা চায় তারা রাজনৈতিক ধারায় রাজনীতি না করে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার ধারায় রাজনীতি করে এবং ছাত্রদেরকে এধারায় জড়িত করে তাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দেয়। রাজনীতি করে ক্ষমতাসীন হয়ার বাস্তব ও আদর্শিক পন্থা হচ্ছে নির্বাচন। তবে, তখনই নির্বাচন নিরপেক্ষ হয় যখন তা অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এটা একটি কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এটা হতে হয় একটি সাংবিধানিক ধারা। এধারায় যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এবং মাঝেমধ্যে 'কু' সংঘটিত না হলে সত্যিকার রাজনৈতিক ধারা অব্যাহত থাকে এবং ছাত্ররাজনীতির কারণে শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রাঙ্গন ও সন্ত্রাসাঙ্গনে পরিণতি হয় না। ফলে, ছাত্ররা সুষ্ঠু ও নির্মল পরিবেশে অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের দ্বারা নিজেদেরকে ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপরিচালনের দায়িত্বগ্রহণের জন্যে উপযুক্ত ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করতে পারে।

ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন দল আছে এবং তাদের এসব দল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট। রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন ও মদদে তারা কাজ করে। এককথায়, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মুরব্বি। তারা তাদের এসব মুরব্বির আদেশ পালনে অত্যন্ত তৎপর। এতৎপরতাতে একছাত্রদল অপর একছাত্রদলের ছাত্রকে হত্যা করতে একটুও ভয় করে না। বিভিন্ন মারপ্যাচে এধরনের হত্যাকারীরা শাস্তি হতে অব্যাহতি পেয়ে যায়। এতে একছাত্রদলের ছাত্র অপর একছাত্রদলের ছাত্রকে হত্যা করাটা একটি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয় এবং একেএকে ছাত্রহত্যা চেইনে চলতে থাকে। ছাত্ররাও মাবাবার সন্তান। চেইনে ছাত্রহত্যার কারণে বহু মাবাবার কোল খালি হচ্ছে এবং তাদের আশাআকাঙ্ক্ষা ভেঙে চূরমার হচ্ছে। অপরদিকে, দেশে একটি নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি

www.pathagar.com

বিরাজ করছে। রাজনীতিবিদেরাও দেশের মানুষ। দেশকে ভালোবাসার প্রমাণ পায়া যায় মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। রাজনীতিবিদেরা দেশকে ভালোবাসলে মানুষকে ভালোবাসা উচিত। তখনই তাদের দেশকে ভালোবাসার প্রমাণ পায়া যাবে যখন তারা ছাত্রদেরকে তাদের রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করবে না এবং চেইনে ছাত্রহত্যার অবসান বা পরিসমাপ্তি ঘটবে। রাজনীতিবিদেরা ছাত্রদেরকে এতো সুযোগ ও প্রশ্রয় দিচ্ছে যে, তারা ছাত্রদেরকে ছাড়া একপাও নড়তে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। ফলে, একার্থে রাজনীতিবিদেরা ছাত্রনেতাদের হাতের পুতুল। কাজেই, একদিকে রাজনীতিবিদেরা ছাত্রদেরকে নাচালে অপরদিকে ছাত্রনেতারাও রাজনীতিবিদদেরকে নাচায়। তাই, বর্তমানে রাজনীতিবিদ ও ছাত্রনেতারা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এটা উভয় রাজনীতির ও শিক্ষার পরিবেশের পরিপন্থী। এধরনের পরিপন্থী পরিবেশ দেশকে স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতি দিতে পারে না।

ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের খুবকাছাকাছি। শিক্ষকরাই ছাত্রদেরকে খুবদ্রুত প্রভাবিত করতে পারে। ছাত্রদের এটি দৃঢ় ও বদ্ধমূল ধারণা যে, তাদের শিক্ষক তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। তাই, যেছাত্রের নিকট যেশিক্ষক প্রিয় সে তার নির্দেশনাই মেনে চলে। শিক্ষকরা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তাদের একেক জন একেক মতাদর্শ ও রাজনৈতিক দলের সমর্থক। ফলে, তাদের মতানুসারে তাদের ছাত্ররাও তাদের নেতৃত্বাধীনে একেক মতাদর্শ ও রাজনৈতিক দলের সমর্থক। এটাই ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি, বিভেদ, মতানৈক্য, উগ্রতা, হিংস্রতা, হানাহানি, সন্ত্রাস, গোলাগুলি ও বোমাবাজির কারণ। আমরা জানি যে, শিক্ষকরাই মানুষ গড়ার কারিগর। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ছাত্রদেরকে গড়া, ধ্বংস করা নয়। কিন্তু, শিক্ষকরা রাজনীতির সাথে জড়িত বিধায় তারা ছাত্রদেরকে পরোক্ষভাবে হলেও তাদের রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করে ধ্বংস করছে। ছাত্রদেরকে এধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে সরকারী কর্মচারীদের ন্যায়, আইন করে হলেও, শিক্ষকরাজনীতি বন্ধ করতে হবে, কেননা শিক্ষকরাজনীতির পথ খোলা রেখে ছাত্রদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। শিক্ষকরাও তাদের ছাত্রদেরকে ভালোবাসলে এবং তাদেরকে দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার হিসেবে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে চেলে শিক্ষকরাজনীতি বিসর্জন দিতে হবে।

যেকোন বিপ্লবের সফলতার মূলে ছাত্রদের মূল্যবান ভূমিকা থাকে। বিপ্লব আমূল পরিবর্তন সাধন করে। এককভাবে কোন আমূল পরিবর্তন সাধন করা যায় না। আমূল

www.pathagar.com

পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন সবার সঙ্গবদ্ধ ও সমবেত প্রচেষ্টা ও কর্ম। ছাত্ররাই ত্যাগতিতিক্ষা স্বীকারের মাধ্যমে এপ্রচেষ্টা ও কর্মকে সার্থক করে তুলতে পারে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ছাত্রদের ভূমিকাই বিপ্লবকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছাতে সক্ষম হয়। বিপ্লবে সব ছাত্রসংগঠন ও রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একই কর্মসূচিতে কাজ করে। একর্মকসূচিতে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ থাকে না। এটাতে থাকে সমষ্টিগত জাতীয় স্বার্থ। এজন্যে বিপ্লব একদিন–না–একদিন সফলকাম হয়ই। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস আমাদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন লক্ষ্যে পৌছতে চায়াটা বিপ্লব নয়। এটা হচ্ছে দলীয় ব্যাপার। এটা সমষ্টিগত জাতীয় ব্যাপার নয়। ওটাই সমষ্টিগত জাতীয় ব্যাপার যেটাতে দলমতনির্বিশেষে একটা জাতির জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ থাকে। তাই, একটা জাতির একেক দলের একেক ব্যাপারকে বিপ্লব বলা যায় না এবং তা কোনভাবেই বিপ্লব নয়। এটা হচ্ছে রাজনীতিতে রাজনৈতিক মতপার্থক্য। একটি দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। এটাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যে, প্রত্যেক দল তার মতের পক্ষে কাজ করে যাবে এবং অধিকাংশ জনসাধারণ যেদলের মতে আকৃষ্ট হবে সেদলই নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে এবং রাষ্ট্রপরিচালনা করবে। জোর করে মত চাপিয়ে দেয়ার ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ার প্রচেষ্টা সংঘাত ও গোলযোগ সৃষ্টি করে। বিপ্লব এবং একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেরানিজেরা সংঘাত ও গোলযোগে অবতীর্ণ হয়াটা এককথা ও বিষয় নয়। রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদেরকে দিয়েই এসংঘাত ও গোলযোগ সৃষ্টি করায়। এসৃষ্টির ফলাফল হচ্ছে অশান্তি, পশ্চাৎপদতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, জনসাধারণের সীমাহীন দুর্ভোগ এবং একশ্রেণীর লোকের ঘোলা পানিতে মাছ ধরার ও জাতীয় অর্থসম্পদ কুক্ষিগত করার সুযোগ। বিপ্লবে সংঘাত ও গোলযোগের প্রয়োজন হয়। এগুলো ব্যতীত বিপ্লব সফলতা অর্জন করতে পারে না। যুবক হিসেবে ছাত্ররাই সংঘাত ও গোলযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই, বিপ্লবে সফলতা অর্জনকে ছাত্ররাই সম্ভবপর করে তোলে। রাজনীতিতে প্রয়োজন সহনশীলতা, ধৈর্য এবং নিজেদের কর্মসূচির প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করার মতো জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা। প্রকৃত ও যথার্থ জ্ঞানের জন্যে প্রয়োজন উচ্চতর সুশিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয় এশিক্ষার আধার বা স্থান। তাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা হবে আদর্শবান, কেননা তাদেরকেই অনুকরণঅনুসরণ করে অন্যসব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। উচ্চতর সুশিক্ষা গ্রহণ করে ফলিত রাজনীতিতে পদার্পণ করলে পর্যায়ক্রমে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী হয়া যায়। এরাজনীতিই উদার ও কল্যাণকর রাজনীতি। এরাজনীতিতে সংঘাত ও গোলযোগ থাকতে পারে না। তাই, ছাত্ররা প্রকৃতার্থে বিপ্লবে

www.pathagar.com

অংশ নিতে কোন আপত্তি ও বাধা নেই। কিন্তু, তারা রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় রাজনীতির নামে সংঘাত ও গোলযোগে লিপ্ত বা জড়িত হয়ে যথার্থ জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত হয়া এবং অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশের অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সবার জন্যে অমঙ্গলজনক। বর্তমানে দেশের ও জাতির সুখসমৃদ্ধির জন্যে ছাত্রদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে এবিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে হবে যে, তারা কেউই সংঘাত, মারামারি, হানাহানি, রক্তারক্তি, সন্ত্রাস, অস্ত্রধারণ, গোলযোগ ইত্যাদি অপকর্মে লিপ্ত হবে না। ছাত্ররা তাদের এবিপ্লবে সফলতা অর্জন করতে পারলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের ও জাতির সুখসমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হবে।

ধ

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ্যনির্ঘণ্ট (সিল্যাব্যাস) ও পাঠ্যক্রম (ক্যারিকিউল্যাম) পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হচ্ছে। বাস্তবে শিক্ষিত লোকের মধ্যে শিক্ষার মান যে কতোটুকু উন্নত হয়েছে তা দেখাও যাচ্ছে না, বুঝাও যাচ্ছে না। সিল্যাব্যাস ও ক্যারিকিউল্যাম রদবদল করাটা যতোসহজ বাস্তবে শিক্ষার মানোন্নয়ন করাটা ততোসহজ নয়। ভালোভাবে লেখাপড়া শিখাতে বলা আর ভালোভাবে লেখাপড়া শিখানো এককথা নয়। ভালোভাবে শিখানোর জন্যে ভালো লেখাপড়াজানা ও আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজন। সবাই ভালোভাবে চলতে এবং ভালো সামাজিক মর্যাদা ও পদমর্যাদা পেতে চায়। এসব মর্যাদার ভিত্তি হচ্ছে ভালো বেতনভাতা ও আনুষংগিক সুবিধাদি। বস্তুত, শিক্ষকদের এসব মর্যাদা ও সুবিধাদি না থাকায় ভালো লেখাপড়াজানা ব্যক্তিরা শিক্ষকতার পেশায় না এসে অন্যান্য পেশা গ্রহণ করে। তাদের কেউকেউ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হয়ে সাময়িকভাবে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত হয়ে অন্যপেশায় সুযোগ পেলে এপেশা ছেড়ে দেয়। সত্যকথা বলতে কি, তারাই এপেশায় থেকে যায় বা আসে যারা সাধারণত তাদের পছন্দানুযায়ী বা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পেশায় যোগদানের সুযোগ পায় না। শিক্ষার মানোন্নয়ন বলতে সিল্যাব্যাস ও ক্যারিকিউল্যামের মানোন্নয়ন বুঝায় না। শিক্ষকের শিক্ষার মান উন্নত হলে শিক্ষার মান উন্নত হয়। শিক্ষার মান অনুন্নত হলে শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান সাধারণত উন্নত হয় না। অতীতের চেয়ে বর্তমানে অনেক শিক্ষার্থী অনেকবেশি নম্বর পাচ্ছে। এটার পেছনে কাজ করছে কিছু ভালো শিক্ষক ও গৃহশিক্ষকের এবং অভিভাবকদের শিক্ষা, পরীক্ষায় আসতে পারে ওরকম সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর যথার্থভাবে তৈরি করে মুখস্থকরণ এবং পরীক্ষার্থীর নিজস্ব মেধা। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরিতে যোগদানকারী এমনএমন কর্মকর্তাও

www.pathagar.com

কর্মকর্তাও আছে যারা নিজেদের মাতৃভাষা বাংলাতেও স্বচ্ছ ধারণা দিয়ে শুদ্ধভাবে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তুলে ধরতে অপটু ও অসমর্থ। করণিক ও অন্যান্যের কথা নাইবা বললাম। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাকাল সমাপনান্তে চাকরিবাকরিতে, রাষ্ট্রীয় কার্যাদি পরিচালনায়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয় এবং তাদের মানানুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদন করে। তাদের উন্নতমানের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে উন্নতমানের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উন্নতজ্ঞান প্রদান করতে পারে উন্নজ্ঞানের অধিকারী শিক্ষক। এজন্যেই শিক্ষকরা হচ্ছে দেশগড়ার কারিগর। দেশকে উন্নত করতে হলে উন্নতজ্ঞানের অধিকারীদেরকেই দেশগড়ার কারিগর, অর্থাৎ শিক্ষক, বানাতে হয়। উন্নত দেশগুলোতে এনিয়মই চালু আছে। উন্নতজ্ঞানের অধিকারীরা সেদিনই শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করবে তারা যেদিন বেতনভাতা ও আনুষংগিক সুবিধাদিসহ একনম্বর সামাজিক মর্যাদা ও পদমর্যাদা পাবে। পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল ও উন্নত শিক্ষার জন্যে সিভিল সার্ভিসে শিক্ষা ক্যাডারকে প্রথম ক্যাডারে পরিণত করতে হবে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব শিক্ষক একক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের জন্যে প্রতিযোগতামূলক পরীক্ষায় যাদের অবস্থান মেধাতালিকায় ওপরের দিকে থাকবে তাদেরকেই একক্যাডারে নিয়োগ করতে হবে। তাদেরকে সবরকমের সুযোগসুবিধা ও পর্যায়ক্রমে সচিবের পদ ও পদমর্যাদা প্রদান করতে হবে। অনুন্নতমানের ও খারাপ বীজ হতে উন্নতমানের ও অধিক ফসল লাভের আশা করাটা অবান্তর। উন্নতমানের ও ভালো বীজ হতে যথার্থ পরিচর্যার দ্বারা উন্নতমানের ও অধিক ফসল লাভ করতে পারাটা সম্পূর্ণরূপে বাস্তব ও স্বতঃসিদ্ধ। ছাত্রছাত্রীরা হলো বীজের মতো। তারা উন্নতমানের ও ভালো না হলে আমরা উন্নতমানের ও ভালো দেশপরিচালনা প্রত্যাশা করতে পারি না। তাদেরকে উন্নতমানের ও ভালো বানাতে হলে, আমি দৃঢ়তার সাথে বলছি, উক্ত পন্থার বিকল্প পন্থা নেই।

শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানগরিমা ও সভ্যতাসংস্কৃতি মানুষের মনুষ্যত্ববোধের বিকাশ ঘটায়। বাস্তবে আমরা দেখছি যে, শিক্ষিতদের অমনুষ্যজনিত বা মনুষ্যত্বহীন কাজ পশুর পশুত্বকেও হার মানাচ্ছে। ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থে বোমা বা ধারালো অস্ত্রের দ্বারা প্রতিপক্ষের লোকের দেহকে ছিন্নভিন্ন করতে ইতস্তত করা হয় না। শিশুদের মাতাপিতার সাথে কলহের কারণে শিশুদেরকে নির্দয় ও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সম্পদ জ্বালিয়েপুড়িয়ে ভস্ম করা হয়। যাদেরকে গুণ্ডা বলা হয় তাদের দ্বারা জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংঘটন করানো হয়। যেস্ত্রী অর্ধাংগিনী তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পশুর হিংস্রতা ও নৃশংসতাও এতোদূর অগ্রসর হয় না। তারা স্বজাতিকে হত্যা করে না। মানুষের এসব নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা দেখে পশুরাও আঁতকে ওঠে। হিংস্রতা হিংস্রতাকে ডেকে আনে। রাজনীতিতে বা অন্যকোন নীতিতে হিংস্রতা দ্বারা কোন মহৎ

www.pathagar.com

কাজ সাধিত বা সম্পাদিত হতে পারে না। হিংস্রতার দ্বারা যেসফলতা আসে তা সাময়িক ও অস্থায়ী। একটি হিংসাত্মক ঘটনা অনেক হিংসাত্মক ঘটনার জন্ম দেয়। এগুলো শৈশব ও কৈশোর পার হলে যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং আনুষংগিক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকে। তাই, হিংস্রতা দ্বারা প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রতিযোগিতা কারো জন্যে আনন্দদায়ক ও সুখকর নয়। এহিংস্রতা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ জড়বাদী শিক্ষায় আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তার পরিণতি। কারোকারো পুঁথিগত শিক্ষা আছে। কারোকারো বাস্তব শিক্ষা আছে। কারোকারো উভয় শিক্ষাই আছে। এশিক্ষা 'সু'– ও হতে পারে, 'কু'–ও হতে পারে। তবে, মানুষ কুশিক্ষার প্রভাবে তাড়াতাড়ি প্রভাবিত হয়। অক্ষরজ্ঞান ছাড়াও শিখা যায়। তাই সব লোকই শিক্ষিত। কেউ সুশিক্ষিত ও কেউ কুশিক্ষিত। সুশিক্ষাই প্রয়োজন। এশিক্ষার আধার হচ্ছে আল্লাহ্প্রদত্ত ধর্ম। এধর্মের ভিত্তি ছাড়া যেশিক্ষা রয়েছে সেটাকে যেকোন দিকে নেয়া যায়।

উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে শিক্ষার প্রয়োজন। বাস্তবে উন্নতি ও অগ্রগতির কাজের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত তারা শিক্ষিত। যারা রাজনীতিতে আছে এবং যারা ক্ষমতাসীন ও রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত তারাও শিক্ষিত এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শিক্ষিত। এরা যা করে তা হয়। এরা ভালো হলে সবকিছু ভালো হয় এবং এরা খারাপ হলে সবকিছু খারাপ হয়। এরাই বলে যে, শিক্ষিতের হার না বাড়লে ভালোকিছু করা সম্ভব নয়। আইন, বিধি, নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব শিক্ষিত লোকের ওপর ন্যস্ত, অশিক্ষিত লোকের ওপর ন্যস্ত নয়। এরা দুর্নীতি ও অপরাধমুক্ত হলে সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। অপরাধ সংঘটনের মূলে এদের স্বার্থ ও যুক্তিপরামর্শ কাজ করে। অন্যায়অবিচার ও বিভিন্নধরনের অপরাধের বিচার শিক্ষিত লোকই করে। তবু, অন্যায়অবিচার ও অপরাধ চলে। এসবের জন্যে অশিক্ষিত লোক দায়ী নয়, শিক্ষিত লোকই দায়ী। কথায় বলে যে, যতোদোষ নন্দঘোষ। অনরূপভাবে, যতোকিছু ঘটে সবকিছু অশিক্ষিত লোকের ঘাড়ে গিয়ে চাপে। বাস্তবে সবকিছু পরিচালনার ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে শিক্ষিত লোকই। শিক্ষিত লোকই আইন ও বিধিপ্রণয়ন করে, শাসনকার্যপরিচালনা করে, অফিসআদালতে চাকরিবাকরি করে, শিক্ষাপ্রদান করে, রাজনৈতিক দল গঠন করে, সংঘসমিতি দাঁড় করায়, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে, আন্দোলনপরিচালনা করে ইত্যাদি। এককথায়, তারা সবকিছুর অগ্রভাগে থাকে এবং অশিক্ষিত লোককে তারাই বিভিন্ন কাজে বিভিন্নভাবে ডেকে আনে। তাই, শিক্ষিত লোক নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ও নৈতিকতার দিশারী হলে এবং আইনকানুন ও নিয়মপদ্ধতির উর্ধ্বে কোনপ্রকার দুর্নীতি তাদেরকে স্পর্শ না করলে অশিক্ষিত লোক কোনভাবেই আর্শীবাদ না হয়ে অভিশাপ হতে পারে না এবং শিক্ষিত লোকের পক্ষে এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে তারা নিজেদের অপকর্ম, অপকীর্তি ও

www.pathagar.com

ঢাকার জন্যে অশিক্ষিত লোককে কথায়কথায় সামনে উপস্থিত করে। অশিক্ষিত লোক ওল্টাপাল্ট কিছু করলে শিক্ষিত লোকের অনুকরণ ও অনুসরণেই করে থাকে। মস্তান, সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী, অস্ত্রধারী, চাঁদাবাজ ইত্যাদি সবার পেছনে যে শিক্ষিত লোকের যোগসাজশ ও মদদ নেই এবং তাদের কারণেই যে এদের জন্ম হচ্ছে না তা প্রায়সব শিক্ষিত লোক বুকে হাত রেখে প্রত্যয়ের সাথে হল্‌ফ করে বলতে পারবে না। তবু, বলা হয় যে, নিরক্ষরতার কারণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। এটা আত্মপ্রবঞ্চনা বা সজ্ঞানে স্বীয় মনকে প্রবোধদান। রাজনীতিবিদেরাই জনগণের সাথে মিশে। তাই, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে নিয়ে এআত্মপ্রবঞ্চনার বেড়াজালকে ছিন্নভিন্ন করা।

১১-৮-৯২ ইং তারিখের " আজকের কাগজে" প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে ৪৬ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং ৩৮ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। অথচ, আমাদের গ্রামের সংখ্যা হচ্ছে ৬৮ হাজার। মানুষের কয়েকটি মৌলিক অধিকারের মধ্যে শিক্ষাও একটি। এঅধিকারটি নিশ্চিত বা নিরাপদ করার সরল পন্থাটি বহুদূরে থেকে যাচ্ছে। এপন্থাটি হচ্ছে শিশুদের জন্মের সাথেসাথে সুনির্দিষ্ট কর্মচারীদের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট অফিসে তাদের জন্মতারিখসহ স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করানো। প্রত্যেক শিশুর একটি করে জন্মতারিখ কার্ড তার জন্মস্থানের ও স্থায়ী আবাসের ঠিকানাসহ তার মাতাপিতার নিকট, তারা যেখানেই যায়-না-কেন বা থাকে-না-কেন, থাকবে। এতালিকা ও কার্ড অনুযায়ী যেদিন তার বিদ্যালয়ে যাবার বয়স হবে সেদিন হতে তার বিদ্যালয়ে যায়া নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যালয়ে যে ভালো দিকটির প্রতি তার আকর্ষণ ও ঝোঁক পরিলক্ষিত হয় তাকে সেদিকেই পরিচালিত করতে হবে। এতে যে যেকাজের উপযুক্ত সে সেটাকে তার পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কাজ সরকারী পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করানোর নিমিত্ত রাজনীতিবিদদের অকপট ও জোরালো তৎপরতার প্রয়োজন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের উৎকর্ষসাধন। শিক্ষার দ্বারা সবকিছু জানা ও বুঝা যায়। শিক্ষা নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের এক অতুলনীয় ও অনন্য উপায়উপকরণ। শিক্ষা সদ্‌গুণাবলী ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করে এবং যাবতীয় খারাপ চিন্তা ও কর্ম, কলুষতা, অপরাধ, অবিচারঅনাচার ও পাপাচার থেকে মুক্ত রাখতে পারে। শিক্ষা ভ্রাতৃত্ববোধ, মমত্ববোধ, দয়া, সম্মান ও স্নেহ জাগ্রত করতে পারে। যে আর্থিক মোহ লোভলালসা, অহংকার, পদলিপ্সা, অপরাধ, পাপ, দুর্নীতি, অসদাচরণ, সংঘাত, সন্ত্রাস, হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পরচর্চা, ইত্যাদির জন্ম দেয় শিক্ষা তা অপনয়ন বা দূর

www.pathagar.com

করতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকরিবাকরি না পেলে হতাশাগ্রস্ত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করা নয়। নিজত্ববিকাশের ও স্বকীয়তার ধারক ও বাহক হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার ফলে কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় এবং অবৈধ ও অপ্রাসঙ্গিক হস্তক্ষেপ ও প্রতারণাপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত থাকা যায়। শিক্ষা শ্রমকে মর্যাদা দিতে শিখায়। শিক্ষিত হলেই, চাকরিবাকরির ক্ষেত্র সীমিত বিধায়, সব শিক্ষিত লোককে চাকরিবাকরি দেয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। শিক্ষিত হয়ে শ্রমকে মর্যাদা দিয়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হবে — এটাই শিক্ষার আদর্শ। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এউদ্দেশ্য ও আদর্শ কার্যকর করতে ব্যর্থ। এব্যর্থতার জন্যে দায়ী ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা। এটা অবশ্য একটা কথা যে, ধর্মনিরপেক্ষ অন্যান্য দেশ সবদিক দিয়ে উন্নত। শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে আদর্শভিত্তিক। রাশিয়া ও আমেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তাদের স্বস্ব আদর্শ সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া, সাম্যবাদ ধর্মবিহীন এবং পুঁজিবাদী আদর্শ ধর্ম বলতে যে চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান তার সাথে সামঞ্জস্যহীন। আমরা মোসলমান। আমাদের আদর্শ হচ্ছে ইসলাম বা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। তাই, আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে আমাদের আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থা। এ আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থার কারণেই আমরা সবদিক দিয়ে অনুন্নত ও ক্ষতিগ্রস্ত। তাই, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী আদর্শভিত্তিক হয়াটা বাঞ্ছনীয়। নৈতিক উন্নতির জন্যে এটার চেয়ে আরকোন উত্তম আদর্শ নেই। এ আদর্শিক শিক্ষা প্রাথমিক স্তর হতে প্রদান করা প্রয়োজন। নরম মাটি দিয়ে ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোন জিনিস বানানো যায়। কোমলমতি বালকবালিকাদেরকেও ইচ্ছা অনুযায়ী তৈরি করা যায়। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার নামে আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে এদেরকে অনৈতিক শিক্ষা ও যেশিক্ষার সাথে আমাদের আদর্শের কোনপ্রকার সংযোগসম্পর্ক নেই সেশিক্ষা দেয়া হয়। এশিক্ষার মধ্যে আছে প্রতারণামূলক কাল্পনিক গল্প, অসাধুতা, শঠতামূলক বিষয়, প্রতারণা, পরের সম্পদ হস্তগত করার পদ্ধতি, ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধির বুদ্ধি ইত্যাদি। তাই, এদেরকে আমাদের ইসলামী আদর্শে এমন ছড়া, কবিতা, গল্প, রচনা, প্রবন্ধ ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যেটাতে আছে সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাধুতা, অধ্যবসায়, মহত্ব, মহানুভবতা, সমাজসেবা ইত্যাদি। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব ছড়া, কবিতা, গল্প, রচনা, প্রবন্ধ, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে সেগুলো, বলা হতে পারে, ভাষা শিক্ষার ও বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টির জন্যে। ইসলামী আদর্শের ছাড়া, কবিতা, গল্প, রচনা, প্রবন্ধ, ইতিহাস ইত্যাদিতে শুধু ভাষাই শিক্ষা হয় না, নৈতিকতা ও শুভবুদ্ধিরো জন্ম হয়। যে আদর্শিক শিক্ষায় একই সাথে ভাষা, নৈতিকতা ও শুভবুদ্ধি পায়া যায় সেটাইতো সর্বোত্তম বা সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর জন্যে তাদের ধর্মাদর্শের আলোকে ছড়া, কবিতা, গল্প, রচনা. প্রবন্ধ.

www.pathagar.com

ইতিহাস ইত্যাদি শিখানো হবেতো হোক, তাতে কারো আপত্তি ও বিরুদ্ধযুক্তি থাকার কিছুই নেই, কেননা আমাদের ধর্মাদর্শ অন্যান্য ধর্মাদর্শের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করে। এতে অন্তত মোসলমানদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধ হতে আস্তেআস্তে দূরে সরিয়ে নেয়ার জন্যে বিশ্বজোড়া সর্বতোমুখী চক্রান্ত ও উদ্ভাবিত নকশা বাধাপ্রাপ্ত হবে। এজন্যে আমাদের শিক্ষাপ্রচারের মাধ্যমগুলোতে ইসলামী আদর্শভিত্তিক অনুষ্ঠানাদি ও কর্মসূচির ব্যাপক প্রতিফলন ঘটানো অত্যাবশ্যক। তাছাড়া, সাহিত্যকর্ম শুধু ভাষার কর্ম নয়, শিক্ষার কর্মও। সাহিত্যের উদ্দেশ্য শুধু ভাষায় পাণ্ডিত্য বা উৎকর্ষ অর্জন করানো নয়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষার মাধ্যমে বিভিন্নধরনের জ্ঞানের কিরণ বিকিরণ করাও সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা নিয়ে লিখাও সাহিত্যকর্ম, কেননা সাহিত্যে যেমন ভাষাপ্রয়োগ করতে হয় এগুলোতেও তেমনি ভাষাপ্রয়োগ করতে হয় এবং এভাষা যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয় না তা নয়।

শিক্ষাজীবনে প্রাপ্তশিক্ষা বাস্তবজীবনে কাজে আসছে না। শিক্ষাজীবনে শিক্ষার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য থাকে জ্ঞানার্জন, শিষ্টাচার, সততা, সাধুতা, উন্নত মানসিকতা, দেশপ্রেম, জনসেবা, দেশোন্নয়ন, নৈতিকতা, মহৎজীবন, পরের জন্যে ত্যাগতিতিক্ষাস্বীকার, পবিত্র আদর্শ, আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরশীলতা, অধ্যবসায়, শ্রমের মর্যাদা, সময়ের মূল্য, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, আইনমান্যতা, পাপাচার হতে মুক্তি, অপরাধ সংঘটন না করা, সামাজিক সুবিচার সুনিশ্চিত করা, দারিদ্র্যদূরীকরণ, নিরক্ষরতাদূরীকরণ, অসৎসংগবর্জন, সত্য ও ন্যায়ের জন্যে জীবনবিসর্জন, মানুষকে ভালোবাসা ইত্যাদি। বাস্তবজীবনে এসব বিষয়বস্তুর ও উদ্দেশ্যের কার্যকারিতা থাকে না। বাস্তবজীবনে এগুলোর কার্যকারিতা থাকলে মানুষ স্বর্গরাজ্যে বসবাস করতে পারে। বাস্তবজীবনে এগুলোর কার্যকারিতা না থাকার জন্যে কারা দায়ী তা দেখা প্রয়োজন। বাস্তবজীবন থেকে প্রবীণেরা বিদায় নেয় এবং নবীনেরা এজীবনে প্রবেশ করে। তাই, এজীবনে প্রবীণেরা আগে এবং নবীনেরা পরে। মানুষ স্বভাবগতভাবে বাস্তবজীবনে অনুকরণপ্রিয়। এঅনুকরণপ্রিয়তা ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে। প্রবীণেরা ভালো হলে নবীনেরা তাদেরকে ভালোভাবে অনুকরণ করে। প্রবীণেরা খারাপ হলে নবীনেরা তাদেরকে খারাপভাবে অনুকরণ করে। কথায় বলে যে, আগের হাল যেখান দিয়ে যায় পরের হালো সেখান দিয়ে যায়। তাই, বাস্তবজীবনে প্রবীণদের সংস্রব ও সাহচর্যে এসে নবীনেরা তাদের শিক্ষাজীবনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে এবং শিক্ষাজীবনে প্রাপ্তশিক্ষা বাস্তবজীবনে কাজে না আসার জন্যে প্রবীণেরাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী ও দোষী। চাকরী, রাজনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদিতে নবীনেরা প্রবীণদের পদাংক অনুসরণ করছে। তারা নবীনদেরকে যেভাবে যেপথে পরিচালিত করছে তারা সেভাবে সেপথে পরিচালিত হচ্ছে। তাই, প্রবীণেরা সত্যপথে চললে নবীনেরাও সত্যপথে

www.pathagar.com

চলবে এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদেরা সত্যাসত্যের আলোকে রাজনীতি করলে ও নবীন রাজনীতিবিদদেরকে এরকম রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিত করলে রাজনৈতিক অংগন কলুষমুক্ত হবে। তাছাড়া, বইপুস্তকে যেশিক্ষাই থাকে–না–কেন মানুষ বাস্তবে বিদ্যমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিকেই অনুসরণ ও অনুকরণ করে। আমাদের বইপুস্তকের শিক্ষার সাথে বাস্তবতার কোন মিল খুঁজে পায়া যায় না। তাই, বইপুস্তকে যা শিখে বাস্তবে তা ভুলে যেতে হয়। এজন্যেই পড়ে জানা ও শিখার প্রতি মানুষের ঝোঁক নেই বললেও চলে। তখনই পড়ার প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হবে যখন পড়াতে যেশিক্ষা পায়া যায় সেটার সাথে বাস্তবতার মিল বা সামঞ্জস্য থাকবে। জ্ঞানানুশীলনের দিকে ছাত্রদের ঝোঁক ও প্রবণতা দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। তারা যতো মেধাবীই হোক–না–কেন তাদের চিন্তাজগত বিস্তৃত নয়। তারা পরিস্থিতি ও বর্তমান অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে আগ্রহী এবং চলেও। বর্তমানে তারা দেখছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের ও জ্ঞানের অবমূল্যায়ন হচ্ছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের জ্ঞানগরিমা ও বুদ্ধিশালিতা কাজে লাগাতে পারছে না। তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি গ্রহণ করতে কেউই রাজী নয়। তাদের এবং সাধারণ লোকের মধ্যে তেমনকোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তারা অস্বস্তিকর ও বিভীষিকাময় পরিবেশে ছটফট করছে। অপরদিকে, যারা গলাবাজি করছে, রাজনীতির নামে উচ্ছৃঙখলতা ও বিশৃঙখলায় মেতে থাকতে পারছে, সর্বপর্যায়ে তাল মিলাতে পারছে, যেখানে যা করার দরকার করছে, চাটুকারিতায় পারদর্শিতা দেখাতে পারছে এবং দুর্নীতি করছে ও করতে দিচ্ছে তারাই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে বহাল থাকতে পারছে। যেদিন ছাত্ররা দেখবে যে, বাস্তবে জ্ঞানী ব্যক্তিদের ও জ্ঞানের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেদিন আমরা তাদেরকে যেভাবে সঠিক পথে পেতে চাচ্ছি সেভাবে তাতে পাবো, কেননা তারা তখন অধ্যবসায়ী হবে ও জ্ঞানানুশীলনে আত্মনিয়োগ ও মনোনিবেশ করবে এবং তাদের মধ্যে কোন অপকর্ম ও অপবিদ্যালাভে লিপ্ত হয়ার প্রবণতা লোপ পাবে।

আমরা জানি লোকজন শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত না হলে দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ব্যাহত হয়। তবে, শিক্ষার উন্নয়নে অসম ও বৈষম্যমূলক শিক্ষাই একটি বড়ধরনের প্রতিবন্ধকতা। সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেপদ্ধতিতে ও মানে লেখাপড়া শিখানো হয় বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেপদ্ধতিতে ও মানে লেখাপড়া শিখানো হয় না। অপরদিকে, ক্যাডেট কলেজগুলোতে যেপদ্ধতিতে ও মানে লেখাপড়া শিখানো হয় সরকারী কলেজগুলোতে সেপদ্ধতিতে ও মানে লেখাপড়া শিখানো হয় না। একদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অপরদিকে কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়। যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তাদের শিশুরাই কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে পড়তে পারে। বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একই বিদ্যালয়ে একশ্রেণী হতে অপরশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলে বাধ্যতামূলকভাবে সবধরনের ফী দিয়ে নতুনভাবে ভর্তি হতে হয়। তাছাড়া, মাসিক টিউইশন ফী ও অন্যান্য ফী ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক অধিকহারে

www.pathagar.com

ধার্য করা হয়। এসব ব্যাপারে সহজসরল ও আর্থিক অভাবঅনটনগ্রস্ত অভিভাবকেরা সম্পূর্ণভাবে অসহায়ত্বে থাকে। তাদের প্রতিবাদ করার কিছুই থাকে না। কেউকেউ সাহসিকতার সাথে একটুআধটু প্রতিবাদ করলে তাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কোনকোন শিক্ষক বিদ্বেষপোষণ করে এবং তাদেরকে নানাভাবে নাজেহাল করতে আদৌ ইতস্তত করে না। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও নানাপ্রকার ফী-র নামে প্রচুর টাকা আদায় করা হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্যাণ্টনমেণ্ট ও রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে আছে। শিক্ষার কোন নির্মল ও বিশুদ্ধ পরিবেশ নেই। মাসের পর মাস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকে। নির্ধারিত সময় পরীক্ষা হতে পারে না। তাই, সামর্থবান ব্যক্তিরা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে বিদেশে পড়াচ্ছে। এসব কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃষ্টবৈষম্যের কুফল জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন ও পরিব্যাপ্ত করে ফেলছে। শিক্ষার মতো একটি মৌলিক অধিকারে কোনপ্রকার বৈষম্য কোনধরনের দৃষ্টিকোণ থেকেই অভিপ্রেত নয়। জাতীয় স্বার্থে যেকোন মূল্যে এঅধিকার সংরক্ষণ করতে হয়। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একধরনের পদ্ধতিতে ও মানে পরিচালনার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোনপ্রকার বৈষম্যমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকতে পারবে না। এমনিতেই সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাগুলোর মধ্যে রাতদিন প্রভেদ। তদুপরি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় চললে সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যেপ্রভেদ বিরাজ করবে তা কতোটুকু মঙ্গলজনক বা হিতকর হবে তা পরীক্ষানিরীক্ষা করে ও ভেবেচিন্তে দেখা জরুরী। প্রাইভেট পড়ানোর কারণে শ্রেণীতে উত্তমরূপে পড়ানো হয় না, দায়সারা গোছে পড়ানো হয়। এমনিতেই বছরের প্রায়সময় বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। তারপরো কোনকোন শিক্ষক ঠিকমতো ক্লাস নেয় না এবং তা ফাঁকি দিতে পারলেই তারা,মনে হয়, বেঁচে যায়। অথচ, শ্রেণীতে উত্তমরূপে পড়ালে অনেক ছাত্রছাত্রীই ভালো ফলাফল করতে পারে। এব্যাপারে প্রায় শিক্ষকেরই আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার অভাব। প্রায়সব অভিভাবকই গরীব। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়ার ব্যবস্থাগ্রহণ করতে অপারগ ও অক্ষম। বাস্তবে তারা তাদেরকে সাধারণভাবে ভরণপোষণ করতেও হিমশিম খায়। প্রাইভেট পড়ানোর প্রথাটাও শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিরাট বৈষম্য বা অসমতা সৃষ্টি করে রেখেছে। তাই, প্রাইভেট পড়ানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে ও আইনত বা আইনের বিচারে দণ্ডনীয় হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব ছাত্রছাত্রী একধরনের পোশাক পরিধান করবে। এতে ধনী ও গরীবের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অন্তত বা কমসেকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন বৈষম্য পরিলক্ষিত হবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রীদেরকে সঠিকভাবে পাঠ দিতে এবং তা আদায় করে নিতে হবে। ধনীগরীবনির্বিশেষে যেছাত্রের বা যেছাত্রীর যেদিকে ঝোঁক তাকে সেদিকে তৈরি করতে হবে। এতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিযোগিতা চলবে এবং তারা

www.pathagar.com

কর্মক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী স্থান পেয়ে যাবে ও সুষম ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসে যাবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা যাবে না। সরকারী পর্যায়েই এটা দূর করা সম্ভব। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরাই বাস্তবে সরকার। তাই, তাদেরকেই এবৈষম্য দূর করতে হবে এবং বিরোধী রাজনীতিবিদেরা তাদেরকে জাতীয় স্বার্থে এব্যাপারে পূর্ণোদ্যমে সহযোগিতাপ্রদান করতে হবে।

গ্যাজেটেড পদে নিয়োগের জন্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয়। এপরীক্ষা মেধাযাচাইর পরীক্ষা। যেসব প্রশ্নের উত্তর বইপুস্তক খুললেই পায়া যায় সেসব প্রশ্ন দিয়ে যেপরীক্ষা নেয়া হয় তাতে মেধাযাচাই করা সম্ভব হয় না। মেধাযাচাইর জন্যে এমন সব প্রশ্ন করতে হয় যেগুলোর উত্তর নিজের জ্ঞান ও মেধা না থাকলে কোন বইপুস্তক দেখে ও মুখস্থবিদ্যা দিয়ে লিখতে পারবে না। একবার যেপ্রশ্ন করা হবে পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও সেপ্রশ্ন থাকতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ, একবার একটি রচনা থাকবে 'প্রবাদের উপকারিতা'। এরচনা কোন বইপুস্তকে পায়া যাবে না। প্রবাদ সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েই রচনাটি লিখতে হবে। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে এরচনাটির পুনরাবৃত্তি হতে পারবে না। অন্যএকবছর একটি রচনা থাকবে 'লেখার অভ্যাস'। এধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে নিজে গুছিয়ে লিখতে পারতে হবে। এজন্যে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যনির্ঘণ্ট ১ম শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত এমন হতে হবে যাতে ৫ম শ্রেণী হতে প্রত্যেক ছাত্রের বা ছাত্রীর নিজের ভাষায় লিখার পরিশীলন বা চর্চা শুরু হয় এবং ১০ম শ্রেণীতে গিয়ে সে যা-ই লিখবে শুদ্ধরূপে নিজের ভাষায় লিখতে পারবে। নৈব্যক্তিক প্রশ্নের প্রচলন থাকবে। তবে, কোন্ বিষয়ে কতকগুলো নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরে প্রস্তুতি নিতে হবে সেসংখ্যা প্রশ্ন ও উত্তরসহ নির্ধারিত থাকতে পারবে না। পুরো সিল্যাব্যাস থেকেই প্রশ্নকর্তা তার বুদ্ধিবত্তা খাটিয়ে প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করবে। পূর্ববতী বছর যেসব প্রশ্ন করা হবে পরবর্তী বছরে সেসব প্রশ্ন থেকেও বাধ্যতামূলকভাবে প্রশ্ন করতে হবে। একটি প্রশ্নের কয়েকটি ভুল উত্তরের সাথে একটি সঠিক উত্তর দিয়ে সঠিক উত্তরটির পাশে বা ওপরে টিক দেয়ার পদ্ধতি যথার্থ নয়। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এককথায় বা একবাক্যে দেয়ার পদ্ধতিই যথার্থ হবে। এপদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীরা প্রতিটি বিষয়ে পুরো সিল্যাব্যাস অধ্যয়ন করতে হবে এবং তারা কিছুটা হলেও জ্ঞানার্জন করতে পারবে। ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরীক্ষাপদ্ধতি ঠিক রাখা বা পরিবর্তন করা যাবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছাত্রদেরকে জ্ঞানদান করা। তাই, সরকার ও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তানুযায়ী পরীক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তিত ও সংশোধিত হবে এবং তারা সস্তা পাসকে, কেননা সস্তার তিন অবস্থা, গুরুত্ব না দিয়ে যেকোনভাবে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানানুশীলনকে প্রাধান্য ও মূল্য দিতে হবে। তা হলে ওপরের দিকে ছাত্রছাত্রীরা যতোই জ্ঞানার্জন করবে তারা তাদের নিজের ভাষায় যেকোন বিষয় ততোই পরিচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করতে পারবে। এতে উচ্চ শিক্ষায় ও গবেষণাকর্মে

www.pathagar.com

কোনপ্রকার অসুবিধা হবে না এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শুধু মেধাবী পরীক্ষার্থীরাই কৃতকার্য হবে ও রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সুচারুরূপে সম্পাদিত হবে। এটা জাতীয় নীতি হতে হবে। রাজনীতিবিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় নীতিগুলো প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে যাতে এগুলো বারবার পরিবর্তিত না হতে পারে।

কোনকিছু যথার্থভাবে ব্যক্ত করার জন্যে শুদ্ধ বাক্যগঠন, শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ অপরিহার্য। ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু পড়ে ও জানে ; কিন্তু তাদের প্রায়সবাই শুদ্ধ বাক্য, শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণের দ্বারা কোনকিছু যথার্থভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কেও তাদের তেমনকোন জ্ঞান নেই। তারা বুঝে না ও জানে না যে, কখন ও কেন দু' বা ততোধিক শব্দ একশব্দ হয়ে যায় এবং কখন ও কেন সেগুলো আলাদাআলাদা থাকে। যতো জ্ঞানই থাকে–না–কেন তা যথার্থভাবে ব্যক্ত করতে না পারলে তেমন সুফলদায়ক হয় না। তাই, ব্যাকরণকে এমনভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা শুদ্ধ বাক্যগঠন, শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে সবকিছু যথার্থভাবে ব্যক্ত করার জ্ঞানলাভ করতে পারে। পাঠ্যপুস্তক যথাযথভাবে বুঝার জন্যে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। পাঠ্যপুস্তক বুঝার জন্যেই নোটবই প্রয়োজন, কেননা খুবকমসংখ্যক ছাত্রছাত্রীই গৃহশিক্ষকের নিকট পড়াশুনা করতে পারে এবং খুবকমসংখ্যক শিক্ষকই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদেরকে আন্তরিকতার সাথে পাঠদান করে থাকে। তাই, তারা বাধ্য হয়ে নোটবই পড়ে এবং এটার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু, ছাত্রছাত্রীরা পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে বুঝতে পারে না যে, অধিকাংশ নোটবইতে বিষয়বস্তুগুলো সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ নয় এবং এগুলো অশুদ্ধ বাক্য, বেঠিক শব্দপ্রয়োগ ও অশুদ্ধ বানানে ভরপুর। তাছাড়া, এগুলোতে যতিচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ নেই। তাই, প্রতিটি নোটবইতে বিষয়বস্তুগুলো সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে এবং তাতে অশূদ্ধ বাক্য, বেঠিক শব্দপ্রয়োগ, অশুদ্ধ বানান ও যথাযথ যতিচিহ্নের অভাব থাকতে পারবে না। যার নোটবই এসব নিয়মরীতিবহির্ভূত হবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তি নির্ধারিত থাকতে হবে। শিক্ষকরাও ছাত্রছাত্রীদেরকে শুদ্ধ বাক্য, সঠিক শব্দপ্রয়োগ, শুদ্ধ বানান ও যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদান করতে বাধ্য থাকতে হবে। যারা সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ দূষণীয় বলে নির্দেশ দেয় তারা নিজেরাই এ দু'ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দূষণীয় কাজ করে থাকে। চলিত ভাষায় কোনকোন শব্দের প্রয়োগ একেকজন একেকভাবে করে থাকে। কেউকেউ সাধু ভাষায় প্রয়োগকৃত কোনকোন শব্দকে, সেগুলোর চলিত রূপ থাকা সত্ত্বেও,চলিত ভাষায় প্রয়োগ করে থাকে। যুক্তবর্ণের এবং 'ি' ও 'ী' যুক্ত শব্দের বানানে প্রভেদ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এসব বানান যে যেভাবে লিখে সেটার বিপরীতে অন্যকেউ লিখলে সেগুলো তার নিকট গ্রহণীয় হয় না। জাতীয়

www.pathagar.com

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকগুলোতেও নানাপ্রকার ভুল পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব কারণে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে এমন একটি অভিধান রচনার প্রয়োজন যেটাতে সর্বপ্রকারের শব্দ, ভুলক্রমেও কোন একটি শব্দ বাদ পড়তে পারবে না, শব্দের উভয় সাধু ও চলিত রূপ, যুক্তবর্ণের এবং 'ি' ও 'ী' যুক্ত শব্দের স্থিরিকৃত বানান, দু' বা ততোধিক শব্দের একশব্দে প্রয়োগপদ্ধতি, দু' বা ততোধিক শব্দের পৃথকপৃথক প্রয়োগপদ্ধতি, শব্দের বিভিন্ন রূপ ইত্যাদি থাকবে। এঅভিধানটি জাতীয়ভাবে অনুমোদিত থাকবে এবং এটাই হবে আমাদের ভাষাতত্ত্বের মূল দলীল। আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে এদলীলের পরিপন্থী ব্যবহৃত সাধু ও চলিত রূপ, শব্দের বানান ও প্রয়োগ ইত্যাদি হবে অশুদ্ধ ও অগ্রহণীয়। এতে আমাদের ভাষাপ্রয়োগে সামঞ্জস্য আসবে এবং আমাদের ভাষা হবে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর, শ্রুতিমধুর, খেয়ালখুশিমতো প্রয়োগবিবর্জিত ও বিভেদশূন্য।

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। সংস্কৃতি জাতীয় সত্তাকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেয়। নিজের সংস্কৃতি ছেড়ে অন্যের সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হয়াটা আত্মঘাতী। এধরনের সংস্কৃতিই হচ্ছে অপসংস্কৃতি বা সংস্কৃতি বিষয়ে আদর্শচ্যুতি। সংস্কৃতি হচ্ছে স্বীয় আদর্শিক ক্রিয়াকলাপের বহিঃপ্রকাশ। ইসলাম হচ্ছে আমাদের আদর্শ। আমাদের আদর্শিক ক্রিয়াকলাপ ইসলাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যান্য জাতির আদর্শিক ক্রিয়াকলাপের সাথে আমাদের আদর্শিক ক্রিয়াকলাপের স্বাতন্ত্র্য আছে। এস্বাতন্ত্র্যের কারণে আমরা তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করতে পারি না। তবু, আমরা অন্যান্যের সংস্কৃতি গ্রহণ করতে গিয়ে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হারাতে যাচ্ছি। এজন্যেই অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি আমাদের জন্যে অপসংস্কৃতি। তাতে দ্বিমতপোষণ করার মতো কিছুই নেই। সাধারণত দু'টি কারণে আমাদের সংস্কৃতিতে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। যারা মোসলমানদের অগ্রগতি ও উন্নতি কোনভাবেই চায় না এবং বুঝে যে, ইসলামী পুনর্জাগরণের ফলে বিশ্বে মোসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব চলবে তারা তাদের মদদপুষ্টদের দ্বারা আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার প্রয়াসে আমাদের মধ্যে তাদের সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিচ্ছে বা তাদের সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। রণাংগনে পরাজয় কোন জাতির প্রকৃত পরাজয় নয়। সাংস্কৃতিক পরাজয়ই একটি জাতির প্রকৃত পরাজয়। সাংস্কৃতিক অংগনে পরাজিত হলে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার সবচেয়ে বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। যেসব জাতি হৃত বা হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছে তারা তাদের সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের দ্বারাই তা করতে সক্ষম হয়েছে। তারা তাদের জাতীয় ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই তাদের জাতির লোককে ঐক্যবদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছে। যেসব জাতি সাংস্কৃতিক অংগনে বা ক্ষেত্রে তাদের স্বকীয়তা বজিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি ও প্রাচুর্য নিঃশেষ হয়েছে। তারা তাদের স্বকীয়তা ভুলে বিজাতীয় সংস্কৃতির কাছে

www.pathagar.com

পরাভূত হয়েছে বা হার মেনেছে। অর্থলিপ্সার কারণে অপসংস্কৃতি অর্থোপার্জনের বাহন হচ্ছে। যারা এটাকে অর্থোপার্জনের বাহন বানাচ্ছে তারা তাদের স্বার্থটাকে আমাদের জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে, সাংস্কৃতিক পরাজয় যে বড় পরাজয় বা পরাভব তা ভুলে গিয়ে, স্থান দিচ্ছে। একজাতির সংস্কৃতি একবার অপরজাতির মধ্যে খুঁটি গাড়তে বা অনড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে সেজাতির মধ্যে সহজেই তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে তাকে আধিপত্যে বা কবলে আনা যায়, যেটা যুদ্ধ করেও সম্ভব হয় না। সেজন্যেই বলা হয় যে, সাংস্কৃতিক পরাজয়ই বড় পরাজয়। অশ্লীল নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা, অনুষ্ঠান, চালচলন, পোশাকাশাক, পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন, বইপুস্তক ইত্যাদি অপসংস্কৃতির বাহন। এসব বাহন আণবিক ও পরমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও ভয়াবহ, কেননা এসব অস্ত্র ভূখণ্ড ও মানুষ ধ্বংস করে এবং এসব বাহন একটি জাতির আদর্শে আঘাত হানে ও তাকে অন্যআদর্শে টেনে নিতে সক্ষম হয়। একটি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে সীমান্তে জাগ্রত প্রহরীদের দ্বারা প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করা হয়। সার্বক্ষণিক প্রহরায় এব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জাতীয় বাজেটের সিংহভাগ প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় করার পরো এটার দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখতে হয়। এব্যাপারে কোনপ্রকার অবহেলা ও শৈথিল্য যেমন একটি জাতির পরাধীনতা ডেকে আনতে পারে, সাংস্কৃতিক সীমান্ত রক্ষায়ও একই ব্যবস্থা ও সতর্কতা অবলম্বন না করলে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ দ্বারা তেমনি তার সর্বনাশ ও বিপদাত্মক অবস্থা হতে পারে। আমরা নৈতিক ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের, উচ্ছৃঙ্খলতার ও অপরাধপ্রবণতার কথা বলছি। প্রকৃতপক্ষে, এগুলোর জন্যে অপসংস্কৃতিই বহুলাংশে দায়ী। জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নতির স্বার্থে নৈতিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদৃঢ়তার স্বার্থে অপসংস্কৃতি রোধ করাটা অপরিহার্য।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তস্থাপনে মোসলমানদের স্থান সবার অগ্রে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তারা ইসলামী আদর্শিক চেতনায় আত্মত্যাগের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তাদের আত্মত্যাগ তাদেরকে অমরত্বদান করে এবং জাতি তাদেরকে সম্মানের সাথে স্মরণ করে। অথচ, তাদেরকে বিজাতীয় সাংস্কৃতিক পদ্ধতিতে স্মরণ করা হয়। প্রভাতফেরি, যুবকযুবতীদের নগ্নপদে দলবেঁধে হাঁটা, কোন স্মৃতির বেদিমূলে পুষ্পার্ঘ অর্পণ, আলপনা আঁকা এবং অশ্লীল নাচগান ও আমোদআহ্লাদ মোসলমানদের কৃষ্টি নয়। তাদেরকে এসব বিজাতীয় সাংস্কৃতিক পদ্ধতিতে স্মরণ করাতে তাদের বিদেহ বা অশরীরী আত্মা সন্তুষ্ট না হয়ে অসন্তুষ্ট হয়। আমাদের সংস্কৃতি হচ্ছে তাদের রূহের বা আত্মার মাগফেরাতের জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়া বা প্রার্থনা করা, কোরআন তেলাওয়াত বা পাঠ করা ও দুঃস্থদেরকে সাহায্য করা। এধরনের মহৎ সংস্কৃতিগুলো বাদ দিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণে প্রয়াত বা পরলোকগত মহৎ ব্যক্তিদেরকে

www.pathagar.com

স্মরণে কোনপ্রকার সার্থকতা নেই। ইসলামী আদর্শে এসব অপসংস্কৃতি পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন, কেননা এগুলো ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী ও মোসলমানদের জন্যে ক্ষতিকর। যাদের প্রয়াত বা পরলোকগত মহৎ ব্যক্তিদেরকে স্মরণ করার ধর্মীয় পদ্ধতি নেই তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যেভাবেসেভাবে তাদেরকে স্মরণ করতে পারে। কিন্তু, আমাদের ধর্মীয় পদ্ধতি আছে বিধায় আমরা তাদের ইচ্ছার শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি না। একটি জাতির প্রতিচ্ছবি হচ্ছে তার সংস্কৃতি। একটি জাতি এবং তার বর্তমান ও অতীত ঐতিহ্যকে জানার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে তার সংস্কৃতি। যেসংস্কৃতিতে তার আপন স্বকীয়তার প্রতিফলন ঘটে না তা তার সংস্কৃতি হতে পারে না। এধরনের সংস্কৃতি পরানুকরণ বা অপসংস্কৃতি। আন্তঃদেশীয় পর্যায়ে একটি জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতি উপস্থাপন করে। এটাতে সে গর্ববোধ করে। জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক ফোরামে পৃথিবীর বহু উন্নত ও অনুন্নত দেশের নেতারা তাদের কথাবার্তায়, আচারআচরণে, পোশাকাশাকে ও সংস্কৃতিতে নিজেদের স্বকীয়তা তুলে ধরতে দ্বিধা না করে গর্ববোধ করে। সাংস্কৃতিক ব্যাপারে আপন স্বকীয়তাবোধের পরিচয়দানে কোনপ্রকার দুর্বলতা মনে আনাটা হীনম্মন্যতা বা হীনমানস। হীনম্মন্যতা বা হীনমানস আপন সংস্কৃতির বিলোপসাধন করে এবং অপসংস্কৃতির আগমন বা প্রাদুর্ভাব ঘটিয়ে নিজেদেরকে প্রকৃত আদর্শ হতে চ্যুত করে। জাতির সুষ্ঠু চিন্তাচেতনার এবং বিশ্বাসসঞ্জাত মার্জিত ও কর্ষিত কর্মকাণ্ড ও আচারাচরণের বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে সংস্কৃতি। একটি জাতির বিশ্বাস, জীবনবোধ ও ঐতিহ্যের অভিব্যক্তি তার সংস্কৃতিতে ঘটে। তার বিশ্বাসের পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক কর্মকাণ্ড, আচারাচরণ ও যুবচরিত্রবিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপ তার জন্যে পুরোপুরি অপসংস্কৃতি। নৃত্যে আপত্তিকর, রুচিহীন ও দৃষ্টিকটু দৃশ্য, তরুণী ও যুবতীদের লেংগট বা নেংটি পরে লাখো পুরুষদর্শকের সামনে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ, নাট্যোৎসবে বিজাতীয় চেতনার প্রকাশ ইত্যাদি মোসলমানদের বিশ্বাস, জীবনবোধ ও ঐতিহ্য নয়। এধরনের সংস্কৃতি যুবচরিত্রকে ধ্বংস করে এবং নৈতিক, চারিত্রিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। মহিলারা পুরুষদেরকে বেশি খায়ায়ে ও তারা নিজেরা কম খেয়ে আনন্দ পায়। তারা পুরুষসদস্য ও সন্তানদেরকে ভালো খাবার খায়ায়ে নিজেরা খারাপ খাবার খেয়েও আনন্দ পায়। মহিলাদের সন্তান হলে তাদেরকে আলাদা ঘরে রাখা হয় এবং তাদের খাওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হয়। পরীক্ষার সময় ডিম ও কলা খায়াটা নিষিদ্ধ থাকে। এসব ও এজাতীয় আরোঅনেক বিষয় সংস্কৃতি নয়। এগুলো হচ্ছে লোকাচার ও কুসংস্কার। আমরা রাজতন্ত্র ও সামন্তবাদকে প্রগতিশীল, আধুনিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘৃণার চোখে দেখলেও সেগুলোর ব্যবস্থাধীন বিচিত্র মাধ্যমগুলোকে ঘৃণা না করে সংস্কৃতির নামে গ্রহণ করছি। অথচ, যারা এগুলোকে অপসংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত করছে

www.pathagar.com

তাদেরকে রক্ষণশীল, কূপমণ্ডুক বা সংকীর্ণচেতা, প্রগতিবিরোধী ও সেকেলে বলে তিরস্কার করা হচ্ছে। খোদ মহানবী (সঃ) সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও পরিচয় ঠিক রাখার জন্যে মোসলমানদেরকে বলেছেন। দু'সহোদর ভাইর মধ্যেও দু'জনের আচারাচরণ দু'রকম হয়ে থাকে। একভাই অপরভাইর আচারাচরণ গ্রহণ করে না। দু'সহোদর ভাইর যেখানের এঅবস্থা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও জাতির সেখানে কি অবস্থা তা এমনিতেই বোধগম্য হয়ার কথা। তাই, একধর্মাবলম্বীকে অপরধর্মাবলম্বীর বা একজাতিকে অপরজাতির আচারাচরণের দিকে আকৃষ্ট করানোর প্রবণতা কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়।

একই বিষয় বিভিন্ন সংবাদপত্র বিভিন্নভাবে তুলে ধরে। এটা সাধারণত দলগত ও মতগত কারণে হয়ে থাকে। এতে সঠিক বিষয়টি দূরে সরে যায় এবং পাঠকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে মতিস্থৈর্য বা সংকল্পের দৃঢ়তা হারায়। প্রত্যেক পত্রিকায় সপ্তাহে একদিন দু'এক পৃষ্ঠা বিয়ে হয়া, বিয়ে ভাঙা, গোপন কথা, ইত্যাদির ওপর থাকে। এগুলো আনন্দদায়ক ও আনন্দময় হলেও নৈতিকতার পরিপন্থী। নৈতিকতার স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলো আনন্দমুখর হলেও নৈতিকতার পরিপন্থী খবরাখবর প্রচার না করাটাই ভালো। বিশেষতঃ প্রধানপ্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব সংবাদপত্র থাকে। তাদের সংবাদপত্রগুলোতে পরিবেশিত সংবাদাদি তাদের স্বার্থভিত্তিক। যেদলের যেপত্রিকায় যেসব সাংবাদিক কাজ করে তারা সাধারণত সেদলেরই সমর্থক। সেদলের সমর্থক না হলে তারা সেপত্রিকায় সুযোগ পায়ার কথা নয়। দলীয়ভিত্তিতে পরিবেশিত সংবাদ দলের স্বার্থেই হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকাগুলো সরকারের, অর্থাৎ ক্ষমতাসীনদের, দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে সংবাদ পরিবেশন করে। তাই, সংবাদপত্রে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের পরিসর সীমিত থেকে যায়। তাছাড়া, সরকার সমর্থিত পত্রিকাগুলো অন্যান্য পত্রিকা হতে সুযোগসুবিধা অতিরিক্ত মাত্রায় পেয়ে থাকে এবং সেসব পত্রিকার প্রতি দমননীতিও চলে। রাজনীতিবিদেরা তাদের স্বস্ব পত্রিকায় দলমতনির্বিশেষে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ খবর প্রকাশ করতে হবে এবং ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা যেকোন পত্রিকার প্রতি যেকোন খোঁড়া অজুহাতে বা নিজেদের স্বার্থে দমননীতি পরিহার করতে হবে। আমাদের দেশে এমনএমন খবরের কাগজ আছে যেগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মোসলমানদের প্রতি অবর্ণনীয় নিপীড়ন ও অত্যাচরের তেমনকোন খবর স্থান পায় না, কেননা, আমার মনে হয়, এরকম খবরকে কার্যকর ও পুরোপুরিভাবে স্থান দিতে গেলে মোসলমানদের প্রতি সমর্থন এসে যায়। অথচ, এসব খবরের কাগজ মোসলমানদের দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। অপরদিকে, পৃথিবীর বিভিন্ন খবরের কাগজে, মোসলমানদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত না হয়া সত্ত্বেও, এসব খবর প্রকাশ করে মোসলমানদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে ও তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি বিশ্বমানবতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতে এটা পরিষ্কার যে, এরা

www.pathagar.com

মোসলমান হয়েও মোসলামানবিদ্বেষী এবং বিশ্বের মোসলমানদের হালাবস্থা এরা এদের পাঠকদের নিকট তুলে না ধরে গোপন রাখতে চায়। এটা মোসলমান হয়ে মোসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যধরনের রাজনীতি। এধরনের রাজনীতির উদ্দেশ্য সব রাজনীতিবিদের বুঝা ও উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক। টেলিভিশন হচ্ছে একটি প্রচারমাধ্যম। এটার বিভিন্ন প্রোগামের মধ্যে সংবাদ/খবর ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশের জন্যে এসব প্রোগাম নিরপেক্ষ হতে হয়। সংবাদে শুধু ক্ষমতাসীন দলের কথাবার্তা না পড়ে বিরোধী দলগুলোর কথাবার্তাও পড়তে হয় এবং ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিবিদদের ন্যায় বিরোধী দলের রাজনীতিবিদদেরকেও টেলিভিশনের পর্দায় দেখাতে হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সর্বদা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে সুযোগ না দিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিকে সুযোগ দিতে হয়। এতে গণতান্ত্রিক বিকাশ সাধিত হয় এবং জনসাধারণ বিভিন্ন জন থেকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জেনে মোটামুটিভাবে নির্মল ধারণা সৃষ্টি করে তা বাস্তবে কাজে লাগানোর জন্যে চেষ্টা করতে বা সচেষ্ট হতে পারে।

ন

অনেক ক্ষেত্রেই আইন, বিধি, নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে দুর্নীতি করা হচ্ছে। যারা এগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সাধারণত তারাই এটা করছে। এগুলোর পরিপন্থী কাজ করলে এবং তা কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হলে ব্যবস্থাগ্রহণের কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয়। যাদেরকে এদায়িত্ব দেয়া হয় তাদের সাথে যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয় তারা যোগাযোগরক্ষা করে। তারা এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে তাদের চাহিদামোতাবেক টাকা না দিলে তাদের বিরুদ্ধে কোন্ আইন, বিধি বা পদ্ধতির আওতায় কার্যক্রম শুরু হবে তা তাদেরকে দেখিয়ে দেয়া হয় এবং তারা যে শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাবে না তা তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। এতে তারা তাদেরকে তাদের চাহিদামোতাবেক টাকা দিলে তারা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি বা পদ্ধতি এড়িয়ে যায় বিধায় তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে না এবং তাদের কোনপ্রকার শাস্তি হয় না। অপরদিকে, আইন, বিধি, পদ্ধতি ইত্যাদি কার্যকর করার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এরকম ভয়াবহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের কিছুই করার থাকে না, কেননা তারা যতোখানে যায় সবখানে একই অবস্থা। এজন্যেই বলছি আইন, বিধি, পদ্ধতি ইত্যাদি দুর্নীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমরা যেভাবেই দেখি-না-কেন এটা প্রত্যেকের নিকট সুস্পষ্ট যে, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সর্বস্তরে ও

www.pathagar.com

পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুর্নীতির ব্যাপকতার কারণে আমরা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এদুর্নীতিরোধই আমাদের সব সমস্যার সমাধানের পথ সুগম করতে পারে। সে-ই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি, দেশোদ্রোহী ও দেশের শত্রু যে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে দুর্নীতিতে জড়িত। তাই, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, আমাদের স্বাধীনতা ও উন্নতির রক্ষাকবচ হচ্ছে দুর্নীতিবাজদেরকে, আপনপর ভেদাভেদের কথা ভুলে গিয়ে, সমূলে নিপাত করা। দুর্নীতিবাজদেরকে সমূলে নিপাত করার জন্যে আইন ও তার প্রয়োগ অত্যন্ত সহজসরল ও সরাসরি হতে হবে। দুর্নীতির খবর পায়ার সাথেসাথে সেসম্পর্কে আনুষংগিক রেকর্ড, তথ্য এবং তথ্য ও রেকর্ডনির্ভর সাক্ষ্য গ্রহণ করে তা প্রমাণিত হলে জনসম্মুখে দুর্নীতির মাত্রা অনুযায়ী দণ্ডপ্রদান, সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত, করতে হবে। এটা রূঢ় কোনকিছু নয়। এটা দেশের, জাতির ও জনগণের স্বার্থে আইনানুগতা, ন্যায়ানুগতা ও নিরপেক্ষতা। এটার বিকল্প ব্যবস্থা নেই। এটার বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে গেলে ব্যবস্থার পর ব্যবস্থা আসবে ; কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে যে কখনো পৌঁছা যাবে না তা পরীক্ষা করে দেখার কোন প্রয়োজন নেই।

দুর্নীতির অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের জনগণের নিকট জবাবদিহিতার অবিদ্যমানতা ও অনুপস্থিতি। বর্তমান নিয়মরীতিমোতাবেক প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের নিকটই চেতে হয়। ফলে, তেমনকোন প্রতিকার পায়া যায় না। জনগণ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্যে আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু, আদালাতের রায় কার্যকর করার দায়িত্ব কর্মচারীদের। তারা সর্বসময় তা কার্যকর করে না বিধায় জনগণ দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়। এটা হতে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের জনগণের সাথে আইনানুগ প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা। তারা সরকারী পর্যায়ে জনগণের সাথে আইনানুগভাবে এপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হবে যে, তাদের দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণ সরাসরি আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে এবং তারা আদালতের রায়ের অন্যথা করবে না ও তারা তা করলে আদালত তাদেরকে সংশ্লিষ্ট ধারায় দণ্ডপ্রদান করতে পারবে। তারা জনগণের সাথে এপ্রতিজ্ঞায়ও আবদ্ধ হতে হবে যে, তাদের কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারা আদালতের রায় অনুযায়ী তার ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য থাকবে এবং তা না করলে আদালত যে দণ্ডপ্রদান করবে তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। এধরনের একটি প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার কার্যকারিতায় আনতে পারলে প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, দৌরাত্ম্য ও পাপাচরণ বহুলাংশে লাঘব হবে।

যারা বড়াকারের দুর্নীতি করে, অর্থাৎ যাদের দুর্নীতির সাথে কোটিকোটি টাকা জড়িত, তারা তাদের দুর্নীতির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের একাংশ খরচ করে তা হতে

www.pathagar.com

অব্যাহতি পেয়ে যায়। এ একাংশ অর্থ কারা পায়? নিশ্চয়ই এঅর্থ সাধারণ লোক এবং ছোটমোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পায় না। এটা অবশ্যই সর্বোচ্চ পর্যায়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও কর্মকর্তারা পেয়ে থাকে। কাজেই, এরাই বড়াকারের দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা ও হোতা। অপরদিকে, এরাই দেশের ও জাতির কর্ণধার এবং নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। যারা দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা ও হোতা তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সর্বদাই ত্রুটিযুক্ত। ত্রুটিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা কোন জাতির মঙ্গলসাধন করতে পারে না। তাই, আমাদের জাতীয় অনগ্রসরতার জন্যে এরাই পুরোপুরিভাবে দায়ী। এরা দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা ও হোতা না হলে সবাই 'দুর্নীতি' শব্দটি ভুলে যায়ার কথা। অথচ, যত্রতত্র বা যেখানেসেখানে এশব্দটি উচ্চারিত হচ্ছে। এরা একদিকে দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা ও হোতা এবং অপরদিকে দুর্নীতি দমনের জন্যে আইন ও নিয়ম করে। তাই, এরা দু'মুখো সাপের মতো। আমরা জানি যে, দু'মুখো সাপ যাকে দন্তাঘাত বা দংশন করে সে বাঁচে না ও বাঁচতে পারে না। এদের দুর্নীতির দংশনে আমরা জাতি হিসেবে মৃতপ্রায় ও আমাদের দেশ নির্জীবতা কেটে ওঠতে পারছে না। জাতীয় স্বার্থে এ দু'মখো সাপগুলোকে কি করা প্রয়োজন সেসিদ্ধান্ত নেয়ার ভার জনতার ওপর ছেড়ে দিলাম। আমাদের দেশে কোটিকোটি টাকা খরচ করে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্যে যেবাঁধ দেয়া হয় তা ভেঙে যায়, রাস্তা তৈরি করার বা মেরামত করার অল্পদিন পর তা নষ্ট হয়ে যায়, দালান নির্মাণ করার পর তা নষ্ট হতে থাকে এবং যেকোন কাজ ত্রুটিপূর্ণ হয়। আমরা কথায়কথায় জাপান, চীন, আমেরিকা ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর দৃষ্টান্ত দেই। সেসব দেশে আমাদের দেশের মতো বাঁধ ভেঙে যায় না, রাস্তাঘাট ও দালানকোঠা সহজে নষ্ট ও ধ্বংস হয় না এবং কোন কাজ ত্রুটিপূর্ণ হয় না। দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাৎই এপার্থক্যের অন্যতম কারণ। উন্নত দেশেগুলোতে এসব কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ব্যক্তিরা দুর্নীতিমুক্ত থাকে। কিন্তু, আমাদের দেশে এরাই দুর্নীতি বেশি করে। তাই, আমাদের দেশে একই উন্নয়নমূলক কাজ বারবার করতে হয় বিধায় একদিকে দুর্নীতির পর দুর্নীতি চলতে থাকে এবং অপরদিকে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারছে না।

যে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ করে সে ঘুষপ্রদানকারীর নিকট দুর্বল থাকে। ফলে, তাকে ঘুষপ্রদানকারীর সুবিধা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। এটাকে ব্যাঙ্গার্থে বলা হয় ঘুষকে হালাল করা। তবে, হারাম হারামই থাকে। তা কখনো হালাল হতে পারে না। ঘুষপ্রদানকারীর সাথে ঘুষগ্রহণকারীর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এসম্পর্কের কারণেও ঘুষের ক্ষেত্র ব্যাপক হচ্ছে। ইসলামের দৃষ্টিতে ঘুষপ্রদানকারী ও ঘুষগ্রহণকারী উভয়ই সমান অপরাধী। তাই, ঘুষগ্রহণকারীর সাথেসাথে ঘুষপ্রদানকারীরো শাস্তি হয়াটা

www.pathagar.com

বাঞ্ছনীয়। যদিও ঘুষগ্রহণকারীরা তা গ্রহণ না করলে ঘুষপ্রদানকারীরা তাদেরকে তা দিতে পারে না তবুও ঘুষপ্রদানকারীদেরো শাস্তি হলে তারা তা প্রদান করতে কিছুটা হলেও চিন্তাভাবনা করবে। ঘুষপ্রদানকারীরা ইজ্জত পাচ্ছে। তারা ঘুষগ্রহণকারীদের সাথে দেখাসাক্ষাতে ও কথাবার্তায় যথেষ্ট ইজ্জত পায়। অপরদিকে, যারা ঘুষপ্রদান না করে এটার বিরোধিতা করে তারা অবহেলিত হয়। তারা যেখানে যেকাজে যায় যারা সেখানে নিয়োজিত থাকে তারা তাদেরকে দেখলে অসন্তুষ্ট হয় এবং আপদ মনে করে না পারতে কথাবার্তা বলে। অপরদিকে, ঘুষগ্রহণকারীরা যেখানে যায় যারা সেখানে নিয়োজিত থাকে তারা তাদেরকে দেখলে উৎফুল্ল হয় এবং খোশ মেজাজে আলাপচারিতা শুরু করে। তাছাড়া, যারা ঘুষপ্রদান করতে পারে তাদের সামাজিক মর্যদা ও প্রতিপত্তি খুববেশি, কেননা তারা সব কাজ পারে বলে তাদেরকে সবাই সম্মান ও ইজ্জত করে। অন্যদিকে, যারা ঘুষপ্রদান না করে সেটার বিরোধিতায় সোচ্চার তাদের প্রতিপত্তি নেই ও তাদেরকে ঝামেলাসৃষ্টিকারী মনে করা হয়। এরকম সমাজব্যবস্থায় আমরা কি করে দেশোন্নয়ন আশা করতে পারি।

কোনকোন কর্তৃপক্ষ কোনকোন কাজে বিনা কারণে প্যাঁচ লাগিয়ে দেয়। যেকাজ যেভাবে হবার সেটা সেভাবে হতে না দিয়ে প্যাঁচ লাগনোর পেছনে যেকারণটি বিদ্যমান থাকে তা হচ্ছে ঘুষগ্রহণের ও দুর্নীতি করার প্রবণতা ও প্রবল বাসনা। যেকোন কাজে প্যাঁচ না লাগালে তা যথাসময়ে যথাযথভাবে হয়ে যায়। প্যাঁচ লাগালে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। এসব জটিলতার দোহাই দিয়ে ঘুষগ্রহণ করাটা সহজ হয়। জটিলতা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কোন প্রতিকার পায়া যায় না, বরং জটিলতার জট বাড়তে থাকে। এজটিলতা দূর করার জন্যে যারা আইন ও নিয়মের কঠোর প্রয়োগের দ্বারা জটিলতাসৃষ্টিকারীদেরকে শায়েস্তা করতে উদ্যোগী তারা অদক্ষ, অকর্মণ্য ও ট্যাকট্লেস বলে পরিগণিত। এরকম একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে একটা সৎ, মহৎ ও ত্যাগী সরকারই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। আমাদের দেশে দুর্যোগদুর্বিপাক লেগেই আছে। এসব মোকাবেলা করার জন্যে বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্যসহযোগিতা পায়া যায়। কিন্তু, বাস্তবে নানাধরনের দুর্নীতি ও কারচুপির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এটার একাংশও পায় না। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যথাযথভাবে বিলিবণ্টন হলে পরবর্তীতে তাদের কোন অসুবিধা থাকতে পারে না। কিন্তু, বাস্তবে তাদের কোন সমস্যারই সমাধান হয় না এবং অপরদিকে একাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভাগ্যে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে। সম্পদশালী ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ, প্রকৌশলী, ডাক্তার, পদস্থ কর্মকর্তা ও যেসব অফিসে দুর্নীতি করার সুযোগসুবিধা আছে সেসব অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পদ সম্পর্কে বাস্তবানুগ ও ন্যায়ানুগ স্যারভে চালালে দেখা যাবে যে তারা কে কি পরিমাণ সম্পদের অধিকারী এবং তাদের কে

www.pathagar.com

কিভাবে এসম্পদের মালিক হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে, তারা দুর্নীতির মাধ্যমে এসম্পদের মালিক হয়েছে। তাই, দুর্নীতি একটি মারাত্মক ও ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। তবে, এব্যাধি দুরারোগ্য নয়। এব্যাধি হতে আরোগ্যলাভের সহজসরল পন্থা হচ্ছে যে সরকার বলতে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা এরোগ নিরাময়ের ডাক্তার হিসেবে সর্বপ্রথমে নিজেরা এরোগ হতে মুক্ত থেকে এরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে নিরাময় করতে হবে এবং তারা এমন প্রতিষেধক প্রয়োগ করতে হবে যাতে কেউ এরোগে আক্রান্ত না হয়। এপ্রতিষেধক হচ্ছে আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিধিবিধানের বাস্তবায়ন। অনেক বড়বড় বাড়ির মালিক লোন নিয়ে বাড়িনির্মাণ দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর যোগসাজশে বিভিন্ন কর ফাঁকি দিয়ে থাকে। এমনএমন বাড়ি আছে যেগুলোর সামান্য কাজ লোনের টাকায় হয়েছে। অথচ, বাড়ির মালিকেরা পুরো বাড়িই লোনের টাকায় নির্মিত দেখিয়ে চালিয়ে দিচ্ছে। এসব বাড়ি যে কালো টাকায় নির্মিত তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। অপরদিকে, যারা সুদ ও লোনের ঝামেলায় না জড়িয়ে অনেক কষ্টেসৃষ্টে ও ধনী আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় সাধারণভাবে বাড়ি নির্মাণ করে তাদের ওপর, লোন না থাকার কারণে, উচ্চহারে বিভিন্ন করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। এসব কর পরিশোধ করতে তাদের যে কি নিদারুণ কষ্ট হয় তা, তারা ও আল্লাহ্ ব্যতীত, অন্যান্যরা আদৌ উপলব্ধি করতে চায় না। ফলে, সৎপন্থা নিরুৎসাহিত হয়ে অসৎপন্থা উৎসাহিত হচ্ছে এবং সৎলোক সীমাহীন দুঃখকষ্টে আছে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে সবরকমের অসৎপন্থা প্রতিহত করে সৎ-পন্থাকে উৎসাহিত করা ও সেটার জন্যে সর্বতোভাবে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।

বিভিন্ন অফিসে, ব্যাংকে ও সংস্থায় পদোন্নতির পরীক্ষায় ও চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি চলে। এদুর্নীতির মধ্যে রয়েছে ঘুষ, সুপারিশ, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, ক্ষমতার প্রভাব,ইত্যাদি। ফলে, জুনিয়র সিনিয়রকে-সিউপ্যারসিড করে, মেধা উপেক্ষিত হয়, অযোগ্য ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হয়, অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, কর্মসম্পাদনের সুষ্ঠু পরিবেশপরিস্থিতি বিনষ্ট হয়, অযোগ্য ব্যক্তি যোগ্য স্থান দখল করে নেয়, ঘুষগ্রহণের কাজ খোলাখুলি চলে, কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রতা চলতে তাকে, ক্ষোভ ও হতাশার কারণে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিরুৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, দলাদলির বীজ অংকুরিত হয়, অশান্তি চলতে থাকে ও নানা অঘটন বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। এগুলো জাতীয় চরিত্র ধ্বংস করে ও জাতীয় অগ্রগতির পথে অপ্রতিরুদ্ধ অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। যারা ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে এদিকসেদিক হতে নানা কায়দার ভেতর দিয়ে, অর্থাৎ দুর্নীতির মাধ্যমে, ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা হয় তারা পুনরায় নানা কায়দার ভেতর দিয়ে দুর্নীতির কারণে সিনিয়রিটি নিয়ে উচ্চপর্যায়ে চলে যায়। এতেও প্রশাসনিক কাজকর্ম বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এবিপর্যয়ের ফলে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ হয় ;

www.pathagar.com

কিন্তু জাতীয় স্বার্থ বর্ণনাতীতভাবে ক্ষুণ্ন হয়। যারা ফিল্ডে কর্মসম্পাদনে হস্তক্ষেপের সমালোচনা করে এবং এহস্তক্ষেপের ফলে নীতিগতভাবে কাজ করাতে প্রতিবন্ধকতার বিরোধিতা করে তারাই ফিল্ডে পোস্টিং নেয়ার জন্যে ভেতরেভেতরে বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে তদবির চালায়। বিভিন্ন পোস্টিং, বিশেষ করে ফিল্ডে পোস্টিং, ক্ষতাসীনদের ইচ্ছা অনুযায়ী হলে কর্মকর্তাদেরকে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কর্মসম্পাদন করতে হয়। এতে বিধিবিধান, নিয়মরীতি ও পদ্ধতি উপেক্ষিত হয় বিধায় ক্ষমতার অপব্যবহার হয়, দুর্নীতি চলতে থাকে, অসংখ্য লোক ন্যায়বিচার হতে বঞ্চিত হয়, সামাজিক সুবিচারের অভাবে জনগণের মধ্যে হতাশা বিরাজ করে, রাজনৈতিক সংকট ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে, যে যেভাবে পারে সেভাবে ফায়দা তোলতে থাকে ইত্যাদি। এসব হচ্ছে ক্ষমতাসীনদের স্বার্থের বহিঃপ্রকাশ। দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণেই কোন সরকারই সার্বিকভাবে জনগণের আশাআঙক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে না। ঘুষ বা প্রভাব ব্যতীত তেমনকোন কাজ সম্পাদন করানো যায় না। কাজ উদ্ধারের জন্যে যারা প্রভাব খাটাতে পারে না তারা ঘুষপ্রদান করতে হয়। টাকা দিয়ে নাকি বাঘীর দুধো পায়া যায়। অনুরূপভাবে, আমাদের দেশে ঘুষপ্রদান করে বা প্রভাব খাটিয়ে অসাধ্যও সাধন করা যায়। একারণে বিধিবিধানের কথা শুনলে সাধারণ লোক আঁতকে ওঠে। তারা অপারগ হয়ে হতো ঘুষপ্রদান করার জন্যে যোগাযোগ করে অথবা প্রভাব খাটাবার চ্যানেল খোঁজে। তবে, প্রভাব খাটাতেও ঘুষপ্রদান না করে পারা যায় না। কিছুকিছু নীতিবান লোক আছে। তারা না ঘুষপ্রদান করতে পারে, না চ্যানেল খোঁজ করে বের করে প্রভাব খাটাতে পারে। ফলে, তাদেরই যতো অসুবিধা ও সমস্যা। একথাটি শুনা যায় যে, নিজে ভালো হলে সবকিছু ভালো হয়। এটা হচ্ছে বিচারবিশ্লেষণশূন্য কথা, কেননা একজন ভালো হয়ে সে তার নিকট অন্যান্যের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে ; কিন্তু অন্যান্যের নিকট তার যেসব কাজ আছে তারা সেগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন না করলে সে বাধ্য হয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে সেগুলো সম্পাদন করিয়ে নিতে হয়। তাই, এটা পরিষ্কার যে, নীতিবোধের তাড়নায় কেউকেউ ব্যতীত অন্যান্যেরা তাদের স্বস্ব পর্যায়ে নীতিগতভাবে ভালো কাজ করে না। সবাই সবার পর্যায়ে নীতিগতভাবে ভালো কাজ করার জন্যেই বাধ্যবাধকতা এবং এবাধ্যবাধকতা হচ্ছে আইন, নিয়ম ও পদ্ধতি। এবাধ্যবাধকতাকে কার্যকারিতায় রাখার পবিত্রতম দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। তবে, একটি ন্যায়ানুগ, বলিষ্ঠ ও ত্যাগী সরকারই এদায়িত্ব পালন করতে সক্ষম।

দুর্নীতির ক্ষেত্রে সরকারের এধারণা ভুল হবে যে, দুর্নীতির মাধ্যমে যেঅর্থ হস্তগত ও যেসম্পদ গড়ে তোলা হয় সেগুলো দেশেই থাকে এবং একরম একটি গরীব দেশে কত অর্থ ও সম্পদইবা আত্মসাৎ করবে। তবে, যেকারণেই হোক একরম একটি পরোক্ষ ধারণা বলবৎ আছে বলেই ওপরদিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড়াকারের দুর্নীতি চলে

www.pathagar.com

আসছে এবং একারণেই দুর্নীতির মাত্রা, যে যা-ই বলে-না-কেন, হ্রাস না পেয়ে দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা দুর্নীতি সম্পর্কে যে যেধারণাই পোষণ করি-না-কেন এটার পরিণামফল কোনভাবেই শুভ নয়। দুর্নীতি চরিত্রহীন করে তোলে, কালো টাকা সৃষ্টি করে, বিলাসিতা বৃদ্ধি করে, উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হ্রাস করে, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে, উন্নয়নপরিকল্পনা ব্যাহত করে, অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে, সুষম বণ্টন প্রতিহত করে, জীবিকানির্বাহের ক্ষেত্রে বৈষম্য বিস্তৃত করে, সাধারণ মানুষকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করে, শোষণ ও নির্যাতন বৃদ্ধি করে, জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চার করে, পাপাচার বৃদ্ধি করে, সন্ত্রাসী তৎপরতাকে উৎসাহিত করে, তোষামোদের ও চাটুকারিতার শিক্ষাপ্রদান করে, বিদেশে অর্থপাচারের সুযোগ সৃষ্টি করে ইত্যাদি। এসব কারণে সরকার বলতে ক্ষমতাসীন দল, সর্বতোভাবে দুর্নীতিমুক্ত থেকে, যাবতীয় দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

প

সবদিক বিচারবিবেচনা ও বিশ্লেষণ না করে নিজের পূর্বধারণা অনুযায়ী কোন কাজ করলে বা কোন সিদ্ধান্ত দিলে তা সর্বসময় সঠিক না-ও হতে পারে। নিজের পূর্বধারণার ওপর বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নধরনের আলোচনাপর্যালোচনায় তা ভুল প্রমাণিত হয়া সত্ত্বেও তাতে একগুঁয়েমি প্রদর্শন করলে উভয় ব্যক্তি ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। টেলিভিশনে অনুষ্ঠিত বিতর্ককে এপ্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। এবিতর্কে দেখা যায় যে, বিচারকেরা বিতর্কের বিষয়বস্তুর পক্ষেবিপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিগুলোকে বিশ্লেষণ না করে তাদের পূর্বধারণা অনুযায়ী নম্বর দেয় বিধায় যেপক্ষ জয়ী হবার তারা হেরে যায় এবং যেপক্ষ হেরে যাবার তারা জয়ী হয়। টেলিভিশনে অনুষ্ঠিত বিতর্ক বিভিন্ন বিষয়ে জাতিকে দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এবিতর্কে যাদেরকে বিচারক হিসেবে রাখা হয় তারা তা খেয়াল করে না। উক্ত দৃষ্টান্তটি দিয়ে আমি জাতীয় স্বার্থে এটা বলতে চাচ্ছি যে, আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে নিজের পূর্বধারণার পক্ষেবিপক্ষে সবকিছু জেনেশুনে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা। এচিন্তাচেতনা জাতীয় জীবনে অনেক সুফল বয়ে আনতে পারবে। সরকার নিজেদের চিন্তাচেতনার আলোকে কর্মসম্পাদনের জন্যে বিভিন্ন বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি প্রণয়ন করে। দেখা যায় যে, সাধারণত সরকার এগুলো প্রণয়নটাকে কৃতিত্বের কাজ মনে করে ও এটার মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখে, কেননা এগুলো কার্যকর করার দায়িত্ব হচ্ছে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সরকারের বিভিন্ন আদেশ মানতে হয়। কখনোকখনো এসব আদেশ মানতে গিয়ে তাদেরকে

www.pathagar.com

সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতির পরিপন্থী কাজ করতে হয় এবং কখনোকখনো এগুলোর কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয় না। দুর্নীতি ও অবিচার প্রতিরোধের স্বার্থে সরকার তাদের দ্বারা প্রণীত বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতির বাইরে কোন আদেশ, তাতে তাদের যেস্বার্থেই জড়িত থাকে–না–কেন, করতে নেই এবং তাদেরকে সেগুলোর বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে কিনা সেদিকে কড়া নজর রাখতে হয় ও তা সময়েসময়ে সর্বপর্যায়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং যারা সেগুলোর বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ তাদের বিরুদ্ধে সাথেসাথে একশান নিতে হয়। কাজ করতে বললেই দায়িত্ব শেষ হয় না। কাজ করিয়ে নিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ হয়। তাই, সরকার শুধু করতে বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলে না। তারা কাজ করিয়ে নিতে হয় এবং করিয়ে নিতে হলে নিজেদেরকেও কিছু–না–কিছু করতে হয়। তাই, সরকার বলতে শুধু আদেশ ও বক্তৃতা নয়। সরকার বলতেই গুরুদায়িত্ব ও কর্মসম্পাদন। গুরুদায়িত্ব পালনে কর্মসম্পাদন করতে হয়। এভাবে কর্মসম্পাদন না করে কোন সরকারই সফলকাম হতে পারে না এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা তাদের স্বস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারলেও জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ হয় না। অথচ, সরকারের একমাত্র কাজ হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করা। এজন্যেই সরকার কাজ করার জন্যে বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নিজেরাই একাগ্রচিত্তে কাজ করে যেতে হয়। চিহ্নিত ও দাগী মস্তান, সন্ত্রাসক, অস্ত্রধারী ও অপরাধীদের অনেকেই যখন যেদল ক্ষমতাসীন হয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে তখন সেদলের ছত্রছায়ায় চলে যায়। ক্ষমতাসীন দলো নিজেদের সুবিধার্থে তাদেরকে গ্রহণ করে নেয়। জনগণ এটা প্রত্যক্ষ করছে। কিন্তু, তাদের কিছুই করার নেই। এতে এটা পরিষ্কার যে, ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতার ও নিজেদের স্বার্থে জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নষ্ট করে। ক্ষমতাসীন দলের এপ্রবণতার কারণেই জাতীয় স্বার্থ বিসর্জিত হয়। অথচ, জাতীয় স্বার্থসিদ্ধি করাটাই ক্ষমতাসীন দলের পবিত্রতম দায়িত্ব। কোন ক্ষমতাসীন দলই চিহ্নিত ও দাগী মস্তান, সন্ত্রাসক, অস্ত্রধারী ও অপরাধীদেরকে নিজেদের দলের ছত্রছায়ায় গ্রহণ না করলে তাদের কেউ আইনের আওতায় রক্ষা পাবে না বিধায় আইনশৃঙখলা পরিস্থিতি উন্নত, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজমান থাকবে।

আমরা স্বচক্ষে দেখছি যে, অন্যান্য দল হতে ক্ষমতাসীন দলে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা যোগ দিচ্ছে। শুধু তা নয়। এদলে বড়বড় শিল্পপতি, পুঁজিপতি, ব্যাংকপ্রতিষ্ঠাকারী ও আরো অনেকেই যোগ দেয়। এযোগদান নিজেদের স্বার্থেই হয়ে থাকে। এদলের আশ্রয়ে এসে এদলের পক্ষে শ্লোগান দিয়ে নিজেদের অতীত অপরাধ ঢাকা দিতে এবং নানা অপকৌশল ও দুর্নীতির মাধ্যমে কুক্ষিগত সম্পদ নিরাপদ করতে

www.pathagar.com

পারে। তাই, যারা মারাত্মক অপকর্ম ও জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন করে নিজেদের স্বার্থে নানা অপকৌশল ও দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ গড়ে তোলে তারা সরকারের ছত্রছায়ায় সবসময় নিরাপদে থাকে। এদের নিরাপত্তার জন্যে সরকারই দায়ী। সরকার ন্যায়ানুগ ও বলিষ্ঠ হলে এরা নিরাপত্তাহীন হয় এবং এধরনের সরকারই জাতীয় অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে আমরা এমন অবস্থা ও ব্যবস্থায় আছি যে, ব্যক্তিগত স্বার্থে মরলেও জাতীয় স্বার্থে শহীদ বলা হয়। বিভিন্ন সংঘসমিতি তাদের নিজেদের স্বার্থে আন্দোলন, মিছিল ও সভাসমাবেশ করে থাকে। তাদের কেউ কোন কারণে এগুলোর কোন একটিতে মারা গেলে সে যে তাদের স্বার্থেই মারা গেছে তা না দেখিয়ে জাতীয় স্বার্থে দেখানো হয়। এধরনের কার্যকলাপে রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা থাকে। এসহযোগিতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সভাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং পত্রপত্রিকায় সেগুলো ফলাও করে বর্ণনা করা হয়। এভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থে মরেও জাতীয় স্বার্থে শহীদের স্থান পেয়ে যায়।

আদমব্যবসায়ী, প্রতারক, প্রবঞ্চক, মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ রাজনীতিবিদ আছে। এদের সাথে যারা মিশে নেই ও কাজকারবার করে নেই তারা এদেরকে বুঝতে পারে না। নিরীহ জনসাধারণ এদেরকে বিশ্বাস করে। এরা বিদেশে পাঠানোর ও কাজ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিরীহ লোকজন থেকে অনেক টাকাপয়সা নেয় এবং তাদেরকে ঘুরাতে থাকে। একদিকে তাদেরকে বিদেশে পাঠানো হয় না ও তাদের কাজ হয় না এবং অপরদিকে তারা ভোগান্তিতে নিপতিত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়। যেসব রাজনীতিবিদ ক্ষমতাসীন হয়ার আগেই নিরীহ লোকজনের সাথে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকাবাজি করে তারা যেকোনেভাবে ক্ষমতাসীন হলে দেশ ও জাতিকে যে কিভাবে ধোঁকা দেবে এবং প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করবে তা ভাষায় প্রকাশ করে বুঝানো সম্ভব নয়। রাজনীতিবিদদের হীন স্বার্থের কারণে দেশ ও জাতি তাদের নিকট বারবার প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হয়ে অগ্রগতিসাধনের মাধ্যমে জনসাধারণের কল্যাণসাধনে ব্যর্থ হচ্ছে। এমন রাজনীতিবিদও আছে যে অতীতে মন্ত্রী ছিলো ও বর্তমানে পৃথক দল গঠন করে রাজনীতি করছে এবং বিদেশে পাঠানোর ও কোনকোন কাজ করে দেয়ার কথা বলে নিরীহ জনগণ থেকে টাকা নিয়ে তাদের সাথে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকাবাজি করছে। অনেক রাজনৈতিক দল বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সম্মেলন, অধিবেশন ও নির্বাচনে লাখলাখ ও কোটিকোটি টাকা খরচ করে থাকে। জনমনে জিজ্ঞাসা তারা এতো টাকা কোথায় পায় এবং তাদের ফাণ্ডে এতো টাকা কিভাবে জমে। তাদের এজিজ্ঞাসার উত্তরে তারাই ভাবে যে, হয়তো রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা এটাকার যোগান দেয় নয়তো অন্যান্যের থেকে তারা এটাকা পেয়ে থাকে। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা এটাকার যোগান দিলে বুঝতে হয় যে, তারা সম্পদশালী। অপরদিকে, অন্যান্যরা এটাকা দিলে মনে প্রশ্ন জাগে

www.pathagar.com

যে, তারা কি জন্য দেয়, কেননা তারাতো দুস্থ লোকের জন্যে এভাবে অকাতরে টাকাপয়সা খরচ করে না। তাই, এটা পরিষ্কার যে, বিনা স্বার্থে তারা এটাকা দেয় না। তাদের এস্বার্থ রয়েছে যে, তারা তাদের প্রয়োজনে এসব দলকে কাজে লাগাতে পারে। এতে এটা সুস্পষ্ট যে, অভ্যন্তরীণভাবে রাজনৈতিক দলগুলো সম্পদশালী ব্যক্তিদের ওপর নির্ভরশীল। কারো ওপর নির্ভরশীল হয়ে তার ওপর কর্তৃত্ব করা যায় না এবং তলেতলে হলেও তার অনুবর্তী হয়ে চলতে হয়। এঅনুবর্তিতার কারণেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পদশালীদের অসাধু কর্মকাণ্ড চলে যা দুর্নীতি, শোষণ, অপরাধ ও অসামাজিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে। তাই, রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীরা মহৎচরিত্রের অধিকারী হয়ে নিজেদেরকে কথা অনুযায়ী কাজে নিয়োজিত না করলে আমরা জাতি হিসেবে আমাদের আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবো না। জনগণ এব্যাপারে কালক্ষেপণ বা কালাতিপাত না করে সচেতনতার পরিচয় দিয়ে সব ভেদাভেদের উর্ধ্বে গিয়ে তাদেরকেই রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত যারা সত্যিকারার্থে সব দৈন্যের ও বাধাবিপত্তির উর্ধ্বে সচ্চরিত্রতার অধিকারী।

আমাদের দেশে বহু রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদ আছে। আমরা এসব রাজনীতিবিদকে চিনি ও জানি। তাদের মধ্যে কেউকেউ অতীতে ক্ষমতায় ছিলো, কেউকেউ বর্তমানে ক্ষমতায় আছে, কেউকেউ ক্ষমতায় আসার সংগ্রামে লিপ্ত আছে ও কেউকেউ ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা আছে। ক্ষমতা পায়ার জন্যে কোনকোন রাজনীতিবিদ একদল ছেড়ে অপরদলে যোগ দিচ্ছে এবং কোনকোন রাজনীতিবিদ নতুন দল গঠন করছে। ঘুরেফিরে আমাদের রাজনীতিতে লোক সেগুলোই, অর্থাৎ একই লোক। তাই, এদের আদর্শ, উদ্দেশ্য, নৈতিক চরিত্র ইত্যাদি জনগণের অজানা নয়। এরা কি করেছে, কি করছে ও কি করতে পারবে এসব জনগণ উপলব্ধি করছে। তারপরো জনগণ বিভিন্ন কারণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যা গ্রহণ করা দরকার তা করছে না বিধায় নিজেরা রাজনৈতিক সংকটসহ বিভিন্ন সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং দেশের ও জাতির ভাগ্যাকাশ মেঘমুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না। এভাগ্যাকাশকে মেঘমুক্ত করে সূর্যালোক ও চন্দ্রলোক উপভোগ করতে হলে আকাশ, সূর্য ও চাঁদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক যেআদর্শ তাঁর পবিত্র গ্রন্থে, যার হেফাজতকারী তিনি স্বয়ং, বাতলিয়েছেন তা ঐক্যবদ্ধভাবে গ্রহণ করতে হবে।

সমালোচনা ও আন্দোলন করাটা সহজ ; কিন্তু ত্যাগী ও উৎসর্গীকৃত হয়ে কোনকিছু করাটা খুব কঠিন। বক্তৃতায় ও খবরের কাগজে শুধু সমালোচনা ও আলোচনা শুনা ও দেখা যায়। রাজনীতিতে সব রাজনীতিবিদই সমালোচনা করছে। সমালোচনার

www.pathagar.com

মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো কাজ, অর্থাৎ সবাই ভালো কাজ চায়। সবাই ভালো কাজ চায়া সত্ত্বেও আমাদের সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নতি নেই এবং সংকটনিরসন ও সমস্যাসমাধান করা যাচ্ছে না। সবাই যেভাবে ভালো কাজ চাচ্ছে সেভাবে নিজেরা ভালো হলে ও স্বস্ব ক্ষেত্রে ভালো কাজ করলে সংকট নিরসিত ও সমস্যার সমাধান হয়ে অগ্রগতি ও উন্নতি সাধিত না হয়ে পারে না। ভালো কাজের জন্য ভালো লোক হতে হয়। খারাপ লোক হয়ে ভালো কাজ করতে পারে না। তাই, রাজনীতিবিদদের বুঝতে অসুবিধা হয়ার কথা নয় যে, আমাদের অগ্রগতি ও উন্নতিতে বড় বাধাটি কি। এ বড় বাধাটি হচ্ছে নিজে ভালো না থেকে বা না হয়ে অন্যকে ভালো থাকতে বা হতে বলা। এপর্যায়ে প্রত্যেক রাজনীতিবিদের পরম বা সর্বাতীত কাজ হচ্ছে প্রথমে নিজেকে সব ভুলত্রুটির উর্ধ্বে রাখা।

একদিকে আইন আছে এবং অপরদিকে অপরাধ, অপকর্ম, দুর্নীতি ইত্যাদি চলছে। আইন হচ্ছে এগুলো প্রতিহত করার জন্যে। কিন্তু, এগুলো হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই, বলতে হচ্ছে যে, আইনের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না। এটার অপপ্রয়োগ হচ্ছে। সবাই বুঝে যে, এটার অপপ্রয়োগ বন্ধ করা উচিত। কিন্তু, কে কিভাবে এটা বন্ধ করবে? জনসাধারণ আন্দোলন করতে পারবে ; কিন্তু এটা বন্ধ করতে পারবে না। আইনপ্রয়োগ রাষ্ট্রীয় কার্যাদির আওতাভুক্ত। তাই, এটার অপপ্রয়োগ বন্ধ করার জন্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গই এটা করতে পারে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সর্বসময়ই কিছু–না–কিছু লোক অধিষ্ঠত থাকে। কিন্তু, যেপর্যন্ত সৎ, মহৎ ও ত্যাগী লোক অধিষ্ঠিত না হবে সেপর্যন্ত আইনের অপপ্রয়োগ বন্ধ হবে না, কেননা নেতা ভুল পথে অগ্রসর হলে অনুসারীরা তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে ভুল পথেই অগ্রসর হয় এবং ভুল পথে অগ্রসর হয়ে সঠিক পথের সন্ধান পায়া যায় না। আমরা যে যা–ই বলি না কেন আইনের নিরপেক্ষ, বাস্তবমুখী ও সময়োচিত প্রয়োগই আমাদের আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। এপ্রসঙ্গে কাজীর বিচারের কথা এসে যায়। কাজীরা নির্ভীকতার সাথে বিচার করতো। তাদের চোখে রাজাপ্রজা ও ধনীগরীব সবাই সমান ছিলো। তাদের বিচারে কোনপ্রকার দীর্ঘসূত্রতা ছিলো না। তারা আইনের সাথে বাস্তবানুগতা প্রয়োগ করে বিচারকার্যসম্পন্ন করতো। ফলে, সুবিচার সুনিশ্চিত হতো এবং কোন অপরাধী অপরাধ সংঘটন করে তা হতে নিষ্কৃতি পায়ার কোন সুযোগ থাকতো না।

লোকজন বিচার বলতে কাজীর বিচার চায়। তাই, ঘটনাস্থলে বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন প্রয়োজন। বিচারকেরা ঘটনাস্থলে বসে বিচারকার্যপরিচালনা করবে। এতে প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হবে এবং কারো প্রতি অবিচার হবে না। এধরনের বিচারব্যবস্থায় সরকারের

www.pathagar.com

খরচ বৃদ্ধি পাবে। যে বর্ধিত খরচের ফলে মানুষের কাঙ্ক্ষিত সুবিচার সুনিশ্চিত হবে তা বহনে জনগণের কোন অমত বা অসম্মতি থাকবে না। আমাদের বর্তমান অবস্থা এমন যে আইন, নিয়ম ও পদ্ধতিমোতাবেক সত্যিকারার্থে কি হবে বা কি হবে না এবং কি করা যাবে বা কি করা যাবে না তা এককথায় বা অল্প কথায় বলে বিশ্বাস করানো যায় না। অথচ, আইন, নিয়ম ও পদ্ধতিমোতাবেক কাজে বেশি কথার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, যে যতোবেশি কথা বলতে পারে সে ততোবেশি বিশ্বাস জন্মাতে পারে। তবে, এটা সত্য যে, ধোঁকা দিতে হলে নানা কায়দা করে কথা বলে বিশ্বাস জন্মাতে পারতে হয় এবং ধোঁকাবাজরা তা পারেও। মানুষ সর্বস্তরে ধোঁকাবাজদের ধোঁকায় পড়েপড়ে কিছু ভালো লোক থাকলে,চিনতে পারে না বিধায়, তাদেরকেও বিশ্বাস করতে পারে না এবং মনে করে যে, বহু কথা বলেও সেখানে শেষপর্যন্ত সঠিক কাজ করে না এককথা বা অল্প কথা বলে সেখানে কি করে সঠিক কাজ করবে। বাস্তবে এটা চিরসত্য যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাদের কাজ আইন, নিয়ম ও পদ্ধতিমোতাবেক করলে এমনিতেই কোন বেআইনী ও অনিয়মতান্ত্রিক কাজ হতে পারে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে সরকার নিরপেক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে সব কাজই আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পাদিত হতে বাধ্য। সরকার তাদের নিরপেক্ষতা দ্বারা সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে জনগণের আস্থায় আনতে পারার ওপরই দেশের সার্বিক শান্তিশৃঙ্খলা নির্ভর করে। আইন, নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পূর্বাপর সম্পর্ক রেখেই প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। তাই, নতুন আঙ্গিকে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলো সংশোধন করলে সমস্যার সমাধান না হয়ে তা জটিল আকার ধারণ করে। এটার কারণ হচ্ছে যে, পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরের দৃষ্টিভঙ্গির পূর্বাপর সম্পর্কের সামঞ্জস্য ঠিক থাকে না। তাই, আইন, নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদি প্রয়োজনবোধে নতুন আঙ্গিকে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নতুনভাবে প্রণয়ন করাটাই যুক্তিযুক্ত।

ফ

সরকারের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ও আয়উৎপাদক সংস্থায় অহরহ কোটিকোটি টাকা লোকসানের কথা শুনা যাচ্ছে। বাস্তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দুর্নীতির ও বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে এসব টাকা আত্মসাৎ করে হিসেবের খাতায় লোকসানের ঘরে দেখিয়ে দেয়। আত্মসাৎ করে লোকসান দেখানোর প্রবণতা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, আত্মসাৎকারীরা তাদের প্রয়োজনানুযায়ী সবকিছুই করতে পারে। যারা কোটিকোটি টাকা ঋণ নিচ্ছে তাদের সেঋণের বাস্তব প্রয়োগ নেই বিধায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটসহ নানাধরনের সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।

www.pathagar.com

এসব সংকটের জন্যে এরা দায়ী হচ্ছে না বা এদেরকে দায়ী করা হচ্ছে না। এরা এঋণের টাকা জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপনে ও শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিষ্ঠায় অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করছে। দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বিভিন্ন কারণে এদের থেকে সুদসহ এঋণ আদায়ের ব্যাপারে কোন জোরালো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ব্যক্তিমালিকানায় ব্যাংকস্থাপনের জন্যে সুযোগসুবিধা দেয়া হচ্ছে। এভাবে ব্যাংকস্থাপনের ফলে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি অগাধ সম্পদের মালিক হচ্ছে এবং সাধারণ লোক শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। ব্যাংকস্থাপনকারীরা আমানতদারের আমানতের টাকা দিয়ে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধি করছে। অনেকের মতো এরাও বিদেশে সম্পদ গড়ে তোলে। যারা বড়াকারের ঋণ নিয়ে যথার্থ প্রকল্পে ব্যয় করে না ও যথাসময়ে সুদসহ তা ফেরৎ দেয় না, যারা ব্যাংকস্থাপন করে শোষকে পরিণত হয় এবং যারা বিদেশে সম্পদ গড়ে তোলে তাদের, দেশের স্বার্থে, জনসমক্ষে ন্যায়নুগভাবে সর্বোচ্চ শাস্তি হয়াটা অপরিহার্য। অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা, অপরাধ ও আত্মসাৎ ফাঁস বা প্রকাশিত হলে তদন্তকমিটি গঠনের কথা শুনা যায়। বাস্তবে একমিটি এসব ধামাচাপা দেয়ার একটি তাৎক্ষণিক পন্থা। এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ চ্যানেলে চলাচল করে। একমিটির প্রতিবেদনে কি থাকে তা জনসাধারণের জানার সুযোগ হয় না এবং এসবের জন্যে ওসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনকিছু হতে সচরাচর দেখা যায় না। ফলে, তারা নিরুদ্বেগে বা উদ্বেগহীনভাবে তাদের জঘন্যতম অপরাধমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যায় এবং দেশের অগ্রগতি সাধিত না হয়ে বেআইনীভাবে একশ্রেণীর লোকের স্বার্থচরিতার্থ হয়।

আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। এঅবস্থায় সম্পদ কিছু লোকের হাতে পুঞ্জিভূত ও অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়িত হচ্ছে। এতে শোষণ, দারিদ্র ও বেকারত্ব প্রকট হচ্ছে। এরকম একটি পরিস্থিতিতে দেশোন্নয়নের কাজ অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল। বড়াকারের ঋণের, দুর্নীতির, পাচারের, কালোবাজারের, চোরাকারবারের ও মজুদদারির কারণে সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জিভূত হচ্ছে। দেশের স্বার্থে আইনের বাস্তবমুখী প্রয়োগের দ্বারা এগুলো প্রতিহত করতে পারলে সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত হবে ও সম্পদ উৎপাদনশীল খাতে ব্যয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন প্রজেক্ট ও কর্পোরেশনে কাজের নামে যে হরিলুট হয় তা যেকোন সচেতন নাগরিক জানে। কর্পোরেশনগুলোতে বিভিন্ন সমিতি রয়েছে। সমিতির নেতা ও কর্মকর্তারা কাজের পরিবর্তে সংগ্রামে ও দলীয় কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকে। কর্মচারী ও শ্রমিকরা কাজে মনোযোগী না হয়ে মাতামাতিতে লেগে থাকে। কর্মকর্তারা নিজেদের দুর্নীতির কারণে তাদেরকে আইনানুগভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহসী হয় না ও তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। কর্মকর্তারা নিজেদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করার ফন্দিতে ব্যস্ত থাকে। তাদের এদুর্বলতার কারণে বিশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজমান থাকে। তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

যারা ওপরের দিককে সন্তুষ্টচিত্তে রাখতে পারে তারা যা-ই করে-না-কেন তাদের দ্রুতগতিতে, সিনিয়র ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তাদেরকে ডিঙিয়ে হলেও, পদোন্নতি হয় এবং অগ্রগতি হতে থাকে। এজন্যে যে রাষ্ট্রপরিচালনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ দায়ী তা বিশ্লেষণ করে লিখার দরকার নেই। যারা সমস্যাসমাধানের দায়িত্বে নিয়োজিত তারা স্বয়ং সমস্যাসমাধানের পথে বড় বাধা। তারা সমস্যাসমাধানের পথে এমনভাবে অগ্রসর হয় যে, তাদের একটি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অনেক আনুষংগিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এটা তাদের দুর্নীতি, অদক্ষতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে এবং দেশোপ্রেম ও দেশোন্নয়নের প্রতি সদিচ্ছার অভাবে হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে 'বেড়ায় ক্ষেত খায়' প্রবাদটির মতো। এপ্রবাদের মর্মানুযায়ী এরা রক্ষক হয়ে ভক্ষণ করছে। এরাই হচ্ছে বড় অত্যাচারী। এদের অত্যাচার হতে রক্ষা পায়া না গেলে দেশোন্নয়ন সম্ভব হবে না। এরা দেশোন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসৃষ্টিকারী। যারা দেশোন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তারা কোনভাবেই দেশের মিত্র হতে পারে না। যারা দেশের শত্রু দেশ তাদেরকে লালন করতে পারে না। তারপরো তারা লালিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে, দেশটা তাদের জন্যেই এবং তারা দেশের জন্যে নয়। এরা বিনাশিত না হলে দেশ শত্রুমুক্ত হতে পারবে না। তবে, এরা আপনাআপনি বিনাশিত হবে না। এদেরকে কেউ-না-কেউ বিনাশ করতে হবে। জনগণ এ কেউ-না-কেউর অপেক্ষায় আছে।

শ্রমিকআন্দোলন সম্পর্কে বলতে হয় যে, শ্রমিকেরা আন্দোলন করে না, তাদেরকে দিয়ে আন্দোলন করানো হয়। শ্রমিকেরা আন্তরিকতার সাথে শ্রম দেবে ও ন্যায্য মজুরী পাবে। বর্তমানে শ্রমো আন্তরিক নয়, মজুরীও ন্যায্য নয়। এজন্যে শ্রমিকদেরকে দায়ী করার মতো কোন যুক্তিসংগত কারণ আমি দেখছি না। এজন্যে ব্যবস্থাপনা ও সরকার দায়ী। ব্যবস্থাপনার ও সরকারের কাজ হচ্ছে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরীর নিশ্চয়তাবিধান করা এবং তাদের থেকে যথার্থ শ্রম নেয়া। ব্যবস্থাপনার ও সরকারের দুর্বলতার কারণেই শ্রমিকেরা আন্দোলন করছে ও আন্তরিকভাবে শ্রম দিচ্ছে না। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। ফলে, তারা নামে শ্রমিক হলেও কাজে রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মী। এককথায়, তারা রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনীতির হাতিয়ার। রাজনৈতিক দলগুলোর মদদের ও সহযোগিতার কারণে তারা বিভিন্ন আন্দোলন করছে। তাদের আন্দোলনের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে, মারামারি ও হানাহানি চলছে, কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, হরতাল চলছে, দুর্নীতি প্রকট হচ্ছে, ইত্যাদি। সরকারো শ্রমিক সংগঠনকে কাজে লাগচ্ছে। কাজেই, কোন শ্রমিক সংগঠনের বিরুদ্ধে সরকার কোন আইনানুগ

www.pathagar.com

ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না। এতে কলকারখানা উৎপাদনের অঙ্গনের পরিবর্তে রাজনৈতিক অঙ্গনে রূপান্তরিত হয়ে আছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি কারো খেয়াল আছে বলে মনে হয় না। তা থাকবেতো শ্রমিকেরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় আন্দোলনের নামে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে কেন। সার্বিক স্বার্থে এমন একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে কোন শ্রমিক সংগঠনের প্রয়োজন থাকবে না এবং শ্রমিকেরা যথার্থ শ্রম দেবে ও ন্যায্য মজুরী পাবে। তবে, এব্যবস্থা ইসলামী আদর্শ ব্যতীত অন্যকোন আদর্শে নেই। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, ব্যাংক ইত্যাদিতে কর্মচারীদের বিভিন্নধরনের সংগঠন আছে। এসব সংগঠনের নেতা ও নির্বাহী কমিটির সদস্যরা সংগঠনের কাজকর্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে। অফিসের কাজকর্মে তারা মনোযোগী হতে পারে না। এতে অফিসের কাজকর্মের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সংগঠন তাদের পেছনে এক বিরাট শক্তি হিসেবে কাজ করে বিধায় তাদের বিরুদ্ধে কোন একশান নেয়া সম্ভব হয় না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সংগঠনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এনির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রচারাভিযান চলে, সভা অনুষ্ঠিত হয় ও জটলা চলে। এসময় অনেক কর্মচারী এসব কাজে ব্যস্ত থাকে বিধায় সরকারী কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এখানেই শেষ নয়। এসব সংগঠন রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। সংগঠনকে একটা বিরাট শক্তি হিসেবে দেখিয়ে সংগঠনের নেতারা রাজনৈতিক দলগুলো হতে ফায়দা লুটতে কার্পণ্য করে না। বিরোধী দলগুলো কোনকোন সংগঠনকে সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগায়। এজন্যে সরকারো কোনকোন সংগঠনকে নিজেদের হাতে রাখে। ফলে, এসব সংগঠন রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্পর্শে আসার অবাধ সুয়োগ পেয়ে যায় এবং বিভিন্ন অফিসে সরকারী কাজের পরিবর্তে রাজনৈতিক চর্চাই বেশি হয়ে থাকে। অথচ, সরকারী কর্মচারীরা সরকারের কাজ করার জন্যে নিয়োজিত হয়। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে একাগ্রচিত্তে সরকারী কাজ করা এবং সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যবিধান করে বেতনাদি দেয়া। কিন্তু, এসব সংগঠন তাদের বেতনবৃদ্ধির ও নানাবিধ সুযোগসুবিধা আদায়ের জন্যে নানাভাবে আন্দোলন চালায়। এসব আন্দোলনের ফলে সরকারকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ও সরকারী কাজকর্মে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। এসব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংকট মারাত্মক রূপ নেয়। অথচ, আমরা সবাই সুফল চাই। সুফল পেতে হলে সরকারী কর্মচারীদের সুযোগসুবিধা সরকার স্বয়ং সুনিশ্চিত করতে হবে এবং সরকারী কর্মচারীদের কোন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না, কেননা সংগঠন বলতেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়া ও স্বস্ব দায়িত্বের প্রতি অবহেলা ও

www.pathagar.com

উদাসীনতা বুঝায়। তাই, জাতীয় স্বার্থে সরকারী কর্মচারীদেরকে দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তাদের কোন সংগঠন হতে না দেয়াটা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, একান্ত প্রয়োজন।

আত্মনির্ভরশীলতার ও বেকারত্বদূরীকরণের মাধ্যমে দারিদ্রবিমোচনের জন্যে ঋণদান কর্মসূচির উদ্যোগটি বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। ছোটছোট শিল্প ও খামার স্থাপনের জন্যে ঋণদানের পক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন করা হচ্ছে। এতে দারিদ্র কি পরিমাণে বিমোচিত হবে তা-ও ভেবে দেখা প্রয়োজন। বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্প ও খামার বেশি দিন টেকে না। এগুলো স্থাপনকারীদের অনেকেই শেষপর্যন্ত এগুলো বন্ধ করে দেয়। তারা ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় এবং বন্ধকী ভিটেমাটি ও জমিজমা হারায়। ফলাফল এ দাঁড়ায় যে, দারিদ্রের কষাঘাত চলতে থাকে, ঋণ হিসেবে প্রদত্ত টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়, কিছু লোকের অবস্থার উন্নতি হয় ও দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত হয়। বেকারত্বদূরীকরণের মাধ্যমে দারিদ্রবিমোচনের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টনের দ্বারা স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাগ্রহণ। এটার জন্যে প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা ও তা কার্যকর করার সহজসরল ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতি ও প্রণালী। আমাদের মতো অনুন্নত দেশে ব্যক্তিপর্যায়ে বড়াকারের উদ্যোগের দ্বারা এটা সম্ভব নয়, কেননা যারা এজাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে তারা কোটিকোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করে বিলাসবহুল জীবনযাপন করে এবং দেশপ্রেমের বা স্বদেশপ্রেমের অভাবে বিদেশে পাচার করে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে। এধরনের উদ্যোগ সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। কথা ওঠতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ক্ষতি হচ্ছে বলে সরকার বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। এটা সরকারের শোচনীয় দুর্বলতা। সরকার সৎ, মহৎ, ত্যাগী, দুর্নীতিমুক্ত, ক্ষমতার মোহমুক্ত, নিঃস্বার্থপর, কল্যাণধর্মী, ন্যায়ানুগ, পক্ষপাতিত্বহীন ও সম্পূর্ণরূপ আইনের অধীন হলে বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি অবলম্বন করতে হয় না। জাতীয় সংকট সরকারকেই নিরসন করতে হয়। অর্থনৈতিক সংকট একটি জাতীয় সংকট। গণতান্ত্রিক সরকার জনকল্যাণমূলক সরকার ও এসরকারকে জনগণের কল্যাণার্থেই জাতীয় সংকট নিরসন করতে হয়। জাতীয় সংকট জাতীয় পর্যায়ে এবং ব্যক্তিগত সংকট ব্যক্তিগত পর্যাযে সহজে নিরসিত হয়। এটার অভাবে সংকট আরো সংকটাপন্ন হয়। তাই, দারিদ্রদূরীকরণের স্বার্থে একটি ত্যাগী, বলিষ্ঠ ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারের প্রয়োজন যারা দেশের সর্বত্র এমনএমন সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে যেগুলোতে বেকার লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং সম্পদ আত্মসাৎ হতে পারবে না

www.pathagar.com

বিধায় সংকট দূরীভূত হয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হবে ও একটা উন্নত জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো।

আমাদের সবার উচিত দেশীয় শিল্পকে নিরাপত্তা দেয়া। বেকারসমস্যাদূরীকরণ ও দারিদ্রবিমোচনের জন্যে শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। শিল্পের নিরাপত্তার জন্যে শিল্পের মালিকদের বা শিল্পপতিদের বিশেষ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। দেশীয় শিল্পকে রক্ষার জন্যে সরকার যেসব নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলোর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে শিল্পপতিদের আন্তরিকতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করা অত্যাবশ্যক। বাস্তবে তারা সরকার কর্তৃক গৃহীত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার সুযোগে নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখে এবং দেশ ও জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে। অথচ, শিল্পোন্নয়নের জন্যে শিল্পোদ্যোক্তাদের দেশাত্মবোধক মনমানসিকতার প্রয়োজন। যারা কোটিকোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা ফেরত দিচ্ছে না, যারা ব্যাংকপ্রতিষ্ঠা করে দেশের ক্ষতিসাধন করছে, যারা কোটিকোটি টাকা আত্মসাৎ করছে এবং যারা বাজারনিয়ন্ত্রণ করছে তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা জনগণ দেখতে পাচ্ছে না। এদের দ্বারা কুক্ষিগত সম্পদের সদ্ব্যবহার হলে অনেক অর্থনৈতিক সংকট আপনাআপনি দূরীভূত হবে। কিন্তু, একদিকে তারা তা করছে না এবং অপরদিকে তাদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। এটা সরকারের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। সরকার মনে করে যে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অর্থনীতিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে এবং জিনিসপত্রের সংকটসৃষ্টির সাথেসাথে সেগুলোর মূল্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে বিধায় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে এবং তারা ক্ষমতা হারাবে। সুতরাং, এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যেই বড়াকারের দুর্নীতিগুলো মেনে নিচ্ছে। এটার ফলশ্রুতিতে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান না হয়ে সেগুলো দিনদিন জটিল হচ্ছে। তবে, আমাদের খেয়াল করা প্রয়োজন যে, গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে জনগণের সরকার, কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সরকার নয়। তাই, দেশ ও জনগণের স্বার্থের বিপক্ষে কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নিকট আইনের পরিপন্থী পরাভবস্বীকার বা নতিস্বীকার করা এসরকারের কাজ নয়। এসরকার ন্যায়নিষ্ঠ, সৎ, মহৎ ও ত্যাগী হলে ওধরনের বিশেষ কোন গোষ্ঠীকে জাতীয় স্বার্থে ধ্বংস করে দেয়াটা তেমনকোন জটিল কাজ নয়। এতে তারা ক্ষমতা হারাবে না,বরং তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত হবে, কেননা তাদের প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ বা অপ্রতিহত সমর্থন থাকবে। প্রায়ই শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বিত্তবান ব্যক্তিরা বিদেশী ব্যাংকে টাকা রাখছে এবং বিদেশে সম্পদ সৃষ্টি করছে। তাদের এটার পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তারা যাতে প্রয়োজনে

www.pathagar.com

যেকোন মুহূর্তে এদেশ ত্যাগ করতে পারে। ফলে, তাদের দ্বারা গৃহীত কোটিকোটি টাকা ঋণ ও তাদের অর্জিত কোটিকোটি টাকা এদেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়িত হচ্ছে না বিধায় আমরা সুষ্ঠুভাবে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারছি না। এদের সাথে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সুসম্পর্ক রয়েছে। নিরীহ জনসাধারণের এদের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই। অথচ, তারা এদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। জনকল্যাণমূলক সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে শোষণের অবসান ঘটানো। বর্তমানে আমাদের এমন একটি সরকারের দরকার যারা শোষণের অবসান ঘটাতে পারবে।। এশোষণের অবসান ঘটানোর জন্যে সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী নীতির প্রয়োজন । কোন মানুষের নীতি স্থায়ী নয়। ক্ষমতার রদবদলের সাথেসাথে তাদের নীতি পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু, ইসলাম এসম্পর্কে যেনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে তা সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী। তাই, একমাত্র এনীতি বাস্তবায়নের দ্বারাই আমাদের দেশে, এমন কি সারা বিশ্বে, শোষণের অবসান ঘাটনো সম্ভব।

বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হয়, মানুষের আয়বৃদ্ধি করতে হয় ও বেকারসমস্যা দূর করতে হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলামত হচ্ছে দারিদ্র বিমোচিত হয়া, জনগণের আয়বৃদ্ধি পায়া, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়া ও বেকারসমস্যা দূরীভূত হয়া। গণতান্ত্রিক সরকার জনকল্যাণমূলক সরকার। এসরকারের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের কল্যাণসাধন করা। উল্লেখিত অগ্রগতি ব্যতীত জনগণের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। রাষ্ট্রের উন্নতি জনগণেরই উন্নতি। জনগণের কর্মসংস্থান হ্রাস করে তাদেরকে বেকারত্বের দিকে ঠেলে দিয়ে রাষ্ট্রের আয়বৃদ্ধি করার প্রবণতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মানদণ্ড হতে পারে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মানদণ্ড হচ্ছে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র, মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি, দারিদ্রবিমোচন ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে বেকারদের পরিত্রাণ। তাই, সরকারের পবিত্রতম দায়িত্ব হচ্ছে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেগুলোর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়, বেকারত্ব হ্রাস পায়, মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি পায়, দারিদ্র বিমোচিত হয় ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃতির মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। একবার আমাদের দেশ থেকে যেজিনিস প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয় পবর্তীতে সেটার রপ্তানি হ্রাস পায়। তাই, আমাদের যেসব দ্রব্য রপ্তানির ফলে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতাম সেগুলোর রপ্তানি আশানুরূপ নয়। এজন্যে রপ্তানিকারকরাই দায়ী। তারা উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সাথে নিকৃষ্ট দ্রব্য ঢুকিয়ে দেয়। বিদেশে আমদানিকারকদের নিকট এটা ধরা পড়ে যায়। ফলে, তারা আমাদের দেশের প্রতি আস্থাহীন হয়ে আমাদের দেশ থেকে আমদানি হ্রাস করে বা বন্ধ

www.pathagar.com

করে দেয়। যেসব রপ্তানিকারকের কারণে আমাদানিকারক-দেশগুলো আমাদের ওপর আস্থা হারাচ্ছে এবং আমাদের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারা জাতীয় শত্রু। এদের মধ্যে কেউকেউ মানুষের খাওয়ার অযোগ্য দ্রব্য ও বিষাক্ত গুঁড়ো দুধ বাজারে বিক্রি করে থাকে। অথচ, এসব শত্রুরাই দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। এদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাই, এটা পরিষ্কার যে, এধরনের জাতীয় শত্রুদের দ্বারাই জাতি পরোক্ষভাবে পরিচালিত হচ্ছে। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে এটা লজ্জাকর ব্যাপার। জাতীয় স্বার্থে এদেরকে শস্যক্ষেত্রের আগাছার ন্যায় সমূলে উৎপাটন করাটাই বাঞ্ছনীয়। যেসব আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী কোটিকোটি টাকা উপার্জনের জন্য নিরীহ লোকজন ও শিশুদেরকে বিষাক্ত খাবার খায়াচ্ছে তারা হত্যাকারী ও সন্ত্রাসকদের চেয়েও ভয়াবহ ও জঘন্যতম। হত্যাকারীরা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং সন্ত্রাসকদের সন্ত্রাসী তৎপরতাতে নির্দিষ্ট লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু, বিষাক্ত খাবার খেয়ে বহু লোক ও শিশু মৃত্যুবরণ করে এবং মারাত্মক শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অথচ, যেসব আমাদানিকারক ও ব্যবসায়ী বিষাক্ত খাবার খায়াচ্ছে তাদের অনেকেই সমাজে হর্তাকর্তা ও হোমরাচোমরা। এরা ধরা পড়ার সাথেসাথে বিচারের মাধ্যমে এদেরকে জনসমক্ষে গুলি করে হত্যা করাটা বাঞ্ছনীয়।

সুষম বণ্টন বলতে কোন প্রভেদ ছাড়া সবার সমান ভাগ বুঝায় না। এটার জন্যে রাষ্ট্রীয়করণের প্রয়োজনীয়তা নেই। এটা হচ্ছে এমন একটি সুসংগতিপূর্ণ ব্যবস্থা যেটাতে সম্পদের আবর্তন ও বিবর্তন এমনভাবে হয় যে, সবাই ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। এব্যবস্থায় একদিকে সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমতে থাকে না এবং অপরদিকে অসংখ্য লোক অভাবঅনটনে থাকে না ও দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয় না। এব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিরুৎসাহিত হয় এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিত্তবান ও বিত্তহীন শ্রেণী দু'টি বিদ্যমান থাকে। বিত্তবানেরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পদের আবর্তন ও বিবর্তন ঘটায় এবং বিত্তহীনেরা বিত্তবানদের করুণার পাত্র হিসেবে বেঁচে থাকতে হয়। তাই, মানুষ হয়ে মানুষের মতো বাঁচার জন্যে যেব্যবস্থার দরকার তা হচ্ছে সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা। এব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকে এবং বিপুল সম্পদের অধিকারী হতে কোন বাধা থাকে না। তবে, ন্যায়সংগত ও বৈধভাবে এসম্পদের অধিকারী হতে হয় এবং তা এমনভাবে উৎপাদনশীল কাজে খাটাতে হয় যাতে অন্যান্যরা কর্মসংস্থান পেয়ে খেয়েপরে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে পারে ও তার অধিকারীরা তা দিয়ে অনৈতিক ও নীতিবিরুদ্ধ কোনকিছু করতে ও তা থেকে তাদের যথার্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন

www.pathagar.com

বাহুল্য খরচ করতে পারে না। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় ও অনুশাসনেই এটা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব, কেননা এব্যবস্থায় ও অনুশাসনে সবকিছু কোরআন ও হাদীসের নীতিতে পরিচালিত হয় বিধায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, ব্যক্তিস্বার্থপরতা, অবিচারঅত্যাচার, শোষণনির্যাতন, প্রতারণাপ্রবঞ্চনা, লাঞ্ছনাগঞ্জনা, সন্ত্রাস, কালোবাজার, চোরাচালান প্রভৃতি চলতে পারে না। আমরা সবাই, অন্তত আমাদের কথায় ও বক্তৃতায়, এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করছি ও অবলুপ্তি চাচ্ছি। অথচ, এগুলো কোনভাবেই অবলুপ্ত হচ্ছে না। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় ও অনুশাসনে কোরআন ও হাদীসের নীতি অনুযায়ী সম্পদের সুষম বণ্টনে এগুলোর অবলুপ্তি নিশ্চিতরূপে সম্ভব।

সরকার খেয়াল করলেই যেকোন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। তবে, দূরদর্শিতার সাথে যেকর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না তা ব্যর্থ হয়ার ফলে দেশ ও জনগণের প্রভূত ক্ষতি হয়। এমনএমন কর্মপরিকল্পনা আছে যেগুলো শুধু ব্যর্থই হয় না জনসাধারণের ওপর খারাপ প্রভাবো রেখে যায়। তাই, কোন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্বে সরকার সেটার বর্তমান ও ভবিষ্যত ফলাফল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করাটা অপরিহার্য। ঝোঁকের মাথায় কোন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে জনসাধারণকে সেটার অশুভ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়াটা কোনভাবেই যুক্তিসংগত নয়। কোনকোন কর্মপরিকল্পনা আছে যেগুলো গ্রহণ করলে রাজনৈতিকভাবে ফায়দা তোলা যায় ; কিন্তু সেগুলোর পরিণতি দেশের ও জাতির জন্যে খুবই অশুভ হয়। তাই, শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে কোন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ না করে জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেকোন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করলে এবং তা দুর্নীতির উর্ধ্বে সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাস্তবায়িত হলে জাতীয় উন্নতি অবধারিত হয়।

সবাই সব সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নয়। বিভিন্ন জন বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। সমস্যা সম্পর্কে পড়ে ও শুনে জানার এবং বাস্তবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে জানার মধ্যে পার্থক্য আছে। যারা বাস্তবতার নিরিখে সমস্যা সম্পর্কে জানে তারাই সেটার যথার্থ সমাধানের পথ ও পন্থা উদ্ভাবন করতে পারে। তাই, যারা বাস্তবে যেসমস্যার সম্মুখীন তাদেরকে জাতীয় স্বার্থে নিরপেক্ষভাবে তা সমাধানের প্রকৃত পথে ও পন্থায় সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সম্মুখপানে এগিয়ে আসতে হবে। তারা বাধাবিপত্তির ও নিজেদের ক্ষতির কথা ভেবে নিশ্চুপ বসে থাকলে চলবে না। দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা বাস্তবে সমস্যা জেনেও নিশ্চুপ থাকার কারণেই রাজনীতিবিদেরা ও তাদের সহযোগিতায় দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণকারী বিত্তবান শ্রেণী তাদের নিজেদের স্বার্থে দেশের আপামরসাধারণের সার্বিক স্বার্থকে ভূলুণ্ঠিত করে বিভিন্ন

www.pathagar.com

কৌশলে বিভিন্ন কাজ করে চলছে। এদেরকে সুনিয়ন্ত্রণে রেখে দেশের অগ্রগতিসাধনের সাথেসাথে জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণার্থে দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের নিশ্চুপ থাকাটা কোন যুক্তিতে সমীচীন নয়। কখনোকখনো সুবিদাবাদী লোকজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। এ এগিয়ে আসার পেছনে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ লুক্কায়িত থাকে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা তাদের সমর্থনের দ্বারা ও সহযোগিতায় কোন বিষয়ে সফলকাম হলে তারা সেবিষয়ে কর্তৃত্বের জন্যে এগিয়ে আসে ও তা লাভ করে। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা যেঅন্যায়ের বিরুদ্ধে সফলকাম হয় তারা কর্তৃত্বলাভ করে সেঅন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। এতে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা ন্যায়প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পড়ে ও বিব্রত হয় এবং তারাই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সমালোচনা করে থাকে। এভাবে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা প্রায়সব লোকের নিকট অগ্রহণীয় হয়। ন্যায়পরায়ণ লোকের সংখ্যা কম হলেও তারা কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে সর্বস্তরে সরকারী সহযোগিতা পেতে থাকলে ব্যক্তিস্বার্থসম্বলিত কার্যাদি কালক্রমে বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা দেশ ও জনগণের মঙ্গলসাধনে উৎসাহবোধ করবে।

ব

ক্ষমতাসীনদের, উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ও উর্ধ্বতনদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখতে পারলে পদোন্নতিসহ বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পেতে কোন অসুবিধা হয় না। এসম্পর্কের কারণে দুর্নীতি করেও দুর্নীতিপরায়ণ বলে বিবেচিত হয় না। অপরদিকে, দুর্নীতিমুক্ত থেকে জ্ঞানগরিমা ও ধীশক্তি প্রয়োগ করে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে কর্মসম্পাদন করেও অবহেলিতভাবে পেছনে পড়ে থাকতে হয়। প্রশাসনিক উৎকর্ষের মাধ্যমে দেশের অগ্রগতিতে ও সার্বিকভাবে জনগণের মঙ্গলসাধনের ক্ষেত্রে এটা একটি মারাত্মক বিষাক্ত অন্তরায়। এঅন্তরায় অপসারিত না হলে এটার বিষক্রিয়ায় জাতীয় সমস্যাবলী সমাধানের নিমিত্ত প্রশাসনিক উৎকর্ষার্জন দুষ্কর হবে। কোনকোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা দায়িত্বসচেতনতা, উর্ধ্বতনদের সাথে শোভনীয় আচরণ এবং কর্মসম্পাদন ও আদেশপালনে তৎপরতা ইত্যাদি বলতে তাদের সাথে ব্যক্তিগতসম্পর্ক রাখা, তারা ভালোমন্দ যা বলে তা বিনা যুক্তিতে মেনে নেয়া, কাজকর্ম বাদ দিয়ে হলেও তাদের সামনে বসেবসে খোশগল্প বা আমোদজনক আলাপ করা, তারা যা বলে তাতে শুধু হ্যাঁ-হোঁ করা, প্রয়োজনে তাদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম করা, খারাপ কাজেও তাদের উচ্ছ্বসিত বা উচ্ছলিত প্রশংসা করা ইত্যাদি বুঝায়। ধীশক্তি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মকর্তারা নিয়মানুযায়ী যার সাথে যতোটুকু সম্পর্ক রাখার সেটার বেশি রাখে না এবং জাতীয়

www.pathagar.com

স্বার্থে সঠিক ও ন্যায়ানুগ কাজের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে বিধায় ওসব উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে দায়িত্বহীন, অশোভনীয় আচরণকারী এবং কর্মসম্পাদন ও আদেশপালনে অতৎপর। একারণে ধীশক্তি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মকর্তারা চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হতে পারে না বিধায় প্রশাসনিক উৎকর্ষ ব্যাহত হচ্ছে এবং বিভিন্ন কাজকর্মে প্রশাসনিক জটিলতার দরুন জনগণ ন্যায়ানুগতা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এবঞ্চনার জন্যে ওসব উর্ধ্বতন কর্মকর্তাই দায়ী। অথচ, তারা তেলমাখাতে এতোই পরিপক্ক যে, তাদের কোথাও কোন অসুবিধা হতে শুনা যাচ্ছে না। বাস্তবে এরা জাতীয় শত্রু এবং জাতীয় স্বার্থে সর্বাগ্রে এদের বিনাশসাধন অতীব প্রয়োজন। এটার জন্যে একটি ত্যাগী ও বলিষ্ঠ সরকার প্রয়োজন। যেপর্যায়ের যেকাজ তা সেপর্যাযে সম্পাদিত না হলে তাতে ভুলবুঝাবুঝি ও জটিলতার ফলে যেসমস্যার উদ্ভব হয় তা খুবই ক্ষতিকর। একটি অফিসের অন্য একটি অফিসের উর্ধ্বতন কোন কর্মকর্তার নিকট কোন কাজ থাকলে এবং তার সাথে সেকাজের ব্যাপারে আলাপের প্রয়োজন হলে তা তার সমকক্ষ কর্মকর্তা করাটাই যুক্তিযুক্ত। সে তা না করে তার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তাকে তা করতে বললে সে বাধ্য হয়ে তা করে। কিন্তু, যার সাথে সে তা করে সে তাতে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়, কেননা সে মনে করে যে, তার সাথে তার সমকক্ষ কর্মকর্তাই আলাপ করাটা যুক্তিযুক্ত। ফলে কাজটির গতি মন্থর হয়। এমন্থরতার জন্যে ওউর্ধ্বতন কর্মকর্তাই দায়ী। কিন্তু, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এটা না দেখে যে অধস্তন কর্মকর্তা যোগাযোগ করে একতরফাভাবে তাকে দায়ী করা হয়। এটা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পর্যায় অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনে গাফিলতির বা কুঁড়েমির পরিচায়ক। কর্তব্যসম্পাদনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উক্ত বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় দিলে সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যথাসময়ে যথাযথভাবে সম্পাদিত হতে থাকবে এবং সরকারী কর্মকাণ্ডে অহেতুক বা অনর্থক জটিলতা কমবে।

সরকারী অফিসগুলোতে কাজের চেয়ে আদেশনির্দেশের প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। উর্ধ্বতনদের মধ্যে এপ্রবণতা প্রকট। তাদের মধ্যে এধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, তারা কাজের জন্যে নয়, কাজ আদায়ের নিমিত্ত শুধু আদেশনির্দেশ প্রদানের জন্যে। নিয়মমোতাবেক তারা নিজেরা যেকাজ যেভাবে করার তা সেভাবে না করে আদেশনির্দেশ দিয়ে তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা করিয়ে নেয় বিধায় তাদের তেমনকোন কাজকর্ম থাকে না। নিজে করা ও অন্যকে দিয়ে করিয়ে নেয়া এককথা নয়। উর্ধ্বতন হিসেবে নিজে করলে যতো ভালোভাবে করা যায় আদেশনির্দেশ দিয়ে অন্যের দ্বারা করালে ততো ভালো হয়ার কথা নয়। উর্ধ্বতনদেরকেই অধস্তনেরা অনুকরণ ও অনুসরণ করে। উর্ধ্বতনেরা উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী হলে অধস্তনেরা তা অর্জন করতে চেষ্টা করে। তাই, উর্ধ্বতনেরা আদেশনির্দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে

www.pathagar.com

নিজেদের কাজ নিজেরা করে অধস্তনদের উন্নত মনমানসিকতা গঠন করা প্রয়োজন। যেসব কর্মকর্তা বিভিন্নভাবে ওপরে ওঠে কাজকর্ম তেমনকিছু বুঝে না ও জ্ঞানের অভাবে সম্পাদন করতে অপারগ হয় তারা দাপট দেখিয়ে, অযথা ধমকাধমকি করে ও নানা কলাকৌশল প্রয়োগ করে কোনভাবে কাজ চালিয়ে নেয়। কোনকিছু সঠিক ও শুদ্ধভাবে তুলে ধরার মতো ভাষাজ্ঞানো এদের নেই। এতে নানা জটিলতা দেখা দেয় ও প্রশাসনিক উৎকর্ষ গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। এমনএমন কর্মকর্তা আছে যারা যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়ানুগ কথা বলে উর্ধ্বতনদের বিরাগভাজন হতে চায় না। তাদের কথা হচ্ছে যে, যেখানে উর্ধ্বতনদের নিকট তাদের ন্যায়ানুগতা ও যুক্তিযুক্ততা মূল্যহীন হবে সেখানে তারা সেগুলোর কথা বলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ার চেয়ে নিশ্চুপ থাকাই ভালো। ক্ষতিগ্রস্ততার ভয়ভীতিই তাদেরকে ন্যায়ানুগতার জন্যে প্রতিবাদী হতে দিচ্ছে না। তবে, প্রতিবাদ ব্যতীত অবিচারঅত্যাচার, শোষণনিপীড়ন, অন্যায্যতা ইত্যাদির অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। প্রতিবাদী না হয়ে কেউ কোনদিন সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে নেই। বিনা প্রতিবাদে সবকিছু হতোতো বিশ্বময় এতো সংঘাত ও সংঘর্ষ চলতো না। প্রতিবাদ থেকেই আসে সংঘাত ও সংঘর্ষ। বিবেকবান ব্যক্তিরা ন্যায্যতার জন্যে সংঘাত ও সংঘর্ষকে ভয় করতে পারে না। মানুষ অন্যায্য স্বার্থের টানেই বিবেকহীন হয়ে যায়। অথচ, ন্যায্যতা কায়েমের জন্যেই সর্বস্তরে কর্মকর্তারা নিয়োজিত। তাই, ন্যায্যতার স্বার্থে উর্ধ্বতনেরা অধস্তনদের কথা মনোযোগ দিয়ে ও খেয়াল করে শুনাটা একান্ত প্রয়োজন। যেসব অধস্তন কর্মকর্তা ন্যায়ানুগতার জন্যে প্রতিবাদী ও সোচ্চার সরকার জাতীয় স্বার্থে তাদেরকে সরাসরি শুনার ও জানার পন্থা উদ্ভাবন করতে ও তাদের নির্বিঘ্নে সামনে এগিয়ে যাবার পথ অবারিত বা অবাধ করতে হবে।

সিউপ্যারসেশানের মাধ্যমে পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে। এতে অধস্তন কর্মকর্তা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সিউপ্যারসীড করছে। তাছাড়া, খুব জুনিয়র কর্মকর্তা খুব সিনিয়র কর্মকর্তাকে সিউপ্যারসীড করছে। যারা সিউপ্যারসীড করছে তারা যে উন্নত মেধার ও তাদের অন্যান্য গুণাবলী যে উন্নতধরনের তা নয়, কেননা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেই মেধা ও গুণাবলী নির্ধারিত হয়ে থাকে। অপরদিকে, যারা সিউপ্যারসীডেড হয় তারা যারা তাদেরকে সিউপ্যারসীড করে তাদের অধীনে কাজ করতে হয়। সিনিয়র অফিসাররা জুনিয়র অফিসারদের অধীনে চাকরিতে জুনিয়র অফিসারদের ভুলত্রুটি লক্ষ্য করে ও সেটার সাথে জেনেশুনে আপস করতে পারে না। তাই, যেসব জুনিয়র অফিসার ওপরে আছে তারা তাদের অধীনে তাদের চেয়ে সিনিয়র অফিসারদের পোস্টিং গ্রহণ করতে চায় না। এসব সিনিয়র অফিসার দুশচিন্তায় ও মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে। নানা কারণে এরা সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না। জুনিয়র অফিসাররা নিজেদের বস্‌ভাবের বা ওপরওয়ালাভাবের ওপর গুরত্বারোপ করে। এতে তারা জেদের

www.pathagar.com

বশবর্তী হয়ে তাদের অধীনে তাদের সিনিয়র অফিসারদের ক্ষতি করতে ইতস্তত করে না। তাছাড়া, তারা যে কম্‌প্লেকসে বা মনোবিকৃতিতে ভোগে না তা নয়। এসব কারণে প্রশাসনের অভ্যন্তরে ক্ষোভ বিরাজমান থাকে। এবিরাজমানতা ভেতরেভেতরে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড জটিল করে তোলে ও প্রশাসনিক সৌকর্যের বা সহজসাধ্যতার অভাবে দেশের অগ্রগতির ধারা সরকারের অজান্তেই ক্ষয়িষ্ণুতার রূপপরিগ্রহ বা আকৃতিধারণ করে। প্রশাসনিক উৎকর্ষের মাধ্যমে জনগণের মঙ্গলসাধনের জন্যে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সিউপ্যারসেশান অচিরে বন্ধ করাটা অত্যাবশ্যক। তবে, কোন সিনিয়র কর্মকর্তার ক্ষেত্রে মারাত্মক কোনকিছু থাকলে তা বিধিমোতাবেক দেখতে হবে।

ধীশক্তি, বোধশক্তি ও স্মরণশক্তির সমন্বয়ই হচ্ছে মেধা। যেকোন গঠনমূলক কাজের জন্যে এমেধা একান্ত প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় কার্যাদি নিষ্পাদিত হয়। এজন্যে সরকার যেসব কর্মচারী নিয়োগ করে তাদেরকে সরকারী কর্মচারী বলা হয়। তাই, সরকারী কর্মচারীরা কোনভাবেই সরকার নয়। ক্ষমতাসীন দলই সরকার। গণতন্ত্রে সরকার হচ্ছে জনগণ, জণগণের দ্বারা ও জনগণের জন্যে। উভয় সরকার ও সরকারী কর্মচারী জনগণের। এদের দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের ও জনগণের কাজ করা। এরকম একটি গুরুদায়িত্ব পালনে মেধাকে অস্বীকার করা যায় না। মেধা অবহেলিত ও উপেক্ষিত হলেই এগুরুদায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত হয় না এবং বিবিধ সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খেতে হয় বিধায় অগ্রগতিসাধনের মাধ্যমে সুখশান্তি সুনিশ্চিত করাটা একটি দুরূহ বিষয়ে পরিণত হয়। তাই,আমাদের দেশে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ও তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধাযাচাইর পদ্ধতিতে পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। মেধাযাচাইয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে প্রতিটি বিষয়ে এমনএমন প্রশ্ন থাকতে হবে যাতে সত্যিকারের মেধাবীরা বের হয়ে আছে। প্রশ্নের ধরনের একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। সাধারণ জ্ঞানে এপ্রশ্নটি দেয়া যেতে পারে ঃ "রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যারমিট্যার। আলোচনা করুন।" এটা আলোচনা করতে হলে বোধশক্তি, ধীশক্তি ও স্মরণশক্তির – এ তিন শক্তির সমন্বয়সাধন করতে পারতে হবে। সব বিষয়ে সব প্রশ্নই এধরনের হতে হবে। একবছর যেসব প্রশ্ন থাকবে পরবর্তী পঞ্চাশ বছরেও সেগুলোর পুনবনুষ্ঠান বা পুনরাবৃত্তি হতে পারবে না। এর ফলশ্রুতিতে মেধাবীরাই কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে নিয়োগপাপ্ত হবে এবং বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সিউপ্যারসিডেড হবে না। তারপরো কেউ সিউপ্যারসিডেড হলে সে পূর্ণ সুযোগসুবিধাসহ অবসরগ্রহণ করবে।

সিভিল সার্ভিসের অন্যসব ক্যাডার প্রশাসনিক ক্যাডারের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত থাকতে চাচ্ছে। প্রশাসন বলতেই নিয়ন্ত্রণ বুঝায়। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকলে খেয়ালখুশিমোতাবেক কাজ করা যায় না এবং জবাবদিহিতার কারণে যেকোন কাজ ভেবেচিন্তে করতে হয়। তা না হলে বিধিবিধানের আওতায় পড়তে হয়। তাই,

www.pathagar.com

প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের কারণেই অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কাজকর্মসম্পাদনে কিছু–না–কিছু সুষ্ঠুতা আছে। তারা এনিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত হতে পারলে দেশের যে আরো কতো দৈন্যদশা বা দুরবস্থা হবে তা ভাবতে শরীরে শিহরণ জাগে। তবে, আমরা সত্যিকারার্থে বাংলাদেশকে সুখীসমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে চেলে যেকোন মূল্যে সৎ ও মহৎ সরকারী ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে হবে। সিভিল সার্ভিসে বিভিন্ন ক্যাডারের রেষারেষির বা পরস্পর বিদ্বেষের কারণে দেশের কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এতে যে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হয় তা জনসাধারণ ভালোভাবেই বুঝে। অথচ, পরিবেশপরিস্থিতির আলোকে মনে হয় যে, সরকার বুঝেও বুঝে না। এ বুঝেও না বুঝাটা স্বার্থপরতার নমুনা। সরকার বিশেষ কোন ক্যাডারের জন্যে নয়, দেশ ও জাতির জন্যে। তাই, ক্যাডারে ক্যাডারে রেষারেষি নিরসনের দায়িত্ব সরকারর। এজন্যে সিভিল সার্ভিসে সরকারের একটি ভারসাম্যমূলক নীতির প্রয়োজন। এনীতির ভিত্তিতে সব ক্যাডারের কর্মকর্তাদের একটিমাত্র সম্মিলিত তালিকা থাকবে। মেধা অনুযায়ী এতালিকা প্রণীত হবে। যে যেক্যাডারেই থাকবে–না–কেন পরবর্তী পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সেতালিকাতে নির্ধারিত সিনিয়রিটি আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। এতে সব কর্মকর্তার সব ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ হবে এবং ক্যাডারে ক্যাডারে পদোন্নতি নিয়ে কোন সংঘাত থাকবে না। এজন্যে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করার সাথেসাথে কর্মকর্তাদেরকে সব ক্ষেত্রের সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এতে কোন ক্যাডার হতে দ্রুত পদোন্নতির এবং কোন ক্যাডার হতে অনেক দেরিতে পদোন্নতির ফলে ক্যাডারে ক্যাডারে বিদ্যমান অসামঞ্জস্য বিদূরিত হবে এবং কোন কর্মকর্তার সিনিয়রিটি ক্ষুণ্ন হবে না। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে এনীতি প্রশাসনিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে।

একদিকে একটা নির্দিষ্ট মানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ১ম শ্রেণীর চাকরিতে নিয়োগপ্রদান করা হয় এবং অপরদিকে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে এচাকরিতে পদোন্নতি ও স্থান করে দেয়া হয়। এতে এচাকরিতে যে একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড থাকার তা থাকে না এবং মনমানসিকতায়, আচারাচরণে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে, বিদ্যাবুদ্ধিতে, জ্ঞানগরিমায়, প্রতিভাবিকাশে ও আরো অনেক বিষয়ে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এবিভিন্নতার কারণে একটি নির্দিষ্ট মানে ধীশক্তি, বোধশক্তি ও স্মরণশক্তির সমন্বয়সাধনের দ্বারা উৎকর্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয় যা নিরসন করতে গিয়ে আনুষঙ্গিক জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং স্থবিরতার গ্রন্থিতে বাঁধা পড়তে হয়। প্রত্যেকেই চেষ্টা করে। চেষ্টা অনুযায়ী যে যেখানে স্থান পায় সে সেখানে সেমানে কাজ করে যাবে। তাকে তার সেমান থেকে অন্যের উচ্চমানে স্থান করে দিলেই উক্ত সমন্বয়সাধনে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়। শরীরের যেখানে আঘাত লাগে শুধু

www.pathagar.com

সেখানেই ব্যথা অনুভূত হয় না, পুরো শরীরেই তা অনুভূত হয়। রাষ্ট্রীয় কার্যাদির কোন একটিতে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হলে তা পুরো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতেই ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাই, রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি সাধনের নিমিত্ত প্রত্যেক পর্যায়ে নির্দিষ্ট মানে অন্যমানের সংযোজন কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। ছেলেদের আগে মেয়েদের পরিপক্কতা আসে। অথচ, চাকরিতে যোগদানের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে মহিলার বয়সসীমা বেশি রাখা হয়েছে। পরিপক্কতার দিক বিবেচনা করলে চাকরিতে যোগদানের ক্ষেত্রে মহিলার চেয়ে পুরুষের বয়সসীমা বেশি রাখতে হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হচ্ছে মেধাযাচাইর পরীক্ষা। এপরীক্ষায় নর ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। জাতীয় স্বার্থে মেধামূল্যায়নের জন্যে নরনারীনির্বিশেষে এপরীক্ষার ফলাফলে তালিকায় যারা প্রথমদিকে থাকবে তাদেরকে দিয়েই খালিপদগুলো পূরণ করতে হবে। তবে, চাকরিজীবী মহিলাদেরকে যেসব সুযোগসুবিধা দেয়া দরকার তাদেরকে সেগুলো সহজসরলভাবে দিতে হবে। তাছাড়া, মহিলাদের এসব সুযোগসুবিধাই প্রমাণ করে যে, তারা কোনভাবেই পুরুষদের মতো হতে পারে না।

কারোকারো সরাসরি জনপ্রতিনিধিদের অধীনে কর্মসম্পাদনের আগ্রহের পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সাধারণত জনপ্রতিনিধিরা সরকারী কাজকর্মে অনভিজ্ঞ। কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল সর্বসময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে না ও থাকতে পারে না। ফলে, সরকারী কাজকর্ম সম্পাদনে কোন রাজনৈতিক দলেরই পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকে না। তাছাড়া, যখন যারা ক্ষমতায় থাকে তখন তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থটাকে বড় করে দেখে। এতে তাদের মাধ্যমে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করিয়ে নেয়া যায় এবং যারা দেশের স্বার্থের পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থটাকে বড় করে দেখছে তারাই বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করে সরাসরি গণপ্রতিনিধিদের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে কর্মনিষ্পাদনে আগ্রহী ও ব্যাকুল। তাই, দেশের সার্বিক স্বার্থে সবাইকে একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করে যেতে হবে, কেননা একর্তৃপক্ষ সরকারের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ডে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী এবং এদের সাথে ধাপ্পাবাজি করা যায় না। কর্মসম্পাদনে উভয় মাত্রতিরিক্ত তৎপরতা ও উদাসীনতা খুব ক্ষতিকর। মাত্রাতিরিক্ত তৎপরতার কারণে তড়িঘড়ি কর্মসম্পাদন করতে হয়। এতে কর্মে ভুলভ্রান্তি হয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে এবং ভুলভ্রান্তির কারণে একই কর্ম একাধিকবার সম্পাদন করতে হয়। একটি কর্ম একাধিকবার সম্পাদনে বেশি শ্রম ও সময় নষ্ট হয় এবং এটার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের বিরক্তির উদ্রেক হয়।

www.pathagar.com

অপরদিকে উদাসীনতার কারণে কর্মসম্পাদনে কোন শৃঙখলা থাকে না ও তাতে নানা জটিলতা দেখা দেয়। তাই, সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি সাধনের জন্যে কর্মকর্তাদেরকে উভয় মাত্রাতিরিক্ত তৎপরতা ও উদাসীনতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলতে হবে। যেসব কর্মকর্তা এ দু'টি অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য পরিহার করতে ব্যর্থ হবে তাদেরকে জাতীয় স্বার্থে সসম্মানে বিদায় করে দিতে হবে এবং এব্যাপারে কোনপ্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন ও পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করা যাবে না।

শিক্ষিত লোকই বিভিন্ন সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত অফিসে কর্মরত আছে। অথচ, বাস্তবে তাদের তেমনকোন বিবেক ও দায়িত্ববোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাদের যার যেকাজ সে তা যথাসময়ে সম্পাদন করছে না। তাদের নিকট না গিয়ে চেষ্টাতদবির না করে কোন কাজই সম্পাদন করানো যায় না। এটা তাদের একটি শক্ত প্রবণতা যে তাদের দ্বারা কোন কাজ সম্পাদন করাতে হলে তাদের নিকট গিয়ে চেষ্টাতদবির করতে হবে। তাই, যেকাজে তাদের নিকট গিয়ে চেষ্টাতদবির করা হচ্ছে না তা সহজে সম্পাদিত হচ্ছে না। বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে এজাতীয় চেষ্টাতদবির আদৌ সম্ভব নয়। এতে তারা উপেক্ষিত ও অবহেলিত হচ্ছে বলে সামাজিক অগ্রগতি নিদারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যেকর্মচারীর যেকাজ সে যথাসময়ে স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বক্তব্যের আলোকে সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিপ্রদানের অনমনীয় ও কঠোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

যেকোন প্রকল্পে বিভিন্নভাবে মাত্রাতিরিক্ত টাকা আত্মসাৎ হয়। এতে কোন প্রকল্পই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয় না এবং একশ্রেণীর কর্মকর্তা, ঠিকাদার ও লোক লাভবান হয় ও পুরো দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন প্রকল্পে আত্মসাৎ রোধ করতে পারলে খরচের নামে যেটাকা আত্মসাৎ হয় তা সঞ্চিত হয় এবং এসঞ্চয় দিয়ে অনেক লোকের কর্মসংস্থান করা যায়। লোকের কর্মসংস্থান ব্যতীত দেশোন্নয়ন হচ্ছে বলে ধারণা করা যায় না। লোকের কর্মসংস্থান যে দেশোন্নয়নের একটি অন্যতম মাপকাঠি তা অস্বীকার করাটা কোনভাবেই সমীচীন নয়। তাই, কর্মচারী ও শ্রমিক ছাঁটাইকে দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা হিসেবে বিবেচনা করতে হয়। বেকারসমস্যা দূরীকরণার্থে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাটা অত্যাবশ্যক। কথিত আত্মসাৎ রোধ করতে পারলে কর্মচারী ও শ্রমিক ছাঁটাই করার প্রয়োজনীয়তা দূর হবে এবং নতুননতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের অগ্রগতি সাধিত হবে ও বেকার লোকের কর্মসংস্থান হবে। তাই, সরকারের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সার্বিক স্বার্থে নিজেরা সর্বতোভাবে দুর্নীতি হতে মুক্ত থেকে যেকোন মূল্যে উক্ত আত্মসাৎ রোধ করা।

www.pathagar.com

ভ

বিশুদ্ধ ভাষায় বিষয়বস্তু সঠিকভাবে তুলে না ধরতে পারলে কাজে জটিলতা সৃষ্ট হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি গুরুত্ব দেয়াটা অপরিহার্য, কেননা সেখানে এটা অর্জন করতে না পারলে উদ্যোগী হয়া সত্ত্বেও কর্মজীবনে এটা সহজে অর্জন করা যায় না। তাই, শিক্ষকদেরকে ভাষা বিশুদ্ধভাবে জানতে হয়। তাছাড়া, পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তরে ভাষার বিশুদ্ধতার জন্যে কমপক্ষে চারভাগের একভাগ নম্বর রাখাটা অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের থেকে অতিরিক্ত বেতন নেয়া হচ্ছে। সময়মতো বেতনপ্রদানের জন্যে তাদের ওপর চাপপ্রয়োগ করা হচ্ছে। কোন কারণে কোন ছাত্র বিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত পোশাক না পরে বিদ্যালয়ে গেলে তাকে শ্রেণীকক্ষ থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। অথচ, চাপপ্রয়োগ করে তাদের থেকে পাঠ আদায় করে নেয়া হচ্ছে না এবং নির্ধারিত পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। মনোনীত পোশাক পরিধান না করায় যেমন শ্রেণীকক্ষ থেকে বের করে দেয়া হয় পাঠ আদায় করার জন্যে তেমনি শেণীকক্ষে আটকিয়ে রাখতে শুনা যাচ্ছে না। এককথায়, শিক্ষকেরা তাদের সুবিধাজনক কাজের জন্য চাপপ্রয়োগ করে এবং যেসব কাজের জন্যে চাপপ্রয়োগ করলে ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল হবে সেগুলো এড়িয়ে যায়, কেননা সেগুলোতে কষ্টস্বীকার করতে হয়। তবে, শিক্ষকদেরকে তখনই আদর্শবান বলা যায় তারা যখন ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গলের জন্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর প্রতিষ্ঠাতারা তাদের নিজেদের স্বার্থেই এগুলো প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা জাতীয় স্বার্থে এগুলো করেনি। তারা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে যাচ্ছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণের কারণে এগুলোর প্রতিষ্ঠাতারা এগুলোতে শিক্ষাবিস্তারের নামে ব্যবসায় চালিয়ে অর্থোপার্জন করতে পারছে না। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাই, এসব স্কুলে ইচ্ছানুযায়ী ভর্তিফী, বেতন ইত্যাদি নেয়া হয় এবং এগুলো হচ্ছে সহজ উপায়ে প্রচুর অর্থোপার্জনের কেন্দ্র। তবে, এসব স্কুলে শিক্ষার মান উন্নত। এউন্নতমান প্রাথমিক পর্যায়েই শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করছে। অনেক টাকার প্রয়োজন বিধায় বিত্তহীনেরা তাদের শিশুদেরকে এসব স্কুলে পড়াতে পারছে না। তারা তাদের শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একদিকে সরকার থেকে বেতন নেয় এবং অপরদিকে নিয়মানুযায়ী পাঠদান করে না। এবৈষম্য দূরীকরণার্থে সরকারকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মানুযায়ী পাঠদান সুনিশ্চিত করতে হবে। কোচিং সেণ্টার বিদ্যালয়ে আন্তরিকতার সাথে পাঠদানে একটি বড়াকারের বাধা, কেননা অধিকাংশ

www.pathagar.com

ভালো শিক্ষক এটার সাথে জড়িত। বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে এব্যবসা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকতে হবে।

ধীশক্তি, বোধশক্তি ও স্মরণশক্তি–এ তিন শক্তির সমন্বয়ের অভাবে জাতি যে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা শিক্ষা বিভাগের একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে তুলে ধরলাম। এস, এস, সি, পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক ও ৫০ নম্বরের রচনামূলক প্রশ্নের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রতি বিষয়ে ৫০০ নৈব্যক্তিক প্রশ্ন নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং রচনামূলক প্রশ্নে সেরকম কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে, যারা ফেল করার তারা পাশ করছে, যারা দ্বিতীয় বিভাগ পায়ার তারা ১ম বিভাগ পাচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্টার–মার্কস পাচ্ছে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সংখ্যা নির্ধারণ না করে রচনামূলক প্রশ্নের সংখ্যা নির্ধারণ করলে চলতো। পুনরায় এসিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, ১৯৯৬ ইং সন হতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে নির্ধারিত সংখ্যা থাকবে না। তবে, টিক দেয়ার পদ্ধতি থাকবে। এসিদ্ধান্তটিও সঠিক বলে মনে হচ্ছে না, কেননা এপদ্ধতিতেও জ্ঞানের সঠিক বিকাশ ঘটবে না। জ্ঞানের সঠিক বিকাশের জন্যে ছোটছোট পঞ্চাশটি প্রশ্ন করতে হবে। সেগুলোর কোনটির উত্তর একবাক্যে ও কোনটির উত্তর একশব্দে লিখতে হবে। শিক্ষা বিভাগ উক্ত তিন শক্তির সমন্বয় ঘটাতে পারেনি বলে এস, এস, সি, পরীক্ষার ফলপ্রসূ পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেনি। এজন্যে তারা কারো নিকট জবাবদিহি করতে হয়নি এবং বর্তমানেও তারা কারো নিকট জবাবদিহি করতে হচ্ছে না। তাই, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এ তিন শক্তির সমন্বয়সাধনে ব্যর্থতার ব্যাপারে জবাবদিহিতা ও শাস্তির বিধান থাকাটা অপরিহার্য।

কারোকারো মতে চলচ্চিত্র সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। পরপুরুষের সাথে স্ক্রীনে জড়াজড়ি, কোলাকুলি, চুমুচুমি, স্তন উঁচু করে ও নিতম্ব বা পাছা ঘুরিয়ে নাচানাচি এবং বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নেচেনেচে গান গায়া আমাদের সংস্কৃতি নয়, অপসংস্কৃতি। এজাতীয় অপসংস্কৃতি আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ না ঘটিয়ে আমাদের জাতীয় চরিত্রে আঘাত হানছে। সাধারণত খারাপ লোক খারাপই করে। তাদের থেকে ভালো কিছু আশা করাটা স্বপ্নালোকে বিচরণ করার শামিল। যৌবনকাল অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাপূর্ণ। তাছাড়া, ছোটছোট ছেলেমেয়েরা বড়দেরকে এবং যা দেখে তা অনুকরণ ও অনুসরণ করে। তাই, ওপরে কথিত অপসংস্কৃতিগুলো আমাদের যুবকযুবতী ও ছেলেমেয়েদের চরিত্রবিধ্বংসী। এগুলোর কারণেই অসামাজিক কার্যকলাপ এবং নানাধরণের অপরাধ ও পাপাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে অপসংস্কৃতি চালু রেখে অপরদিকে অসামাজিক কার্যকলাপ এবং নানাধরনের অপরাধ ও পাপাচার বন্ধ করার জন্যে যতো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হচ্ছে না কেন সেগুলোর ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা পায়া যাচ্ছে না। আমাদের চলচ্চিত্রের এবং অভিনেতা, অভিনেত্রী, নর্তকী ও গায়িকাদের বিদেশে

www.pathagar.com

সুনামার্জন ও পুরস্কারলাভের কথা শুনা যায়। কথিত অপসংস্কৃতির কারণেই এসুনাম ও পুরস্কার। যারা পুরস্কার দিচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ইসলামী সংস্কৃতির পরিবর্তে আমাদের মধ্যে অপসংস্কৃতি জোরদার করে আমাদেরকে আমাদের মৌল আদর্শ হতে বিচ্যুত করে তাদের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করা। আমাদের চলচ্চিত্র এবং নর্তকী ও গায়িকারা বিদেশে পুরস্কৃত হোক বা না হোক আমাদের ইসলামী সংস্কৃতি ও আদর্শ ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে চলচ্চিত্র, নাচ ও গানে কথিত অপসংস্কৃতিগুলো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে। একশ্রেণীর লোকের অর্থোপার্জনের স্বার্থে এসব অপসংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা কোনভাবেই আমাদের জাতীয় চরিত্রে আঘাত হানাতে পারি না।

মহিলারা তাদের সবলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল। একশ্রেণীর কিছু অত্যুৎসাহী লোক মহিলাদের দুর্বলতাকে আড়ালে রেখে তাদের সমানাধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার। একশ্রেণীর মহিলারা এসুযোগ নিচ্ছে। তারাও তাদের দুর্বলতা প্রকাশ না করে সমানাধিকারের জন্য সোৎসুক। মহিলারা ভালোভাবেই জানে যে, মহিলা মহিলাই ও পুরুষ পুরুষই এবং মহিলা ও পুরুষ কখনো এক হতে পারে না। কিন্তু, উক্ত শ্রেণীর পুরুষদের বাড়াবাড়ির কারণে উক্ত শ্রেণীর মহিলারা নিশ্চুপ থাকতে পারছে না। ওশ্রেণীর মহিলারা ভাবছে যে, যেখানে ওশ্রেণীর পুরুষেরা তাদের দুর্বলতাকে সবলতা হিসেবে জাহির করছে সেখানে তারা যে দুর্বল তা তারা প্রকাশ করাটা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই, দেশের সার্বিক স্বার্থে ওশ্রেণীর পুরুষেরা মহিলাদের দুর্বলতাকে আড়াল করে নিজেদের হীন স্বার্থে মহিলাদেরকে সমানাধিকারের আন্দোলনের ইন্ধন জোগিয়ে পুরুষদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়ে একটা অস্বস্তিকর বা অশান্তিজনক পরিবেশ সৃষ্টি না করাটাই বাঞ্ছনীয়। আমরা খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টালেই অনেক নিরীহ মহিলা নির্যাতিতা ও ধর্ষিতা হয়ার খবর আমাদের নজরে পড়ে। একটু গভীরভাবে খেয়াল করলেই এ ঘৃণ্য কাজের প্রধান কারণ আমাদের নিকট ধরা পড়ে। একশ্রেণীর মহিলাদের অশালীন চালচলনই বা রীতিনীতিই এটার অন্যতম কারণ। তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনভাবে প্রদর্শিত হয় যে, সেগুলো পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদের মধ্যে অবিবাহিত পুরুষদের সংখ্যা বেশি। তারা ওসব মহিলার সাহচর্যলাভের তেমনকোন সুযোগ পায় না এবং তাদের মনে কুচিন্তার সৃষ্টি হয়। এচিন্তার কুপ্রভাবে তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও সুযোগ পেলে বা সুযোগ সৃষ্টি করে নিরীহ মহিলাদের ওপর নির্যাতন চালায় ও তাদেরকে ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণের পর তাদের কাকেওকাকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। তাই, এসব অত্যাচারী ও ধর্ষণকারীদের গুরু হচ্ছে ওসব মহিলা যারা চালচলনে অশালীন ও দাম্ভিক। আমরা জানি যে, যে অপরাধ সংঘটন করে ও যে তা করার জন্যে প্ররোচনা

www.pathagar.com

দেয় তারা উভয়ই সমান অপরাধী। এদিক দিয়ে বিচার করলে এটা বলতেই হয় যে, নিরীহ মহিলাদের ওপর নির্যাতনের ও তাদেরকে ধর্ষণের জন্যে ওসব মহিলারা বেশি দায়ী। এনির্যাতন ও ধর্ষণ বন্ধ করতে হলে ওসব মহিলাদের ওরকম চালচলন বন্ধ করার জন্যে যেপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা আবশ্যিকভাবে অবলম্বন করতে হবে।

প্রত্যেকেই মনে করে যে, সবাই সৎ হলে এবং সে একা অসদুপায়ে কোনকিছু করলে দেশ ও জনগণের কোন ক্ষতি হবে না। একেএকে প্রায়সবাই এটা মনে করছে। ফলে, প্রায়সবাই অসদুপায় অবলম্বন করছে। এপ্রসঙ্গে আমার, প্রত্যেকের জানা, একটি গল্প মনে পড়ছে। এক রাজা একটি দীঘি খনন করিয়ে একরাতে প্রজাদেরকে দুধ দিয়ে তা ভর্তি করার জন্যে আদেশ জারি করে। কিন্তু, প্রত্যেকে মনে করে যে, সে একজন দুধ না দিয়ে পানি দিলে সে যে পানি দিয়েছে তা বুঝাই যাবে না। তার মতো সবাই এটা মনে করে সবাই দীঘিটিতে রাতে পানি দিয়ে আসে ও তা পানিতে ভর্তি হয়। রাজা সকালে দীঘিটি দেখতে গিয়ে দেখে যে, তা পানিতে পরিপূর্ণ। আমরা ন্যায়পরায়ণতার পক্ষপাতী হলে এবং সুন্দর ও সুশৃঙ্খল উন্নত দেশ চেলে আমাদের প্রত্যেকেই এআদর্শের অনুসারী ও অধিকারী হয়া উচিত যে, আরকেউ না থাকুক অন্তত আমি নিজে ন্যায়পরায়ণ, দুর্নীতিমুক্ত, আইনমান্যকারী ও চরিত্রবান থাকবো।

ক্ষমতাকে সম্মান করা ও মানুষকে সম্মান করা দু'টি বিসদৃশ বিষয়, এক বিষয় নয়। যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদেরকে সাধারণত ক্ষমতার কারণে সম্মান করা হয়, কেননা তা না করলে ক্ষমতার অপপ্রয়োগের দ্বারা তারা সমূহ বা বেজায় ক্ষতি করতে পারে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদেরকে যেভাবে সম্মান দেখানো হয় ক্ষমতাহীন ব্যক্তিদেরকে, তারা যতো জ্ঞানীগুণী ও বিজ্ঞ হয়-না-কেন, সেভাবে সম্মান দেখানো হয় না। ক্ষমতার কারণেই যে ক্ষমতাসীনদেরকে সম্মান করা হয় জনগণ অহরহ সেটার ভূরিভূরি প্রমাণ পাচ্ছে। যেক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে সম্মান দেখানোর জন্যে তার চলার পথে দু'ধারে লোক দণ্ডায়মান থাকে, তার সাক্ষাৎলাভকে আশীবাদ মনে করে এবং তার আদেশে যেসে কাজ হয়ে যায় সে ক্ষমতাচ্যুত হলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত না হলেও জনসাধারণ তাকে সাধারণ দশজনের মতোই দেখে। ক্ষমতাসীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে তাদের ক্ষমতার কারণেই জনসাধারণ সম্মান করে। এরা অবসরগ্রহণ করে ক্ষমতাহীন হলে এদের প্রায়সবাইকে এদের অতীত কর্মকাণ্ডের জন্যে সম্মান না করে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। তাই, ক্ষমতাকে সম্মান না করে মানুষকে সম্মান করাটাই প্রকৃত সম্মান। এসম্মান হচ্ছে মনের ব্যাপার। যাদেরকে মনের দিক থেকে সম্মান করা হয় তারাই প্রকৃত সম্মানী। প্রকৃত সম্মানের অধিকারী

www.pathagar.com

হতে হলে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও ন্যায়বান হতে হয়। তাই, যেকোন ক্ষমতাবান ব্যক্তির বুঝা উচিত যে, জনগণ কেন তাকে সম্মান করে। ক্ষমতার কারণে সম্মান প্রকৃত সম্মান নয়, এটা হচ্ছে একপ্রকার ভীতি। সচ্চরিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে প্রদর্শিত সম্মানই হচ্ছে প্রকৃত সম্মান। ক্ষমতাকে সেটার অপব্যবহারের ভয়ে সম্মান করা হয় এবং মানুষকে মনুষ্যত্বের কারণে সম্মান করা হয়। তাই, সার্বিক মঙ্গলের জন্যে যেকোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি সচ্চরিত্রতার, ন্যায়পরায়ণতার ও মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়টা বাঞ্ছনীয়।

আদেশ মানা ও সম্মান করা এককথা নয়। বিভিন্ন কারণে আদেশ মানতে হয়। অধস্তন হিসেবে, আইনপ্রয়োগের ক্ষেত্রে, ক্ষমতার ভয়ে প্রভৃতি কারণে আদেশ মানতে হয়। নিয়ন্ত্রণজনিত অন্যায্য আদেশ ও ক্ষমতার অপব্যবহারজনিত আদেশ সব নিয়মরীতির ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বিকাশকে লণ্ডভণ্ড করে দেয় বিধায় দেশ ও জনগণের সমস্যার সীমাহীনতা বিস্তৃত হতে থাকে যা জাতিকে অগ্রগামী হতে দেয় না। অথচ, আমরা সবাই দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির কথা উঁচু গলায় বলছি। এটা হচ্ছে 'বগলে ইট, মুখে শেখ ফরিদ' প্রবাদটির মতো। এটা হচ্ছে অন্তরে অসৎউদ্দেশ্য ও যেকোনভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার খেয়ালপোষণ করে ঠোঁটে সততার হাসির ঢেউখেলানো। অধীনস্থ হিসেবে ক্ষতির ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগের ফলে ক্ষতির ভয়ে সম্মান এবং ব্যক্তির সচ্চরিত্রতার ও ব্যক্তিত্বের কারণে সম্মান এক নয়। সচ্চরিত্রতার ও ব্যক্তিত্বের কারণে যেসম্মান প্রদর্শন করা হয় সেটাই প্রকৃত ও যথার্থ সম্মান। বাস্তবে এরকম সম্মান দুর্লভ। দুর্নীতি, অপরাধ ও শোষণমুক্ত এবং আইনানুগ সমাজব্যবস্থায়ই এরকম সম্মান সুলভ।

একদিকে, মন্ত্রীরা বলে যে, আমলারা কাজে জটিলতার সৃষ্টি করে বিধায় তারা দ্রুতগতিতে কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারছে না। অপরদিকে, আমলারা বলে যে, মন্ত্রীদের খামখেয়ালের কারণে কাজকর্মে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাদের পক্ষপাতিত্বের কারণে ন্যায়ানুগভাবে সব কাজ সম্পাদিত হতে পারছে না বিধায় জনগণ হতাশাগ্রস্ত। শিল্পপতি, পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ইত্যাদিরা বলে থাকে যে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে তারা তাদের কর্মকাণ্ডে নানাধরনের অসুবিধা ও বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, একস্কন্ধ থেকে অন্যস্কন্ধে দোষ স্থানান্তরিত হচ্ছে। এভাবে দোষ স্থানান্তরকরণ দুর্নীতির ও অন্যায়ভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। বাস্তবে এটার জন্যে এরা সবাই দায়ী। এটার থেকে রক্ষা পেয়ে ন্যায়ের ধ্বজা সমুন্নত রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে কাজের স্বার্থে সর্বপ্রথমে অন্যান্য রাজনীতিবিদসহ

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা পূতপবিত্র ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তা হলে আমলারা তাদের স্কন্ধে দোষ স্থানান্তর করতে ব্যর্থ হবে, কেননা তারা মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণাধীন। অপরদিকে, আমলারা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের স্কন্ধে দোষ স্থানান্তর করতে পারবে না, কেননা তাদের কোন কাজে জটিলতা ও প্যাঁচের উদ্ভব হবে না ও প্রতিটি কাজ ন্যায়ানুগ ও আইনানুগভাবে সম্পাদিত হবে বিধায় সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত হবে, অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীভূত হবে, দেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে এবং জনগণ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারবে।

আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে অতি চালাক মনে করি। ফলে, একজন মনে করে যে, সে যা বুঝে ও করে অন্যজন তা বুঝতে ও করতে পারে না। এরকম চালাকি থেকেই দুর্নীতি, প্রতারণা, প্রচঞ্চনা, ধোঁকাবাজি, বিধিবিধানের পরিপন্থী কাজকর্ম, আইন অমান্যতা ইত্যাদি চলছে। নির্মল চরিত্রের অধিকারী ও আইনের অনুবর্তী হলে, আপনপর ভেদাভেদ না করে বিধিবিধান মেনে চললে, জ্ঞানবৃদ্ধির জন্যে অনুশীলন চালালে,নিজেকে ব্যক্ত করার আগে অন্যকে জানলে এবং বিবেকের রায় মেনে নিলে প্রত্যেকেই মনে করবে যে, সে অন্যান্যের তুলনায় কম জানে। ফলে, চালাকির মাধ্যমে উপরোক্ত খারাপ ক্রিয়াগুলো বন্ধ হবে ও সামাজিক সুবিচার কায়েম করা সম্ভব হবে। রাষ্ট্রীয় কাজে যারা যেপর্যায়ে আছে তাদের সেপর্যায়ে কাজকর্ম দেখে মনে হয় যে, দেশটা তাদের এবং তারা জনগণের মালিক। তারা এ বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করছে যে, তারা যা করবে জনগণ কোনপ্রকার উচ্চবাচ্য না করে তা মেনে চলতে হবে। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। কোন কথাবার্তা ছাড়াই যখনতখন বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এপ্রবাহ দশ মিনিট আগে বন্ধ হয়ে দশ মিনিট পরে চলে আসে এবং পুনরায় দশ মিনিট পরে বন্ধ হয়ে ত্রিশ মিনিট পরে চলে আসে। এতে জনগণের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত ঘটে ও অসুবিধা হয় এবং সূক্ষ্ম ও মর্মান্তিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল বিরক্তির উদ্রেক হয়। কিন্তু, তাদের কিছুই করার থাকে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জনগণের এমনধরনের মালিক যে, তাদেরকে এব্যাপারে জানিয়ে ধমকই খেতে হয়। এভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধের দ্বারা জনসাধারণের অসহনীয় ক্ষতি ও বিরক্তির উদ্রেক করে সিসটেম লস হ্রাস দেখানোর ফলে কোটিকোট টাকা চুরির ব্যাপারটি ঢাকা পড়ে যায়। কর পরিশোধ করতে দেরি হলে সিটি কর্পোরেশান ও পৌরসভা সেটার সাথে স্যারচার্জ যোগ করতে কোনপ্রকার বিলম্ব করে না এবং আইনের আশ্রয়ে হলেও সেগুলো আদায় করে থাকে। অথচ, কোনকোন অনুন্নত এলাকায় যে বছরের পর বছর ড্রেন, রাস্তায় বাতি ও সুষ্ঠুভাবে চলাচলের উপযোগী রাস্তা নেই সেদিকটার প্রতি তারা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। যুগ্ম-সচিব ও তদূর্ধ্বের কর্মকর্তা থেকে পাস না নিয়ে সচিবালয়ে প্রবেশ করা যায় না। কোন

www.pathagar.com

কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সাথে সহজে কথা বলা যায় না। জনগণের সাথে তারা গুরুগম্ভীর ভাব দেখায়। বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের ও মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের সাথে কোন ব্যাপারে আলাপ করলে মনে হয় যে, তারাই এগুলোর মালিক, তাদের কাছ থেকে কোনকিছু জানার কারো কোন অধিকার নেই এবং তারা যা করবে বা বলবে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদেরকে তা নির্বিবাদে মেনে নিতে হবে। ভর্তিফর্ম, প্রস্পেক্টাস ইত্যাদি অত্যধিক উচ্চমূল্যে বেচা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা অধিদপ্তর বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর আয়ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণের জন্যে আর্থিক নিয়মাবলীসংক্রান্ত একটি বাধ্যতামূলক নির্দেশিকা জারি করেছে। কিন্তু, এঅধিদপ্তর নিরীক্ষার সময় এনির্দেশিকা অনুসরণ না করার ফলে বড়াকারের দুর্নীতি চলে এবং বিদ্যালয়গুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এব্যাপারে মুখ খুললে নাজেহাল হতে হয়। উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলো দুর্নীতির বশবর্তী হয়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্যে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, অ্যালাইনম্যাণ্ট ঠিক করে ও ভূমি হুকুম দখল করায়। বন বিভাগে বনায়ন কর্মসূচির ও প্রকল্পের নামে কোটিকোটি টাকা লোপাট হচ্ছে। জনসাধারণ কিছু করতে পারছে না। এভাবে একটিএকটি করে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, জনগণ তাদের কাজে সরকারের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত মালিকানায়। তাদের এমালিকানা থেকে জনগণের মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পায়া যাচ্ছে না। তবে, একদিন–না–একদিন এউপায় উদ্ভাবিত হবেই।

সরকার বক্তৃতায় ও কাগজেকলমে যেভাবে অগ্রগতি দেখায় তাতে দেশে কোনপ্রকার অর্থনৈতিক সংকট না থাকার কথা। কিন্তু, বাস্তবে আমরা অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত। এতে এটা সুস্পষ্ট যে, সরকারের কথার সাথে কাজের সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে। কথার সাথে কাজের সামঞ্জস্যের অভাবই হচ্ছে মোনাফেকি। মোনাফেকি দ্বারা জনগণকে ধোঁকা দেয়া যায় ; কিন্তু দেশের সার্বিক অগ্রগতি সাধন করা যায় না। তাই, একটি দেশপ্রেমিক সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে কথা অনুযায়ী কাজ করা এবং কাগজেকলমে যা পায় তা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা সেব্যাপারে নিজেরাই সরেজমিনে পরীক্ষানিরীক্ষ করা। ন্যায়ানুগ কথা বলে ও সত্যের জন্যে প্রতিবাদ করে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারোকারো মতে একথা ও প্রতিবাদ একগুঁয়েমি। এর বিপরীতে অন্যায় ও অসত্যকে ব্যক্তিস্বার্থের দিকে তাকিয়ে নীরবে সহ্য করাটাই, তাদের মতে, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার। তাছাড়া, ন্যায়কথা বলার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো কিছু লোক আছে বলেই সবকিছু চলছে। তা না হয় আমাদের যেরকম মানসিকতা আমরা অবিচারঅত্যাচার, জোরজুলুম, অপকর্ম, দুর্নীতি ইত্যাদিতে ডুবে থাকতাম। তাই, আমাদের ওরকম ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের প্রয়োজন নেই যাতে অন্যায়কে মেনে নেয়া হয়। আমাদের ওরকম একগুঁয়েমিরই প্রয়োজন যেটাতে

www.pathagar.com

ন্যায় ও সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নির্বিঘ্নে ও উদারচিত্তে কাজ করা যায়। আমরা চাই না যে, কেউ স্বার্থপর হোক। আমাদের এচায়াটা ঠিক নয়, কেননা প্রকৃতির ধর্মানুযায়ী আমরা স্বার্থপর। স্বার্থপরতার কারণেই আমরা টিকে আছি। স্বার্থপরতা না থাকতোতো এদুনিয়াই জান্নাতে পরিণত হতো। তবে,আমাদের এস্বার্থপরতার একটা সীমা আছে। এসীমারেখা হচ্ছে যে, আমি আমার স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে গিয়ে এমনকোন কাজ করবো না যাতে অন্যের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটে। অন্যের স্বার্থ নষ্ট না করে নিজের স্বার্থ ঠিক রাখতে চেলেই আইনের সঠিক প্রয়োগ হবে এবং দুর্নীতি, অপরাধ ও অপকর্ম লাগামহীনভাবে চলবে না। স্বার্থপরতার এনীতি মানবতাবিকাশে সহায়ক এবং অপ্রতিহত গতিতে অগ্রগতিসাধনের ধারা। এধারা অব্যাহত রাখা আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব। যা হবে না তা এককথায় সরাসরি বলে দেয়াটাকে কেউকেউ নঞর্থক মনোভাব বলে। প্রকৃতপক্ষে, এটাই হচ্ছে স্পষ্ট মনোভাব। তাদের মতে যা হবে না তা সরাসরি না বলাটা ভালো, কেননা তা সরাসরি বললে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে কষ্ট পায় ও হতাশ হয়। তবে, সরাসরি না বলে অন্যভাবে বলতে গেলে কিছু-না-কিছু মিথ্যা ও প্রতারণা এসে যায়। তাই, ন্যায়বান ও বিবেকবান ব্যক্তিরা সরাসরি বলার পরিবর্তে অন্যভাবে কোনকিছু বলতে পারে না। কেউই আইন ও নিয়মের উর্ধ্বে স্থান না পেলে এবং কোনভাবেই এগুলোর পরিপন্থী কোন কাজ না হলে যা হবে না তা সরাসরি 'না' বলে দেয়াটা নঞর্থক মনোভাব বলে বিবেচিত হবে না।

নকল ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাদেরকে হত্যাকারী বললে অত্যুক্তি হয় না, কেননা এওষুধের প্রতিক্রিয়ায় রোগীর মৃত্যুও ঘটে। বহু নকল ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা ধৃত হয়ার কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; কিন্তু এদের তেমনকোন শাস্তি হতে শুনা যায় না। তবে এরা মানুষের ও মানবতার শত্রু। মানুষের ও মানবতার স্বার্থে এদের মৃত্যুদণ্ড হয়াটা যুক্তিযুক্ত। শোষণ ও দুর্নীতি না করে আইনানুগ ও নীতিগতভাবে কাজ কারবার করলে সম্পদশালীদের এতো সম্পদ হতে পারে না এবং অন্যান্যরা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্যে এতো কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। অর্থই দুর্নীতির মূল। ইসলামী নীতিতে অর্থের সুষম বণ্টন দুর্নীতিদূরীকরণে সক্ষম। দেশের সমস্যার সমাধান হলে কারো সমস্যা থাকবে না। তাই, প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সমস্যাসমাধানে সততার সাথে সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা পালন করা। তবে, আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার সাথে নিজের মধ্যে অন্যান্যকে দেখলে সততা ও মহত্ব অর্জিত হয়। অবস্থার প্রেক্ষিতে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ না করে ইতিবাচক মনোবল রেখে সম্মুখপানে এগিয়ে গেলেই সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে। একারণে যারা খারাপ তাদেরকে ভালো

www.pathagar.com

করার জন্যে ভালোর মাধ্যমে কাছে টানতে হবে, দূরে ঠেলে রাখা যাবে না এবং প্রবীণদের অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সেটার ওপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করে ও মহান আল্লাহ্‌র ওপর অবিচল বিশ্বাস রেখে নবীণদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

ম

ইসলাম যে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরন্তর শান্তি ও অগ্রগতির একমাত্র সনদ বা ফরমান তা দ্বিধাহীনচিত্তে ও নিঃসংকোচে বলা যায়। ইসলামী আদর্শ কার্যকর করলে ইসলামের নিকট বশ্যতাস্বীকার করা হয়। এতে ইসলামপন্থীদের অগ্রগামিতা এসে যায়। তাই, ইসলামবিরোধীরা তাদের অগ্রগামিতা ঠিক রাখার নিমিত্ত মোসলমানদেরকে অবদমিত রাখার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্রিয়ায় লিপ্ত ও ব্যতিব্যস্ত। মোসলমানদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যের, পারস্পরিক সহযোগিতার ও বিধিবিধানের কার্যকারিতার অভাবে ইসলামবিরোধীদের পক্ষে এটা সম্ভবপর হচ্ছে। তারা মোসলমানের সাথে মোসলমানের বিভেদ ও সংঘাত সৃষ্টি করে রাখছে। তারা মুসলিমঅধ্যুষিত দেশগুলোতে যেসব দল ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের দ্বারা অনাবিল শান্তি ও অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করার জন্যে কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য দলকে ইন্ধন দিয়ে ও মদদ যুগিয়ে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পেছনে সরিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। মোসলমানদের ব্যক্তিস্বার্থের ও অদূরদর্শিতার কারণেই তারা তা করে যেতে পারছে। যেসব দল ইসলামী আদর্শে রাজনীতি করছে তাদেরকে সমর্থন করাটা হচ্ছে ইসলামী আদর্শকে সমর্থন করা। এটা প্রত্যেক মোসলমানের ওপর ফরজ যে সে ইসলামী আদর্শের আলোকে জীবনযাপন করবে এবং এআদর্শ সার্বিকভাবে বাস্তবায়নের জন্যে একাগ্রচিত্তে কাজ করে যাবে। সার্টিফিকেট পেতে হলে পরীক্ষায় পাস করতে হয়। পাঠ্যনির্ঘণ্ট অনুযায়ীই পরীক্ষা নেয়া হয়। সবকিছু তাদের মূলের দিকে প্রত্যাগমন বা প্রত্যাবর্তন করে। আমাদের প্রাণ বা শ্বাসরূপে গৃহীত বায়ু আল্লাহ্‌র হুকুম। তাই, আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের প্রত্যাগমন অনিবার্য ও অবধারিত। তাঁর নিকট প্রত্যাগমন করার পর তিনি আমাদের অনন্ত শান্তি ও অশান্তির ফয়সালা বা মীমাংসা করে দেবেন। এজন্যে তিনি এদুনিয়া আমাদের পরীক্ষার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এখানে আমাদের পরীক্ষার বিষয়াবলী তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কোরআনে এবং বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদের (সঃ) অজস্র হাদীসের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এগ্রন্থের ও মহানবীর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত সিল্যাব্যাসের দৃষ্টান্তের দ্বারাই আমাদের পার্থিব জীবনে এগ্রন্থের ও এবাণীর কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করছি। সিল্যাব্যাস বা পাঠ্যনির্ঘণ্ট অনুযায়ী অধ্যয়ন না করে পরীক্ষার কৃতকার্য হয়া যায় না। অনুরূপভাবে,

www.pathagar.com

আমাদের জীবনে প্রতিটি কর্মে এগ্রন্থের ও এবাণীর নির্দেশাবলীর প্রতিফলন না ঘটলে আমরা এদুনিয়াতে সুন্দর, ন্যায়ানুগ, আদর্শিক ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাগমন করে অনন্ত শান্তির আশা করতে পারি না। এমতাবস্থায়, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় হতে হবে এগন্থের ও এবাণীর নির্দেশাবলী অনুযায়ী প্রতিটি কাজ নিষ্পাদন করা। আমাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। রেডিওতে ও টেলিভিশনে নামাজের সময় আযান দেয়া হয়। আযানের পর কিছু সময়ের জন্যে হলেও কোন অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে না। যারা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে তাদের মধ্যে যারা মোসলমান তাদের নামাজের যে কি অবস্থা হয় তা বুঝে ওঠতে পারছি না। বিশেষ করে মাগরিবের আযানের কথা উল্লেখ করছি। এআযানের পর সাথেসাথে নামাজ পড়াটা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু, অনুষ্ঠান চলতে থাকে বিধায় এটা সম্ভব নয়। এটা রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলামের প্রতি একপ্রকার অবমাননা। এঅবমাননা কোনভাবেই চলতে দেয়া যায় না। তাছাড়া, নামাজের সময় অনুষ্ঠান চলে বিধায় যারা নামাজি তারা নামাজ আদায় করতে গিয়ে তা শুনতে ও দেখতে পায় না। এটাও কোনভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়।

আমরা কথায়কথায় বলি যে, অমুসলিমরা মুসলিমদের ভালো দেখতে পারে না এবং মুসলিমদেরকে ধ্বংস করার কাজে তারা ঐক্যবদ্ধ ও তৎপর। অমুসলিমদেরকে দোষী করার আগে আমরা মুসলিমরা আমাদের দিকে তাকানো উচিত। আমরা একটা দেশের মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ নই। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন দল ও মত। আমরা পরস্পরের স্বার্থ বিনষ্ট করছি এবং একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করছি। যেখানে আমরা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারছি না সেখানে অমুসলিমদেরকে দোষ দিয়ে লাভ কি? আমরা ঐক্যবদ্ধ ও 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র' পূর্ণ অনুগামী হলে অমুসলিমদের কোন চক্রান্তই আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বলা হয়ে থাকে যে, অমুসলিমরা আমাদেরকে গোঁড়া, মৌলবাদী ইত্যাদি বলে থাকে। এপ্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, মুসলিম-অমুসলিম সবাই চায় যে, অপরাধ সংঘটিত না হোক, দুর্নীতি না চলুক এবং সুবিচার সুনিশ্চিত হোক। কিন্তু, মানুষের মতবাদের ও দিকনির্দেশনার দ্বারা এচায়াটা সফলকাম হচ্ছে না। সবাই বলে যে, নবী করিম (সঃ) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আইনবিদ। তিনি নিজে কোন আইন রচনা করেননি। তিনি আল্লাহ্‌প্রদত্ত আইনের বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এআইন সর্বসময় আধুনিক ও বর্তমান। মুসলিমরা এআইনের বাস্তব প্রতিফলন চায়। এজন্যে তাদেরকে গোঁড়া, মৌলবাদী ইত্যাদি বলাটা অযৌক্তিক। মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে খোদায়ী অনুশাসন কায়েমের দ্বারা এটা প্রমাণ করাটা অপরিহার্য যে, তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তাদের মধ্যে গোঁড়ামি বলতে কিছুই নেই। আমরা মহানবী ও ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের প্রশংসার কথা বলি এবং অমুসলিম মনীষীদের লেখা থেকে মহানবীর ও ইসলামের প্রশংসার উদ্ধৃতি দেই। মহানবী ও ইসলাম সম্পর্কে এসব মনীষীর প্রশংসা

www.pathagar.com

এটাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, মহানবী কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম 'ইসলামই' সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এধর্মই আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এব্যবস্থাই অশান্তির মূলোৎপাটন করে অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং আমরা সবাই অনাবিল শান্তির প্রত্যাশী। তবে, আমাদের দেখা ও বুঝা দরকার যে, মহানবীর ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসা করা সত্ত্বেও এসব মনীষী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে কিনা। না, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। যেটাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলা হয় সেটা গ্রহণ না করে যেটা সর্বনিকৃষ্ট সেটার দিকে আকৃষ্ট হয়ার পেছনে অবশ্যই কোন হেতু আছে। আমরা সহজে বুঝে নিতে পারি যে, এটা হচ্ছে 'দরবার মানি, তবে খেজুর গাছ আমার' এবং 'গাছের মূল কেটে দিয়ে আগায় পানি ঢালা'। একারণেই অনেক মুসলিম আছে যারা মহানবীর ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছে ; কিন্তু মহানবীর আদর্শানুযায়ী ইসলামী অনুশাসনের মাধ্যমে অনাবিল শান্তিপ্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত কর্মের ঘোর বিরোধী। ওসব মনীষীদের ন্যায় এসব মুসলিমরাও মহানবীর মহান আদর্শের কথা বলে ; কিন্তু তাঁর আদর্শানুযায়ী আল-কোরআনের দিকে অগ্রসর হয় না। তবে, ওসব মনীষীরা কোরআন ও হাদীস অধ্যয়ন ও গবেষণা করেই এসিদ্ধান্তে পৌছেছে যে, মহানবী ও ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট। যেসব মুসলিম মহানবীর মহান আদর্শের কথা বলা সত্ত্বেও তাঁর আদর্শালোকে আল-কোরআনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে তাদের দ্বারা সমর্থিত মতাদর্শের সাথে আল-কোরআন ও আল-হাদীস তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করা। ওসব মনীষী অমুসলিম হয়ার কারণে তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মত্যাগ করে মহানবীর আদর্শের ভিত্তিতে আল-কোরআনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। কিন্তু, সব মুসলিমের এদিকে অগ্রসর হতে অসুবিধা কোথায়? উন্নত দেশগুলোতেও অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে ও আইন অমান্য করা হচ্ছে। তবে, আমাদের চোখে সেগুলো কম ধরা পড়ছে। তাই,আমরা বলে থাকি যে, উন্নত দেশগুলোতে অপরাধ ও আইন অমান্যতা নেই। বিভিন্ন কারণে অপরাধ সংঘটিত হয় ও আইন অমান্য করা হয়। আমরা জানি যে, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। তবে, আর্থিক প্রাচুর্যও স্বভাব নষ্ট করে। সাধারণত, অভাব না থাকলে স্বভাব নষ্ট না হয়ারই কথা। উন্নত দেশগুলোতে লোকজনের সামাজিক নিরাপত্তা আছে। তারা নিজেদের ও বংশধরদের খেয়েপরে বেঁচে থাকার নিরাপত্তার কথা ভাবতে হয় না। এতে তাদের অভাবো থাকে না, স্বভাবো নষ্ট হয় না। তারপরো সেসব দেশে অপরাধীদের যথাসময়ে যথাযথ শাস্তি হয় এবং বিচার প্রহসনে পরিণত হয় না। এসব কারণেই সেসব দেশের লোকজন আচারাচরণে ও স্বভাবে ভালো। এদিক থেকে কেউকেউ বলে থাকে যে, তারা মোসলমানদের চেয়ে ভালো। কিন্তু, তারা খেয়াল করছে না যে, আমাদের দেশে একদিকে সামাজিক নিরাপত্তা নেই এবং অপরদিকে ইসলামী অনুশাসন বলবৎ নেই। আমাদের দেশের লোকজন সামাজিক

www.pathagar.com

নিরাপত্তা পেলে ইসলামী মূল্যবোধের কারণে সেসব দেশের লোকজনের চেয়ে অনেকবেশি ভালো হবে। আমাদের এদেশ মুসলিমঅধ্যুষিত দেশ। ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার পূর্ণাঙ্গ নিশ্চয়তা আছে। এনিরাপত্তার জন্যে ইসলামী অনুশাসনের প্রয়োজন রয়েছে। একটি মুসলিমঅধ্যুষিত দেশে একদিকে সামাজিক নিরাপত্তা ও সুবিচারের জন্যে সোচ্চার হয়ে এবং অপরদিকে ইসলামী অনুশাসনের, ধর্মনিরপেক্ষতার ধোঁয়া ছেড়ে, বিরোধিতা করে এগুলো প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। যেকোন মুসলিম দেশে ইসলামী অনুশাসনের মাধ্যমেই এগুলো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এজন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল হযরত মোহাম্মদের (সঃ) আদর্শের ভিত্তিতে মোসলমানদের অটুট বা অক্ষুণ্ন ঐক্যের প্রয়োজন।

ইসলামে সহনশীলতা, সেবাপরায়ণতা, ক্ষমা, ধৈর্য, দয়া, পরোপকার, দানশীলতা, সহিষ্ণুতা, পরের জন্যে কষ্টস্বীকার, পরের ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা, দারিদ্রবিমোচন, দেশোন্নয়ন, সুসম্পর্ক, বেকারসমস্যাদূরীকরণ, মানবতা ইত্যাদি আছে বলে তা অন্যায়অবিচার, শোষণনির্যাতন, জোরজুলুম, ব্যভিচার, দুর্নীতি, মিথ্যা, পাপাচার ইত্যাদি বরদাস্ত বা সহ্য করে না। এসব প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ইসলাম আপসহীন ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া, ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ ও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্যে সে প্রয়োজনানুযায়ী কাজ করার নিমিত্ত নির্দেশপ্রদান করে। ইসলামের নীতি অনুযায়ী তার প্রতি আঘাত, অন্যায়অবিচার, শোষণনির্যাতন, জোরজুলুম ইত্যাদি প্রতিহত করার জন্যে প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হয়। এজন্যেই মহানবী সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল হয়েও বহু যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। মহানবীর সবদিক কার্যকারিতাতে রাখার ওপরই মোসলমানদের শান্তি ও অগ্রগতি নির্ভর করছে। তাই, প্রত্যেক মোসলমানের নিরপেক্ষ দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে নিজের সুবিধা অনুযায়ী ইসলামের কথা না বলে তার সার্বিকতা সম্পর্কে কথা বলা ও সে অনুযায়ী কাজ করা। মানবরচিত আইনে অপরাধ করে তা হতে বেঁচে থাকার জন্যে যথেষ্ট সুযোগ করে নেয়া যায়। কিন্তু, আল্লাহ্প্রদত্ত বিধিবিধানে এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। আল্লাহ্প্রদত্ত বিধিবিধান কার্যকর থাকলে খামখেয়ালীভাবে কোনকিছু করা সম্ভব নয়। এবিধিবিধানের আওতায় অপরাধকারীরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী অপরাধ সংঘটন করতে পারে না, চোরেরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চুরি করতে পারে না, ধোঁকাবাজ ও প্রতারকরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করতে পারে না, ঘুষখোরেরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ঘুষগ্রহণ করতে পারে না, জালিয়াতরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী জালিয়াতি করতে পারে না, অপকর্মকারীরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী অপকর্ম করতে পারে না, তেলমর্দনকারীরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তেলমর্দন করতে পারে না, ভোগবাদীরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভোগ করতে পারে না, মজুতদারেরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মজুত করতে

www.pathagar.com

পারে না, চোরাচালানি ও কালোবাজারিরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চোরাচালান ও কালোবাজার করতে পারে না, লম্পটরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী লাম্পট্যে জড়িত হতে পারে না, সন্ত্রাসকরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সন্ত্রাস করতে পারে না, বেঈমান ও মোনাফেকরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বেঈমানি ও মোনাফেকি করতে পারে না এবং আরো অনেকে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আরো অনেককিছু করতে পারে না। অথচ, এদের চিন্তাচেতনায় এরা কোনভাবেই এগুলো করা হতে বিরত হতে চায় না। ইসলামী বিধিবিধানের বাস্তবায়ন এদেরকে এগুলো থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। তাই, এরা সবাই এদের স্বস্ব স্বার্থে ইসলামী আইন নির্মল ও মঙ্গলজনক জেনেও এটার বিরোধিতা করে ও বাস্তবায়ন চায় না। যারা ইসলামের আলোকে রাজনীতি করে তারা জনগণের সার্বিক মঙ্গলার্থে এটার বাস্তবায়ন চায়। অপরদিকে, অন্যান্য দল এটার বিরোধিতা করে। ফলে, এসব দলের প্রতি বিপুলসংখ্যক জনগণের সমর্থন থেকে যায়। একারণেই ইসলামের পক্ষে কাজ করার মতো লোকের সংখ্যা কম পায়া যায়। বস্তুত, সবাই স্বস্ব স্বার্থ না দেখে সার্বিক স্বার্থ দেখলে ইসলামী অনুশাসন কায়েমের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট হতে পারে না। অন্যায়ভাবে কারো হাত কাটা, রগ কাটা বা কোনপ্রকার ক্ষতিসাধন করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং কোন মোসলমান এটা করতে পারে না। তাছাড়া, ইসলাম ক্ষমা, দয়া ও সহনশীলতা উৎসাহিত করে। তবে, সাধ্য থাকলে ইসলাম কোন অন্যায়কে প্রতিহত না করে সহ্য করাটাকে ঘৃণা করে। 'ক' 'খ'–র হাত কাটবে, রগ কাটবে বা কোনপ্রকার ক্ষতিসাধন করবে এবং 'খ' নিজেকে রক্ষার জন্যে তা প্রতিহত করতে গিয়ে পারলে 'ক'–র হাত কাটতে, রগ কাটতে বা কোনপ্রকার ক্ষতিসাধন করতে পারবে না তা ইসলাম কোনভাবেই সমর্থন করে না। তাছাড়া, ইসলামে ক্ষমা, দয়া ও সহনশীলতা অন্যায়ের প্রতি নয়। এটা অতিসাধারণ কথা যে, অন্যায়ের প্রতি ক্ষমা, দয়া ও সহনশীলতা অন্যায়কে উৎসাহিত করার পন্থা ব্যতীত অন্যকিছু হতে পারে না। এপ্রসঙ্গে মহানবীর ও সাহাবাদের ক্ষমা, দয়া ও সহনশীলতার কথা ওঠাটা স্বাভাবিক। তাঁদের এসব বুঝতে হলে কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামকে বুঝতে হবে। তাঁদের এসব ছিলো ইসলামের নীতিতে মানবতার প্রতি, অন্যায়ের প্রতি নয়। তাঁদের এসবের অর্থ এ নয় যে, তাঁরা অন্যায়ের প্রতি এগুলো প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা ঈমানের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে অবস্থা অনুযায়ী কাজ করেছেন। ঈমানের বিষয়বস্তু অনুযায়ী শক্তি থাকলে সর্বপ্রথমে শক্তিপ্রয়োগ করে অন্যায় প্রতিহত করতে হবে, শক্তি না থাকলে মুখ, অর্থাৎ কথা, দিয়ে সেটা প্রতিহত করতে হবে এবং শক্তি বা কথা দিয়ে সেটা প্রতিহত করতে না পারলে অন্তরেঅন্তরে সেটা ঘৃণা করতে হবে। মহানবী ও সাহাবারা তাঁদের বিজয়ের পর ও রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে থেকে যেসব ক্ষমা, দয়া ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন সেগুলো তাঁদের মহানুভবতা।

www.pathagar.com

উদারতা ও মহানুভবতা অবিশ্বাসীদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার একটি মহৎ ও উত্তম পন্থা। অপরদিকে, তাঁরা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। তাঁরা শুধু ক্ষমা, দয়া ও সহনশীলতাতে সীমাবদ্ধ থাকতেনতো তাঁদেরকে যুদ্ধপরিচালনা করতে হতো না। তাই, বলতে হচ্ছে যে, তাঁরা পরিবেশপরিস্থিতি ও ঈমানের বিষয়বস্তু অনুসারে ইসলাম, মোসলমান ও মানবতার স্বার্থে যখন যা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন তখন তা করেছেন। তাঁরা ত্যাগতিতিক্ষা স্বীকার ও যুদ্ধপরিরচালনা না করে, যারা ইসলামে ক্ষমা, দয়া ও সহনশীলতার কথা বলে তাদের কথা অনুযায়ী, শুধু ক্ষমা, দয়া ও সহনশীলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেনতো বিশ্বের বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো বলে আমার মনে হয় না এবং বর্তমান বিশ্বে ইসলামের জন্যে কাজ করার মতো লোক বিরল হতো। তাই, ইসলাম শুধু ক্ষমা, দয়া, সহনশীলতা ও মানবতার ধর্ম নয়। এটা ইসলামের বিরোধিতা, অন্যায়অবিচার, ইসলামের পরিপন্থী কার্যকলাপ, জোরজুলুম, শোষণনির্যাতন, পাপাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি যুদ্ধ করে হলেও প্রতিহত করার ধর্ম। এসব কারণে ইসলাম হচ্ছে সার্বজনীন ধর্ম, পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ও বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ। আজকের এ অশান্ত বিশ্বে ইসলামী অনুশাসনই পুনরায় শান্তিস্থাপন করতে সক্ষম। কিন্তু, মোসলমানদের অনৈক্যের কারণে তারা এসফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ। তাই, বর্তমানে মোসলমানদের করণীয় কাজ হচ্ছে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে জীবনপরিচালনা করা।

ইসলামের আলোকে মোসলমানেরা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। মোসলমানেরা ইসলামের কথা বলতে গিয়ে কোরআন, হাদীস, রাসূল, ইসলামী আইন, ইসলামী অনুশাসন ইত্যাদির কথা বলে। যারা সাম্প্রদায়িকতার কথা বলে তারা চায় যে মোসলমানেরা এসব কথা না বলুক। তবে, আমাদের এটা মনে রাখা জরুরী যে, যেটার প্রচলন থাকে না সেটা বিলুপ্ত হয়। মোসলমানেরা এসব কথা না বললে এগুলো তাদের মন থেকে আস্তেআস্তে মুছে যাবে এবং তারা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে। অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা ও সমর্থনকারীরা চায় যে, মোসলমানেরা এসব কথা না বলে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ থাকুক। মোসলমানেরা অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে হলে এসব কথা বলা হতে বিরত থাকতে হবে। তারা এসব কথা বলা হতে বিরত থাকলে ইসলামী আদর্শের প্রচার ও কার্যকারিতার প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ, তাদের জাতীয় আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। যেঅসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাতে ইসলামী আদর্শে কথা বলা ও রাজনীতি করা যাবে না সেঅসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলাম সমর্থন না করে অপনোদন করে। ইসলাম অন্যকোন সম্প্রদায়ের প্রতি কোনপ্রকার বিদ্বেষ পোষণ করে না ও তাদের ধর্মে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করে না। তাই, মোসলমানেরা ইসলামী আদর্শে কথা বলাতে,

www.pathagar.com

কাজ করাতে ও রাজনীতি করাতে ইসলামবিরোধীদের প্রতিবন্ধকতা সম্পূর্ণরূপে অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত এবং ইসলামই সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যকলাপ প্রতিহত করে। ইসলামবিরোধীরা ইসলামকে খুব অভিনব কায়দায় প্রতিহত করার কাজে লিপ্ত আছে। মহানবীর আদর্শে দাড়ি রাখা ও টুপি পরা সুন্নত। জামায়াতের ও ছাত্র শিবিরের কর্মীরা সাধারণত দাড়ি রাখে ও টুপি পরে। মহানবীর আদর্শে বহু মোসলমান দাড়ি রাখে ও টুপি পরে। যারা জামায়াত ও ছাত্র শিবিরের বিরোধী তারা যার মুখে দাড়ি ও মাথায় টুপি দেখে তাকে হুজুগে আক্রমণ করে আঘাত ও নাজেহাল করে। তাদের এসব করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যারা দাড়ি রাখে ও টুপি পরে তারা আঘাত ও হয়রানির ভয়ে দাড়ি রাখা ও টুপি পরা বাদ দেবে এবং মোসলমান হয়েও মহানবীর আদর্শ হতে বিচ্যুত হবে। সব মোসলমানকে এসব বুঝতে হবে এবং সরকার এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে কেউই ইসলামী আদর্শের প্রতি কোনপ্রকার আঘাত হানতে কোনরকম সুযোগ সৃষ্টি না করতে পারে।

য

যেটা রাজনৈতিক নয় সেটাই অরাজনৈতিক। রাজনৈতিক হচ্ছে রাজনীতিগত ও রাজ্যশাসনঘটিত। সহজসরল কথায় রাজনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রনীতি ও রাজনৈতিক মতাদি বা কার্যাদি। রাজনৈতিক মতাদির বা কার্যাদির ভিত্তিতেই রাষ্ট্রনীতি প্রণীত ও কার্যকর হয়। রাজনীতির সাথে যেটা সম্পর্কহীন সেটাই অরাজনৈতিক। রাজনীতি নীতিশূন্যতা বা নীতিহীনতা নয়। পক্ষান্তরে, যেনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রপরিচালিত হয় তা হচ্ছে রাষ্ট্রনীতি। তাই, নীতিসম্পর্কীয় তর্কবিতর্ক, বাদানুবাদ, আলোচনা, সমালোচনা, কথাবার্তা, পরামর্শ, মতামত, পর্যালোচনা ইত্যাদিকে কোনক্রমেই অরাজনৈতিক বলা যায় না। নীতিবহির্ভূত যেকোনকিছু অরাজনৈতিক। বহু সংগঠন আছে যেগুলোকে গঠনতান্ত্রিকভাবে অরাজনৈতিক বলা হয়। সেগুলো কতকগুলো নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়। তবুও সেগুলোকে অরাজনৈতিক বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, সেগুলো সরকারের বিপক্ষে যায় এমনকোন কাজ করবে না ও কর্মকাণ্ডে জড়িত হবে না। দেশ ও জনগণের স্বার্থে যথার্থ ও সঠিক কথা ক্ষমতাসীন দলের বিপক্ষে বা বিরুদ্ধে কথা হতে পারে না। এধরনের কথা প্রকারান্তরে সরকারের পক্ষেই হয়ে থাকে, কেননা সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে যথার্থ ও সঠিক কাজ সম্পাদন করা। সরকার হিসেবে ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতা অস্থায়ী এবং সরকারী কর্মচারী বলতে যারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা স্থায়ী। কাজেকাজেই, রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ক্ষমতাসীন

www.pathagar.com

দলের চেয়ে কর্মচারীদের বাস্তব ও স্বহস্তে আয়ত্ত অভিজ্ঞতা অনেকবেশি। তাই, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেউকেউ দেশ ও জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাদের অভিমত প্রকাশ করলে সেটাকে রাষ্ট্রবিরোধী বা সরকারবিরোধী কার্যকলাপ বলা যায় না। তাছাড়া, সরকারী কর্মচারীরাও দেশের নাগরিক। সরকারী কর্মচারী হিসেবে তারা সরকারী বিধিবিধান অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করবে এবং নাগরিক হিসেবে তারা দেশ ও জনগণের মঙ্গলকামনায় রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পর্কে তাদের অভিপ্রায় ও মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে। তাদের অভিপ্রায় ও মনোভাবপ্রকাশকে কোনভাবেই সরকারবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী বলা যায় না। এটা সঠিক যে, সরকারী কর্মচারীরা অরাজনৈতিক। এটার অর্থ এ'যে, তারা একই সময় কর্মচারী থাকতে ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাই, অরাজনৈতিক হিসেবে তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে না। কিন্তু, তারা অরাজনৈতিক বলে তাদেরকে তাদের অভিপ্রায় ও মতামতপ্রকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তাছাড়া, কোনকিছু সরকারের বিরুদ্ধে গেলেই যে তা অরাজনৈতিক হবে তা নয়। সেটাই হবে অরাজনৈতিক যেটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাবে।

প্রত্যেক ক্ষমতাসীন দল যেভাবে সব কর্ম করছে ও হচ্ছে বলছে তারা তাদের সেবলা অনুযায়ী সর্ব কর্ম করলে ও তাদের সেবলা অনুযায়ী সব কর্ম হলে আমাদের তেমনকোন সমস্যা থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা তাদের এবলাতে আত্মপ্রসাদ ও তৃপ্তি লাভ করে থাকে। এটা আত্মবঞ্চনা, সজ্ঞানে স্বীয়মনকে মিথ্যা প্রবোধদান, আত্মবিরোধ, নিজের মতেরই বিরুদ্ধমত, আত্মম্ভরিতা ও আত্মশ্লাঘা। তারা হয়তো একেবারেই বোঝে না নয়তো ক্ষমতার বিভোরতায় বোঝেও বোঝে না যে, এগুলো প্রত্যেকের জন্যেই আত্মঘাতী। এ আত্মঘাতী কাজ হতে রক্ষার জন্যে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি, আত্মবুদ্ধি, আত্মশাসন, আত্মসংবরণ ইত্যাদি। এগুলো অর্জন করতে পারলে আত্মবিরোধ, আত্মবঞ্চনা, আত্মম্ভরিতা ও আত্মশ্লাঘা দ্বারা আত্মপ্রসাদ ও তৃপ্তি লাভ করার প্রবণতা দূরীভূত হয়। যেদলই ক্ষমতাসীন হয় তারা বলে থাকে যে, সুষ্ঠুভাবে দেশপরিচালনা করা সরকারের পক্ষে একাকী সম্ভব নয়। অথচ, সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে দেশপরিচালনা করা। সরকার বলতে ক্ষমতাসীন দল ও সরকারী কর্মচারীরাই এপরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা আইনকানুন, বিধিবিধান, নিয়মরীতি ও পদ্ধতির দ্বারা এপরিচালনার কার্যাদি করে থাকে। তারা এগুলো পুরোপুরিভাবে মেনে কার্যাদি করলে এবং এগুলো হতে বিন্দুমাত্র বা লেশমাত্র এদিকওদিক না হলে কেউই এগুলো অমান্য করে কোনকিছু করে নিস্তার পেতে পারে না। যারা এগুলো অমান্য করে তারাই সুষ্ঠুভাবে দেশপরিচালনায় বিঘ্নসৃষ্টিকারী। এসব বিঘ্নসৃষ্টিকারীকে জনগণ ভালো জানে না। অথচ, এসব বিঘ্নসৃষ্টিকারীই নির্বিঘ্নে চলে।

www.pathagar.com

এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে সরকারের দুর্বলতা এবং সরকারের দুর্বলতার সুযোগে অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী দুর্নীতিপরায়ণ হয়। ক্ষমতাসীন দলের সবাই ন্যায়নিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, সৎযোগ্যতাসম্পন্ন ও সত্যিকারার্থে দেশপ্রেমিক হলে সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতিমুক্ত থেকে প্রতিটি কাজ সম্পাদন করতে বাধ্য থাকে এবং সরকার একাকী রাষ্ট্রপরিচালনা করতে পারে। তাই, একথা ঠিক নয় যে, সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা সরকাররের পক্ষে একাকী সম্ভব নয়।

যেকোনকিছু সচারুরূপে পরিচালনার জন্যে জ্ঞানগরিমা ও অভিজ্ঞাতার প্রয়োজন। অভিজ্ঞতাই পারদশী বানায়। কর্মক্ষেত্রে পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্যেই বহুবিধ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। জ্ঞানগরিমার সাথেসাথে বয়োবৃদ্ধিও অধিক অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে। রাষ্ট্রপরিচালন ও আইনপ্রণয়ন খুব সহজ কাজ নয়। এ দু'টোতে অনবধানতার কারণে ভ্রমপ্রমাদ বা ভুলক্রটি হলে এবং ভ্রমাত্মক বা ভ্রান্তিমূলক কোনকিছু ঘটলে গোটা জাতি কোন-না-কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তাই, যারা রাষ্ট্রপরিচালন ও আইনপ্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত হয় তাদের জ্ঞানগরিমা, বাস্তবসম্মত অভিজ্ঞতা ও বয়সকে প্রাধান্য দিতে হয়। মহান আল্লাহ্ আমাদের নবীকরিমকেও (সঃ) চল্লিশ বছরের পূর্বে নবী করেননি। তাই, আমাদের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও সাংসদদের বয়স চল্লিশের উর্ধ্বে হয়টা অভিপ্রেত। জ্ঞানহীনতার ও স্বার্থের টানের কারণে বেঠিক কাজকে সঠিক কাজ বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানহীনতার কারণে কোনকোন সময় বেঠিক ও সঠিক কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে না পেরে বেঠিক কাজটিকেই সঠিক কাজ মনে করা হয়। অপরদিকে, যেখানে বেঠিক কাজে স্বার্থ জড়িত থাকে সেখানে জেনেশুনেই সেকাজটিকে সঠিক বলা হয়। বেঠিক কাজ সঠিক হয়ার কারণেই আমরা জ্ঞানের বাসনা ও ভরসা অনুযায়ী দেশটিকে শান্তিশৃঙ্খলা ও অগ্রগতির পথে বাধাহীনভাবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিতে অপারগতার স্তরে অবস্থান করছি এবং বেঠিক কাজকর্মের মধ্যে লম্ফঝম্ফ ও আস্ফালন করে শূন্যের সাথে শূন্যযোগ করে চলছি। এক শিক্ষকের এক একচোখহীন ছাত্র আছে। শিক্ষক বাইর থেকে ছাত্রটিকে ভেতরে টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসটি আনতে নির্দেশ করলো। একচোখ না থাকার কারণে ছাত্রটি টেবিলের ওপর দু'টি গ্লাস দেখলো। সে শিক্ষকের নিকট জানলো যে, সে কোন্ গ্লাসটি আনবে। শিক্ষক বললো যে, গ্লাস একটিই আছে এবং সেটিই আনবে। ছাত্রটি বলতে লাগলো যে, গ্লাস দু'টিই আছে। এতে শিক্ষক বিরক্ত হয়ে তাকে একটি ভেঙে ফেলতে বলার সাথেসাথে সে গ্লাসটি ভেঙে ফেলে চিৎকার করে বলতে লাগলো যে, টেবিলের ওপর কোন গ্লাস নেই। আমাদের অবস্থা এ একচোখহীন ছাত্রের মতো। আমরা আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতিমোতাবেক কাজকর্ম না করে আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজকর্ম করাতে

www.pathagar.com

শান্তিশৃঙ্খলা, অগ্রগতি ও সুষম বণ্টনকে ভেঙে চুরমার করে ফেলছি। এখনো এমনএমন লোক আছে যারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্যে কাজ করছে। তাদের অনেকেই হিংসাঈর্ষার কারণে ও অর্থাভাবে সামনে এগিয়ে এসে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারছে না। দেখা যায় যে, এধরনের ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর তাদের জন্যে আমাদের দরদ উথলিয়ে ওঠে এবং তাদের প্রশংসায় আমরা উদ্বেলিত হই। অথচ, তাদের জীবদ্দশায় আমরা তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে আনি না। এটার কারণ হচ্ছে যে, তারা সামনের দিকে এগিয়ে আসলে, আমাদের চিন্তাধারায়, আমাদের কোন মূল্য থাকে না এবং আমরা তাদের নিকট ছোট হয়ে যাই। তাদের মৃত্যুর পর তাদের অবদান রাখার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় বিধায় তারা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না। তাই, আমরা জোরেসোরে তাদের গুণকীর্তন ও যশোগান করি এবং তাদের গুণগরিমার ও সদ্‌গুণাবলীর মহিমা বর্ণনা করি। আমরা তাদেরকে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে না করে জাতীয় সম্পদ হিসেবে পরিগণিত করে তাদের জীবদ্দশায় তাদেরকে সামনের দিকে উৎসাহউদ্দীপনা দিয়ে এগিয়ে নিলে তারা অনেক অবদান রেখে যেতে পারবে এবং তাদের অনুকরণ ও অনুসরণে সত্যিকারার্থে ভূরিভূরি দেশপ্রেমিক আবির্ভূত হবে এবং আমাদের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হবে।

যেদল ক্ষমতাসীন হয় সেদল ক্ষমতাসীন থাকা কালে সেদলের বিরাগভাজন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। সাধারণত ক্ষমতাসীন দল চেলে বেআইনী কাজো নিষ্পাদিত হয়ে যায় এবং তারা না চেলে আইনসিদ্ধ কাজো নিষ্পন্ন হয় না। তাছাড়া, ক্ষমতাসীন দলো চায় যে, সবাই তাদেরকে একচেটিয়াভাবে সমর্থন করুক। এদলের প্রতি সমর্থন দেখিয়ে বহুকিছু বাগে আনা যায়, অর্থাৎ অনেক অযৌক্তিক ও বেমানান সুযোগসুবিধা আদায় করা যায়। এদলের প্রতি যাদের সমর্থন নেই বুঝা যায় তারা তাদের যৌক্তিক ও ঠিকঠিক কাজ আদায় করতেও অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। যেসব সরকারী কর্মচারীর কাজকর্ম এদলের মনঃপূত বা পছন্দসই হয় না তারা এদলের আস্থাভাজন থাকতে না পারলে নানাভাবে নাকানিচোবানি খেতে ও নাজেহাল হতে হয়। তাই, এদল যেটোপ ফেলে বা তাদের প্রতি আকৃষ্ট করা জন্যে যেপ্রলোভন দেখায় অহেতুক ঝামেলায় না পড়ে নিজেদের সুবিধার্থে স্বাভাবিক পরম্পরা অনুযায়ী সেটোপ গেলে বা সেপ্রলোভনে প্রলোভিত বা প্রলুব্ধ হয়। এটা হচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের বা সরকারের দলীয়করণ ও মেরুকরণ। এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের এক বিরাট অবক্ষয়, অর্থাৎ ধীরেধীরে অথচ নিয়মিতভাবে ক্ষয়প্রাপ্তি বা অধোগতি। এটা গণতান্ত্রিক বিকাশ ও পরিস্ফুটনের পথে এক বিরাট অন্তরায়, কেননা এটাতে অনেকেই সর্বজনসমন্বীয় ও সর্ববিষয়ব্যাপী স্বাধীন মতামত ও মনোভাব ব্যক্তির বা প্রকাশের দ্বারা ক্ষমতাসীন দলের রুক্ষতা ও রূঢ়তাতে পতিত হয়ে

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্ত হতে চায় না। ক্ষমতাসীন দল দলমতনির্বিশেষে সবকিছুর উর্ধ্বে সত্যতা, ন্যায্যতা, নিয়মানুবর্তিতা ও আইনানুগতাকে প্রাধান্য দিলে গণতন্ত্র বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হতে পারবে এবং তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করতে সক্ষম হবে। তাই, সেটাই হবে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক চর্চা যেটাতে সত্যতা, ন্যায্যতা, নিয়মানুবর্তিতা ও আইনানুগতার চেকনাই বা ঔজ্জ্বল্য উদ্ভাসিত থাকবে। আলাপআলোচনায়, কথাবার্তায়, লেখায় ও বক্তৃতায় সব দলই গণতন্ত্রের এচর্চা বা অনুশীলন চায়। কিন্তু, আমাদের মতো দেশে যখন যেদল ক্ষমতাসীন হয় তখন সেদল তাদের মনের গোচরে বা অগোচরে এটা বিস্মৃত হয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে এভ্রমের চেয়ে সাংঘাতিক ভ্রম, আমার চিন্তাচেতনা ও মনমানসিকতায়, আরকিছু হতে পারে না। এখন কথা হচ্ছে যে, যেভ্রম ও বিস্মৃতি আমাদের গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভের পথে একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধক সেটা মুক্তমনে বর্জন করার প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক দায়িত্ব ক্ষমতাসীন দলের বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। এদলের প্রতিটি কর্ম সত্য, ন্যায্য, নিয়মানুগ ও আইনানুগ হলে তাদের দলীয়করণসংক্রান্ত কোন অভিযানের আবশ্যকতা থাকে না। আমার তিক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, ক্ষমতাসীন দল যতোদিন উক্ত নীতিতে অটলতার সাথে কর্মসম্পাদন করবে ততোদিন তাদের প্রতি জনগণের অক্ষুদ্ধ ও অকাতর সমর্থন থাকবে এবং তাদের পতন ঘটবে না। এসব কারণে আমাদের রাজনীতি সত্যতা, ন্যায্যতা, নিয়মানুবর্তিতা ও আইনানুগতার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত থাকতে হবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগতিতিক্ষার বিনিময়েই আজকের এ বাংলাদেশ। যেসব মুক্তিযোদ্ধা জীবিত আছে এবং যেসব শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারপরিজন আছে তারা সবাই যে অভাবশূন্য ও সংগতিপন্ন জীবনযাপন করতে পারছে তা কেউই সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারবে না। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে যেকোন সরকার বড়বড় কথা বলে ও গর্ববোধ করে। তাদেবকে নিয়ে কবিতা লিখা হয়, গান রচনা করা হয়, নাটক মঞ্চস্থ করা হয়, শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়, সভা হয় এবং আরো অনেককিছু হয়। কিন্তু, যেসব জীবিত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারপরিজন অভাবপূর্ণ ও অসংগতিপন্ন জীবনযাপন করছে, তাদেরকে মাঝেমধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সাহায্য ব্যতীত, তাদের সার্বিক অভাবশূন্যতা ও সংগতিপন্নতার জন্যে কোন উদ্যোগ ও কার্যক্রম নেই বা তাদের জন্যে করণীয় কার্যের ক্রমানুযায়ী তালিকা নেই। স্বাধীনতার অর্থবহতার অংশ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে কথাকে বাস্তব কাজের সাথে অবিরুদ্ধ ও সমন্বিত করতে হবে এবং যেসব জীবিত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারপরিজন অভাবপূর্ণ ও অসংগতিপন্ন জীবনযাপন করছে তাদেরকে কোনপ্রকার সংকোচ ছাড়া অচিরেই সার্বিকভাবে অভাবশূন্য ও সংগতিপন্ন

www.pathagar.com

জীবনযাপনের ব্যবস্থার অন্বেষণ বা সন্ধান দিতে হবে। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসবিরচন সম্পর্কে নানা কথাবার্তা শুনা যাচ্ছে। আমি ইতিহাসরচয়িতা বা ইতিহাসবেত্তা নই। তবে, একজন নাগরিক হিসেবে এতোটুকু বুঝি যে, আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের সঠিক, নির্ভুল ও নিরপেক্ষ ইতিহাসের প্রয়োজন। নাটক ও উপন্যাসের মতো ইতিহাসেও সবরকমের চরিত্র স্থান পায়। ইতিহাস পড়ে ইতিহাস সম্পর্কে আমার এধারণা হয়েছে। এ ইতিহাসের পটভূমি থেকে যবনিকা পর্যন্ত থাকতে হবে। এ সুদীর্ঘ পরিক্রমায় কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা এবং চরিত্রও বাদ পড়তে পারবে না। এ ইতিহাসরচনা শুধু ঘরে ও অফিসে বসে কোনভাবেই সম্ভব নয়। এ ইতিহাসরচনার জন্যে মূল ঘটনা ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র বা ভিত্তি করে ধারাবাহিকভাবে পরম্পর বা পরপর সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এজন্যে দেশের সর্বত্র নিরলসভাবে অবিরামগতিতে ছুটে বেড়াতে হবে। আমার চিন্তাধারা মতে আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসবিরচনের ক্ষেত্রে এটাই হবে সর্বোত্তম উপায়।

সংসদের বিভিন্ন কমিটি আছে। একেক কমিটির ওপর সরকারের একেক ধরনের কাজের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ অর্পিত। এসব কমিটি বিভিন্ন দলের সাংসদদের সমন্বয়ে গঠিত। তাই, এসব কমিটির সিদ্ধান্ত ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত হয়। এসব কমিটির সদস্যরা প্রতিটি বিষয় চুলচেরাভাবে বা অতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে তাতে যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌছতে অসুবিধা হয় না। তবে, তাদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হয়। তা না হলে একদিকে তারা সিদ্ধান্ত নিতে এবং অপরদিকে সবকিছু গতানুগতিকভাবে চলতে থাকে। সরকারকে যেকোন কাজে বিচারবিবেচনা করে ও ভেবেচিন্তে দূরদৃষ্টির সাথে পদক্ষেপগ্রহণ বা পদার্পণ করতে হয়। এটার কারণ হচ্ছে যে, তারা যেটা বাস্তবায়ন করতে পারবে না সেটার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়ে বিফল হয়ে তাদের অপারগতার বহিঃপ্রকাশের দ্বারা তারা নিজেরাই বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণের পথ সুগম করে দেয়। এতে জনগণো সরকারের প্রতি আস্তেআস্তে হলেও আস্থাহীন হয়ে পড়ে। ক্ষতাসীনেরা মাঝেমাঝে ছদ্মবেশে বা আত্মগোপনার্থে পরিধেয় বেশে জনগণের সাথে মিশে গিয়ে বাস্তবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তারা এবেশে বিভিন্ন যানবাহনে যাতায়াত করে যাত্রীদের সুবিধাঅসুবিধা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ও কর্তৃপক্ষগুলোর কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি ও হাবভাব প্রত্যক্ষভাবে বুঝে নিতে পারে। তারা এবেশে বিভিন্ন অফিসে ও কোর্টে কাজকর্মের জন্যে গেলে ঘুষ, অবিচার, শোষণ, জ্বালাতন, হয়রানি, দীর্ঘসূত্রতা, অনিয়ম, অবহেলা, ইত্যাদি সবকিছুর প্রকটতা ও ভয়াবহতা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে পারে। এককথায়, তারা ছদ্মবেশে সর্বত্র বিচরণ করতে হবে। এবিচরণ তাদেরকে সব ব্যাপারে এবং সাধারণ মানুষের দুর্বিষহতা বা দুঃসহতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা দেবে।

www.pathagar.com

তারা তাদের এ প্রত্যক্ষ ধারণা অনুযায়ী কাজ করলে তাদের কোন পদক্ষেপই ত্রুটিপূর্ণ হবে না বিধায় তারা একের পর এক সব সমস্যার সমাধান দিয়ে দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে। কলকারখানায়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ও অফিসআদালতে নিম্নপর্যায়ে কাজের প্রতি অনীহা ও নিস্পৃহতার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে। শ্রমিক ও কর্মচারীরা দুর্ভাগ্যগ্রস্ত ও মন্দাবস্থ জীবনযাপন থেকে মুক্তিলাভ করে সাবলীল জীবনযাপন চায়। এরকম জীবনযাপনের জন্যে তাদের চাহিদা অপূরণীয় এবং যারা উঁচুপর্যায়ে আছে তারা প্রাচুর্য ও ভোগবিলাসে মত্ত থাকলে তাদের হৃদয়ে ক্ষোভাগ্নি জ্বলতে থাকে। পরিণামে বা ফলশ্রুতিতে, কাজের প্রতি তাদের অনীহা ও নিস্পৃহতা দেখা দেয়। এতে উৎপাদন হ্রাস পায় ও কাজকর্ম যেভাবে নিষ্পন্ন হয়ার কথা সেভাবে হয় না। এগুলোর জন্যে শ্রমিক ও নিম্নপর্যায়ের কর্মচারীদের ঘাড়ে বা স্কন্ধে সব দোষ চাপানো হয়। এপ্রসঙ্গে এপ্রবাদটি প্রযোজ্য যে, যতোদোষ নন্দঘোষ। মৌলিক অধিকারগুলোর বাস্তবায়ন থাকলে শ্রমিক ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী এবং উঁচুস্তরের লোকের মধ্যে এরকম একটি দীর্ঘ বৈষম্য ও প্রভেদ থাকতে পারে না। দুর্নীতি ও শোষণের কারণেই এবৈষম্য ও প্রভেদ টিকে আছে। দুর্নীতি ও শোষণের অবসান ঘটলে এবং সুষম বণ্টনের ভিত্তিতে শ্রমিক ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের প্রয়োজন মিটতে থাকলে কাজের প্রতি তাদের অনীহা ও নিস্পৃহতা থাকবে না। অর্থনীতি উক্ত রূপ পরিগ্রহ করলে বা বিশেষভাবে গ্রহণ করলে সার্বিক স্বার্থের পরিপন্থী তাদের যেকোন দাবি আইনবিরোধী বা বেআইনী হবে। কিন্তু, সর্বাগ্রে লক্ষ্য করতে হবে যাতে যারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের উঁচুপর্যায়ে নিয়োজিত এবং অর্থনীতির ও প্রশাসনের গতিশক্তি হিসেবে সবকিছু পরিচালনা করে তারা সার্বিক স্বার্থের পরিপন্থী কোনকিছুতে কোনভাবেই জড়িয়ে না পড়ে।

র

পুঁজি গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্যে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে, যেসঞ্চয়ের ফলে আবশ্যকীয় খরচ ও কাজকর্ম ব্যাহত হয় সেসঞ্চয় সঞ্চয়কারীর ও তার পরিজনদের জন্যে সুফলদায়ক হয় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকের আয় শোচনীয়ভাবে দারিদ্রসীমার নিচে। তাই, আমরা যে যা-ই বলছি-না-কেন, তাদের সঞ্চয়ের সদিচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে কোনভাবেই সঞ্চয়ী বানাতে পারে না। তাদেরকে সঞ্চয়ী বানানোর চেষ্টা, আমার মতে, অলীক কল্পনা ছাড়া অন্যকিছু হতে পারে না। সরকার ও পুঁজিপতিরা আন্তরিকতার সাথে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে জনসাধারণের আয়বৃদ্ধি করাতে পারলেই সঞ্চয় বাড়বে। শুধু মুখের কথায়,

www.pathagar.com

বক্তৃতাবিবৃতি দিয়ে, বিভিন্ন দিবস বা সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে এবং সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজনের দ্বারা দেশকে স্বনির্ভর করে, পরনির্ভরশীলতা বা বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে, গড়ে তোলা যায় না। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রকৃত ও যথার্থ দেশপ্রেমের দ্বারাই একটি দেশ পরনির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করে স্বনির্ভর হতে পারে। রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেম হচ্ছে নিঃস্বার্থপরতা ও নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দেয়া। তারা নিঃস্বার্থপর ও উৎসর্গীকৃত হলে দুর্নীতি, অবিচারঅত্যাচার ও জোরজুলুম বলতে কিছুই থাকতে পারে না বিধায় দেশোন্নয়নের গতিতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না এবং দেশ আত্মনির্ভরশীল না হয়ে পারে না। বিভিন্ন অফিস বিভিন্ন আমদানির ও কাজের জন্যে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে থাকে। এসব আমদানির মধ্যে গাড়িসহ অনেক বিলাসসামগ্রী রয়েছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার যথেষ্ট অপচয় হচ্ছে। টেণ্ডারের মাধ্যমে আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত কোন জিনিস বা দ্রব্য খারাপ হলে সেজন্যে টেণ্ডারদাতা সম্পূর্ণরূপে দায়ী হয়ার শর্ত কোনকোন টেণ্ডারে থাকে না বিধায় টেণ্ডারের মাধ্যমে কোনকোন আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত দ্রব্য খারাপ পড়ে বা অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় এবং ব্যক্তিস্বার্থের কারণে জাতীয় স্বার্থ ধ্বংস হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কারসাজিতেই এসব হয়ে থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধে, বলতে গেলে, তেমনকোন একশান হয় না। তাছাড়া, যেসব জিনিস ও দ্রব্য দেশে পায়া যায় সেগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করার পশ্চাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হীন স্বার্থ কাজ করে। এসব কর্মকর্তা রাজনৈতিক ও উচ্চপর্যায়ের মদদ পেয়ে থাকে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ সব রাজনৈতিক দলই কর্মীদেরকে সুযোগসুবিধা দিয়ে থাকে। সাধারণত দুর্নীতি, অন্যায় ও অবিচারের মাধ্যমেই তারা সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকে। কর্মীদের ও নিজেদের দুর্নীতি, অন্যায় ও অবিচারের কারণে কোন রাজনৈতিক দলই এগুলোর বিরুদ্ধে তেমনকোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। এমনকোন কাজ নেই যেটাতে টাকার প্রয়োজন হয় না বা যেটা টাকা ব্যতীত সম্পাদিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো ও রাজনীতিবিদেরা রাজনীতিতে বিভিন্ন কাজ নিষ্পাদন করে থাকে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে অফিসপরিচালন, জনসভা, মিছিল, দলীয় আদর্শ প্রচার, কর্মীসংগ্রহ, কর্মীপরিচালন, অনুষ্ঠান, বিদেশভ্রমণ ইত্যাদি। এসব কাজে অজস্র টাকার প্রয়োজন। তাছাড়া, নির্বাচনে কোটিকোটি টাকা ব্যয় হয় এবং রাজনীতিবিদদের নিজেদের চলার ও তাদের মধ্যে যাদের সংসার আছে তারা সংসার চালানোর জন্যে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। এতো টাকা তারা কোথা হতে কিভাবে পায় তা জনগণকে ভাবিয়ে তোলে।

মস্তান ও সন্ত্রাসকদেরকে চাঁদা না দিয়ে ছোটমোট কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি চালানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়, কেননা তারা যখনতখন যেকোন অঘটন ঘটাতে

www.pathagar.com

পারে। এদেরকে সবাই চিনে। কাজকারবারে সুষ্ঠু পরিবেশের জন্যে কোনপ্রকার যুক্তি ও পালটা যুক্তিতে না গিয়ে এদেরকে আইনের দ্রুত প্রয়োগের দ্বারা কঠোর শাস্তি দিয়ে সমূলে বিনাশ করা অতীব প্রয়োজন। শহরে কোনকোন এলাকায় কিছু যুবক ও লোকের কারণে জনসাধারণ অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়। তারা তাদের স্বার্থে জনগণের যাতায়াতের রাস্তা ড্রেনে পরিণত করে, বিভিন্ন অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ডের দ্বারা সামজিক পরিবেশ নষ্ট করে থাকে ইত্যাদি। তাদের এসব অপকর্মে বাধা দিতে গিয়ে মানইজ্জত হারাতে ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। এদের বিরুদ্ধে গোপন অভিযোগ নিয়ে, দ্রুতগতিতে তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগ সত্যি হলে, সাথেসাথে এদেরকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করলে এলাকায় শান্তিশৃঙখলা ও সামাজিক পরিবেশ বেশ উন্নত হবে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও অধিদপ্তরে একঅফিসার বদলি হয়ে যায়ার সময় অন্যঅফিসারের নিকট নথি, রেজিস্টার, হিসাব ইত্যাদির তালিকা প্রণয়নপূর্বক দায়িত্ব হস্তান্তর করার কোন নিয়ম নেই। তাছাড়া, একসহকারী একশাখা হতে অন্যশাখায় বদলির ক্ষেত্রেও এনিয়ম নেই। এতে অনেক সময় জরুরী ও টাকাপয়সাসংক্রান্ত নথিপত্র লাপাত্তা হয় এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার ও ফাইল পায়া যায় না বিধায় সরকারের অনেক ক্ষতি হয় ও দোষী অফিসারের ও সহকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ হয় না। তাই, বদলির সময় উক্তধরনের দায়িত্ব হস্তান্তর বাধ্যতামূলক হতে হবে। তাছাড়া, নথি, রেজিস্টার ইত্যাদি সংরক্ষণ ও ধ্বংসের পদ্ধতি কোথাও সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না বিধায় সরকারের ও কোনকোন ক্ষেত্রে লোকজনের অচিন্তনীয় ক্ষতি হয়। তাই, এগুলো সংরক্ষণ ও ধ্বংসের ক্ষেত্রে যারা দায়ী হবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান থাকা দরকার। সমুদ্রবন্দরে যেসব জাহাজ ভিড়ে সেগুলোর মধ্যে যেগুলো চাহিদা অনুযায়ী ঘুষ দেয় সেগুলো পরে ভিড়লেও আগে খালাস হয়ে যায়। তাছাড়া, যেসব জাহাজে অবৈধ মালামাল ও মাদকদ্রব্য থাকে সেগুলোও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নিরাপদে খালাস হয়ে যায়। মাছচাষ বৃদ্ধির জন্যে কোটিকোটি টাকার প্রকল্প প্রণীত ও গৃহীত হচ্ছে। কোনকোন প্রকল্প টেলিভিশনের পর্দায়ও দেখানো হচ্ছে। কিন্তু, বাস্তবে কি হচ্ছে? বাস্তবে বিভিন্ন কাজ নামমাত্র করে কাগজেকলমে পুরো কাজ ও চাষ দেখিয়ে কোটিকোটি টাকা আত্মসাৎ করে দেশের অবর্ণনীয় ক্ষতি করছে। উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা ও ক্ষমতাসীনদের হাত থাকাতে এআত্মসাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এটা খুবই দুঃখজনক। এক ক্ষমতাসীন ব্যক্তি অপর ক্ষমতাসীন ব্যক্তির এবং এক পদস্থ কর্মকর্তা অপর পদস্থ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে অন্যায্য কাজ করিয়ে নেয়ার ফলে যেদুর্নীতি হয় তা দেশের জন্যে ভীষণ ক্ষতিকর। অথচ, এরা আইনের উর্ধ্বে থেকে যাচ্ছে এবং এদের কোনপ্রকার শাস্তি হচ্ছে না। এটা সরকারেরই দুর্বলাত। সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষ আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে কোটিকোটি টাকার মালিক হয়, কেননা এসব জটিলতা হতে উদ্ধারের জন্যে আমদানি ও রপ্তানিকারকেরা তাদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী উৎকোচ দিতে বাধ্য হয়ে যায়। জনসাধারণকেই এটার মাসুল দিতে হয় এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী উর্ধ্বতনদেরকে ঘুষ সংগ্রহ করে দিতে ও বিভিন্নভাবে আর্থিক সুযোগসুবিধা প্রদান করতে পারে তারাই তাদের প্রিয় হয় এবং তারা যেভাবে চায় সেভাবে চলতে পারে ও যেভাবে যেকাজ চায় সেভাবে তা হয়ে যায়। এটা বিভিন্নধরনের দুর্নীতির অন্যতম কারণ। একারণটি সরকার বলতে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। সরকার সৎ ও নিরপেক্ষ হয়ে দুর্নীতি, অবিচার, জুলুম ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনগণ থেকে সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অভিযোগ গ্রহণ করে সাথেসাথে একশান নিলে ও শাস্তিপ্রদান করলে সমাজ থেকে এগুলোর মূলোচ্ছেদ ও সব সমস্যার সমাধান না হয়ে পারে না। তবে, ইসলামী সমাজব্যবস্থা ব্যতীত এটা সম্ভব নয়। কোনকোন সময় বিভিন্ন কারণে জারিকৃত আদেশে ভুলভ্রান্তি থাকে। যাদের উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করা হয় তারা তাতে ভুলভ্রান্তি বুঝেও সেগুলোতে কোন সুযোগ থাকলে তা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তা জানজানি হলে যার দ্বারা ভুল হয় তার বিরুদ্ধে কার্যক্রমগ্রহণ করার জন্যে তাকে তদন্তের মাধ্যমে বের করা হয়। তবে, এরকম ক্ষেত্রে যারা ভুলভ্রান্তি জেনেও সেগুলোর সুযোগ নিয়ে নেয় তাদেরও শাস্তি হয়া প্রয়োজন, কেননা একজন যেকোন কারণে ভুল করে বলে অন্যান্যরা তা জেনেও সেটার সুযোগ নেয়াটাও গুরুতর অপরাধ। বর্তমানে অফিসআদালতে নিয়মকানুনের পরিবর্তে ব্যবহারের দ্বারা কাজ আদায়ের প্রবণতা প্রকট। নিয়মকানুনের মাধ্যমে কাজ আদায়ে জটিলতা দেখা দেয়, কেননা নিয়ম না মেনে কাজ করাটা একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে। অথচ, নিয়ম না মানলে নিয়মানুবর্তিতা থাকে না এবং যখনকার যেকাজ তখন তা সম্পাদনে নানা অসুবিধা হয়। অপরদিকে, যারা নিয়ম মানতে বাধ্য করতে চেষ্টা করে তাদেরকে কৌশলশূন্য ও ঝগড়াটে মনে করা হয়।

আমাদের দেশ অর্থের জন্যে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, বিশ্ব ব্যাংক ও বিশ্বের আরো ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোসংক্রান্ত কর্মসম্পাদনের জন্যে জ্ঞানী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রয়োজন। অপরদিকে, এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বাধ্যতামূলকভাবে সব সুযোগসুবিধা দিতে হয়। নিচের দিকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কঠোর পরিশ্রম করে একর্ম সম্পাদন করে থাকে। অথচ, তারা কোন সুযোগসুবিধা পাচ্ছে না। এসব সুযোগসুবিধার মধ্যে রয়েছে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ, গাড়ি, ভাতা ইত্যাদি। উক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজগুলো যথার্থভাবে সম্পাদন করতে না পারলে দেশের যে সমূহ ক্ষতি হয় তা জনসাধারণ বুঝতে পারে না। কথায় বলে যে,

www.pathagar.com

অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। সাধারণত বেকার যুবকেরাই আইনশৃঙখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় ও নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। এদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। সরকারই রাষ্ট্রপরিচালনা করে আর রাষ্ট্রপরিচালকদেরই দায়িত্ব হচ্ছে এদের কর্মসংস্থান করা। শুধু কথা, বক্তৃতাবিবৃতি ও উপদেশ দ্বারা কর্মসংস্থান করা যায় না। কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির দ্বারাই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি না করে আনইশৃঙখলা পরিস্থিতির উন্নতি ও উদ্ভূত সমস্যাদির সমাধান সম্ভব নয়। বিভিন্ন পত্রিকাতে বিভিন্ন সেক্টরে কোটিকোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা প্রকাশিত হয়। এসব আত্মসাৎকারী দেশ ও জনসাধারণের শত্রু। এদের আত্মসাতের কারণে অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হচ্ছে ও অর্থের সদ্ব্যবহারের অভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না। এরা পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির কারনেই টিকে আছে। সরকারের সদিচ্ছাই এদেরকে বিনাশ করতে পারে। বিদেশের যৌথ উদ্যোগে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় সেগুলোতেও উচ্চপর্যায়ে বড়াকারের দুর্নীতিতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জনগণের কাজে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করে। এসব জটিলতার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় করা। কখনোকখনো কোনকোন লোক অতিষ্ঠ হয়ে কোন অফিসের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কিছু করলে সেঅফিসের সব কর্মচারী অন্যায়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনগণের জন্যে কষ্টকর সমস্যা সৃষ্টি করে। তাদের এ অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে সরকার তেমনকোন জোরালো ভূলিকা পালন করে না। তাই, জনসাধারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতি, অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ভূমিকা পালনে সামনে এগিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছে এবং জনগণের প্রতি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যায় ও জুলুম বন্ধ হচ্ছে না। সরকার এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জনগণের। তাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণ অগ্রসর হলে সরকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কোন নিরাপত্তা ও প্রশ্রয় না দেয়াটাই দেশের ও জাতির জন্যে মঙ্গলজনক। কখনোকখনো কোনকোন কাজে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট থাকে। কোন একটি কর্তৃপক্ষ এককভাবে এজাতীয় কোন কাজ নিষ্পন্ন করতে পারে না। যেকর্তৃপক্ষ এজাতীয় যেকাজের সার্বিক দায়িত্বে থাকে তারা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলাদাআলাদাভাবে যোগাযোগ করে তা যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে না। তাই, এজাতীয় কাজ যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষ একত্রিত হয়ে আলাপালোচনার মাধ্যমে সব তথ্য ও বিষয়ের সমন্বয় ঘটানোটা অপরিহার্য। সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক নীতিই এটা কার্যকর করতে পারে। দেশের স্বার্থে নানাধরনের ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। এগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয় ও বিভিন্ন পরিকল্পনার চিত্র

www.pathagar.com

তুলে ধরা হয়। বাস্তবে এসব পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদিত হয় না বিধায় যেসব সমস্যার ওপর এসব ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয় সেগুলোর তেমনকোন সমাধান হয় না। অথচ, এসব ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানে সরকারের প্রচুর টাকা খরচ হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে যেসব সমস্যা তুলে ধরা হয় সেগুলো সমাধানের জন্যে অব্যাহত প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। তাছাড়া, সরকারের পক্ষে সেগুলোতে যারা বক্তব্য রাখতে যায় তাদের সাথে প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত ব্যক্তি যায়াতে দেশের যথেষ্ট টাকা অপচয় হয়।

আইন ও নিয়ম মূল দিক থেকে অন্যদিক ঘুরিয়ে ফেলার কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলোতে ন্যায়বিচার পায়া যায় না। যারা সেগুলো মূল দিক থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেলে তাদের কোন অসুবিধা হয় না এবং এব্যাপারে অগ্রসর হয়েও সর্বস্তরে দুর্নীতির কারণে কোন প্রতিকার পায়া যায় না। তাছাড়া, যে এগুলো অন্যদিকে যতোবেশি ঘুরাতে পারে সে-ই ততোবেশী জ্ঞানী, চালাক ও বুদ্ধিমান। যারা আইন ও নিয়মকে প্রকৃত বিষয় থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয় তাদের যথোচিত শাস্তি হতে থাকলে সেগুলো প্রকৃত বিষয় থেকে অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারবে না বিধায় ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত হবে। সরকার যেসব নিয়ম ও আইন প্রণয়ন করে সেগুলো সরকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সরকার স্বয়ং সেগুলো অমান্য করলে জনসাধারণকে সেগুলো মান্য করতে বাধ্য করতে ব্যর্থ হয়। ছোট একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদের দেশে অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ আছে। নির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত সংখ্যক অতিথিকে আপ্যায়ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। অথচ, সরকারের বিভিন্ন অফিস বিভিন্ন কারণে অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে উক্ত আইন মান্য করছে না। তাই, ক্ষমতাসীনেরা সব নিয়ম ও আইন মেনে চললে জনসাধারণ এমনিতেই সেগুলো মেনে চলতে আগ্রহী ও উৎসাহী হয়।

একদিকে নিষিদ্ধ পণ্য দেশের অভ্যন্তরে ঢুকতে দিয়ে অপরদিকে বিভিন্ন দোকান ও গুদাম হতে সেগুলো আটক করে নানা জটিলতা সৃষ্টি করা হয়। যেসব কর্তৃপক্ষ এগুলো দেশের অভ্যন্তরে ঢুকতে দিচ্ছে তারাই পুনরায় দোকান ও গুদামে এগুলো আটক করছে। তাদের এগুলো একদিকে ঢুকতে দিয়ে অপরদিকে আটক করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘুষ ও দুর্নীতি। এসব কারণে সরকার তাদেরই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাগ্রহণ করাটা জনগণের স্বার্থে বাঞ্ছনীয়। যারা সদিচ্ছার সাথে শিল্প ও কলকারখানা স্থাপন করতে চায় তাদের অনেকেই সহজে ঋণ পায় না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে, তারা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী ঘুষ ও শতকরাহার দিতে পারে না। এব্যাপারে তারা কোথাও কোন প্রতিকার না পেয়ে সমস্যার পর সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, একাজে সংশ্লিষ্ট সবাই, ছোটবড়,ঘুষ ও শতকরাহারের

www.pathagar.com

পক্ষপাতী। শিল্পপ্রতিষ্ঠানসহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও সংস্থায় লাভ হলে যারা সংশ্লিষ্ট তারা গর্বের সাথে বলে যে, তারা লাভ করেছে। অন্যদিকে, এগুলোতে লোকসান হলে তারাই বলে যে, সরকার লোকসান দিয়েছে। লাভ হলে তাদের নিজেদের বাহাদুরি এবং লোকসান হলে সরকারের বদনাম। অথচ, সরকার এগুলো চালায় না। এগুলো তারাই চালায় এবং সত্যকথা বলতে কি, তাদের কারণেই লোকসান হয়। নিরপেক্ষভাবে তদন্তকার্যপরিচালনা করলে এসত্যটি বের হয়ে আসে। তবে, এটা এজন্যে বের করে আনা হয় না যে, ক্ষমতাসীনদের অনেকের সাথে এরা সংশ্লিষ্ট। ক্ষমতাসীনেরা এসংশ্লেষ ত্যাগ করে সত্যাসত্যের ভিত্তিতে তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করলে এগুলোতে সর্বদা লাভের পদচুম্বন করা যাবে। বর্তমানে শহরেও অজস্র টাকার গমের বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হচ্ছে। কিন্তু, বাস্তবে এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এটা সরকারো জানে। তবু, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন একশান হচ্ছে না। এতে এটা পরিষ্কার যে, সরকারের জ্ঞাতেই এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাই, ক্ষমতাসীনেরা তাদের স্বার্থেই জেনেশুনে দুর্নীতি করতে দেয় ও দুর্নীতিবাজদেরকে লালন করে। যারা ক্ষমাতসীন হয়ে স্বয়ং দুর্নীতি করে, দুর্নীতি করতে দেয় ও দুর্নীতিবাজদেরকে লালন করে তারা শুধু বাগাড়ম্বরই করে, দেশের উন্নতি করতে পারে না।

দেশের আর্থিক অবস্থার সাথে সংগতি রেখে আমাদের দূতাবাসগুলোর ব্যয়নিয়ন্ত্রণ করাটা অপরিহার্য। যেসব বিলে সুদের হার নির্ধারিত থাকে সেগুলো যেসব ব্যাংক গ্রহণ করে সেগুলো সুদযোগ করে করার লিখিত নিয়ম থাকলে বিলপ্রদানকারীদের বেশ সুবিধা হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে উত্তীর্ণ হলে কোচিং বাধ্যতামূলক থাকতে পারবে না, কেননা এটা বাধ্যতামূলক করে পরীক্ষার্থীদের থেকে, কোচিং গ্রহণ না করলেও, অনেক টাকা ফী আদায় করা হয়। এটা একপ্রকার জুলুম। আত্মসাৎ প্রতিহত করার জন্যে সব বিদ্যালয়ে টিউইশান ফীসহ সবরকমের ফী ব্যাংকে জমা দেয়াটা বাধ্যতামূলক হতে হবে। যেকোন অডিটে ভাউচারের সাথে খরচের বাস্তবতার, অর্থাৎ কেনাকাটা থাকলে কেনাকাটার বা কাজ থাকলে কাজের, সামঞ্জস্যপরীক্ষাটা বাধ্যতামূলক হতে হবে। অভিযোগ তদন্তের ও বিচারকার্যপরিচালনার পদ্ধতি অত্যন্ত সহজসরল হতে হবে এবং তদন্ত ও বিচারকার্য স্বল্প সময়ে শেষ করতে হবে। এগুলো এজন্যে অত্যন্ত সহজ যে, সত্য ও মিথ্যা বুঝতে ও উদ্‌ঘাটন করতে কোন অসুবিধা হয় না। বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পেতে হলে বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীদেরকে সাথেসাথে শাস্তিপ্রদান করতে হবে। তাতে কোনপ্রকার বিলম্ব ও টালবাহানা করা যাবে না। যারা সমাজে শান্তিপ্রিয় লোকজনের অসুবিধা করে তাদেরকে বিলম্ব না করে যথোচিত শাস্তি

www.pathagar.com

প্রদান করতে হবে। শহরে অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী বাড়িঘর ও দোকানের কাজ হলে রাস্তাঘাট ও পরিবেশের অনেক সমস্যা থাকতে পারে না। কিন্তু, প্রায়ক্ষেত্রেই তা হচ্ছে না। এজন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই দায়ী। প্ল্যান অনুযায়ী বাড়িঘর ও দোকান নির্মিত না হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের শাস্তির বিধান থাকলে তাদের কঠোর তত্ত্বাবধানে এগুলো নির্মিত হবে। সিটি কর্পোরেশান ও মিউনিসিপলিটি বিভিন্ন রাস্তাঘাট নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজের তালিকা বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ করতে হবে। তা হলে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত সুবিধা অনুযায়ী আগের কাজ পরে ও পরের কাজ আগে করতে ও কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হবে।

যেকোন জিনিস ও নির্মাণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নষ্ট হলে সেটার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সম্পূর্ণরূপে দায়ী হবে এবং তাদেরকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করতে হবে। যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে তারা সেটার প্রতিকার পায়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময় নিজেদের শ্রম না দিয়ে ও অর্থ খরচ না করে থেমে যায়। এতে দুর্নীতিবাজরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় দুর্নীতির জন্যে শাস্তি হতে মুক্ত থাকে এবং দুর্নীতির পর দুর্নীতি করতে থাকে। যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে তারা আইনের সহজসরল ও যথার্থ প্রয়োগের দ্বারা অল্প সময়ে কম শ্রম দিয়ে ও কোন অর্থ খরচ না করে সেটার প্রতিকার পেলে দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করতে সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং জনসাধারণ দুর্নীতির অভিশাপ থেকে রেহাই পাবে। রাষ্ট্রীয় প্রত্যেক বিষয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, নিয়ম ও বিধি থাকাটা অত্যাবশ্যক। এগুলো একেক অফিস একেক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারবে না। এভাবে দেখতে গেলে জটিলতা বৃদ্ধি পায়, দুর্নীতির সুযোগ হয় এবং প্রকৃত কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় বিধায় দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি পরিচালনায় বিক্ষিপ্ত পদ্ধতি, নিয়ম ও বিধি একেক অফিস একেক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে বিধায় যেঅফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যেভাবে পারছে নিজেদের সুবিধার্থে, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি ও উন্নতির স্বার্থে নয়, সেভাবে অর্থবরাদ্দ নিয়ে খরচ করছে।

একটি মূল কাজের সাথে কয়েকটি আনুষংগিক কাজ সম্পৃক্ত থাকে। আনুষংগিক কাজগুলো সম্পাদিত না হলে মূল কাজটি পূর্ণাঙ্গ হয় না। সংশ্লিষ্ট অফিস হতে মূল কাজটি যেকোনভাবে উদ্ধার করলেও আনুষংগিক কাজগুলো উদ্ধার করতে বর্ণনাতীতভাবে পোহাতে হয়। এটা দেশোন্নয়নে ও জনসাধারণের সুশৃঙখল জীবনযাপনের পথে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত অন্তরায় এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব করার একটি হীন সুযোগ। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্যে একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একটি শিল্প স্থাপনের জন্যে ঋণ,

www.pathagar.com

জমি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির প্রয়োজন। কিন্তু, এসব একসাথে পায়া যায় না। এসবের আলাদাআলাদা কর্তৃপক্ষ রয়েছে। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে এসব আলাদাআলাদাভাবে পেতে হয়। এসব পেতে গিয়ে যে ঘুষ ও দুর্নীতিসহ কতকিছুর আশ্রয় নিতে হয় তা যারা শিল্পোদ্যোক্তা শুধু তারাই চরমভাবে অনুভব করে। কেউ কোথাও কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কাজে গেলে সে প্রথমে তাদের থেকে সাধারণত না-সূচক সাড়া পায়। কিন্তু, সে তাদেরকে ঘুষের ও দুর্নীতির মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে পারলে পরবর্তীতে তার কাজটি আপসে হয়ে যায়। বাস্তবে কার্যকারিতার ভিত্তিতেই যেকোন কর্মপরিকল্পনার বিস্তৃতি ঘটাতে হয়। তা না হলে নানা সমস্যা দেখা দেয় ও জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহের দৃষ্টান্ত দিয়ে এবিষয়টি সুস্পষ্ট করছি। শহরনগরে ও শিল্প এলাকায় বিদ্যুৎবিভ্রাট চলছে। এতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, সরকারী কর্ম বিঘ্নিত হচ্ছে ও বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এগুলোর কারণ হচ্ছে যে, এসব এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা না মিটিয়ে সারা দেশে তা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এতে কোন দ্বিমত নেই যে, সারা দেশে তা ছড়িয়ে দিতে হবে। তবে, বিভ্রাটের বিষয়টি বিবেচনা করেই পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে দিতে হবে, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ও জনগণকে খুশি করার জন্যে ছড়িয়ে দিলে চলবে না। সব অফিসে বিভিন্ন কর্ম বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে নিষ্পাদিত হয়। সাধারণত এসব পর্যায় করণিক থেকে সচিব পর্যন্ত রয়েছে। উচ্চপর্যায়ের কোন কর্মকর্তা তার পর্যায়ে কর্মগুলো সম্পাদন না করে কায়দা করে নিম্নপর্যায়ে কোন কর্মকর্তার নিকট বারবার পাঠিয়ে তাকে দিয়ে সম্পাদন করিয়ে নিতে গেলে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়, জটিলতার সৃষ্টি হয়, সময়ের কাজ সময়ে নিষ্পাদিত হয় না, বিশৃঙখল পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং সার্বিকভাবে জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হয়। তাই, যেখানে যেকর্মকর্তার যেকাজ সেখানে সে স্বয়ং তা সম্পাদন না করলে তার যথোচিত শাস্তির বিধান আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে। যেসব অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে যথেষ্ট টাকার ও সম্পদের মালিক হচ্ছে তারা সরকারের আয় বাড়াচ্ছে অজুহাতে নানাধরনের সুযোগসুবিধা পাচ্ছে ও নিচ্ছে। এতে দেশের কোটিকোটি টাকা খরচ হচ্ছে। সরকারের বুঝা দরকার যে, এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দায়িত্ব হচ্ছে সততা ও ন্যায়ানুগতার সাথে কর, শুল্ক ইত্যাদি সংগ্রহের কর্ম সম্পাদন করা ও সংগ্রহ করা। একদিকে তাদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অপরদিকে দেশের অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের জন্যে শ্রমিক ও কর্মচারী ছাঁটাই করা হচ্ছে ও নতুনভাবে নিয়োগ বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। এতে একদিকে একটি সুযোগসুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী থেকে যাচ্ছে ও অপরদিকে সাধারণ লোক দুর্বিষহতার ভেতর দিয়ে দিনপাত করছে এবং

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে না। একদিকে অর্থনৈতিক সংকট দূর করার জন্যে ব্যয়সংকোচন নীতির কথা বলে অপরদিকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী তা অমান্য করালে এবং ব্যয়নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের জাতীয় স্বার্থে ব্যয়নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা সৃষ্টি করলে অর্থনৈতিক সংকট দূরীভূত না হয়ে গোষ্ঠীস্বার্থ পূর্ণ হয়। ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার এরকম মারাত্মক অপব্যবহার দেশের অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হচ্ছে সরকার সেগুলোর ঋণ মওকুফ করাতে দেশের কোটিকোটি টাকা গচ্ছা যাচ্ছে। অপরদিকে, যাদের পরিচালনায় এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিলো তারা কোটিকোটি টাকার মালিক বনে নিরাপদে থেকে যাচ্ছে এবং তাদের থেকে এটাকা আদায় করার কোন পদক্ষেপ নেই ও তাদের কোন শাস্তিও হচ্ছে না। এতে ক্ষমতাসীনদের হাত থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ক্ষমতাসীনেরা, উঁচুপর্যায়ের কর্মকর্তারা ও অর্থসম্পদের দিক দিয়ে উঁচুশ্রেণীর লোকেরা পারস্পরিক যোগাযোগের দ্বারা নিজেদের স্বার্থে অন্যায্য কাজ উদ্ধার করে নেয়। অথচ, এদেরই পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে কোনভাবেই কোন অন্যায্য কাজ হতে না দেয়া। এরা ন্যায়পরায়ণ হলে গোটা জাতি ন্যায়পরায়ণ হতে বাধ্য। তবে, এদেরকে ন্যায়পরায়ণ বানানোর জন্যে ইসলামী সমাজব্যবস্থার ও আইনের বিকল্প নেই।

ক্ষমতাসীনেরা যেকারণে কাকেও আটকিয়ে বিচারের মাধ্যমে শাস্তিপ্রদান করে সেকারণ অনেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয় না। যেকারণে একজনের শাস্তি হয় সে কারণ অন্য যাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাদেরকেও একই শাস্তি দিলে দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করার সাহস হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। কিন্তু, ক্ষমতাসীনদের অনুগত হয়ে তাদের আদেশমোতাবেক কাজ করতে পারলে দুর্নীতি করাতে অসুবিধা হয় না বিধায় প্রত্যেক সরকারের সময়ই দুর্নীতি চলে। ফলে, দুর্নীতিবাজদের সংখ্যা না কমে বেড়েই চলছে। একটি মহৎ ও সৎসরকারই সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে দুর্নীতি বন্ধ করতে ও দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে পারে। বর্তমানে যেসব পত্রিকায় ও যেটেলিভিশনে ক্ষমতাসীনদের মহৎকর্মের কথা বলা ও যশোগান করা হচ্ছে অতীতে এগুলোতেই অতীত ক্ষমতাসীনদের মহৎকর্মের কথা বলা ও যশোগান করা হতো। অতীতে যেসব প্রচারমাধ্যমে অতীত ক্ষমতাসীনদের নিবেদিতকর্ম তুলে ধরা ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হতো বর্তমানে সেগুলোতেই তারা তাদের অতীত ক্রিয়াকলাপের জন্য ধিকৃত ও ঘৃণিত হচ্ছে। যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে এসব বিস্মৃত না হয় তারাই সব দুর্নীতি, অন্যায় ও জুলুমের উর্ধ্বে থেকে মহৎকর্ম সম্পাদন করে যশস্বী হয়ে থাকতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর রাজপথের সভা জনসাধারণকে ভোগান্তিতে নিপতিত করে। তারা বুঝেও বুঝে না যে, রাজপথ

www.pathagar.com

সভার জন্যে নয়। এপথ যাতয়াতের জন্যে। তাদের সভার জন্যে মাঠ বা ময়দানের প্রয়োজন। বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা রাজপথকে সভার জন্যে মাঠ বা ময়দানে পরিণত করে জনসাধারণকে ভোগান্তিতে নিপতিত করতে পারে না। রাজপথে সভা করাটা গণতান্ত্রিক অধিকার নয়। এটা হচ্ছে বিশৃঙ্খলা ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি একটি বাধা। তাই, রাজনৈতিক দলগুলোর সভার জন্যে শহরতলিতে একটি বিরাট মাঠ বা ময়দান থাকাটাই অত্যাবশ্যক যেটাতে প্রতিদিন বহু দল বহু সভা করতে পারবে। দেশের টাকা দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শেষ করে সেগুলোর নামকরণ ক্ষমতাসীনদের কারোকারো নামানুসারে করা হয়। এটা হচ্ছে ক্ষমতার অপব্যবহার। ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশের মঙ্গলসাধন করা যায় না। ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের দ্বারাই দেশের মঙ্গলসাধন করা যায়। ক্ষমতা হারাবার ভয় থাকলেই দৃঢ়তার সাথে সব ন্যায়ানুগ কাজ সম্পাদনের পথে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়। ক্ষমতা হচ্ছে ন্যায়নুগতার জন্যে। তাই, দেশের স্বার্থে সব ন্যায়ানুগতার জন্যে যেকোন সরকারকে ক্ষমতা হারাবার ভয় পরিহার করে কাজ করতে হয়।

কেউকেউ কথায়কথায় বলে যে, ইসলামী অনুশাসনতো মানুষই কার্যকর করবে। এপ্রসঙ্গে তাদের কথা হচ্ছে যে, মানুষ তা করছে না কেন। অপরদিকে, যেসব মানুষ তা করতে চাচ্ছে তারা তাদেরকে সমর্থন দিচ্ছে না। তারা তাদেরকে এ বলে সমর্থন দিচ্ছে না যে, তারা ইসলামকে তাদের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল করে প্রকাশ করছে। এখন কথা হচ্ছে যে, যারা ইসলাম সম্পর্কে এতোকিছু বুঝে তারাই ইসলামী অনুশাসন কায়েম করতে পারে। তারা এটা করলে যারা এটা চাচ্ছে তারাও তাদেরকে সমর্থন দেবে। তবুও, তারা তা করছে না। তাই, এটা পরিষ্কার যে, তারা যেকোনভাবে ইসলামী অনুশাসন কায়েমের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবেই।

ল

বিমানবন্দরে, সমুদ্রবন্দরে ও সীমান্তে তারাই ধরা পড়ে যারা এসব স্থানে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে কোনপ্রকার যোগাযোগ ছাড়াই সেরে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু, যারা ধরা পড়ে তাদের কথা পত্রপত্রিকায় এভাবে প্রকাশিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ববোধের, সচেতনতার ও সাহসিকতার ফলে তারা ধরা পড়েছে। এপ্রসঙ্গে একটি ছোট গল্প আমার মনে পড়েছে। একবার একটি ছোট ছেলে একটি লঞ্চ থেকে পানিতে পড়ে যায়। এতে লঞ্চটির সব যাত্রী একসাথ হয়ে হৈচৈ ও ঠেলাঠেলি করার সময় হঠাৎ

www.pathagar.com

একজন যাত্রী পানিতে পড়ে যায় এবং ছেলেটিকে পানি থেকে ওঠিয়ে আনে। এটা তার একটি বীরত্বপূর্ণ কাজ হয় এবং সব যাত্রী তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। তখন যাত্রীটি বলে ওঠে, "আমিতো স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দেই নেই। আমি যাত্রীদের ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে গিয়েছিলাম।" এগুনাকথাটি একেবারে মিথ্যা নয় যে, এসব স্থানে শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা খালি ব্রিফকেস নিয়ে গিয়ে ও খালি জেবে গিয়ে ব্রিফকেস ও জেব ভর্তি মুদ্রা নিয়ে বাসায় ফেরে। একথাটি কর ও ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পর্কেও শুনা যাচ্ছে।

যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ও এন, জি, ও,-র সাথে সংশ্লিষ্ট তারা আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হচ্ছে। অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা বাস্তবে প্রশাসনিক কাজ বুঝে না বিধায় তাদের কেউকেউ প্রশাসনিক ক্যাডারে নিয়োজিত হয়ে প্রশাসনিক কাজে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে যা দেশের ও জাতির জন্যে খুবই ক্ষতিকর হয়। যারা ঘুষ দিতে পারে না বা দেয় না দুর্নীতি দমন বিভাগের বিভিন্ন অফিস তাদের ছোটমোট ব্যাপারে, এমনকি মিথ্যা ব্যাপারে, সাজিয়েগুছিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দাঁড় করায় এবং ঘুষ পেয়ে যারা বিরাটবিরাট দুর্নীতিতে জড়িত থাকে তাদের দুর্নীতিকে সুনীতিতে পরিণত করে দেয়। সংসদে বিরোধী দলগুলো অনেক বাস্তবানুগ ও সত্যধর্মী বিষয় তুলে ধরে। কিন্তু, ক্ষমতাসীন দল সাধারণত, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে, নিজেদের সুবিধাঅসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে সেগুলো গ্রহণ করে না। তাই, যেসংসদের পেছনে প্রতিবছর কোটিকোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে তা দেশ, জাতি ও জনগণকে তেমনকিছু দিতে পারে না এবং দেশোন্নয়ন ও জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে তেমনকোন অবদান রাখতে পারে না। ব্যয়নিয়ন্ত্রণের নিয়ম থাকা সত্ত্বেও বিশেষবিশেষ কারণে কোনকোন অফিসের ব্যয় অনিয়ন্ত্রিতই থেকে যাচ্ছে। সরকারী অফিসের জন্যে বাড়িভাড়ার নির্দিষ্ট হার থাকা সত্ত্বেও পক্ষপাতিত্বের ও দুর্নীতির কারণে কারোকারো বাড়ি যুক্তিপ্রদর্শের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হারের অনেকবেশি হারে ভাড়া করার ফলে সরকারের অজস্র টাকা ক্ষতি হয় এবং কিছু লোক অন্যায়ভাবে যথেষ্ট লাভবান হয়। একদিকে বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ দিয়ে এবং অপরদিকে ব্যয়নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রেখে বাস্তবে ব্যয়নিয়ন্ত্রিত না হয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই, সার্বিক দিক বিবেচনা করেই বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ দিতে হয় এবং ব্যয়নিয়ন্ত্রণের জন্যে সংসদে পাসকৃত সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হয় যা প্রয়োজনে সংসদেই সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে হয়। কোনকোন সরকারী উকিল সরকারের পক্ষে বিভিন্ন মামলা সঠিকভাবে পরিচালনা না করাতে সরকারের প্রতিবছর কোটিকোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। অপরদিকে, এসব উকিল ও সরকারের বিরুদ্ধে মামলাদায়েরকারীরা অজস্র টাকার মালিক হচ্ছে এবং তাদের কোন ক্ষতি ও অসুবিধা হচ্ছে না। কোনকোন কারণে সরকার কোনকোন

www.pathagar.com

ব্যাংক বন্ধ করে দিচ্ছে। ফলে, আমানতকারীরা তাদের আমানতের টাকা ফেরত পাচ্ছে না বিধায় কোনকোন আমানতকারী, হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়াতে, মারা যাচ্ছে এবং কোনকোন আমানতকারীর দুঃখকষ্টের সীমাপরিসীমা নেই। সরকার এসব ব্যাংক বন্ধ রাখলে সরকারেরই দায়িত্ব এগুলোর প্রতিষ্ঠাকারীদের থেকে আমানতকারীদের আমানত বের করে আনা, কেননা তাদের আমানত এরা কোথাও-না-কোথাও রেখেছে, এবং এদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা। এপদক্ষেপ গ্রহণ করার যৌক্তিকতা না থাকলে এদের ব্যাংক খুলে দিয়ে আমানতকারীদের আমানতের নিশ্চয়তা বিধান করাই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

বিভিন্ন অফিসে যেকোন বিষয় একেক কর্মকর্তা একেকভাবে বুঝে এবং তা ঘুরেঘুরে নিচের পর্যায়ে আসতে থাকে। এতে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং বিষয়টির ওপর যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্তের অভাবে কর্মসম্পাদনে প্রতিবন্ধকতার কারণে নানা সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া, ওপরের দিকের কোন কর্মকর্তা যেকোন বিষয়ে যেকোন কারণে যেভাবে সিদ্ধান্ত দিতে চায় সেবিষয়ে তুলে ধরা বক্তব্য তার সেভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হলে সে অসন্তুষ্ট হয় এবং তার ভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বক্তব্য তুলে ধরার জন্যে খুব কায়দা করে চাপপ্রয়োগ করে। এব্যাপারে নিচের দিকে যেকর্মকর্তা যুক্তিপ্রদর্শন করে তার ক্ষতি করা হয়। ক্ষতিকে ভয় করে কোন কর্মকর্তা নতিস্বীকার করে ওপরের দিকের কোন কর্মকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কাজ করাতে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সেজন্যে সে-ই দায়ী হয়ে যায় এবং ওপরের দিকের ওকর্মকর্তা ওদায়িত্ব ঠাণ্ডা মাথায় অস্বীকার করে। তাই, নিচের দিকের কোন কর্মকর্তা কোন বিষয়ে যেভাবে তুলে ধরে ওপরের দিকের কোন কর্মকর্তা সেটার সাথে একমত পোষণ করতে না পারলে সে তার মতানুযায়ীই সিদ্ধান্ত দেবে। নিচের দিকে কোন কাজ না হলে ওপরের দিকে জানালে সাধারণত যেউত্তর পায়া যায় তা হচ্ছে কি করবেন, কিছু দিয়েটিয়ে কাজটি সেরে নিন। এতে এটা পরিষ্কার যে, কারো প্রতি কারো নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ নিয়ন্ত্রণ নেই এবং বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি একটি প্রথায় পরিণত হয়ে আছে এবং ইসলামী অনুশাসনই এপ্রথা প্রতিরোধ করতে সক্ষম। যারা হাউজিং-এর ও বিদেশে লোক পাঠানোর নামে বহু লোককে সর্বস্বান্ত করে কোটিকোটি টাকার মালিক তারা নিরাপদে বসবাস করতে দেখা যাচ্ছে। এদের যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ক্ষমতাসীন ও মস্তানদের সাথে সম্পর্ক আছে তা এমনিতেই বুঝা যাচ্ছে। তবে, সরকারের নিরপেক্ষ ও ন্যায়ানুগ কর্মপন্থাই এদেরকে শায়েস্তা করতে পারে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর বাসভবনে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও অফিসে লোডশেডিং-এর প্রভাব না পড়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, এসব বাসভবনে এবং স্থান ও অফিসে মাঝেমধ্যে

www.pathagar.com

লোডশেডিং-এর প্রভাব পড়লেও এমনএমন বাসবভন আছে যেগুলোতে এটার প্রভাব পড়তে দেখা যায় না। এব্যাপারে কথাবার্তা বলে ও অভিযোগ করে কোন প্রতিকার পায়া যায় না। এটা সরকারের যে কোনধরনের দুর্বলতা তা জনগণকে ভাবিয়ে তোলে।

বিভিন্ন অফিসে যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঘুষ নেয় ও দেয় তাদের, বলতে গেলে, কাজকর্মে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু, যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী তা করে না তারা কর্মসম্পাদনে নানা অসুবিধা ও ঝামেলার সম্মুখীন হয়ে থাকে। দুর্নীতিপরায়ণ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ থাকে এবং তাদের খুঁত ধরার জন্যে ওঁত পেতে থাকে। কাজকর্মে বা দায়িত্বসম্পাদনে যে একেবারেই ত্রুটিবিচ্যুতি হয় না তা নয়। আমরা জানি মানুষমাত্রই ত্রুটি আছে। তাই, তাদের কোন ত্রুটিবিচ্যুতি পায়া গেলেই এসব কর্মকর্তা তাদের বিরুদ্ধে একশানে চলে যায়। এ শত্রুতামূলক প্রক্রিয়া সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়ানুগতা, স্পষ্টবাদিতা ইত্যাদির পথে একটি বড় অন্তরায়। এটা সবাই কমবেশি জানে। অপরদিকে, ঘুষ নেয়া ও দেয়ার এবং দুর্নীতি ও আত্মসাৎ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে সন্তুষ্ট করার ফলে যে দেশ ও জনগণের অপরিমেয় ক্ষতি হয় এবং অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধি সাধিত হয় না সেসব ব্যাপারে কোন একশানের কথা মনে আসে না। এমন একটি প্রবণতা বিরাজমান আছে যে, উর্ধ্বতনদেরকে যেভাবেই হোক আর্থিকভাবে সন্তুষ্ট না করলে তারা নানা ছুতানাতা ধরে বিরক্ত করতে থাকে। স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও অফিসগুলোও সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এসব সংস্থা ও অফিস স্বায়ত্তশাসনের নামে সরকারের অনেক নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত থাকে। ফলে, এগুলোতে দুর্নীতি ও লুটপাট অবাধে চলতে থাকে। তাই, বাস্তবে স্বায়ত্তশাসনের ত্রুটি সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণের ত্রুটির চেয়ে কম নয়, বরং ভয়াবহ।

চোরাচালানি, কালাকারবারি, পাচারকারী, চোরডাকাত, চাঁদাবাজ, মস্তান, সন্ত্রাসক, ছিনতাইকারী, টাউটবাটপাড় ও আরো বিভিন্নধরনের অপরাধীরা নাকি তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সদস্যদেরকে নিয়মিত হারে চাঁদাপ্রদান করে থাকে। ফলে, পারতপক্ষে তাদের তেমনকোন অসুবিধা হয় না। তাদের কখন কি হতে পারে তা নাকি তারা আগেভাগেই বা সর্বাগ্রেই জেনে যায় এবং তদনুযায়ী তারা তাদের কাজ করে থাকে। তাই, এটা একটি মুখরোচক কথা যে, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো হচ্ছে অপরাধীদেরকে লালন করার জন্যে। যেসমাজে আইনপ্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধীরা শায়েস্তা না হয়ে আইন তাদের হাতের মুঠোতে চলে যায় সেসমাজ যে কিরকম অন্ধকারাচ্ছন্ন তা বিবেকবান লোকের নিকট ভাষায় ব্যক্ত করার দরকার নেই। বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তারা নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে মোটাঅংকের ঋণ দিয়ে থাকে। তারা বোগাস শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকেও কোটিকোটি টাকা ঋণ

www.pathagar.com

দিয়ে থাকে। এতে দেশ ও জনগণের ক্ষতি হচ্ছে এবং তারা বাহাদুর থেকে যাচ্ছে। এসব নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা, কথাবার্তা ও লিখালিখি হয়। কিন্তু, কোন প্রতিকার হয় না, কেননা এসব দুর্নীতির ফলে তাদের এতো টাকা যে তারা সবাইকে হাত করে নিতে পারে। তাছাড়া, অবৈধ টাকার জোরে তারা জোরালোভাবে রাজনৈতিক ও উচ্চপর্যায়ের ব্যাকিং পেয়ে থাকে। সেরাজনীতি ও উচ্চপর্যায় সবরকমের দুর্নীতি দূর করে ন্যায়প্রতিষ্ঠার জন্যে তা ও সেপর্যায় দুর্নীতি উৎসাহিত করলে জনগণ শেষাবধি কি পন্থা অবলম্বন করতে পারে তা রাজনীতিবিদ ও উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের চিন্তাভাবনা করে দেখা অতীব জরুরী। সংসদে ও সংসদীয় কমিটিতে এসব আলোচনা হলেও কোন একশান পরিলক্ষিত হয় না। আসলে যে যেটা করার দায়িত্বে নিয়োজিত সে তা না করলে এবং না করার কারণে তার তাৎক্ষণিক শাস্তি না হলে হৈচৈ হয়, অশান্তি বাড়তে থাকে, ক্ষমতায় যাবার জন্যে বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ চলতে থাকে, সে যেভাবে পারে স্বার্থসিদ্ধি করতে থাকে, নিরীহ জনগণের দুঃখদুর্দশা বাড়তে থাকে এবং জাতি অনগ্রসর থেকে যায়। তবে, একদিন-না-একদিন এসবের পরিণতি ভয়াবহ রূপ লাভ করে।

ক্ষমতাসীন দল, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও সম্পদশালী ব্যক্তি এবং সর্বস্তরে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝখানে অবস্থান করছে কোটিকোটি নিরীহ জনসাধারণ। বর্তমানে আমাদের দেশে জনসাধারণ উক্ত চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে আছে। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের প্রভাবের এবং সম্পদশালী ব্যক্তিদের টাকাকড়ির বশীভূত। এতিন শ্রেণী তাদের স্বস্ব স্বার্থে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করার কারণে আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতির যথার্থ ও সঠিক প্রয়োগ সাধিত হচ্ছে না এবং ৪র্থ শ্রেণীর কোটিকোটি নিরীহ জনসাধারণ নিগৃহীত হচ্ছে। এশ্রেণী যে অন্য তিন শ্রেণীর অপকর্মের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে, কেননা দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারী শ্রেণী ক্ষমতাসীন ও সম্পদশালী শ্রেণী দু'টির সহযোগিতায় আইনশৃঙখলার নামে আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে এশ্রেণীকে সর্বতোভাবে প্রতিহত করে আসছে এবং বিরোধী দলগুলোও তাদের স্বস্ব স্বার্থে এশ্রেণীকে ব্যবহার করার সুযোগ হারাতে চায় না।

একদিকে সরকারের হিসাব নিরীক্ষণ অফিস আছে এবং অপরদিকে একাউণ্টিং ফারম রয়েছে। হিসাব নিরীক্ষণ অফিস থাকা সত্ত্বেও সরকারের বিভিন্ন অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান একাউণ্টিং ফারমের দ্বারা নিরীক্ষা করানো হয়। অথচ, একাউণ্টিং

www.pathagar.com

ফারমগুলো দ্বারা নিরীক্ষা করানোর ফলে বড়বড় দুর্নীতি ও আত্মসাৎ ঢাকা পড়ে যায়, কেননা এদের অনেককেই টাকাপয়সা দিয়ে হিসেব ওকেড করিয়ে নেয়া যায়। তাই, একদিকে এরা নিরীক্ষার জন্যে নিরীক্ষা ফী হিসেবে অনেক টাকা নেয় ও অপরদিকে এদের নিরীক্ষা রিপোর্ট যথাযথ ধরে নেয়াতে কোটিকোটি টাকা লোপাট হয়ে যায় এবং বর্তমানে এরা দুর্নীতির আরেকটি মারাত্মক অস্ত্র, কেননা এদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ ক্যাশ বুক ও ব্যয়সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্রের সাথে বাস্তব কাজ ও খরচের আলোকে মিলিয়ে দেখে না। বাস্তবমুখী নিরীক্ষাই সবরকমের দুর্নীতি ও আত্মসাৎ প্রতিহত করাতে একটি অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই, শুধু সরকারী পর্যায়ে এমন একটি নিরীক্ষাব্যবস্থা থাকতে হবে যেটাতে থাকবে দেশের বাছাই করা সৎ, মহৎ ও উৎসর্গীকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এটাতে সততা, মহত্ব ও উৎসর্গের নামে নানাধরনের পক্ষপাতিত্বের কারণে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমাবেশ ঘটতে পারবে না।

আত্মসাৎ, ঘুষ ও দুর্নীতি দেশের উন্নতি, সুখশান্তি, আইনশৃঙখলা পরিস্থিতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সুষম বণ্টন, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সম্প্রীতি ইত্যাদি লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। আত্মসাৎ প্রত্যক্ষ। কাগজপত্রই এটা প্রমাণ করে দেয়। তাই, কাগজপত্রের মাধ্যমে, আইনের বিভিন্ন পদ্ধতিগত জটিলতা পরিহার করে ও সময় নষ্ট না করে, সরাসরি এটার বিচার হতে থাকলে আত্মসাৎকারীরা যথাসময়ে যথোচিত শাস্তি পেতে থাকবে বিধায় আত্মসাতের প্রবণতা সন্দেহাতীতভাবে দূর হবে। যেআইন, নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী যেকাজ যেভাবে হবার তা যথাসময়ে সেভাবে হয়ে গেলে ঘুষ ও দুর্নীতির কোন সুযোগ সৃষ্ট হতে পারে না। তা হচ্ছে না বলেই ঘুষ ও দুর্নীতির খেলা চলছে। এটার জন্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাই দায়ী। এব্যাপারে, নানা জটিলতাতে না গিয়ে, সহজসরলভাবে যথাসময়ে তাদের যথাযথ শাস্তি হলে প্রতিটি কাজ যথাসময়ে আইন, নিয়ম ও পদ্ধতিমোতাবেক সম্পাদিত হবে বিধায় ঘুষ ও দুর্নীতি শব্দ দু'টি জনসাধারণ ভুলে যেতে হবে। তবে, এসবের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে অভিযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন ও পদ্ধতিগত জটিলতা এবং বিচারে, এজটিলতার কারণে, দীর্ঘসূত্রতা সর্বতোভাবে দূর করা। এরকম একটি পদ্ধতি শুধু আল্লাহ্‌র বিধিবিধানে নিহিত রয়েছে।

উভয় সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ব্যক্তির দ্বারাই ব্যবস্থাপিত ও পরিচালিত হয়। তবে, বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার ও পরিচালকদের নিজস্ব এবং সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার ও পরিচালকদের নিজস্ব নয়। বেসরকারী

www.pathagar.com

শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিজস্ব বলে এগুলোর ব্যবস্থাপক ও পরিচালকেরা এগুলোতে লাভের ও এগুলোর বিস্তৃতির জন্যে কাজ করে থাকে এবং এগুলোতে দুর্নীতি, আত্মসাৎ, অব্যবস্থা, অদক্ষতা ইত্যাদি নেই। এগুলোতে প্রয়োজনানুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ ও ছাঁটাই করা হয়, কোন সম্পদ নষ্ট হতে পারে না ও ব্যবস্থাপনায় কোন ফাঁকিজুকি চলে না এবং এগুলোর উন্নতির ওপরই মালিকদের উন্নতি নির্ভরশীল। অপরদিকে, যারা সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার ও পরিচালনের দায়িত্বে নিয়োজিত তারা এগুলোকে তাদের নিজেদের মনে করে না। এগুলো ধ্বংস হলেও তাদের কিছুই যায়আসে না। তারা সর্বদা তাদের স্বার্থে কাজ করে। তাছাড়া, এগুলোর পরিচালনা বোর্ডের পরিচালকেরা সরকারী কর্মকর্তা। এরা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে প্রতিনিধিত্ব করে। বাস্তব কাজ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই বললেও চলে। এরা মাঝেমাঝে বৈঠকে মিলিত হয় ও কিছুকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ভার ব্যবস্থাপনার ওপর ন্যস্ত থাকে। বাস্তবে, পরিচালনা বোর্ডের পরিচালক হিসেবে যেসব কর্মকর্তা প্রতিনিধিত্ব করে তাদের তেমনকোন প্রত্যক্ষ ও সরাসরি ভূমিকা থাকে না। তাই, সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে দেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে। দুর্নীতি, বেআইনী ও নীতিবিরুদ্ধ কাজ, অবিচারঅত্যাচার, জোরজুলুম, শোষণনির্যাতন, অপরাধ, অসম বণ্টন ইত্যাদি প্রতিহত করে একটি আদর্শিক সমাজব্যবস্থার নিমিত্ত সাথেসাথে প্রতিকারের পথ ও পন্থা বলবৎ থাকতে হয়। দু'পক্ষের মধ্যে কোন ব্যাপার উদ্ভব হলে বিনা ক্লেশ ও খরচে এবং সময়ের অপচয় না করে সত্যাসত্যের ভিত্তিতে তারা সেটার প্রতিকার পেতে থাকলে কথিত অনাকাঙ্ক্ষিত কর্ম নিরুৎসাহিত হয় এবং জনগণ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল জীবনের নিশ্চয়তা লাভ করে। এজন্যে প্রয়োজন ভ্রাম্যমান ও এলাকাভিত্তিক আদালত। তবে, ইসলামী অনুশাসনেই ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে এব্যবস্থা সম্ভব।

বিরোধী দলগুলোও দেশের মঙ্গলের জন্যে। তবে, বিশৃঙ্খলা মঙ্গলের পথে একটি অনভিপ্রেত জটিল প্রতিবন্ধকতা। বিরোধী দলগুলোর প্রতি ক্ষমতাশীল দলের থাকতে হয় সহনশীলতা। দেশ ও জনগণের স্বার্থে তাদেরকে সহনশীলতার মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যেতে হয় এবং যেসব রাজনীতিবিদ, যে যেদলেরই হোক-না-কেন, রাজনীতির নামে নিজেদের স্বার্থে নানাধরনের বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে দেশ ও জনগণের ক্ষতিসাধন করে তাদের যার যেঅপরাধ হয় তার বিরুদ্ধে তার সেঅপরাধ অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে একশান নিতে হয়। তা না হলে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না এবং সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে দেশ ও জনগণের অগ্রগতি ও উন্নতি ত্বরান্বিত হয় না। যে ঘোষণা পাঠ করে সে-ই শ্রেষ্ঠ ও সব কৃতিত্ব তারই হলে সর্বপর্যায়ে যারা

www.pathagar.com

ঘোষণা পাঠ করে তারাই সরকার হয়াটা অপরিহার্য। বস্তুতঃ, সবকিছু ঠিকঠাক হয়ার পর নির্দেশমোতাবেকেই ঘোষণা পাঠ করা হয়। তাই, ওদেরই শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্ব যারা সবকিছু ঠিকঠাক করে ও ঘোষণার জন্যে নির্দেশপ্রদান করে বা ঘোষণার পর্যায়ে পৌছিয়ে দেয়। অনেক ব্যক্তি আছে যাদের কথাবার্তা শ্রুতিমধুর এবং যারা আচারাচরণে ভদ্র ও মহৎ তারা সমাজে বিভিন্ন পর্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ, তারা ভেতরেভেতরে দুশ্চরিত্র ও ভয়াবহ। তাদের মতো লোক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে থাকলে দেশের সার্বিক অগ্রগতি হয় কিনা তা যেকোন বিবেকবান ব্যক্তি সহজেই অনুভব করতে পারে। মহৎ ও সৎউদ্দেশ্য নিয়েই যেকোন দল, সংঘ ও সমিতি গঠন করা হয়। প্রথমাবস্থায়, এউদ্দেশ্যের কিছুটা বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু, নানা কারণে শেষপর্যন্ত এউদ্দেশ্য সফলকাম হয় না। মহৎ ও সৎউদ্দেশ্য অসৎউদ্দেশ্য প্রতিহত করার একটি অনন্য উপায় ও হাতিয়ার। অসৎউদ্দেশ্যের ফলেই দুর্নীতি, উৎকোচ, অবিচারঅনাচার, মজুদ, চোরাকারবার, চোরাচালান, শোষণনিপীড়ন, অসম বণ্টন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, মস্তানি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অপরাধ ইত্যাদি চলছে এবং মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পাচ্ছে, সহমর্মিতা ও সহানুভূতি ওঠে যাচ্ছে, দেশের সঠিক অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চরম আকার ধারণ করছে। যারা অসৎউদ্দেশ্যে লেগে আছে তাদের হাতেই দেশের অর্থসম্পদ কেন্দ্রীভূত। যারা সৎউদ্দেশ্যে দল, সংঘ ও সমিতি গঠনের মাধ্যমে এদের অসৎকর্মকাণ্ড স্তব্ধ করার জন্যে আগুয়ান হয় তাদের মধ্যে এরা অর্থসম্পদের প্রলোভন ঢুকিয়ে ভাঙন ধরায়। তাই, সৎউদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হলেও যেকোন দল, সংঘ, সমিতি অসৎউদ্দেশ্য নস্যাৎ করতে ব্যর্থ হয় এবং সৎউদ্দেশ্যের ধ্বজাধারীদের মধ্যে অনেকেই অসৎউদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়।

ক্ষমতাসীন দলের পতনের জন্য ক্ষমতাসীনেরা যতোটুকু না দায়ী তার চেয়ে অনেকবেশি দায়ী সেদলের এলাকায়এলাকায় কর্মী ও ছোটছোট নেতারা। এটারো কারণ আছে। ক্ষমতাসীনদের বড়বড় অপকর্ম ও দুর্নীতি সাধারণ লোকজনের চোখে সহজে ধরা পড়ে না। অপরদিকে, কর্মী ও ছোটছোট নেতাদের যেকোন অপকর্ম ও দুর্নীতি সাধারণ লোকজনের চোখ এড়াতে পারে না। এসব নেতা ও কর্মীর অপকর্মের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসলে বিপদে পড়তে হয়, কেননা ক্ষমতাসীনেরা এদের পক্ষে, দলের স্বার্থে জনগণের স্বার্থের বিপরীতে, কাজ করে ও সরকারী সংস্থাগুলোর নিকট এদের জন্যে সুপারিশ করে। বিরোধী দলের এধরনের নেতা ও কর্মীরাও অপকর্ম করলে এদের বিরুদ্ধেও এজন্যে এগিয়ে আসা হয় না যে, এদল ক্ষমতায় আসলে নানা অসুবিধা সৃষ্টি করবে। ক্ষমতাসীন দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংঘ ও সমিতি এবং বিভিন্ন মহল অন্যায়াবিচার, জোরজুলুম, শোষণনিপীড়ন, ঘুষ, দুর্নীতি, আত্মসাৎ, চাঁদাবাজি, মস্তানি, অপরাধ, সন্ত্রাস, চোরাচালান, কালাকারবার, পাচার, ছিনতাই ইত্যাদির

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে সোচ্চার। অপরদিকে, এসব দেদার চলছে। এ যেন একধরণের আপসকামিতা, অর্থাৎ আমরা জনসাধারণকে দেখানোর ও বোকা বানানোর জন্যে সোচ্চার থাকবো ও তোমরা এসব চালিয়ে যাবে এবং তোমরা ও আমরা ভেতরগতভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকলে কেইবা কি করতে পারবে।

কাজের সাথে আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতির সম্পর্ক। এগুলোর ভিত্তিতে সব কাজ, ধরন যা-ই হোক-না-কেন, সম্পাদিত হতে হয়। অথচ, যেকোন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রাধান্য পাচ্ছে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক, যেভাবে হোক, গড়ে তুলতে পারলেই যেকোন কাজ অতিসহজে আদায় করা বা নিষ্পাদন করানো যায়। আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতিতে যা না হয় ব্যক্তিগত সম্পর্কের ফলে তার চেয়ে অনেকবেশিকিছু হয়ে যায়। এগুলোর আওতায় যেখানে ন্যায়সংগত কাজ উদ্ধার করা যায় না ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা সেখানে চরম অন্যায্য কাজো উদ্ধার করা যায়। এককথায়, আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রাধান্য পায়াতে অন্যায়াবিচার, শোষণনির্যাতন, দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, স্বার্থপরতা, অসৎপন্থা, মস্তানি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অসম বণ্টন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ইত্যাদি প্রতিহত করে একটি সুখীসমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। যৌক্তিকতা ও আইন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। যেযুক্তি আইনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তা গ্রহণ করতে হয়। যেযুক্তি আইনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় তা অযুক্তি। আইনকে পাশ কেটে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে যৌক্তিকতা দেখিয়ে কাজ করলেও অনাচার ও অবিচার হয় এবং শান্তিশৃঙ্খলা ও অগ্রগতি অর্জিত হয় না। বর্তমানে রাজনীতিতে আইনকে পাশ কেটে যৌক্তিকতা দেখিয়ে অগ্রসর হয়ার ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে জনসাধারণ হতাশাগ্রস্ত। বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পাদনের জন্যে বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি প্রণীত আছে। কোন কাজই এগুলো বহির্ভূত হতে পারে না। অথচ, কর্মসম্পাদনে এগুলো সহজলভ্য হয় না, এমনকি পায়াও যায় না। এগুলো সংরক্ষণ করার দায়িত্ব হচ্ছে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। এগুলোর অভাবে কর্মসম্পাদনে দীর্ঘসূত্রতা দেখা দেয় এবং কোনকোন কর্ম যে ভুলভাবে সম্পাদিত হয় না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাই, প্রত্যেক অফিসের প্রত্যেক শাখা ও অধিশাখায় এবং বিভাগ ও অনুবিভাগে এগুলো সংরক্ষণের নিশ্চয়তাবিধান করাটা বাধ্যতামূলক হতে হবে। এটার অন্যথা শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।এগুলোর সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ এবং নতুন বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি যথাসময়ে সংরক্ষণে কোনপ্রকার অন্যথা করা যাবে না। সুষ্ঠু শব্দচয়ন ও ভাষাপ্রয়োগের অভাবে সরকারী আইনকানুন, বিধিবিধান, নিয়ম, পদ্ধতি, আদেশ, চিঠি ইত্যাদিতে জটিলতা দেখা দেয় ও একেক জন একেক অর্থ করে। এজন্যে এগুলোতে শব্দচয়ন

www.pathagar.com

সঠিক হতে হয় এবং প্রয়োগকৃত ভাষা ছোটছোট বাক্যে সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হতে হয়। সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এব্যাপারে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে, সরকারী কর্মকাণ্ডে জটিলতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। এককথায়, যা দিয়ে মনোভাবপ্রকাশ করা হয় তাকে ভাষা বলে। তাই, যেভাষাতে ভাবে জটিলতা ও দ্ব্যর্থকতার সৃষ্টি হয় সেটাকে, আমার মতে, ভাষা বলা যায় না। সেটাই হবে ভাষা যেটার অভিব্যক্তিতে কোন জটিলতা ও দ্ব্যর্থকতার লেশ থাকবে না। যেহেতু ভাষাপ্রয়োগের দ্বারাই সবকিছু করতে হচ্ছে সেহেতু সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্ব্যর্থকতাহীন শব্দচয়ন ও ভাষাপ্রয়োগের ওপর আবশ্যিকভাবে গুরুত্বারোপ করতে হবে।

কখনোকখনো উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কাজ না বুঝে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্যে অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে হৈচৈ করে ও তাদেরকে, তারা কাজ না বুঝার ও জানার অজুহাত দাঁড় করিয়ে, বকাবকি করে। এক্ষেত্রে তারা সত্যকথা বললে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কেউকেউ তাদেরকে বিপদে ফেলে দিতে আদৌ ভাবে না। সত্যকথা বলে সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদে এটা একটি ঘৃণাসূচক প্রতিবন্ধকতা। জনগণ থেকে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্নভাবে বিভিন্নধরনের কর আদায় করছে। এমনো লোকজন আছে যারা পরিবারপরিজন নিয়ে খাওয়াপরাতে কষ্ট করে হলেও তাদের ওপর আরোপিত কোনকোন কর প্রদান করতে বাধ্য হচ্ছে। এসব করের উদ্দেশ্যে হচ্ছে সার্বিকভাবে দেশোন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারনের ভাগ্যোন্নয়নসাধন। অথচ, একদিকে করের চাপের কষাঘাতে নিরীহ লোকজন জর্জরিত হচ্ছে এবং অপরদিকে করের টাকা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিলাসিতায় ব্যয়িত হচ্ছে। তাদের জন্যে গাড়ি কেনা হচ্ছে, বাড়ি বানানো হচ্ছে ও নানাধরনের সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জনগণের । তাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করা। জনগণ নিজেরা অসুবিধায় থেকে কখনো রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রী এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করতে ও তাদেরকে বিলাসিতায় রাখতে চাচ্ছে না। তবুও তাদের সুযোগসুবিধা হচ্ছে এবং তারা বিলাসিতা করতে পারছে, কেননা তারা বুঝেও বুঝে না যে, জনগণই তাদের প্রভু ও তারা ভৃত্য। জনগণ যেখানে এসব সুযোগসুবিধা ও বিলাসিতা হতে বঞ্চিত সেখানে জনগণের অসম্মতিতে তাদের এসব সুযোগসুবিধা ও বিলাসিতা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। ইসলামী অনুশাসনই এ অবৈধ কাজ পরিহার করে জনগণের সুখশান্তির প্রতি মনোযোগী হতে সক্ষম। বর্তমানে অফিসসংক্রান্ত গোপনীয়তার নামে দুর্নীতির ও জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যের গোপনীয়তা রক্ষা পাচ্ছে। অফিসসংক্রান্ত কার্যাবলী হচ্ছে জনগণের কার্যাবলী। এসব কার্যাবলীতে গোপনীয়তা বলতে কিছু থাকার কথা নয়। আইন, বিধি, নিয়ম ও

www.pathagar.com

পদ্ধতিমোতাবেক প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে সম্পাদিত হলে তার গোপনীয়তা বলতে কিছুই থাকতে পারে না। তবে, এমন কতকগুলো কাজ আছে যেগুলোর গোপনীয়তা অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে বাজেট প্রণয়ন ও ঘোষণা। এটা ঘোষিত হয়ার পূর্ব পর্যন্ত গোপন থাকাটা বাঞ্ছনীয়। অথচ, এটা ঘোষিত হয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট মহল এটা জেনে যায় এবং এব্যাপারে কোন একশান নেই। অপরদিকে, ওপরের দিকের কোন দুর্নীতি ও জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ জানাজানি হলে অফিসসংক্রান্ত গোপনীয়তা প্রকাশের অজুহাতে একশানের ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়।

তেজস্বী ও বুদ্ধিদীপ্ত অধস্তন কর্মকর্তা আছে। তাদের তেজস্বিতা ও বুদ্ধিদীপ্তি দেশের অগ্রগতি ও উন্নতিতে অপরিহার্য। কিন্তু, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, উর্ধ্বতনেরা তাদের বুদ্ধিদীপ্তি ও তেজস্বিতা সহ্য করতে না পেরে তাদেরকে সহ্য করতে পারে না। তাই, তারা তাদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করে ও হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। বুদ্ধিদীপ্তি ও তেজস্বিতার কারণে তারা স্পষ্টভাষী ও ওল্টাপাল্টা কথাবার্তাতে ও কাজকর্মে প্রতিবাদী হয় বিধায় তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন খারাপ হয় এবং তারা, বলতে গেলে, পদেপদে ঝামেলা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় এবং সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে দেশেকে অগ্রগতি ও উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে কোন সুযোগ পায় না ও ব্যর্থ হয়। বীর্যবান ও দীপ্তিশীল অধস্তন কর্মকর্তারা যাতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা ও ঈর্ষার ফলে ছিটকে না পড়ে জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান রাখতে ব্যর্থ না হয় সেজন্যে একটি সৎ,মহৎ, নিরপেক্ষ ও ত্যাগী উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি থাকবে। একমিটি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের রোষানল থেকে বীর্যবান ও দীপ্তিশীল অধস্তন কর্মকর্তাদের সামনে এগিয়ে যাবার পথ উন্মুক্ত ও বিস্তৃত রেখে তাদেরকে জাতীর অগ্রগতিতে অবদান রাখাতে সফলকাম করে তুলবে। ওপরদিক থেকে নিচদিকে অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক ও অবাস্তব কাজ দিয়ে দেয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে যে নিচদিকে অসন্তোষ বিরাজ করে তা ওপরদিক বুঝে। তবু, তারা এটা বন্ধ করে না। তারা মনে করে যে, এটার দ্বারা নিচদিককে কাজে ব্যস্ত রাখা হয়। বাস্তবে, এটা কাজে ব্যস্ত রাখা নয়। এটা হচ্ছে অযথা কর্মশক্তির অপচয় ঘটানো ও সংশ্লিষ্ট কাজে জটিলতা সৃষ্টি করানো। জাতীয় স্বার্থে কর্মশক্তির অপচয় ও কাজে জটিলতা দুটোই অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। এঅপচয় ও জটিলতা রোধকল্পে সরকারের বাস্তবমুখী ও কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা যায় না।

গরীব লোকজনের কোন মারাত্মক রোগ হলে তারা সংগতির অভাবে চিকিৎসা করাতে না পেরে ধুঁকেধুঁকে মারা যায়। তবে, সংগতির ব্যবস্থা হলে তারা চিকিৎসা করিয়ে বেঁচে যেতে পারে। পত্রপত্রিকায় দেখা যাচ্ছে যে, এরা এদের মারাত্মক রোগের

www.pathagar.com

চিকিৎসার জন্যে ধনবান ব্যক্তিদের নিকট আর্থিক সাহায্য চায়। মোসলমানেরা জানে যে, তাদের দুর্দশা ও অবনতির যেরোগ হয়েছে সেটা থেকে আরোগ্যলাভ করতে হলে কি সম্পদের প্রয়োজন। এসম্পদ হচ্ছে কোরআন ও হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ কর্তৃক অনুসৃত আল্লাহ্‌র নির্দেশিত হুকুমআহকাম ও বিধিবিধান। এটা জেনেও মোসলমানেরা ইসলামবিরোধীদের চক্রান্তের শিকার হয়ে এটাকে পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ না করে সমষ্টিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ভুল পথে ও পন্থায় মুক্তির পথ খুঁজছে। বর্তমানে এইডস একটি ঘাতক ব্যাধি। এব্যাধি হতে বাঁচার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। সর্বত্র বলা হচ্ছে যে, এটার আক্রমণ হতে রক্ষা পায়ার একমাত্র উপযুক্ত উপায় হচ্ছে ইসলামী বিধিবিধান মতে যৌনাচার হতে মুক্ত থাকা। তবে, ইসলামের আলোকে যৌনাচার হতে মুক্ত থাকতে হলে প্রয়োজন হচ্ছে মহিলাদের শালীনতার জন্যে পর্দা, নারীপুরুষদের অবাধ ও মুক্ত মেলামেশা পরিহারকরণ ও ইসলামী আইনের বাস্তব প্রয়োগ। সত্যকথা বলতে কি, শুধু এইডস নয়, যেকোন সমস্যার সমাধান ইসলামী বিধিবিধানের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

জাতীয় সংসদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দেশের অবস্থার প্রয়োজনে আইন ও বিধিপ্রণয়ন করা। অধ্যাদেশ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা হয়। অধ্যাদেশের কার্যকারিতা আইন ও বিধির ন্যায়। অধ্যাদেশ জারির বিভিন্ন যৌক্তিকতা থাকলেও তা যে সংসদের সার্বভৌমত্বকে খর্ব করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অধ্যাদেশ হচ্ছে একক সিদ্ধান্ত। ইসলামে রাষ্ট্রপতির এধরনের ক্ষমতা নেই। বিরোধী দলগুলোও রাষ্ট্রপতির এধরনের ক্ষমতার বিরোধিতা করছে। বাস্তবিকপক্ষে, ইসলামেই রয়েছে নিরপেক্ষতা ও সবধরনের ভারসাম্যমূলক নীতি। তাই, সব রাজনীতিবিদের পবিত্রতম দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামকে জানা ও ইসলামের নীতি অনুসারে সঠিক মঙ্গলের নিমিত্ত কাজ করে যায়া। সভ্যতার ওপর অনেক কথাবার্তা হয়। আসলে সভ্যতা কি? এককথায়, সভ্যতা হচ্ছে মানবসমাজের উন্নতি ও প্রগতির সাথেসাথে এমনসব মানবীয় গুণাবলী অর্জন করা যাতে মানুষে মানুষে কোন বিভেদ না থাকে, সবাই সবার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখে, কেউই এমনকোন কাজ না করে যাতে অন্যকেউ, পরোক্ষভাবে হলেও, বিন্দুবিসর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একজনের কারণে অপরজন শোষিত, অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অবহেলিত না হয়, একজনের ন্যায় অপরজনো খেয়েপরে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা হতে বঞ্চিত না হয়, বিজ্ঞান ধ্বংসযজ্ঞের হাতিয়ারে পরিণত না হয়ে মানবকল্যাণের উৎস হিসেবে কাজ করে, কাকেও বিভিন্নভাবে দেবে রেখে তার ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত না করা হয়, কেউই সুশিক্ষার আলো থেকে দূরে সরে যেতে না পারে, অসত্যকে ভিত্তি করে যুদ্ধ, সংঘাত, সংঘর্ষ, মারামরি, হানাহানি, রেষারেষি,

www.pathagar.com

সংঘাত, জীবননাশ, সম্পদের বিনাশ ইত্যাদি না চলে ও সব মানুষ মিলে একজাতিতে পরিণত হয়। এসভ্যতা ইসলাম ব্যতীত মানুষের কোন মতবাদ আজপর্যন্ত দিতে পারে নেই, এখনো দিতে পারছে না এবং, নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ভবিষ্যতেও দিতে পারবে না। কোরআন, হাদীস, মহানবীর আদর্শ, খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ ও ইসলামী মনীষীদের আদর্শ আলোচনা করলে এসত্যটি সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রাজনীতিবিদদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতা। তারা মানবতার দিশারী। মানবতার দিশারী হিসেবে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে মানবতা প্রতিষ্ঠাকল্পে ইসলামী আদর্শে অগ্রবর্তী হয়া। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত কোন রাজনৈতিক দল এমনকিছু ভাবা উচিত হবে না যে, তাদের একক প্রচেষ্টাতেই লোকজন ইসলামী অনুশাসনের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন লোকজন, মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র, ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক ও ছাত্র, মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন ও খাদেম, আলেমওলেমা, পীর এবং আরো অনেকেই ইসলামী অনুশাসনের পক্ষে তাদের সাধ্যানুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। লোকজনের ইসলামী অনুশাসনের দিকে আকৃষ্ট হয়াতে এদের অবদান অনেকবেশি কাজ করছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এদের এঅবদানের সুফল ইসলামের ভিত্তিতে কোন-না-কোন রাজনৈতিক দল পেয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে, ইসলামের ভিত্তিতে গঠিত কোন রাজনৈতিক দল এমনকিছু দাবি করা ঠিক হবে না যে, তাদের সব নেতা ও কর্মী নিরপরাধ এবং যারা ইসলামের জন্যে নিবেদিত হয়েও ইসলামের ভিত্তিতে গঠিত কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নয় তাদের কেউই ওরকম কোন দলের উপযুক্ত নয়। একজন ন্যায়সংগতভাবে অপরজনের উপকার করতে ও তার জন্যে ভালো কাজ করতে পারে। কিন্তু, সে তা সহজে করে না। সে সেটাকে নিজেকে জাহির করার ও তাকে দায়বদ্ধ করার একটি মোক্ষম সুযোগ হিসেবে ধরে নেয়। এটা হীনম্মন্যতা ব্যতীত অন্যকিছু নয়। এহীনম্মন্যতার কারণেই সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় নয় এবং মানুষে মানুষে যেসোহার্দ ও সহমর্মিতা থাকার কথা তা নেই। আছে শুধু কোন্দল, শত্রুতা, হিংসাবিদ্বেষ ইত্যাদি। তবে, ইসলামী আদর্শেই এসবের অবসান ঘটানো সম্ভব। টেলিভিশনে ও রেডিওতে অনুষ্ঠানের শুরুতে ও শেষে কোরআনের আয়াত পাঠ করা হয়। পঠিত আয়াতের অর্থ ও তফসির করা হয়। এতে এটা পরিষ্কারভাবে ফুঠে ওঠে যে, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা। শুরুতে ও শেষে আল্লাহ্‌র কথা শুনিয়ে মাঝখান দিয়ে আল্লাহ্‌র কথার সাথে সামঞ্জস্যহীন কোনকোন অনুষ্ঠান কোন যুক্তির নিরিখেই গ্রহণীয় হতে পারে না। এমনএমন কাজ আছে যেগুলো সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিপন্থী সেগুলোর শুরুও কোরআনের আয়াত তেলাওয়াতের দ্বারা করা হয়। এতে এট বুঝা যাচ্ছে যে, শুরুতে কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করাটা একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। যেসব রাজনৈতিক দল ইসলামী রাজনীতিতে

www.pathagar.com

বিশ্বাসী নয় তারাও এরেওয়াজ মেনে চলছে। মোসলমান হয়ে এরেওয়াজ মেনে চলাটাও একটি রাজনৈতিক চাল। কোরআনের আয়াত হচ্ছে তা অনুযায়ী কার্যসম্পাদনের জন্যে, তাকে রেওয়াজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তার পরিপন্থী কর্মসম্পাদনের জন্য নয়। কোরআনের আয়াত পাঠ করার অর্থই হচ্ছে কোরআনকে স্বীকার করা। তাই, যেখানে কোরআনকে স্বীকার করা হচ্ছে সেখানে তাকে রাজনৈতিক চালের দ্বারা পঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তার মর্মানুযায়ী প্রতিটি কাজ নিষ্পন্ন করাটাই প্রত্যেক মোসলমানের, মোসলমানিত্ব বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে, ঈমানী দায়িত্ব। কারো উপকার করতে পারলে আনন্দ পায়ার এবং কারো ক্ষতি হলে তাতে অনুতপ্ত ও দুঃখিত হয়ার মনমানসিকতা মানুষকে অন্যায় ও অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে। এমন মানসিকতার জন্যে প্রয়োজন মনুষ্যত্ব, দৃঢ়সংকল্প, উন্নত চরিত্র ও পরকালের ওপর নির্মল আস্থা। মোসলমান নামধারণ করে ইসলাম ও প্রকৃত মোসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করে যায়ার লোকো আছে। এরা ইসলামের মূল আদর্শ থেকে মোসলমানদেরকে অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার কর্মে লিপ্ত রয়েছে। বাস্তবে, এরা ইসলামবিরোধী এবং ইসলামবিরোধীদের অনুচর ও মদদপুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, এরা অমুসলিম। তাই, ইসলামের স্বার্থে এদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা প্রয়োজন।

পাড়ায়পাড়ায় পিকনিক, বিভিন্ন উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে অনেক ছেলে খুবজোরে মাইক বাজিয়ে একটা অস্বস্তিকর ও অস্বাচ্ছন্দ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে। এঅবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী থাকে। এসব ছেলের মাতাপিতা ও অভিভাবকরা এটা দেখে; কিন্তু তাদেরকে তা না করতে নিষেধ করে কিনা অন্যান্যারা তা বুঝতে ও জানতে পারে না। পাড়ার বিবেকবান লোকজন তাদেরকে এরকম না করার জন্যে, মানইজ্জত হারাবার ভয়ে, বলতে সাহসী হয় না। কেউকেউ মূল্যবোধের তাড়নায় তাদেরকে তা না করতে বলে তাদের শত্রুতে পরিণত হয় এবং তাদের কারণে কখনোকখনো ঝামেলাতে পড়ে যায়। আইনশৃঙখলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে তাদের আইনানুগ ভূমিকা সচেতনতার সাথে, যারা তাদেরকে এব্যাপারে অবহিত করে তাদের সাহায্য কামনা করে তাদের প্রতি মনের দিক দিয়ে ক্ষুব্ধ না হয়ে, পালন করলে পাড়ায়পাড়ায় এরকম গণউপদ্রব হতে পারে না।

সন্ত্রাসক দিয়ে সন্ত্রাসক প্রতিহত করার ধ্যানধারণা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ও অবাস্তব। সন্ত্রাসক দিয়ে সন্ত্রাসক প্রতিহত করতে গেলে সন্ত্রাসি তৎপরতাই বৃদ্ধি পাবে, সন্ত্রাস দমিত হবে না। কোন লোক সন্ত্রাস প্রতিহত করতে এগিয়ে আসলে তাকেও সন্ত্রাসি দল গঠন করতে হবে, কেননা সে কোনভাবেই এমনিএমনি সন্ত্রাস প্রতিহত করতে পারবে না এবং তার নিরাপত্তা অনিশ্চিত হবে। সরকারো নানা কারণ ও যুক্তি

www.pathagar.com

দেখিয়ে সন্ত্রাসক ও অপরাধী হাতে রাখে। তাদের ধারণায় বিরোধী দলগুলোর সন্ত্রাসক ও অপরাধীদেরকে দাবিয়ে রাখতে হলে নিজেদের হাতেও সন্ত্রাসক ও অপরাধী রাখাটা যথার্থ। এতে যেদল ক্ষমতা হারায় সেদলের সন্ত্রাসক ও অপরাধীরা ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দল থাকা অবস্থায় তাদের লালিত সন্ত্রাসক ও অপরাধীদের সাথে মিশে যায় এবং, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, একদল সন্ত্রাসক ও অপরাধী সরকারের হাতে থেকে যায়। এদিক দিয়ে সরকার ও আইন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই, সন্ত্রাস উৎখাত করার জন্যে কোনভাবেই সরকারের হাতে কোন সন্ত্রাসক, মস্তান ও অপরাধী থাকতে পারবে না ও দলীয় কর্মীরা তাদেরকে কোনপ্রকার সমর্থন দেবে না ও তাদের জন্যে কোন কাজ করবে না এবং সরকার আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা আইনের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ প্রয়োগসাধন করাতে হবে। তা না হলে সরকার আসবে ও সরকার যাবে, দেশ সন্ত্রাস ও মস্তানি হতে মুক্ত থাকবে না এবং সর্বদা সন্ত্রাসক ও মস্তানদের রাজত্ব কায়েম থাকবে বিধায় জনসাধারণ দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে থাকবে। এককথায়, এরকম দুর্বিষহ অবস্থা হতে মুক্তি দিতে পারে মহান আল্লাহ্‌র ইসলামী অনুশাসন। সন্ত্রাসক ও মস্তানদেরকে নির্বাচনে ও বিভিন্ন কাজে সমর্থন দেয়া না হলে তারা যেকোন সময়, জীবননাশ পর্যন্ত, যেকোন ক্ষতি করতে পারে। ফলে, সন্ত্রাসক ও মস্তানদের সন্ত্রাস ও মস্তানি খোলামেলাই চলতে থাকে। বাস্তবে, এটাও দেখা যায় যে, তারা ক্ষমতাসীনদের সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে থাকে। নিরীহ জনগণ তাদেরকে ভয় করার এটাও অন্যতম কারণগুলোর একটি। ক্ষমতাসীন দলসহ বিভিন্ন দলের ও এসব দলের অংগ সংগঠনগুলোর কর্মীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন উপলক্ষে লোকজন থেকে একপ্রকার জোর করে চাঁদা আদায় করে। নেতারা এটা না চেলে এবং এটাতে তাদের সমর্থন না থাকলে কর্মীরা কখনো এধরনের কাজে সাহসী হতে পারে না। অথচ, ক্ষমতাসীন দলসহ সব দলই চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে সোচ্চার। নির্বাচনে দলীয়ভিত্তিতে সাধারণত তারাই মনোনয়ন পেয়ে থাকে যারা জোরালো প্রভাব খাটাতে ও অধিক টাকা দিতে পারে। এদের খুঁটি শক্ত থাকে বিধায় এরা অনেক অপকর্ম করতে পারে। এসুবাদে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত লোক, মস্তান, সন্ত্রাসক ইত্যাদি প্রতিনিধি হয়ে যায়।

ক্ষমতাসীনদের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সভা করা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করা, দলীয় কর্মীদের জন্যে সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করা, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে পথ ও পন্থা উদ্ভাবন করা, কাজ না করেও ব্যস্ততা দেখানো, সর্বরকমের সুযোগসুবিধা ভোগ করা ইত্যাদি; বিরোধী দলগুলোর কাজ হচ্ছে ক্ষমতায় আসার জন্যে সংগ্রাম ও আন্দোলন

www.pathagar.com

করা, গণতন্ত্রের নামে অনেক অগণতান্ত্রিক কাজ করা, ক্ষমতাসীন দলকে সুষ্ঠু পরিবেশপরিস্থিতিতে কাজ করতে না দেয়া, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চেষ্টা চালানো, ছাত্রদেরকে বিভিন্ন অপতৎপরাতে নিয়োজিত করে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা ইত্যাদি; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজ হচ্ছে ঘুষে ও দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়া, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য ভুলে যারা, পারলে কোন কাজ না করেই বেতনভাতা নেয়া ইত্যাদি; বিচারকদের কাজ হলো আইনের ওপর সবকিছু চেপে দিয়ে নিরাপদে থাকা; আইনশৃঙখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কাজ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ যে তাদের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত সেসম্পর্কে যুক্তিপ্রদর্শন করা; শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবসায়ীদের কাজ হচ্ছে সাধারণ লোকজনকে শোষণ করে নিজেদের সম্পদ ও জাঁকজমক বৃদ্ধি করা; শ্রমিকদের কাজ হচ্ছে নিজেদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরির জন্যে সংগ্রাম করা; খেতমজুর ও কৃষকদের কাজ হচ্ছে অক্লান্ত পরিশ্রম করে শস্যোৎপাদন করা ও কষ্টেসৃষ্টে দিনপাত করা; সন্ত্রাসক ও মাস্তানদের কাজ হচ্ছে সন্ত্রাস ও মাস্তানি করা ; চাঁদাবাজদের কাজ হচ্ছে চাঁদা আদায় করা; ছাত্রদের কাজ হচ্ছে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়া; অপরাধীদের কাজ হচ্ছে অপরাধ সংঘটন করা; আইনজীবীদের কাজ হচ্ছে সত্যকে মিথ্যায় ও মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করা; বুদ্ধিজীবীদের কাজ হচ্ছে বুদ্ধির প্যাঁচ প্রয়োগ করা; শিক্ষকদের কাজ হচ্ছে শিক্ষা বেচার পন্থা বের করা ; ডাক্তারদের কাজ হচ্ছে রোগীর জীবনকে অর্থোপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে টেনে ধরা; প্রকৌশলীদের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন কাজ ও প্রকল্পে টাকা উপার্জনের ফাঁক ও সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সাধারণ লোকজনের কাজ হচ্ছে নীরবেনিভৃতে সবকিছু সহ্য করা। এককথায়, সবাই সবার স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি উপেক্ষিত হয়াতে দেশে সর্বস্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরাজ করছে এক চরম নৈরাজ্য যেটার অবসান ব্যতীত শান্তিশৃঙখলা, অগ্রগতি, সুষম বণ্টন, ন্যায্যতা, মঙ্গলসাধন ইত্যাদি সম্ভব নয়। এনৈরাজ্য অবসানের জন্যে প্রয়োজন একটি ন্যায়পরায়ণ ও খোদাভীরু সরকার যেটা ইসলাম ব্যতীত অন্যকোন মতবাদ আজপর্যন্ত দিতে পারে নেই, বর্তমানে পারছে না এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে বলে যার যা খুশি সে তা লিখছে। বাকস্বাধীনতার কারণে যার যা খুশি সে তা বলছে। যতো পার লিখ ও যতো পার বল, তাতে কি। আমরা যা করার তা করেই যাবো এবং তোমাদের লেখা ও বলাতে আমাদের কিছুই যাচ্ছেআসছে না। এটা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতার প্রতি চরম অবমাননা ও অবহেলা এবং স্বাধীনতার ছদ্মাবরণে ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় স্বৈরাচার। প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

স্বৈরাচারীরা যতো মারাত্মক নয় তার চেয়ে বেশি মারাত্মক স্বাধীনতার ছদ্মাবরণে স্বৈরাচারীরা। জনগণ ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে ক্ষমতাসীন করার অর্থ এ নয় যে ক্ষমতাসীনেরা পরবর্তীতে জনসাধারণের মতামতের প্রতি কোন মূল্য দেবে না এবং তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু করে যাবে এবং বলবে যে, তারা যেসময়ের জন্যে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছে তা একান্তভাবে তাদের সময় এবং তাদের সময়ে তাদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কোন লাভ নেই। তবে, এটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, স্বৈরতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। সরকারের বড় ক্ষমতা হচ্ছে আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি। অন্যকোন ক্ষমতা ও শক্তি এগুলোর নিকট পরাভূত। সরকার সৎ, মহৎ, দুর্নীতিমুক্ত, স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে ও উৎসর্গীকৃত থেকে যথাসময়ে যথাযথভাবে আইন, বিধি, নিয়ম ও পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ও করাতে পারলে কোন অপশক্তিই তাদের নিকট টিকতে পারে না ও টিকতে পারার কথা নয়, কেননা জনসাধারণ এখন সবকিছু বুঝে।

আসামী ও অপরাধীর মধ্যে পার্থক্য আছে। কোনকোন ক্ষেত্রে অপরাধী না হয়েও আসামী হয় এবং কোনকোন ক্ষেত্রে অপরাধী হয়েও আসামী হয় না। তাই, সব আসামীই যে অপরাধী তা নয়। প্রকৃত অপরাধী আসামী হয়াটা বাঞ্ছনীয় এবং অপরাধী না হয়ে আসামী হয়াটা অনভিপ্রেত। বিচারে সিদ্ধান্ত হয় কোন্ আসামী অপরাধী এবং কোন্ আসামী অপরাধী নয়। কোনকোন বিচারে ঘটনার ও আইনের মারপ্যাঁচে কোনকোন নির্দোষ আসামীর শাস্তি হয়ে যায় এবং কোনকোন ক্ষেত্রে দোষী আসামী খালাস পেয়ে যায়। তাই, কাকেও আসামী করা ও কাকেও আসামী না করা এবং কোন আসামীকে শাস্তি দেয়া ও কোন আসামীকে শাস্তি না দেয়া অত্যন্ত জটিল কাজ। এ জটিল কাজটি তারাই নিষ্পন্ন করতে পারে যারা জ্ঞানী, খোদাভীরু ও ন্যায়বান। তাই, সর্বস্তরে এধরনের লোক নিয়োজতি রাখাটার অপরিহার্যতাকে খাটো করে দেখার সময় আর নেই। কেউকেউ বলতে শুনা যাচ্ছে যে, লোকজনের স্বভাবচরিত্র ঠিক না হলে আইন দিয়ে কিছু হবে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে, কথাটি ঠিক নয়। লোকজনের স্বভাবচরিত্র ঠিক রাখার জন্যেই আইন। সর্বক্ষেত্রে আইনের যথাযথ ও সময়োচিত প্রয়োগ নেই বলেই লোকজনের খারাপ স্বভাবচরিত্র নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। আইনের যথার্থ ও সময়োচিত প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারলেই লোকজনের খারাপ স্বভাবচরিত্র নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে। এটার যথার্থ ও সময়োচিত প্রয়োগের জন্যে, প্রসেসের ও পদ্ধতির জটিলতাতে না গিয়ে এবং বিভিন্ন কারণে সময় অতিবাহিত না করে, প্রতিটি মামলায় ও অভিযোগে বাদী ও বিবাদীসহ তাদের সাক্ষীদেরকে ধারাবাহিকভাবে শুনে এবং তাদের পেশকৃত কাগজপত্র দেখে রায় ও সিদ্ধান্ত দিতে ও সাথেসাথে কার্যকর করতে হবে। এজন্যে ছোটছোট

www.pathagar.com

এলাকাভিত্তিক বিচারালয় থাকতে হবে এবং এবিচারালয়ের বিচারক আবশ্যিকভাবে ধার্মিক, ন্যায়বান, খোদাভীরু, সৎ, মহৎ ও ত্যাগী হতে হবে এবং কেউই এবিচারালয়ের ঊর্ধ্বে থাকতে পারবে না।

সাহিত্য, গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি পড়া হচ্ছে। চলচ্চিত্র, নাটক ইত্যাদি দেখা হচ্ছে। গান, গজল, নাথ, হামদ ও বক্তৃতাবিবৃতি শুনা হচ্ছে। বিভিন্ন সম্মেলন, ওয়ার্কশপ ও সিম্পোজিয়ামে যোগদান করা হচ্ছে। এগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ভালো করা। এতোকিছুর পরো যারা ভালো হয়ার ওপর অন্যান্যরা ভালো হয়াটা নির্ভর করছে তারা কি ভালো হচ্ছে? এটার উত্তর সবাই জানে। তাই, উত্তরটি পাঠকদের জন্যে রলো। বাস্তবে, এগুলো আনন্দ, উপভোগ ও বিনোদনের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এগুলো যে ভালো হয়ার উপাদান তা মনেই হয় না। আনন্দ, উপভোগ ও বিনোদনের সাথেসাথে এগুলো ভালো হয়ার উপাদান হিসেবে মনে রেখাপাত করলে এগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য 'ভালো হয়াটা' বাস্তব রূপ লাভ করবে। তাই, এমন একটি বাস্তব ও কার্যকর পরিকল্পনার প্রয়োজন যেটাতে এটাকে সম্ভবপর করে তোলা যায়। এটা সম্ভব সব শিক্ষিত লোকের, যে যেকাজে ও অবস্থায়ই থাকছে–না–কেন, সদিচ্ছা ও দেশপ্রেমের ওপর। কথায়কথায় বলা হয় যে, কি পেলাম তা দেখার বিষয় নয়, কি দিতে পারলাম তাই দেখার বিষয়। কি দিতে পারলাম? এপ্রশ্নের উত্তরে মানবিকতা ও ন্যায়ানুগতা এসে যায়। পূর্ণ মানবিকতা ও ন্যায়ানুগতার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরকালে বিশ্বাস। ইসলামই পরকালে বিশ্বাস সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা দিয়ে থাকে। তাই, ইসলামী বিধিবিধানই মানুষকে দেয়ার প্রতি সহজে আকৃষ্ট করতে পারে।

সৎলোক যে একেবারে নেই, তা নয়। অসৎলোকের সংখ্যা এতোবেশি যে খুবকমসংখ্যক সৎলোককে বুঝতে পারাটা একটি কঠিন কাজ বলে আমি মনে করি। অসৎলোক ও কাজ দেখতেদেখতে এবং অসৎকথা শুনতেশুনতে জনসাধারণের মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে, কে যে সৎ তা তারা বুঝে ওঠতে পারছে না। তাছাড়া, অসৎলোকের ভিড়ে সৎলোক হারিয়ে যাচ্ছে। তবে, একথা ঠিক যে তাদের তেমনকোন মূল্য না থাকলেও তারা আছে বলেই সবাই ও সবকিছু টিকে আছে। সুদ এবং অদূরদর্শিতার সাথে নিরূপিত কর, শুল্ক ও ভ্যাট শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে দেশোন্নয়নের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। সুদ বাড়তেবাড়তে ও অদূরদর্শিতার সাথে নিরূপিত কর, শুল্ক ও ভ্যাট দিতেদিতে শিল্প ও কলকারখানা অচল হয়ে পড়ে এবং অচল শিল্প ও কলকারখানার কোটিকোটি টাকা সুদ সরকার ও জনগণকে প্রদান করতে হয় ও একটি গোষ্ঠী তা এমনিএমনি পেয়ে যায়। ঘুষ, দুর্নীতি, আত্মসাৎ, চোরাচালান, কালাকারবার ইত্যাদির ফলে কালো টাকার পাহাড় গড়ে ওঠছে। এটাকা উৎপাদিত

www.pathagar.com

খাতে ব্যয়িত না হয়ে এটার কিয়দাংশ অনুৎপাদিত খাতে ব্যয়িত হচ্ছে। তাই, সার্বিক উন্নতি ও প্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। আমাদের বিভিন্নধরনের অপরাধ ও বেআইনী ক্রিয়াকলাপের ফলে অনগ্রসরতার ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্যে কেউকেউ যুগ, সময় ও প্রকৃতিকে দায়ী করে কথা বলে। বাস্তবে এগুলো ঠিকই আছে। এগুলো দায়ী নয় এবং এগুলোর কোন দোষ নেই। দায়ী হচ্ছি আমরা ও দায়ী হচ্ছে আমাদের স্বভাবচরিত্র। আমরা এমন নির্বোধ যে, আমরা আমাদের দোষ যুগ, সময় ও প্রকৃতির ওপর চেপে দিতে আদৌ চিন্তাভাবনা করি না। যারা সত্যাশ্রয়ী তাদের সত্যকথা অনেকের নিকট বিষতুল্য। তাদেরকে আইনের আওতায় সহজে জব্দ করা যায় না। কখনোকখনো তাদেরকে অবস্থা অনুযায়ী মস্তান ও সন্ত্রাসক দিয়ে জব্দ করা হয়ে থাকে। এতে সত্যাশ্রয়ীরা সত্যের জন্যে কাজ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং দেশ ও জাতি অনগ্রসর থেকে যায়। কিভাবে অসত্য টিকে যায় তা সাধারণত সিনেমায়, নাটকে, থিয়েটারে ও যাত্রায় তুলে ধরা হয়। এতে অসত্যের কলাকৌশলের সম্প্রচার ঘটছে। অথচ, আমাদের অনিবার্য প্রয়োজন হচ্ছে সত্যের কলাকৌশলের সম্প্রচার। তাই, কিভাবে সত্য টিকে যায় এগুলোতে তা তুলে ধরতে হবে।

বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতের কারণে মতপার্থক্য থাকে। তাছাড়া, বিভিন্ন কারণে একজনের সাথে অপরজনের ঝগড়াঝাঁটি ও বিবাদবিসংবাদ হতে পারে। মানবসমাজে এগুলো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, স্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষ এস্বাভাবিকতা বিস্মৃত হয়ে, এগুলোর কারণে, শত্রুতাতে লেগে যায়। তাই, যাকে শত্রু মনে করা হয় তার কোন ভালো কাজেও সমর্থন দেয়া হয় না। এতে ভালো কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং খারাপ কাজের ও শত্রুতার জাল বিস্তৃত হতে থাকে। খারাপ কাজে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি তা পরিহার করে ভালো কাজ করার সুযোগ চেলে মতপার্থক্য ও শত্রুতাপোষণের কারণে তাকে তা না দিয়ে সেটার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার প্রবণতাটা বেশি ক্রিয়ান্বিত। যারা তার এসুযোগ সৃষ্টি করাতে সহযোগিতা করে তারাও যারা তার এসুযোগ সৃষ্টির পক্ষপাতী নয় তাদের শত্রুতে পরিণত হয়। যে খারাপ লোক ভালো হয়ে ভালো কাজ করতে চায় তাকে তা করার সুযোগ সৃষ্টি করে না দিলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে মারাত্মকধরনের খারাপ কাজ করতে থাকে। এসব কারণে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র সার্বিক কল্যাণসাধন করে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের সুদৃঢ় বন্ধনের ও ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির স্বার্থে মানবজাতি নিজেদের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে মতপার্থক্য, কোন্দল, ঝগড়াঝাঁটি ও বিবাদবিসংবাদের ঊর্ধ্বে থেকে পরস্পরকে মহৎ, সৎ ও ভালো কাজে সহযোগিতা এবং সম্মিলিতভাবে অসৎ, অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ প্রতিহত করতে হবে। যারা

www.pathagar.com

ইসলামের কথা বলে এবং মানবকুলকে ইসলামী অনুশাসনের দিকে আহ্বান জানায় তারা সদাসতর্ক থাকতে হয় যাতে তাদের দ্বারা খারাপ কোনকিছু সংঘটিত না হয়, কেননা যারা তাদেরকে সহ্য করতে পারে না তারা তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি জনসমক্ষে তুলে ধরে তারা যে বস্তুত তাদের স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহার করে তা প্রমাণে তৎপর থাকে। যারা ইসলামের কথা বলে না ও ইসলামী অনুশাসনের দিকে আহ্বান জানায় না জনসাধারণ তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ও অপকর্মকে তেমনকোন গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু, যারা ইসলামের কথা বলে ও ইসলামী অনুশাসন কায়েমের জন্যে কাজ করে তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ও অপকর্ম জনসাধারণ এজন্যে সহ্য করতে পারে না যে, তাদের ইসলামী আন্দোলন ও সংগ্রামতো এগুলোর বিরুদ্ধেই। তাই, যারা ইসলামের কথা বলছে ও ইসলামী অনুশাসনের জন্যে কাজ করছে তাদেরকে সব ত্রুটিবিচ্যুতির ও অপকর্মের উর্ধ্বে থেকে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী থাকতে হবে। এবিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তাই, এককথায় বলতে হয়, সব শক্তির উৎস হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্‌ এবং তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অথচ, এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা যে মানুষ সব শক্তির উৎস। প্রত্যেক ক্ষেত্রে অন্তত কিছুকিছু ন্যায়বান ও খোদাভীরু জ্ঞানীগুণী লোকের একান্ত প্রয়োজন। অর্থনৈতিক দৈন্যের ফলে বিভিন্ন চিন্তার উদ্রেক হয়। চিন্তা যথার্থভাবে কর্মসম্পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাদেরকে অর্থনৈতিক দৈন্যের উর্ধ্বে রেখে কর্মসম্পাদনের সুযোগ দিলে তারা দুর্নীতি, অপকর্ম, অন্যায্যতা, অবিচার, অপরাধ ইত্যাদি প্রতিহত করাতে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে। নৈতিকতার জন্যে ইসলামী তালিমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমাদের সমাজে বিভিন্ন শিক্ষার ও কাজের জন্যে ছেলেমেয়েদেরকে শাসন করা, এমনকি মারধর করা, হয়। কিন্তু, ইসলামী শিক্ষার জন্যে এতাগিদ খুবকমই পরিলক্ষিত হয়। ছেলেমেয়েদেরকে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ও খোদাভীরু করে গড়ে তুলতে হলে তাদেরকে সবকিছুর উর্ধ্বে জোরালোভাবে ইসলামী শিক্ষার তাগিদ দিতে হবে।

শ

রাজনীতি কি? প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি হচ্ছে শাসনবিজ্ঞান। শাসন হচ্ছে সুব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালন ও প্রতিপালন। বিজ্ঞান হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান বা ওবিদ্যা যেটার দ্বারা কর্মে পটুতা অর্জিত হয়। সুতরাং, শাসনবিজ্ঞান হচ্ছে বিশেষ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সুব্যবস্থার ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা রাষ্ট্রপরিচালন ও নাগরিকদের প্রতিপালন। এককথায়, রাজনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রপরিচালননীতি। কিন্তু, ক্ষমতা অর্জিত এবং সরকার

www.pathagar.com

গঠিত না হলে রাষ্ট্র পরিচালননীতি বাস্তবায়িত হয় না। তাই, রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতা অর্জন করে সরকার গঠন করা। সরকার হলো একটি সংগঠন যা একদল লোক কর্তৃক দেশের মঙ্গলজনক কাজের জন্যে সংগঠিত হয়। তা হলে দেখা যায় যে, রাজনীতির সাথে বিজ্ঞান, সরকার ও শাসন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিজ্ঞান শুধু বিশেষ জ্ঞান নয়, এটা প্রণালীসম্মতভাবে সাজানো জ্ঞানো। তাই, বাস্তবে ব্যাপকার্থে রাজনীতি হলো প্রণালীসম্মতভাবে সাজানো জ্ঞানের মাধ্যমে সাংগঠনিকভাবে শাসনকার্যপরিচালনা করে দেশের মঙ্গলসাধন।

সাধারণত যারা রাজনীতি করে তাদেরকে রাজনীতজ্ঞ ব্যক্তি বা রাজনীতিবিদ বলা হয়। এদের কাজ হলো রাজনীতি করা। তা হলে মূলতঃ একজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রণালীসম্মতভাবে সাজানো জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়, কেননা এজ্ঞানের অভাবে সাংগঠনিকভাবে শাসনকার্যপরিচালনা করে দেশের মঙ্গলসাধন করা সম্ভব নয়। সাংগঠনিকভাবে শাসনকার্যপরিচালনা করে দেশের মঙ্গলসাধনের জন্যে ন্যায়পরতা, পরিণামদর্শিতা, মিতাচার ও দৃঢ়সংকল্পের একান্ত প্রয়োজন। ন্যায়পরতা হলো ন্যায়বান হয়ার বৈশিষ্ট্য ও যার যা প্রাপ্য তাকে তা প্রদান করার চেতনা এবং এচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ার জন্যে একজন বিচারকের যেসব গুণের দরকার সেগুলোর অধিকারী হয়া। একজন বিচারককে আইন জানতে হয়। তাছাড়া, একজন বিচারকের চারটি জিনিস তার নিজস্ব থাকতে হয় — বিনয়সহকারে শোনা, জ্ঞানীর মতো উত্তর দেয়া, সংযত হয়ে বিবেচনা করা এবং পক্ষপাতিত্ব না করে বিচার করা। আইন হলো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধি। কোন ব্যক্তি এবিধি না জেনে বিচারক হলে সে বিনয়সহকারে শুনে, জ্ঞানীর মতো উত্তর দিয়ে, সংযত হয়ে বিবেচনা করে এবং পক্ষপাতিত্ব না করে বিচারকার্যপরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়, কেননা সে বুঝে না যে, বিচারালয় খোদার দরবার, বিচারের মালিক খোদা, মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বিচারাসনে বসে এবং সেখানে মিথ্যার আদৌ কোন স্থান নেই। সুতরাং, এটা সুস্পষ্ট যে, ন্যায়পরতার জন্যে আইন অপরিহার্য। পরিণামদর্শিতা হলো বাস্তবে জ্ঞান বা বিজ্ঞতা খাটানো। এজ্ঞান বা বিজ্ঞতা হলো অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার আলোকে পরে কি হবে তা পূর্ব হতে অনুধাবন করার জ্ঞান বা বিজ্ঞতা। অতএব, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ সে-ই পরিণামদর্শী এবং পরিণামদর্শিতার জন্যে জ্ঞান ও বিজ্ঞতা হচ্ছে মৌল উপাদান। মিতাচার হলো আত্মসংযম। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে একটা সীমা মেনে চলতে হয়। অধিকারেরো একটা সীমা আছে। সেসীমা না মানলে, যেখানে যতোটুকু সংযমী হয়া দরকার ততোটুকু না হলে এবং নিয়ম ও শৃঙ্খলা লংঘন করলে জীবনে ব্যর্থতা ও দুঃখ আসতে বাধ্য। অতএব, মনের শান্তি বিরাজ করে আত্মসংযমের মধ্যে। জীবনের প্রতিপদেই প্রলুব্ধতা ও প্রলোভন আছে। বাইর থেকেও আছে দুর্দমনীয় প্রলুব্ধতা ও

www.pathagar.com

প্রলোভন। কিন্তু, অনুক্ষণ সংযত হয়ে প্রলুব্ধতা ও প্রলোভনকে জয় করতে হয়। যেব্যক্তি পাশবিক বৃত্তিগুলোকে পরাজিত করে জিতেন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়জয়কারী হয়ে পুরস্কারের প্রত্যাশী সে বাস্তবিকই জ্ঞানী ও বিবেচক। ইন্দ্রিয় হচ্ছে সেসব দেহযন্ত্র ও শক্তি যেগুলো দ্বারা বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিভিন্ন ক্রিয়াসম্পাদনে সামর্থ্য অর্জিত হয়। চৌদ্দটি ইন্দ্রিয় তিন ভাগে বিভক্ত। বাক বা কথা, পাণি বা হাত, পাদ বা পা, পায়ু বা মলদ্বার ও উপস্থ বা লিঙ্গ হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়, চক্ষু বা চোখ, কর্ণ বা কান, নাস্য বা নাক, জিহবা ও ত্বক বা গাত্রচর্ম হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত হচ্ছে অন্তরিন্দ্রিয়। অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে বর্তমানকে সংযত করতে হয়। প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে, অভ্যাস দ্বারাই সংযমকে আয়ত্ত বা অধীন করা যায়। সংযমের অভ্যাস না হলে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা আয়ত্তের বা অধীনতার বাইরে গিয়ে রোগের আকৃতিধারণ করে অপমৃত্যু আনে। আত্মসংযম মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলেই তার মধ্যে মনের শান্তি বিরাজ করে। সুতরাং, মিতাচার আত্মসংযমের মাধ্যমে মনের শান্তি আনয়ন করে এবং আত্মসংযম ও মনের শান্তির জন্যে মিতাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। আল-হাদীসে বর্ণিত আছে, "যেব্যক্তি সংযমী ও মিতাচারী সে যে-ই হোক-না-কেন এবং যেস্থানেই থাকুক-না-কেন আমার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী।" দৃঢ়সংকল্প হলো সহিষ্ণুতাতে বা সহনশক্তিতে সাহস। সহিষ্ণুতা ও সহনশক্তির দ্বারা কষ্ট, ব্যথা ও যাতনা লাঘব হয়। সাহসের মধ্যেই বিরাজ করে বিশ্বাস। তাই, যে সাহসের দ্বারা পূর্ণ সে বিশ্বাসের দ্বারাও পূর্ণ এবং সহিষ্ণুতা ও সহনশক্তির মাধ্যমে কষ্ট, ব্যথা ও যাতনা সহ্য করার গুণ অর্জনই দৃঢ়সংকল্পের ভিত্তি বলে প্রকৃতিও সাহসীকে ভালোবাসে।

রাজনীতিতে আদর্শের স্থান সবকিছুর উর্ধ্বে। তাই, আদর্শের ধারাবাহিকতাই রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেদেশ এবৈশিষ্ট্যের অধিকারী সেদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে অনুন্নত হয়। সুতরাং, আদর্শের ধারাবাহিকতা রক্ষাই উন্নতির চাবিকাঠি। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ বিবর্তিত হতে পারে ; কিন্তু পরিবর্তিত ও বিবর্জিত হতে পারে না। আদর্শের এবিবর্তন হতে হয় নিয়মতান্ত্রিক, অনিয়মতান্ত্রিক নয়। নিয়মতান্ত্রিক বিবর্তন যুগোপযোগী, অনিয়মতান্ত্রিক বিবর্তন খামখেয়ালী। নিয়মতান্ত্রিক বিবর্তন রক্তপাতশূন্য, অনিয়মতান্ত্রিক বিবর্তন রক্তপাতের সূত্র। নিয়মতান্ত্রিক বিবর্তন স্বাভাবিক ও সাবলীল, অনিয়মতান্ত্রিক বিবর্তন অস্বাভাবিক ও অসাবলীল। অতএব, রাজনীতিতে নিয়মতান্ত্রিক আদর্শ একটি ক্রমবর্ধমান জীবন্তশক্তি। এশক্তি জাতীয় স্বার্থের ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অনুকূলে। তাই, একটু প্রণিধানপূর্বক বিচার করলেই আদর্শের ধারাবাহিকতার সারবত্তা বা উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আদর্শের গতিপ্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে ; কিন্তু তাদের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য হতে হয় এক। সংকীর্নার্থে আদর্শ হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনে উত্তম পন্থা ও নীতি। ব্যাপকার্থে আদর্শ

www.pathagar.com

হচ্ছে সার্বজনীন পন্থা ও নীতি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সার্বজনীনতা এক নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হচ্ছে নিজের ব্যক্তিগত মতামতের অনুবর্তিতা, সার্বজনীনতা হচ্ছে সর্বজনের পক্ষে হিতকর ও সর্ববিদিত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সার্বজনীনতার অনুবর্তী হলে আদর্শের ধারাবাহিকতা প্রাণবন্ত ও ক্রিয়াশীল থাকে। এতে রাজনীতিতে কোনপ্রকার ক্ষোভ, ক্ষিপ্ততা ও সংঘাত থাকে না, সত্য উপেক্ষিত হয় না, নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়, স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সুশাসন কায়েম হয়, স্বেচ্ছাচারিতা অবলুপ্ত হয়, জাতীয় ঐক্য সুসংহত হয়, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইনের অনুশাসন মেনে চলে। এটাই হচ্ছে আইনের সুষ্ঠু পরিবেশ। এপরিবেশেই সমাজের, জাতির ও পরিস্থিতির সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আদর্শ বিকশিত ও পরিস্ফুটিত হয়। এতে জনগণ সজাগ ও সচেতন হয়ার প্রয়াস চলাতে পারে। জনগণের সজাগতা ও সচেতনতাই রাজনীতির পরিবেশকে কলুষমুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। ফলে, সুযোগ্য ব্যক্তিরা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতে সক্ষম হয় এবং তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সার্বজনীনতার অনুবর্তী হয় বলে আদর্শের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকে ও দেশের অগ্রগতিতে কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকে না বলে জনসাধারণের কল্যাণ সুনিশ্চিত হয়। সার্বজনীন আদর্শের মৃত্যু নেই, কেননা এআদর্শের মধ্যে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার সমন্বয় থাকে। এতে রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দল শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে এবং শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কাজের সামঞ্জস্যবিধান করতে পারে। এর মৌল কারণ হলো সুশিক্ষিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বের উদ্ভব। সুশিক্ষিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সার্বজনীন আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করে দলীয় কর্মসূচি ও রীতির যথাযথ প্রয়োগসাধন করতে পারে। এরা আরো পারে বিরোধী দলের সাথে সহযোগিতা ও সোহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব বজিয়ে রাখতে। এদের থাকে কর্মকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। শাসনব্যবস্থায় নিযুক্ত কর্মচারীরা স্থায়ী। কাজেই, তাদেরকে স্থায়ী শাসনকর্তৃপক্ষ বললে অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন হয় না। ক্ষমতাসীন দলের প্রতিনিধিরা নির্দিষ্টকালের জন্যে নির্বাচিত হয়ে থাকে। তাই, প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপের জন্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্যক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকতে হয়। স্থায়ী কর্মচারীরাই শাসনকার্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। যেদলই ক্ষমতাসীন হয় স্থায়ী কর্মচারীদেরকে অকুণ্ঠচিত্তে সেসরকারের নীতি কার্যকর করতে হয়। এনীতি আদর্শের ধারাবাহিকতা রক্ষা করলে সুশিক্ষিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিনিধিরা মৌল জ্ঞানের ও রাজনীতির মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশাসনিক কার্যে সুষ্ঠু হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে পারে।

রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হলো জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধন করা। যেদেশের জনসাধারণের মধ্যে এজাতীয়তাবোধের অভাব থাকে সেদেশে প্রকৃত রাজনৈতিক দল

www.pathagar.com

গঠিত হতে পারে না। অজ্ঞ ও দরিদ্র লোকের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরিত করে দেশকে অগ্রতির পথে এগিয়ে নেয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় ত্যাগতিতিক্ষা স্বীকার করাই প্রকৃত রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য। পুরো জাতির আশাআকাঙক্ষা দলের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে। এটা জাতির মুখপাত্র হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠালাভ করে। জনগণের কল্যাণের ও অগ্রগতির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে সবার জন্যে সুষম সুযোগ ও সুষম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে রাজনৈতিক দলকে নিরলসভাবে কাজ করতে হয়। এটা তৎপর হতে হয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সর্ববিধ উপায়ে উন্নত করতে। তবে, দলীয় নীতি ও কর্মসূচির সাফল্য বহুলাংশে দলের যেসব নেতা শাসনকার্যপরিচালনা করে এবং যেসব নেতা সরকারী কাজে লিপ্ত না থেকে বাইরে দল সংগঠন ও নীতিনির্ধারণে লিপ্ত থাকে তাদের ওপর।

একজন প্রকৃত রাজনীতিবিদ সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় জনগণের সাথে মিশে তাদের স্বার্থে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে দেশ ও বিশ্বের কল্যাণসাধন করে। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেকোন ব্যাপারে জনগণের নিকট কৈফিয়ত দিয়ে থাকে। তার মধ্যে থাকতে হয় ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা। সচেতনতা হতে হয় তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সচেতনতাতে সৃজনশীলতার জন্ম। একজন সৃজনশীল রাজনীতিবিদই জাতির জন্যে আশীর্বাদ, কেননা তার দৃষ্টি হয় সামগ্রিক। তার উপলব্ধি হতে হয় সার্বজনীন এবং তার মহৎপ্রতিভার মধ্যে থাকতে হয় সাহসিকতা। তাকে হতে হয় প্রত্যয়ী ও বক্তব্যপ্রধান। সে শুধু মানুষের জন্যে নয়, সমাজের জন্যে, জাতির জন্যে ও দেশের জন্যে। যুগের মানবিক দাবিতে তাকে সোচ্চার হতে হয়। মানবতার ব্যাপারে সে কখনো আপসের মনোভাব দেখায় না। সে মানবতা উপলব্ধি করে তার সর্বসত্তা দিয়ে। তাই, সে পারে অন্যায়অবিচার, জোরজুলুম ও পরাধীনতার মূলে আঘাত হানতে। তার আহ্বান শুধু নিজের প্রতি নয়, দেশের প্রতি, জাতির প্রতি ও নির্যাতিত মানবতার প্রতি। তাই, সে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান এবং ঘটাতে পারে মানুষের মানসিক ও নৈতিক বিকাশ। সে মানুষের মনুষ্যত্বের দাবিতে আপসহীন। সে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় এবং জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। মূল্যবোধের দ্বারাই একটি জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব ও মহৎকর্মের যোগ্যতা। সে হয় স্বাধীনচেতা ও দায়িত্বশীল এবং এমূল্যবোধের পথিকৃৎ বা পথপ্রদর্শক। সে একারণে সমাজকে সচল, সজীব ও সচেতন রাখতে সহায়ক হয়। তার জাগ্রত চিন্তা সমাজের জন্যে অত্যাবশ্যক। সে চিন্তা করে কর্ম করে এবং কল্পনা করে বাস্তবায়ন করে। তার ভূমিকাতে থাকতে হয় মুক্তবুদ্ধি ও

www.pathagar.com

স্বাধীনচিন্তার অনুশীলন এবং মহৎজীবনের প্রতি তার থাকে প্রবল আকর্ষণ। সে হয় প্রগতিবাদী ও সর্বসংস্কারমুক্ত এবং মুক্তবুদ্ধির দিশারী বা দিগদর্শক। জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ এবং বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট রাজনীতি সেখানে অর্থহীন। তাই, তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয় ও বুদ্ধি আড়ষ্ট ও বোধশক্তিহীন নয় এবং তার গোটা জীবন হয় মার্জিত, পরিশীলিত এবং পরিমিতিবোধে সংযত ও সংহত। তার চিন্তা হয় বুদ্ধিদীপ্ত এবং সে হয় ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু ও স্নেহপ্রবণ। তার বোকামি হয় চাতুর্যের বোকামি। তার বুদ্ধিতে চালাকি থাকে বলে সে বোকা হয় না। সৎবুদ্ধি এবং চালাকি এক নয়। তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই খোলা এবং এ পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়েই সে সমাজ ও সমাজের মানুষকে দেখে। সে হাস্যকর ও হাসির পাত্র হয় না। সে হয় জনচিত্তজয়ী এবং থাকে ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। সে সময়কে দেয় মর্যাদা এবং আইনকে হতে দেয় না নির্যাতনের হাতিয়ার। নির্যাতন শাসনো নয়, বিচারো নয়, বরং শাসন ও বিচারকে আবিল ও কলুষিত করে। সে নিরপেক্ষ বিচার ও শাসকের সুশাসন পুরোপুরিভাবে সমুন্নত রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে এবং এজন্যে সে লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে আইনকে সহজলভ্য করে। তার রাজনীতি নিষ্ঠার রাজনীতি এবং সে অতিমাত্রায় আবেগপূর্ণ ও বিহ্বল হয় না। তাকে হতে হয় বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল। সে আবেগের বা ভাবজনিত বিহ্বলতার শিকার না হয়ে যুক্তিবাদী হয়। সে হয় মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধের প্রতীক। তার মধ্যে থাকে ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সততা। সে প্রয়োজনে বজ্রের চেয়ে কঠোর হয় এবং ফলের চেয়ে নম্র হয়। তার বীরত্ব দেহে থাকে না, থাকে মন ও চরিত্রে। তার চিন্তায় থাকে স্বচ্ছতা বা নির্মলতা। তাকে হতে হয় বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ।

রাজনীতির সাফল্য নির্ভর করে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। দর্শন একজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুসন্ধিৎসার প্রতিভূ বানায়। দর্শন হচ্ছে যুক্তির ও প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। সমাজ, জাতি ও দেশ যেকোন রাজনৈতিক দলের উর্ধ্বে। কাজেই, শুধু নির্বাচনে বিজয়ই কোন রাজনৈতিক দলের দর্শন হতে পারে না। এবিজয় দেশের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণের একটি পথ। রাজনীতির দর্শন সংকীর্ণতা নয়, উদারতা ; শুধু দল নয়, সার্বজনীনতা ; স্বার্থপরতা নয়, নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা এবং অহংকার নয়, বিনয়। এদর্শনই রাজনীতির প্রকৃত আদর্শ ও ভূমিকা। রাজনীতির দর্শন এও নয় যে, ক্ষমতাসীন হয়ে রাষ্ট্রপরিচালনের নীতি ওলটপালট করে বিল্পব ঘটাবে। সেনীতির উদ্দেশ্য মহৎই হয়। কাজেই, রাজনীতির বিপ্লবাত্মক দর্শন হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপ্লব। অন্যযেকোন বিপ্লব হয় স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার। এ বিপ্লবাত্মক দর্শনের মূল্য হচ্ছে বৃহত্তম সংখ্যার বৃহত্তম কল্যাণ। এজন্যে করতে হয় সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার এবং দেশের সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্রহণ করতে হয় বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা। এতে বেকারত্ব হ্রাস পায়, মানুষের মধ্যে বৈষম্য কমে আসে এবং

www.pathagar.com

কল্যাণের ভিত্তি মজবুত হয়। গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা রাজনীতির দর্শনকে পরাভূত বা পরাজিত করে। তাই, যা নীতিবিরুদ্ধ নয় তা করা বাঞ্ছনীয়। দর্শনের অভাবে দলে ফাটল ধরে এবং দেখা দেয় অনৈক্য। প্রকৃত দর্শন অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভ্রান্ত নীতি পরিহার করে এবং জনগণের অর্থনৈতিক জীবনমান উন্নয়নের বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাকে বাস্তায়নের উদ্যোগগ্রহণ করতে উদ্দীপ্ত ও প্ররোচিত করে এবং সামগ্রিকভাবে জীবনের বিকাশ ও সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ ও ক্ষেত্র তৈরি করে। এটা দলীয় স্বার্থে বৃহত্তম জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতে নিরুৎসাহিত করে এবং মহৎ ও চিরন্তন বা চিরকালীন মানবসত্যকে উদ্ভাসিত ও প্রস্ফুটিত করতে উৎসাহিত করে। এটা মানুষের সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন শক্তির বিস্ময়কর জাগরণে সহায়ক। এটা ভুয়ো প্রতিশ্রুতিকে বাদ দিয়ে সুষ্ঠু ও জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল সমাজব্যবস্থা কায়েমের প্রতি নির্দেশপ্রদান করে। এটা জীবনের সঙ্গে জীবনের এবং জীবনের সঙ্গে বহির্জগতের ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চায় সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণে, ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণে নয়। এতে বিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা ও বিরোধ ধ্বংস হয়। এটা বর্ণবিদ্বেষের মূলে কুঠারাঘাত করতে স্পৃহা যোগায় এবং অদূরদর্শী না হয়ার জন্যে একজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে হুঁশিয়ার করে দেয় ও তার চিন্তাধারায় সৃষ্টি করে মানবিকতা এবং তাকে সহায়তা করে তার যোগ্যতা ও গুণপনা বিকাশে। এটা এগিয়ে নেয় আত্মোপলব্ধির পথে এবং ঘটায় আত্মোন্নতি। এটা জনগণের সামনে আলোকবর্তিকা তুলে ধরার পাথেয়।

দর্শন জটিল। কিন্তু, একজন দার্শনিক–রাজনীতিবিদ এজটিলতার অবসান ঘটিয়ে রাজনৈতিক দর্শনকে করে তুলতে পারে অত্যন্ত সরল ও সহজবোধ্য। অজ্ঞতাই জন্ম দেয় ঘৃণা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ববিরোধের। রাজনৈতিক দর্শনের ছোঁয়া এঅজ্ঞতা দূরীভূত করে এবং মানুষকে অধ্যয়ন করে মনুষ্যত্বকে জানতে দেয়। এটা সত্য রক্ষাতে, সত্য ভঙ্গতে নয়, জোর তাগিদ দেয়। নিজের কথা না ভেবে পরের কথা ভাবাই রাজনীতির আরেক দর্শন। এদর্শনই একজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে করতে পারে তীক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ও দুর্বার বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন। এদর্শনই রাজনীতিকে গঠনমূলক করে। কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতার মাধ্যমে রাজনীতি করে সঠিক পথ খুঁজে পায়া যায় না। এধরনের রাজনীতিতে নিজস্বতা লোপ পায় বলে জটিলতা সৃষ্ট হয়, কেননা এতে বানরের ন্যায় নকল করতে হয় এবং কাকাতুয়ার ন্যায় কথা বলতে হয়। কাজেই, যারা এধরনের রাজনীতি করে তারা ঈর্ষাপরায়ণ ও ফাঁকা কথাওয়ালা। এরা জানে না যে, ঈর্ষা হলো মূর্খতার সমান আর অনুকরণ হলো আত্মহত্যার সমান। এরা অর্ধজাগ্রত অবস্থায় থাকে। এরা দেশ ও জনগণের স্বার্থের পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখে, কারণ এদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য হচ্ছে নিজেদের স্বার্থ। কাজেই, এরা সুচিন্তিত পরিকল্পনার ও সক্রিয় উদ্যোগের

www.pathagar.com

মাধ্যমে এগিয়ে আসতে পারে না এবং এদের প্রতিটি ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়াতে জন্ম নেয় একেকটি আক্রমণাত্মক শক্তি। ফলে, এরা হারিয়ে ফেলে বিচারবিবেচনাবোধ, বিশ্লেষণী শক্তি ও প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস এবং এদের মধ্যে জাগ্রত হয় হতাশা ও নৈরাশ্য। এদের থাকে বাগাড়ম্বর আর এদের মধ্যে বিরাজ করে আত্মম্ভরিতা, জোরজবরদস্তি নিজেদের মত চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা ও পাগলাটে কার্যকলাপ। এদের ভেতরের দিকটা নেহাত ফাঁকা, নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীন এবং অধম। এরা ব্যক্তিত্বহীন ও অযোগ্য। এরা হামেশাই নিজেদের ঠুনকো বা অসার ও ক্ষণস্থায়ী প্রতিপত্তির দ্বারা জনগণকে দেবে রেখে তাদের থেকে কাজ আদায় করে নিতে চায় এবং দেশের নাজুক সময় এরা সীমা ছাড়িয়ে যায়।

একজন সম্পূর্ণ মানুষই সফলতার সাথে রাজনীতি করতে পারে। সে জানে পরাজয় ও মৃত্যুর কোন নির্ধারিত সময় নেই। তাই, সে পূর্বাপর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নিজের বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে গঠনমূলক ও কার্যকর পদক্ষেপ এবং প্রবল প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং তার মধ্যে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা বর্তমান থাকে। তার প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। সে জানে পরোক্ষ প্রক্রিয়া অনেক সময় জটিলতা ও বিরোধিতার শক্তি হ্রাস করে। তাই, সে অপরের আশ্রয়ের মাধ্যমে সমস্যাদির কঠিন প্রাচীরগুলো অপসারিত করে। যেসব অসম্পূর্ণ মানুষ রাজনীতি করে তারা জটিলতার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্নধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কাজেই, রাজনীতিতে তাদের সফলতার আশাটা বাতুলতামাত্র। তাদের কর্মস্পৃহা ও উদ্যম সব প্রতিবন্ধকতাকে জাতীয় অগ্রগতি প্রতিহত না করে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে না। ফলে, তারা প্রয়োজনীয় ভারসাম্য বজিয়ে রাখতে পারে না বলে তাদের মধ্যে পলায়মান মনোভাব বিরাজ করে। অথচ, পলায়মান মনোভাব একটা মারাত্মক ধরনের পশ্চাদপসরণ। তারা আকাশকুসুম কল্পনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে, মিথ্যা বাহানা করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং খুঁড়িয়েখুঁড়িয়ে চলতে থাকে। বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষ তাদের একৃত্রিমতাকে একনজরেই বুঝে নেয়। তবে, অনেক বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্যে একৃত্রিমতাকে ঢাকা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতা অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের সুগম পথের পাথেয়। কাজেই, তারা কপটতা ও কৃত্রিমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে একজন অসম্পূর্ণ মানুষের রাজনীতিকে পদদলিত করলে দেশের ও দেশবাসীর জন্যে সবদিক দিয়ে মঙ্গলের জয়ধ্বনি সূচিত হবে। এতে একজন সম্পূর্ণ মানুষের রাজনীতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত বা উন্মোচিত হবে। এজন্যে চাই আত্মবিশ্বাস। কিন্তু, খারাপ কাজে নিয়োজিত থেকে ভালো ফললাভের দৃঢ়তা আত্মবিশ্বাস নয়। কোন সম্পূর্ণ মানুষই সব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা একসাথে করে না। একজন অসম্পূর্ণ মানুষ এটা করে থাকে বলে সে

www.pathagar.com

কোন সমস্যারই সঠিক সমাধান দিতে পারে না। এটা জাতীয় অপচয়। কাজেই, একজন সম্পূর্ণ মানুষের রাজনীতিতে সব সমস্যা গুরুত্ব অনুসারে পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হয়। তাই, একজন সম্পূর্ণ মানুষ না হয়ে রাজনীতি করে নিজের ও দেশের ক্ষতি করাটা বোকামি। একজন সম্পূর্ণ মানুষ ভবিষ্যৎকে বাদ দেয় না। সে বুঝে যে, ভবিষ্যৎ আছে বলেই সবকিছু আছে এবং বর্তমানের কাজ সুষ্ঠুভাবে করাই ভবিষ্যতের সম্পদ। কাজেই, সে প্রকৃত ব্যাপার কি তা বুঝে নেয় এবং প্রকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করার পর তা বিশ্লেষণ করে এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছে সে অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হয়। এগুলোর উৎস হলো চিন্তা। কিন্তু, এলোমেলা চিন্তার ফলে উৎপত্তি হয় দুশ্চিন্তার। একজন অসম্পূর্ণ মানুষই দুশ্চিন্তায় পতিত হয়। এতে সে বাস্তবতার সাথে তাল রেখে চলতে পারে না। ফলে, তার মধ্যে ভয়ভীতির সঞ্চার হয়। এটার থেকে জন্ম নেয় উদ্বেগ। কিন্তু, উদ্বেগের রাজনীতি কখনো জাতীয় মঙ্গলসাধন করতে পারে না আর যেরাজনীতিতে জাতীয় মঙ্গল নেই সেরাজনীতি নিষ্প্রয়োজন। একজন সম্পূর্ণ মানুষের রাজনীতিতে এমনিতেই যুক্তিসংগত উপায়ে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, কেননা সে বুঝতে পারে যে, সমস্যা কি, কোথায় ও কেন সেটার উদ্ভব হলো এবং কিভাবে সেটা সমাধান করতে হবে ও সমাধানের উপায় কি। এতে অন্যান্যের সাথে তেমন আলোচনার দরকার হয় না এবং অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর কথার উদ্ভব হয় না। তাই, একজন সম্পূর্ণ মানুষই জ্ঞানী। সে জানে দুশ্চিন্তা মানুষের মনোযোগের ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে দেয়। সে নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয় সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কি ঘটতে পারে। তাই, সে সেটাকে সহজভাবে গ্রহণীয় করে তোলে এবং শান্তভাবে চিন্তা করে সমাধান বের করে নেয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রতিদিনই নবজন্ম লাভ করে। কাজেই, একজন সম্পূর্ণ মানুষ হয়ার জন্যে প্রয়োজন জ্ঞানের। কথায় বলে যে, জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই নিজনিজ দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সব বিষয় দেখতে পারে এবং নিজনিজ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে চলতে পারে। তাদের সারাজীবনের অস্তিত্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিপূর্ণ। তাদের অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত থাকে চিন্তাশক্তি। তাই, তাদের ভাবধারা সংযত ও সংহত এবং তারাই পারে ভারসাম্য রক্ষা করার শক্তি অর্জন করতে।

রাজনীতিতে প্রয়োজন একটি বিশিষ্ট জীবনযাত্রা। এতে সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করতে হয়। এজন্যে দরকার অধ্যবসায় ও অভ্যাস। এতে বলিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ ইচ্ছার সাথে কাজ আরম্ভ করতে হয়, কেননা ইচ্ছা ক্ষীণ ও শিথিল হলে সফলতাও অনুরূপ বর্ণ ও আকৃতি ধারণ করে। এতে জাতীয় স্বার্থে জয়ের জন্যে অগ্রসর হতে হয়। তবে, উদ্যোগই জয়ের পথে চালিত করে কৃতকার্যতা দান করে। এউদ্যোগের জন্যে প্রয়োজন পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন। অজ্ঞতা ও অনিশ্চয়তা থেকে ভয়ের উৎপত্তি। পরিপূর্ণ জ্ঞানের মাধ্যমে ও অভিজ্ঞতার আলোকে পুরো ইচ্ছাশক্তিকে ধাবিত করলে ভয়ের পরিবর্তে নির্ভীকতা ও

www.pathagar.com

সাহসিকতা জন্ম নেয় এবং দুর্বলচিত্ততা তিরোহিত হয়। সবল ও অদম্য ইচ্ছাই সফলতার চাবিকাঠি। ইচ্ছাই মনকে ফলপ্রসূ শক্তির বলে বলিয়ান করে। তাই, ইচ্ছা যতোগভীর সফলতা ততোদ্রুত। মন ফলপ্রসূ শক্তির বলে বলিয়ান হলে ইচ্ছা গভীর হয়। এটার জন্যে দরকার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বাস জন্মিয়ে বুঝিয়ে বলার শক্তি। বিশ্বাস জন্মিয়ে বলার শক্তি অর্জনের জন্যে দরকার সব বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করা ও সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা এবং মৌলিক সত্যগুলো উদাহরণ দিয়ে বলা। সব চিন্তাকে মনে স্থান দিতে নেই। একশ চিন্তার মধ্যে নিরানব্বুইটি পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। এটার জন্যে প্রয়োজন মানসিক শক্তি। মানসিক শক্তিতে বলিয়ান হতে পারলে অদম্য ও অপরাজেয় হয়া যায়।

অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় রাজনীতিও একটি বিজ্ঞান। এবিজ্ঞানে সফলতার জন্যে দরকার পদ্ধতিগত সুচিন্তা, কেননা কোন মানুষের জ্ঞান যথোপযুক্তভাবে সঞ্চিত না থাকলে সে অধিকতর জ্ঞানী হলেও তার চিন্তাধারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়াটা অবধারিত। সদালাপের চেতনা ও স্বাভাবিকতা চিন্তায় দ্বিধা কেটে তোলে। তবে, সদালাপ ও স্বাভাবিকতার জন্যে দরকার অধ্যয়ন, গবেষণা, পরীক্ষানিরীক্ষা ও গভীর চিন্তাভাবনা। এগুলোকে মন, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত বলা চলে। সুতরাং, একজন রাজনীতিবিদ যা দেখে, ভাবে, বুঝে ও অনুভব করে একজন সাধারণ লোকো তা দেখবে, ভাববে, বুঝবে ও অনুভব করবে। এতে সে চিরজাগরূক ও চিরঞ্জীবী থাকতে পারে এবং তাদেরকে তার প্রতি মনেপ্রাণে তীব্রভাবে আকৃষ্ট করতে পারে এবং তাদের মধ্যে নতুনতর প্রাণপ্রবাহ ও উদ্দীপনা আনতে পারে। তার মধ্যে কোন ছলনা থাকে না। সে যা বলে নিশ্চয়তার সাথে বলে এবং যা করে নিশ্চয়তার সাথে করে। চলমান অবস্থার সাথে তার সান্দ্র বা নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এতে সে সাপো মারে লাঠিও ঠিক রাখে।

রাজনীতিকে মানবিক সম্পর্ক থেকে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। রাজনীতির শতকরা পঁচাশি ভাগ নির্ভর করে মানবিক সম্পর্কের ওপর, অর্থাৎ অপরকে দিয়ে কাজ করানোর দক্ষতার ওপর। মানুষের মনে কাজ করার উৎসাহ জাগানোই সবচেয়ে বড় সম্পদ। মানুষ চায় সুখশান্তি। তাদের সুখশান্তির পথ সুগম ও সহজলভ্য করতে পারলেই যেকোন কাজেই তাদের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলা যায় এবং তারা কাজটি করতে চায়। যেকোন মানুষের চরিত্রের সবচেয়ে গভীরে থাকে প্রশংসা পায়ার অভিপ্রায় ও আকুতি এবং যেকোন লোকের মধ্যে থাকে কোন-না-কোন গুণ। তার এগুণের প্রশংসা দ্বারাই তাকে যেকোন কাজে উৎসাহিত করা যায় এবং গুণের প্রশংসা দ্বারাই নিজের চেয়েও বুদ্ধিমান লোককে নিজের কাছে আনা যায়। যেকোন

www.pathagar.com

কাজের পেছনে থাকে উন্নতির ইচ্ছা। তাই, তাকে এমন কাজে অনুপ্রেরণা দিতে হবে যাতে সে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। তা না হলে সে কাজ করতে চাবে না। ক্ষমতাপ্রয়োগ করে একজন লোককে একটি কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু, কাজটিতে তার উন্নতির কোন সম্ভাবনা না থাকলে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে তার থেকে পেছন ফেরলেই সে তাতে ঢিলে দেয়।

যারা রাজনীতি করে ক্ষমতাসীন হয় অনেকে তাদেরকে তোষামোদ করে। তোষামোদের প্রলেপ সিমেণ্টের প্রলেপের মতো হলেও এটা মোটেই খাঁটি নয়, জাল। জাল টাকার মতোই এটার দুরবস্থা হয়, চালাতে গেলে বিপদ ঘটে। আন্তরিকতা ও ভান বা কৃত্রিম আচরণ কখনো এক নয়। আন্তরিকতা হচ্ছে অন্তরের ব্যাপার এবং ভান হচ্ছে নেহাত বা নিদেনপক্ষে মুখের কথা। আন্তরিকতা হচ্ছে নিঃস্বার্থ আর ভানে বিরাজ করে স্বার্থ। আন্তরিকতা সবাই পছন্দ করে আর ভানকে সবাই ঘৃণা করে। তাই, তোষামোদ শত্রুর আক্রমণের চেয়েও মারাত্মক এবং শত্রুর আক্রমণের চেয়ে তোষামোদকে বেশি ভয় করা দরকার। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অন্যের ন্যায়অন্যায় সব ব্যাপারে জেনেশুনেও অনুক্ষণ প্রশংসার সাথে তাকে সমর্থন দেয়াই হচ্ছে তোষামোদ। তাই, তোষামোদ হচ্ছে ফাঁকা। তোষামোদকারীরা সর্বদা নিজেদের কথাই ভাবে। তারা অন্যান্যকে নিজেদের মতো করে ভাবে না এবং নিজেদের মতো করে বুঝতে পারে না। তারা জনগণের সমস্যা সম্পর্কে সবকিছু এড়িয়ে চলে এবং তাদের কোন সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায় উদ্ভাবনের কথা ভাবতেও পারে না। তাই, জনগণের মধ্যে বিরাজ করে হতাশা। তোষামোদকারীদেরকে চিনতে হলে নিজের বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে হয়। জাগ্রতবুদ্ধি তোষামোদকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সহায়তা করে। এতে তোষামোদকারীরা দূরে সরতে বাধ্য হয় এবং জনসাধারণের সমস্যাদির সঠিক সমাধান পর্যায়ক্রমে সম্ভবপর হয় বলে তাদের মনে আগ্রহ জন্মে। এতে জনগণের মঙ্গলসাধিত হয় এবং রাজনীতি হয় সফলকাম বা সাফল্যমণ্ডিত।

সাধারণত মানুষ অন্যান্যের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত না হয়ে নিজেদের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত থাকে। তাদের প্রতি আগ্রহান্বিত না হলে তারাও কারো প্রতি আগ্রহান্বিত হয় না। যেলোক রাজনীতি করে জনগণের প্রতি আগ্রহশীল হয় না তার জীবনেই সবচেয়ে বেশি দুঃখ আসে এবং সে-ই জনগণকে সবচেয়ে বেশি ব্যথা দেয়। যেকোন লেখকের লেখার কিছু অংশ পড়লে বুঝা যায় যে, সে মানুষকে ভালোবাসে কিন। লেখকের লেখাতে মানুষকে ভালোবাসার কোন সংকেত না থাকলে মানুষ তার লেখা ভালোবাসে না। অনুরূপভাবে, যেরাজনীতিবিদের রাজনীতিতে মানুষকে ভালোবাসার পরিবর্তে

www.pathagar.com

ধোঁকা দেয়ার বা বোকা বানানোর প্রবণতা থাকে সে রাজনীতিবিদ কখনো রাজনীতিতে সফলকাম বা কৃতকার্য হতে পারে না। যেলোক শুধু নিজের সম্পর্কে কথা বলে সে কেবল নিজের সম্পর্কেই ভাবে। যেলোক কেবল নিজের সম্পর্কে ভাবে সে অতিরিক্ত অশিক্ষিত। শ্রেষ্ঠ হয়ার ইচ্ছা মানুষের অন্তস্থলে বা হৃদয়ে লালিত গভীরতম ইচ্ছা। কাজেই, রাজনীতিতে অতিরিক্ত অশিক্ষিত না হয়ে সর্বসময়ই অন্যলোককে তার শ্রেষ্ঠ হয়ার ইচ্ছা সম্পর্কে ভাবতে দেয়া যুক্তিযুক্ত এবং অন্যলোক যেবিষয়ে বলতে চায় তাকে তা বলতে দেয়াটা ফলদায়ক। একজন রাজনীতিবিদ রাজনীতি করে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চায়। কিন্তু, জনগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত না করে নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তা বেশিদিন টেকে না। কাজেই, রাজনীতির মাধ্যমে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে জনগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাটা হচ্ছে রাজনীতির পূর্বশর্তগুলোর অন্যতম পূর্বশর্ত। তাই, একজন রাজনীতিবিদ নিজের জন্যে যা চায় সে অন্যকেও তা দেয়া প্রয়োজন।

যারা কম গুণ নিয়ে রাজনীতি করে তারা তাদের সেশূন্যতাকে পূর্ণ করার মানসে চেঁচায় ও জনগণকে বিভিন্নভাবে ঠকানোর বিভিন্ন পন্থা বের করে। তারা নিরন্তর বাঁকাতর্ক করে। তারা ঘৃণার সাহায্যে ঘৃণা মুছতে চেষ্টা করে। তারা না পারে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে আর না পারে নিজেদের মেজাজ ঠিক রাখতে। তাদের মধ্যে কৌশল ও কূটবুদ্ধির অভাব থাকে। তারা প্রায়শ ভুল করে। কিন্তু, অন্যের ভুল দেখলে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয়। এটা দ্বন্দ্বযুদ্ধের মতোই হয়। ফলে, শুরু হয় ধ্বংসাত্মক বিরোধিতা। এটা পুরো জাতিকে টেনে নেয় অবনতির দিকে। তাই, এধরনের রাজনীতিবিদেরা জনগণের মিত্র না হয়ে ঘৃণার পাত্রই হয়। ভুলবুঝাবুঝি কখনো তর্ক দিয়ে মেটানো যায় না। তর্কে কোন মানুষেরই মন পরিবর্তন করা যায় না। মানুষের মন পরিবর্তন করার একমাত্র উপায় হলো কূটকৌশলী হয়া। এতে মেজাজ ঠিক রাখা যায়, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং নিজের ভুলকে বাকবিতণ্ডার মাধ্যমে ঢাকা না দিয়ে অপকটে স্বীকার করে নেয়া যায়। এতে সারল্য ও উদারতা প্রকাশ পায়, মহত্ত্ব বেশি প্রমাণিত হয়, মাথা নিচু না হয়ে উঁচু হয় এবং জনগণ আগ্রহান্বিত হয়। যারা রাজনীতি করে তারা নিজেদেরকে বিশ্লেষণ করতে হয় এবং নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা করতে হয়, ভালোমন্দ সবগুলো অভ্যাস খুঁটিয়ে দেখতে হয় ও আবেগ সংযত করার শক্তি পরীক্ষা করতে হয়। এতে মানসিক যোগ্যতা অর্জন করা যায়। এ মানসিক যোগ্যতাই রাজনীতিতে যেবুদ্ধির দরকার তা ধারালো করে এবং একজন রাজনীতিবিদকে দুর্বারশক্তিতে এগিয়ে চলতে সক্ষম করে। এযোগ্যতার ফলে তার চিন্তাভাবনা ও কাজ সঠিক হয়। সে চলার পথে তার ভুলগুলো শুধরে বা সংশোধন করে নেয়, ভালো গুণগুলো ধারালো করে নেয় এবং সুযোগের অপেক্ষায় বসে না থেকে সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়। কাজেই, রাজনীতিতে সে-ই পারে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। সে মানুষের পাশাপাশি এসে তাদেরকে বুঝতে দেয় যে, তাদের কাজ শুধু গাছপালার মতো বেঁচে থাকা নয়, সিংহের মতো খাদ্য খুঁজে বেড়ানো নয় এবং মাছের মতো হাজারহাজার ডিম পাড়া নয়।

www.pathagar.com

চিন্তাবিবর্জিত কোন কাজ কোন রাজনীতিবিদকে বেশিদূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। আদর্শ থেকেই চিন্তার উৎপত্তি। কাজেই,একজন আদর্শহীন রাজনীতিবিদ অন্ধকারে জন্মান্ধের ন্যায় পথ খোঁজা ছাড়া আরকিছুই করতে পারে না। কিন্তু, কোন আদর্শই পরিকল্পনা ব্যতীত বাস্তবায়িত হয় না। তাই, একজন রাজনীতিবিদের জীবন হতে হয় পরিকল্পিত এবং সে তার সত্তাকে করতে হয় সুন্দরতম। সে জীবন বলতে কাজ ও ব্যস্ততা বুঝতে হয়। তার চিন্তাতে থাকতে হয় আবেগ আর আবেগে থাকতে হয় চিন্তা, কেননা আবেগহীন চিন্তা শক্তিহীন আর চিন্তাবিহীন আবেগ লক্ষ্যহীন। তাই, আবেগপূর্ণ চিন্তা ও চিন্তাপূর্ণ আবেগের জন্যে একজন রাজনীতিবিদকে সর্বসময় প্রজ্জ্বলিত রাখতে হয় তার ইচ্ছাশক্তিকে এবং অগ্রসর হতে হয় পরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট কাজে। মানুষকে কাছে না টেনে তাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কাজেই, রাজনীতিতে মানুষকে কাছে টানতে হলে একজন রাজনীতিবিদকে এমন প্রচেষ্টা চালাতে হয় যাতে তারা তার লুক্কায়িত সত্তাকে দেখতে পায়। এজন্যে যেসব গুণাবলীর দরকার তাকে সেগুলো তার মনের মধ্যে গড়ে তুলতে হয় এবং সে তার মনকে গভীরতার ব্যাপকতায় ভরে তুলতে হয়। তাকে চিন্তানায়কদের সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে হয়, তাদের সম্পর্কে লেখা বই পড়তে হয়, তারা কি বলে ও করে তা অনুধাবন করতে হয় এবং যা সুন্দর ও প্রয়োজনীয় তা প্রতিদিনের কাজে গভীরভাবে লক্ষ্য করতে হয়। তাছাড়া, পৃথিবীর ঘটনাবলীর সাথে তাকে পরিচিত হতে হয়। যেরাজনীতিবিদ যোগ্যতাপ্রদর্শন করতে ব্যর্থ, নিজেকে অবহেলা করে এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না সে রাজনীতিতে পরাজিত হয়ই। রাজনীতিতে সফলতার জন্যে যেশক্তির দরকার তা হচ্ছে গতিশক্তি ও অশ্বশক্তি এবং ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা। এধরনের ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদই বিখ্যাত ও যশস্বী হয়। সে এমন শক্তি অর্জন করে না যা বানের জলের মতো আসে এবং পরক্ষণে মরুভূমিতে হারিয়ে যায়। সে এমন শক্তি অর্জন করে যা বিদ্যুতে পরিণত হয়ে ইঞ্জিন, টারবাইন ও ডায়নামা চালায়। তার এশক্তি বিদ্যমান থাকে তার আত্মজ্ঞান ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে। সে দিবাস্বপ্নে কোন কাজ না করে তার শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে মহৎকাজে ব্যবহার করে। এতে সে ব্যক্তিত্বশালী হয়ে জীবনকে আনন্দময় ও উদ্দীপনাপূর্ণ করে তোলে। এব্যক্তিত্বই একটি শক্তি আর এশক্তি বলে সে সামনে এগিয়ে চলে। সে সারাজীবন ধরে শিখে। সে মনে করে যে, সে জীবনে জেনেছে খুবকম এবং অনেককিছু তার জীবনে জানা বাকি। তাই, সে সবার থেকে শিখে। সেজন্যে সে হয় বিনয়ী ও তার মধ্যে থাকে সৌজন্যবোধ।

রাজনীতিতে অযৌক্তিকভাবে মেজাজ খারাপ করতে এবং নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে নেই। তাই, অবচেতন মনের দিকে নজর দিতে হয়। এজন্যে নিজের সবলতা ও

www.pathagar.com

দুর্বলতা উভয়কেই হিসেবের মধ্যে আনতে হয় এবং কাজের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। কিন্তু, প্রবণতার অভাবে এটা সম্ভব হয় না। অতএব, প্রবণতা না থাকলে কাজের সাথে খাপ খায়ানো ও একাত্ম হয়া যায় না। ফলে, অযোগ্যই হতে হয় এবং অন্যপথে যায়ার চেষ্টাতে বিপদই ঘটে। দৃষ্টির অগোচরে থেকেও অবচেতন সত্তা অনেক অঘটন ঘটাতে পারে। তাই, একজন রাজনীতিবিদের জীবনে মহান কর্তব্য হচ্ছে তার জ্বলন্ত প্রবৃত্তিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা এবং প্রবণতার উপযোগী কাজ করা। অন্যকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে সাফল্য আসে। কিন্তু, এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে–তা হচ্ছে কি করে নিজের সত্তাকে প্রভাবিত করা যায়। সেটাই হলো সাফল্যের সর্বোত্তম পন্থা, কেননা তাতে কোন সমস্যাই উপেক্ষিত হয় না আর উপেক্ষা করে কোন সমস্যা সমাধান করা যায় না বলে ব্যর্থতাই আসে। একজন শক্তিশালী রাজনীতিবিদ তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু করতে পারে। সে সব বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে সহজভাবে এগিয়ে চলে। কোনকিছুই তার যাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে না। সে যেন একটা জীবন্ত বৈদ্যুতিক তার। তার শক্তি ও কাজ করার প্রেরণা আছে। সে একজন শক্তিশালী মানুষ। সে কাজ করে। সে সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকে। সে সবকিছু চালায়। সে হয়তো বেশি কথা বলে না বা বেশি সময় দেয় না, তবু তার চার পাশের জগৎ তাকে ঘিরে আন্দোলিত হয়। সে একটু নড়াচড়া করলেই বা কথা বললেই কাজ হয়ে যায়। তার ছোঁয়ায় বা স্পর্শে যেন ঘুমন্ত রাজপুরী জেগে ওঠে, মানুষের চলাচল শুরু হয় এবং বাতাসে মানুষের কণ্ঠের শব্দ ভাসে। এসব ঘটে তার ব্যক্তিত্বের শক্তিতে। এ হলো বাস্তব কাজের শক্তি। সে দলীয় লোককে ভুল শিক্ষা দেয় না, কেননা ভুল শিক্ষার চাপে পড়ে মানুষের কিছুই করার থাকে না। কাজেই, একজন প্রকৃত রাজনীতিবিদ হতে হলে নিজের প্রকৃত সত্তা ও সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলীকে কাজে লাগাতে হয়, কখনো স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে নেই, শয়তানের শিক্ষার কবলে পড়ে নিজের জীবন্ত সত্তাকে দমন করতে নেই এবং পোষা ও বশ্য মানুষ না হয়ে বাস্তবতার জন্যে প্রতিবাদী হতে হয়। তার স্রোতের তোড়ে অপছন্দ ও কুসংস্কার ভেসে যায় এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড তাপে ঘন মেঘ গলে যায় ও বৈরী শিবির মুছে যায়, অর্থাৎ বাধাবিপত্তির মেঘ কেটে যায়। সে নিজের দোষগুলো নিজেই আলোচনা করে এবং নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়ে সেগুলো হতে মুক্ত থাকে। সে দৃঢ়প্রকৃতির লোক। দোদুল্যমানতা ও অস্থিরসংকল্পতা তার মধ্যে নেই। সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। সে সহসা মত বদলায় না। সে যেকোন মূল্যে কথা রাখে। সে কোন অজুহাতের ধারধারে না এবং ভুল করলে নিজেই সেটার দায়িত্ব নেয় ও অন্যের ওপর তা চাপিয়ে দেয় না। কাজে নামার পূর্বে সে ভেবে নেয়। তার সব কাজের পেছনে যুক্তি থাকে। তার প্রতিক্রিয়া সবাই জানতে পারে। সবাই তার বিকশিত সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলী জানতে পারে। সে আলোচনা শুনে। সে কোথাও অস্বস্তিবোধ করে না এবং পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। সে কথার দ্বারা অন্যান্যের মনে দাগ কাটতে পারে।

www.pathagar.com

দেয়া ও নেয়া একটা বড় নীতি। তাই, কথা বলতে হলে কথা বলতে দিতে হয় এবং ভালো বক্তা হতে হলে ভালো শ্রোতা হতে হয়। তাই, একজন রাজনীতিবিদ যা বিশ্বাস করে তা বলতে হয় এবং যা বলে তা বিশ্বাস করতে হয়। এধরনের রাজনীতিবিদকে সবাই পছন্দ করে। যেরাজনীতিবিদ এরকম করে না সে শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয়। তার উদ্দীপনা ভুল কাজে ব্যবহৃত হয়। এজন প্রকৃত রাজনীতিবিদ কারো প্রতি নির্লিপ্ত হয় না। তার দৃষ্টিভঙ্গি হয় উদার। সে মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করে ও তাদের মনের দিকে দৃষ্টি দেয়, অন্যের মতামত তার প্রতি উপকারী হয় এবং অন্যান্যরা তাকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে। এতে জনগণের সাথে তার আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়। এটা একটা বিরাট শক্তি ও অমূল্য ব্যাপার। এটা জীবনকে ধারালো করে। এটা একজনকে সারাজীবন জাগিয়ে রাখতে পারে এবং নতুন শক্তির জন্ম দিয়ে থাকে। সে বিরোধিতা এড়িয়ে চলে, অন্যের দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে দেখে, যথাসম্ভব কম কথা বলে এবং অন্যকে প্রকাশ করার সুযোগ দেয়, লোকের প্রতি তার প্রশংসা হয় সৎ ও আন্তরিক এবং হতাশা, ব্যর্থতা ও ক্ষতি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সে ঝামেলা ও বিরোধিতা কেটে ওঠতে পারে এবং মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে বেশিবেশি জানতে চেষ্টা করে। মনোভাব কাজে উদ্দীপনা সঞ্চার করে। কিন্তু, স্বার্থান্ধ মনোভাব জাতীয় অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। রাজনীতির ভূমিকা হচ্ছে সার্বজনীন। সার্বজনীনতায় স্বার্থান্ধ মনোভাব কোন অবদান রাখতে পারে না। স্বার্থান্ধতা জন্ম দেয় নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা। এতে মানুষের আনুগত্য ও বন্ধুত্ব লাভ করা যায় না। অথচ, মানুষের আনুগত্য, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা ব্যতীত কোন কাজেই সফলতা অর্জন করা যায় না। কাজেই, একজন প্রকৃত রাজনীতিবিদ হতে হলে সর্বপ্রথমে যা পরিহার করতে হয় তা হচ্ছে স্বার্থান্ধ মনোভাব। কারো ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে তার প্রতি চিৎকার করে বা অনধিকার চর্চা করে তা করা যায় না, তা করা যায় তার প্রতি সহানুভূতির দ্বারা। যেকোন নাগরিকের যেকোন সমস্যাই জাতীয় সমস্যা। একজন নাগরিকের একটি সমস্যার সমাধান একটি জাতীয় সমস্যার সমাধান। যখন কোন নাগরিকের কোন সমস্যা থাকে না তখন কোন জাতীয় সমস্যা থাকে না। যখন একটি জাতি সব সমস্যা কেটে ওঠতে পারে তখনই সে উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। তাই, অপরের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের দ্বারাই নিজের সমস্যার সমাধান সম্ভব ও অন্যের উন্নতি দ্বারাই নিজের উন্নতিসাধন করা যায় এবং একমাত্র নিজের উদ্দেশ্যসাধনের ভাবনাকে মন থেকে তাড়ানো ব্যতীত জাতীয় সমস্যার সমাধান দুরূহ।

রাজনীতিতে ভোটারদেরকে প্রভাবিত করার পথ হচ্ছে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করা এবং ধনীদের সম্পদ গরীবদেরকে বণ্টন করে দেয়ার কথা বলা। এতে সাফল্য অর্জিত হয় ;

www.pathagar.com

কিন্তু সেটা অশান্তির সাফল্য। এধরনের রাজনীতিবিদেরা নিজেদেরকে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের চেয়ে বেশি বিজ্ঞ মনে করে। তারা বুঝে না যে, এতে তাদের বোকামিরই পরিচয় ঘটে। তারা তোষামোদ বেশ পছন্দ করে। তারা অহংকারী হয় এবং তাদের শোচনীয় পতন ঘটে। তারা কৃতকার্য হয়ার সঙ্গেসঙ্গে অহংকারী হয় এবং তাদের যে নিদারুণ ও শোচনীয় পতন ঘটে তা তাদের দুষ্কর্মেরই কুফল। তারা জানে না যে, অহংকারী হয়া বোকামি ছাড়া আরকিছু নয়। অন্যের ইচ্ছার প্রতি উদাসীন থেকে বা কারো প্রতি অহমিকাপূর্ণ আচরণের দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। কঠোরতা অপেক্ষা সরলতার শক্তি বেশি, আদেশ অপেক্ষা অনুরোধ যথেষ্ট কার্যকর হয়, অভদ্রতা ও অশিষ্টতা কাকেও দুর্বল করতে পারে না এবং স্বার্থপরতা কৃতকার্যতা আনতে পারে না। তাদের কৃতকার্যতার পরিবর্তে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো তারা দক্ষ লোককে বুঝতে পারে না বলে অদক্ষ লোকের দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং তারা যেকয়দিন ক্ষমতায় টিকে থাকে সেকয়দিন বোকার স্বর্গে রাজত্ব করে। এতে তারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বলে অন্যান্যকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং অন্যান্যকে আঘাত দিতে গিয়ে নিজেরাও আঘাত খায়। তারা অকাট্য বা অখণ্ডনীয় নীতি গ্রহণ করতে পারে না এবং জনগণকে তাদের ভুল বের করতে উৎসাহিত ও প্রলুব্ধ করে না। লোভলালসা তাদের পতন দ্রুততম করে। তারা সংকীর্ণ স্বার্থপরতার দ্বারা অন্যান্যকে আঘাত করে, অন্যান্যের ধ্বংসের কথা ভেবে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে এবং অন্যান্যকে ঘৃণা করে নিজেদেরকে অনেক নিচে নামিয়ে ফেলে। তারা সাধারণ লোকের পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে শুনে না। তারা চতুর ও চালবাজ ব্যক্তিদের থেকে, যাদেরকে তারা তাদের সমপর্যায়ের বা তাদের থেকে বড় মনে করে, উপদেশগ্রহণ করে। ফলে, তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় এবং জনপ্রিয়তার অভাবেই তাদের সাফল্যলাভের সরণিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট হয়। একজন সফলকাম রাজনীতিবিদ হতে হলে নিজের দক্ষতার বিশ্বাসের, সহিষ্ণুতার ও কাজের উন্নতি ঘটাবার জন্যে একজন রাজনীতিবিদ নিজেকে যেরূপ জানে অন্যান্যকেও সেরূপ জানতে চেষ্টা করে। সে জানে যে, শুধুমাত্র নিজের মানসিক ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হলেই চলে না, বরং তার ধারণা ও কাজ অন্যের ওপর কতোটুকু প্রভাববিস্তার করলো তা-ও জানা অত্যাবশ্যক।

যে আত্মকেন্দ্রিক ও বলপ্রয়োগকারী রাজনীতিবিদ অপরের দুঃখকষ্টের প্রতি উদাসীন থাকে সে জাতীয় সমস্যাই বৃদ্ধি করে। তার পরিকল্পনা ও কাজ বিরোধপূর্ণ হয়। এতে সে জনগণের ক্ষতি করে সত্য ; কিন্তু জনগণ তার পতন ঘটায়। সে তার দুর্বলতাগুলো দেখতে চায় না। ফলে, সে তার দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে এবং ভারসাম্যরক্ষা করতে পারে না। সে অপরের স্বার্থকে অবজ্ঞা করে। এতে তার এমন দুর্নাম হয় যে, সে তার পরিকল্পনা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয় এবং তার ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি থাকা সত্ত্বেও সে মরা গাছের ন্যায় ভেঙে পড়ে। সে তার যা প্রয়োজন তা-ই চায়। এতে শীঘ্রই সে লোভী হিসেবে পরিচিত হয় এবং লোকে তাকে এড়িয়ে চলতে

www.pathagar.com

চেষ্টা করে। কিন্তু, লোকে যাকে পছন্দ করে না ও এড়িয়ে চলে সে কেবলমাত্র বলপ্রয়োগ করে উচ্চাসন পেতে পারে না, কেননা একা সবার সাথে বলপ্রয়োগ করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র গলাবাজিতে কোন কাজ হয় না। সাধারণ লোক কি চিন্তা করে ও ভাবে তা না জেনে গলাবাজি করে তাদের মনাকর্ষণ করা যায় না। জনগণের ইচ্ছার, ধারণার ও মতামতের ভিত্তিতে রাজনীতি করে জনপ্রিয়তা অর্জনের ধারায় সফলতার পথ সুগম করা যায়। মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে তাদের নির্বুদ্ধিতা, প্রবঞ্চনা ও চালাকি বুঝা যায় না। মানবিক সম্পর্কের দ্বারাই মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়া যায়। মানবিক সম্পর্ক বাদ দিয়ে শুধু নিজের দিকটা বড় করে দেখলে জনগণের স্বার্থের প্রতি সদয় হয়া যায় না। তাই, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সংকীর্ণ মনোভাব সঠিক পন্থায় রাজনীতিতে বিরাট অন্তরায়। অপরের কল্যাণসাধন ছাড়া রাজনীতিতে যেসুনাম অর্জিত হয় তা ক্ষণস্থায়ী। তাই 'রাজনীতি গবেষণা' রাজনীতিবিদদের জন্যে একান্ত প্রয়োজন। রাজনীতি গবেষণাতে এটা সুস্পষ্ট যে, রাজনীতিতে সাফল্য জনগণের কাছ থেকে আসে। তাই, তাদের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী না হয়ে সফলকাম রাজনীতিবিদ হয়া যায় না। সমাজ হলো জীবনের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবন্ধকস্বরূপ। নিজের বড়ত্ব ও স্বাধীনতাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার দিন আর নেই। বর্তমান যুগ হচ্ছে সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার যুগ। তাই, সমাজের স্বার্থের কথা বাদ দিয়ে নিজের স্বার্থে রাজনীতি ব্যর্থতা ডেকে আনে, কেননা আব্রাহাম লিংকনের মতে সব লোককে কিছু সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায় ; কিন্তু সব লোককে সব সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায় না। রাজনীতিতে জনসাধারণ একজন রাজনীতিবিদ সম্বন্ধে কি ভাবে সেটার ওপরই তার সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। প্রত্যেকের তীক্ষ্মদৃষ্টিশক্তি আছে। কাজেই, একজন রাজনীতিবিদ যে কি তা কিছুদিন আগে বা কিছুদিন পরে জনগণ বুঝতে পারে। তাই, সমাজের স্বার্থে একজন রাজনীতিবিদকে এমনভাবে কাজ করতে হয় যাতে জনগণের সাথে তার বিরোধ না হয়ে সহযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে। যেসব রাজনীতিবিদ ভয় দেখিয়ে কথাবার্তা বলে বা আচারাচরণ করে তাদের পতন ঘটে। একজন দক্ষ ও উদ্দেশ্যপ্রবণ রাজনীতিবিদের উত্তম নীতি হলো সবার কথা সহানুভূতির সাথে চিন্তা করা এবং তাদের সর্বপ্রকার আচারাচরণ ধৈর্যসহকারে অবলোকন করা, কেননা নিষ্ঠুরতার দ্বারা যেকোন ইতর প্রাণীও বশ করা যায় না।

রাজনীতিতে ভাবগম্ভীর্য পরিহার করে চলতে হয় এবং রসিকতাকে কিছু-না-কিছু স্থান করে দিতে হয়, কেননা মানুষের দেহমন ও কাজের ওপর রসিকতার গুরুত্ব চিরন্তন বা চিরকালীন এবং যেকোন লোক তিক্তকর পরিবেশের পরিবর্তে আনন্দকর পরিবেশই কামনা করে। যেকোন দক্ষ রাজনীতিবিদ বক্তৃতাতে রসিকতার সাহয্যে জনগণের এক বিরাট অংশকে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। যেকোন সম্মেলনে বা সাধারণ সভায় হাস্যরসের দ্বারা বহু দ্বন্দ্ব কেটে যায়, নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় এবং যেকোন কাজ সহজসরল হয়। যেকোন কথাবার্তায় বা জনসভায় হাস্যরসে একঘেয়েমি

www.pathagar.com

বা নিষ্ক্রিয়তা দূর হয় এবং জনগণ উল্লসিত হয়, তাদের মনোযোগ গভীরতম হয় ও তাদের থেকে অনুকূল সাড়া পায়া যায়। কিন্তু, স্বৈরাচারী ব্যক্তিরা রসিকতাকে তেমনকোন মূল্য দিতে চায় না। সাফল্য ও শান্তি দুটোকে পৃথক করে চিন্তা করা যায় না। সাফল্য ছাড়া শান্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তবে, শান্তি না থাকলে সাফল্যের কোন সার্থকতা থাকে না। জনসাধারণের স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে নিজের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হলে যেসাফল্য অর্জিত হয় তাতে কোন শান্তি থাকে না আর নিজের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হয়ে পরের স্বার্থরক্ষা করা যায় না। তাই, যতোবড় রাজনীতিবিদই হোক–না–কেন দেশ ও জনগণের সার্বিক স্বার্থকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে সফলকাম রাজনীতিবিদ হতে পারে না। কোন রাজনীতিবিদই সত্যিকারভাবে সফল হতে পারে না যদি তার সফলতা নিজের উপকারের সাথেসাথে জনসাধারণের উপকারে না আসে। যেরাজনীতিবিদ মনে করে যে, সে যা ভালো মনে করে তা করে এবং এতে জনসাধারণ তার সম্বন্ধে যা ভাবে তাতে তার কিছু যায়আসে না তার শোচনীয় পতন ঘটে। যেকোন রাজনীতিবিদকে সদাচরণের বিধিবিধান জানতে হয়। প্রত্যেক সমস্যার সাথে মানুষ জড়িত এবং মানুষই যেকোন বাধার কারণ ও তাদের সাথে দক্ষতাপূর্ণ আচরণ তা দূরীভূত করতে সক্ষম। নেপোলিয়ন তার জীবনের প্রথম অধ্যায়ে জানতো যে, কিভাবে সৈন্যদের সাথে ব্যবহার করতে হয় এবং এতে সে বহু রাজ্য জয়েও সক্ষম হয়েছিলো। কিন্তু, শেষের দিকে সে আত্মকেন্দ্রিক ও উগ্র স্বভাবের হয়ে উঠেছিলো। ফলে, শক্তির সর্বোচ্চ শীর্ষে আরোহণ করা সত্ত্বেও তাকে পরাজয়বরণ করে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হয়েছিলো। যখন সে অন্যের স্বার্থকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছিলো তখন তার সৈন্যরা তাকে রক্ষা করতে পারেনি। রাজনীতি করে ক্ষমতাসীন হয়ে রাষ্ট্রপরিচালনে অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন। এজ্ঞানের সম্পর্ক থাকতে হয় বাস্তবতার সাথে। এতে সম্ভবপর হয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বৈপ্লবিক পরিবর্তনসাধনে একজন ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করার ফুরসত বা অবসর পায় না। সে জীবনের খাতিরেই জীবন সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়। জীবন তার নিকট কোন ক্ষণস্থায়ী প্রদীপ নয় — এক চিরঅনির্বাণ দীপ্তমশাল। এমশাল থাকে তার নিজের হাতে। এমশাল ভবিষ্যৎ বংশধরদের বা প্রজন্মের হাতে ছেড়ে যায়ার পূর্বে সে এটাকে যতোবেশি সম্ভব প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল আলোয় আলোময় দেখতে চায়। সে নিজের ভুলভ্রান্তি অকপটে স্বীকার করে এবং সেগুলো অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করে না। সে মানুষকে বুঝতে এবং তার জীবনটাকে তাদের সেবায় নিয়োজিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। সে জনসাধারণের কাজ ছাড়া অন্যকাজে সামান্যতম সময়ব্যয় করাটাকে সময়ের অপচয় বলে মনে করে। এভাবে সে জনগণের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

www.pathagar.com

রাজনীতিতে সফলতার জন্যে বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। যাদের অসাধারণ প্রতিভা ও ধীশক্তি আছে তাদেরকে কাছে টেনে আনতে হয়। প্রতিভাই সফলতার নতুন পথ সৃষ্টি করতে পারে। তাই, আব্রাহাম লিংকনের মতো প্রেজিডেণ্টও হাঁটু গেড়ে খোদার নিকট প্রতিভাবান লোকের জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন, কেননা প্রতিভাবান লোকের চিন্তাশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যেরাজনীতিবিদ দুর্ভাবনায় ভোগে না সে দৃঢ়তার সাথে কাজ করে যেতে পারে। সে ইতিহাস, জীবন ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত থাকে। তার মধ্যে থাকে আত্মসংযম। ফলে, সে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে পারে এবং দুর্ভাবনা এক মুহূর্তের জন্যও তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায় না এবং তার ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনা একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়। জনগণের রাজনীতিতে অনেক বিপদ থাকে। কিন্তু, এসব বিপদকে কখনো ভয় করতে নেই এবং গতিপথ দেখে পালিয়ে যেতে নেই। বিপদকে ভয় করলে বিপদ বেড়ে যায় আর সাহসের সাথে মুকাবিলা করতে পারলে তা লোপ পায়। যেকোন বিপদ সম্বন্ধে বিজ্ঞ লোকের ভবিষ্যদ্বাণী অনুধাবন করতে হয়। যখন ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিবিদেরা হিটলার সম্পর্কে সচেতন না হয়ে অন্যান্য বিষয়ে বিভোর ও মত্ত ছিলো তখন একমাত্র চার্চিলই হিটলারের ভবিষ্যৎ দুরভিসন্ধি সম্পর্কে বৃটিশ জনগণকে সাবধান করেছিলো ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতিগ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলো। যদি বৃটেন তার ডাকে আন্তরিকভাবে সাড়া দিতো তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একটা পাগলের উদ্ভট কল্পনার বেশি গুরুত্বলাভ করতো না।

অবিসংবাদিত বা সর্বসম্মত নেতা না হয়ে কেউ রাজনীতিতে সফলতা অর্জন করতে পারে না। যেকোন অবিসংবাদিত নেতার লক্ষ্য হলো আদর্শ হয়া, পরিপূর্ণ শান্তি ও জনগণের সার্বিক মঙ্গল। তার বিশ্বাস ও মনোভাব এতো দৃঢ় হয় যে, তার লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে কেউই তাকে টলাতে পারে না। তার লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যে সে জীবনকেও পরোয়া করে না। সে সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করতে পারে। সে দারিদ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং বৈপ্লবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকশ্রমিকের জীবনের মান উন্নত করে। তার নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙখলা দূর করে। স্টেলিন রাশিয়ার একচ্ছত্র শাসক থাকা অবস্থায় জার সম্রাটদের সুরম্য শাহীমহলে বাস করেনি। ইচ্ছা করলে সে বহু মূল্যবান আসবাবপত্রে সজ্জিত শাহীমহলে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারতো। কিন্তু, সেটার পরিবর্তে সে একটি ক্ষুদ্রগৃহ বেছে নিয়েছিলো যেখানে এককালে জার সম্রাটদের এক ভৃত্য বাস করতো। তার আহারাদির ব্যবস্থাও পৃথক ছিলো না। ক্রেমলিনে রান্না করা খাবারই সে খেতো। এখাবার ক্রেমলিনে কর্মরত হাজারহাজার সিপাই ও অফিসার খেতো। একজন

www.pathagar.com

সত্যিকারের রাজনীতিবিদ নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করে না এবং লোকদেখানো কার্যকলাপকে ঘৃণা করে। সে কোন প্রশংসনীয় কাজ করলে সেটাকে ভবিষ্যতে করণীয় কাজের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ মনে করে। তার মধ্যে বিরাজ করে স্বীয় ভুল স্বীকার করার সাহস এবং খুবকম সময়ই নিজের ভুল সংশোধন না করার প্রবণতা তার মধ্যে বিরাজ করে। রাজনৈতিক কারণে ব্যর্থতার ফলে সে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত না হয়ে সফলতার জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। এসংগ্রামে সে উৎকৃষ্ট হতে উৎকৃষ্টতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তির ও প্রতিভাবিকাশের দ্বারা পুনরায় রাজনৈতিক সফলতার মাধ্যমে দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আজকের এবিশ্বে উন্নত দেশগুলোর উন্নতির পথ সুগম করাতে যারা নিরলসভাবে কাজ করেছিলো তাদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের অনেক বাধাবিঘ্ন ছিলো এবং তারা সেগুলো প্রতিহত করে ও নিজেদের সুখশান্তির কথা ভুলে গিয়ে জাতীয় স্বার্থে সবকিছু করেছিলো। যেরাজনীতিবিদ জাতীয় লক্ষ্যার্জনে অবিরাম প্রচেষ্ট চালিয়ে যায় রাজনীতিতে তার সফলতা আসে। যেরাজনীতিবিদ জাতীয় লক্ষ্য স্থির করে এবং তা বাস্তবায়নের পথে যেকোন বাধাকে নীতিগত ও আইনানুগভাবে প্রতিহত করতে পারে এবং একধ্যানে ও একমনে কাজ করতে থাকে একদিন–না–একদিন সে রাজনৈতিক সফলতার পদচুম্বন করেই। একজন সত্যিকারের রাজনীতিবিদ তার দলের লোককে এমন কাজের আদেশ দেয় না যা সে স্বয়ং ভালোবাসে না। যেসব যোগ্যতা ও প্রতিভার দ্বারা বাঞ্ছিত স্থান অধিকার করা যায় সেগুলো গ্রহণে প্রাণপাত প্রশিক্ষণে ব্রতী হতে হয়। একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ শুধু নিজেই এতে ব্রতী হয় না সে তার দলের লোককেও এতে ব্রতী হতে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে। সে নতুননতুন চিন্তাভাবনার বীজ বপন করে তার দলের লোককে প্রাণবন্ত ও কর্মমুখর করে তোলে। এতে তার দল, কোন বিশেষ কারণে অসুবিধার সম্মুখীন না হলে, একমনে ও একধ্যানে কর্মচঞ্চলতা ও উদ্দীপনার মধ্যে জাতীয় অগ্রগতিতে যেকোন সংগ্রামে কৃতিত্ব ও নিপুণতা দেখাতে পারে। যেরাজনীতিবিদ অবসর মুহূর্তগুলোও যোগ্যতাবৃদ্ধির জন্যে ব্যয় করে সে–ই তার দলের লোককে যোগ্যতম করে তুলতে পারে এবং তার যেকোন সতর্কবাণী তার দলের লোক সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে। যেরাজনীতিবিদ দেশকে ভালোবেসে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয় সে–ই অক্ষয়কৃতিত্ব রেখে যেতে পারে। সে জীবনে কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থে কোন কাজ করে না, তার যেকোন কাজ দেশেরই কাজ।

যখন দুর্বলচেতা রাজনীতিবিদদের কারণে দেশে অরাজকতা সৃষ্ট হয় তখন সেনাবাহিনী জনগণের পাশে স্থান করে নিতে পিছপা হয় না। তবে, সেনাবাহিনী বেশিদিন জনগণের পাশে থাকলে তাদের ভেতর কোন্দলের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া,

www.pathagar.com

সামরিকবাহিনীর লোক সরল অন্তঃকরণের হয়ে থাকে। বাস্তবে রাজনৈতিক নেতাদের চালের মারপ্যাঁচ বোঝার ক্ষমতা তাদের কম। ফলে, অনেক সময় দেশ গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি হয়। তবে, যখন সামরিক নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বের শৃঙ্খলা ও মানসিক শক্তিকে নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করে তখন তাদের মনে হয় এদের চেয়ে তাদের মধ্যেই যোগ্যতা ও শক্তি বেশিপরিমাণে রয়েছে। ক্রমেই তাদের মনে হয় রাষ্ট্রচালানোর ব্যাপারটা তাদের হাতেই থাকা উচিত। তাছাড়া, দলভেদে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা তাদের নিকট অনেকটা স্থূল ও সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়। রাজনৈতিক দলের খামখেয়ালটাই তাদের নিকট মুখ্য বা প্রধান মনে হয়। এধরনের চিন্তাভাবনা তাদেরকে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে নেয় এবং একপর্যায়ে সামরিক শাসনের আওতায় তারা রাষ্ট্রপরিচালনের দায়িত্বভারগ্রহণ করে। এরপর যখন তারা দেখে যে, তাদের প্রতিটি কথাই আইন তখন তারা একদিন ক্ষমতাত্যাগ না করার কথা সরাসরি জানিয়ে দেয়। ইতিহাসে এমনকোন ঘটনা বিরল যে কোন সামরিক জান্তা সরাসরি জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বা সমর্পণ করেছে। এক্ষেত্রে সামরিক সরকার শেষাবধি বা শেষপর্যন্ত নিজেরাই বেসামরিক সরকারে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হয় এবং তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার মোটামুটি এটাই সহজ পদ্ধতি। এরমক সময়ে একজন রাজনীতিবিদকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো পূর্ণ যোগ্যতা বজিয়ে রাখতে হয়। তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সব কাজ সম্পাদন করতে হয় এবং অটুট অবিচলতা ও একগ্রতাকে জীবনে পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। তার চাতুর্য ও নৈপুণ্যের দ্বারা সে সামরিকবাহিনীকে বুঝিয়ে দিতে হয় যে, তাদের পবিত্রতম দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, কেননা সার্বভৌমত্বের অভাব পরাধীনতার জিঞ্জির পরিয়ে দেয়। সে জাতিকে ধোঁকা দেবার পরিবর্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে দ্বিধাবোধ করে না ও কুণ্ঠিত হয় না। সে হয়তো গুলির মুখে উড়ে যায়, নয়তো জাতীয় স্বার্থ অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখে।

তখনই একজন রাজনীতিবিদ কেবলমাত্র প্রশান্তমনে ও দুর্বারবেগে কাজ করতে পারে যখন তার থাকে শিক্ষাগতযোগ্যতা ও বহুদিনের অর্জিত অভিজ্ঞতা। তার সাফল্যার্জনের মূলে থাকে শিক্ষাগতযোগ্যতা, সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ, সিদ্ধান্তগ্রহণের শক্তি, কর্মতৎপরতা ও সর্বোপরি মানুষকে নেতৃত্বদানের ব্যাপারে যথার্থ যোগ্যতা। তাই, একজন প্রকৃত রাজনীতিবিদ এমন একব্যক্তি যে শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের লোভ না দেখিয়ে মানুষকে যেকোন কাজে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে পারে। সে নামের কাংগাল নয় এবং তার ভেতরের গোপন কথা নাজুক পরিস্থিতিতেও প্রকাশিত হয় না। সে

www.pathagar.com

স্বভাবে বিনয়ী, সর্বপ্রকার লৌকিকতাবিবর্জিত এবং আন্তরিকতার এক জীবন্তপ্রতীক। তার স্বর বিগড়ায় না বা বিকৃত হয় না এবং রাগের বশে সে কখনো গলাফাটিয়ে চিৎকার করে না। সে নিজে সৎসাহসী হয়ে দলের লোকের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি করে। সে এটাতে বিশ্বাসী যে, তারাই শুধু বেঁচে থাকার যোগ্য যারা জাতীয় স্বার্থে মৃত্যুকে পরোয়া করে না বা ভয়ে ভীত হয় না। তাই, সে যেকোন দুর্যোগের ঘনঘটা বা মেঘাড়ম্বর ঘনীভূত হলে তা কেটে ওঠতে ও নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। রাজনীতিতে দূরের অস্পষ্ট জিনিসকে সুস্পষ্টভাবে দেখার মতো চোখ থাকতে হয় আর ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হয়ার প্রধান উপায় হলো পুরো শক্তি, বুদ্ধি ও আগ্রহ দিয়ে কাজ করা। রাজনীতি এমন একটা বিষয় যেটাতে দুশ্চিন্তা যেকোন সমস্যার সমাধানকে অসম্ভব করে তোলে আর যেরাজনীতিবিদ দুশ্চিন্তা প্রতিরোধ করতে পারে না সে বেশিদিন রাজনীতিতে টিকে থাকতে পারে না। এলোমেলো চিন্তাই দুর্ভাবনার জন্ম দেয়। মানুষ চিন্তা ছাড়া সবকিছুই করতে পারে। কিন্তু, যেরাজনীতিবিদ দুশ্চিন্তার ফলে নিরপেক্ষভাবে বাস্তবতাকে দেখতে পায় না সে জনগণের নিকট সমাদৃত হয় না বা তাদের দ্বারা সংবর্ধিত হয় না। যেরাজনীতিবিদ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না তার পতন অবশ্যম্ভাবী। আত্মশক্তির বাইরে কোন বিষয় সম্পর্কে চিন্তাই দুশ্চিন্তার জন্মদাতা আর যেসব ঘটনা ঘটে যায় সেগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা করাটা কাঠের গুঁড়াকে করাত দিয়ে কাটার মতো হয়।

যেসব লোক একজন ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে সুবিধা করে নিতে চায় তার উচিত তাদেরকে ভুলে যায়া এবং সে যাদেরকে পছন্দ করে না তাদের কথা ভেবে সময় নষ্ট না করাই তার পক্ষে ভালো। সে ক্রোধসংবরণ করে চলা উচিত, কেননা একজন ক্রোধান্বিত লোক সর্বসময় বিষময়। জনগণের কাজে নিজেকে ভুলে যায়ার মধ্যে তার বেঁচে থাকার আনন্দ অর্পিত বা নিহিত থাকে। সে নিজের কথা ভাবে না বলে তার দুশ্চিন্তা হয় না এবং সে বিষাদগ্রস্তও হয় না। যেরাজনীতিবিদ তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে সে-ই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সে নিজেকে জানতে শিখে এবং সম্যক উপলব্ধির মাধ্যমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানুষের শিক্ষা তাকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে আসে যখন সে বুঝতে পারে যে, শত্রুতা হচ্ছে অজ্ঞতা এবং অনুকরণ হচ্ছে আত্মহত্যার শামিল। সে কখনো সিদ্ধান্ত ফেলে রাখে না। সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন উপযুক্ত উপকরণ থাকলে সে সাথেসাথে যেকোন সমস্যা সমাধান করে ফেলে। সে তার সাংগঠনিক ক্ষমতার দ্বারা শুধু কাজ করায় না, তা দেখাশুনাও করে। কঠোর পরিশ্রমে তার অবসাদ বা ক্লান্তি আসে না, কেননা সে জানে যে, দুর্ভাবনা, উত্তেজনা ও মানসিক দুর্ঘটনা ক্লান্তির প্রধান কারণ। সে অন্যায়ভাবে সমালোচকদেরকে তিরস্কার করে না, কেননা সমালোচনা, প্রত্যক্ষভাবে বা

www.pathagar.com

পরোক্ষভাবে, আর্শীবাদ হিসেবে কাজ করে। কাজ করলেও সমালোচনা হয়, না করলেও হয় এবং সঠিক কাজে সমালোচনা থাকেই। কাজেই, যেরাজনীতিবিদ যতোক্ষণপর্যন্ত সঠিক কাজ করে তাকে ততোক্ষণপর্যন্ত কারো কোন কথায় পিছপা বা পশ্চাৎপদ হতে হয় না। অতএব, রাজনীতিতে সফলতার জন্যে সাধ্যমতো ভালো কাজ করতে হয়। এতে সমালোচনার পাথর আঘাত দিতে পারে না এবং সমালোচকেরাই মুখথুবড়ে পড়ে। মানুষের ভালোবাসা ব্যতীত রাজনীতিতে সফলতা আসে না। এজন্যে দরকার ছোটদেরকে স্নেহের এবং বড়দেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে নিজের মহত্বকে ফুটিয়ে তোলা। এটা মানুষকে নিজের চিন্তাপ্রবাহে টেনে এনে তাদের সহযোগিতা লাভ করার সহজতম উপায় এবং তাদেরকে নিজের বিশ্বাসের দুর্গে প্রবেশ করানোর সূক্ষ্মদক্ষতা। এতে সে যা ধারণা করে মানুষ সেটাকে তাদের নিজস্ব ধারণা বলে অনুভব করে। সে মানুষের পছন্দানুযায়ী কাজ করে এবং তাদের মনে আঘাত না দিয়ে বা দুঃখকষ্ট সৃষ্টি না করে তাদের মধ্যে যেকোন পরিবর্তন আনতে পারে।

কেউ একবার 'না' শব্দটি উচ্চারণ করলে তাকে দিয়ে 'হ্যাঁ' বলানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। 'না' আসলে প্রতিবাদ, মতানৈক্য, চ্যালেঞ্জ, অসন্তোষ, বিরক্তি ইত্যাদির প্রকাশ ঘটায়। কাজেই, একজন রাজনীতিবিদ কাকেও এমনকিছু বলতে নেই যার ফলে তার মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব জেগে ওঠে। কাকেও স্বমতে আনতে হলে তার মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব জাগাতে হয়। জনসাধারণকে বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হয় নিজেকে আর নিজেকে বুঝার উপায় হলো জ্ঞানার্জন। তাই, একজন রাজনীতিবিদের জীবনে বড় পুঁজি হলো জ্ঞান। সত্যিকারের রাজনীতিবিদ হতে হলে সত্যিকারের মানুষ হতে হয় এবং সে-ই সত্যিকারের মানুষ যে জ্ঞানের সাধনা করে। তাছাড়া, মানুষকে লক্ষ্য করতে হয়। লক্ষ্য করতে হয় তাদের মধ্যে কিকি গুণ আছে এবং তাদের ভালো গুণগুলো নিজের মধ্যে আমদানি করতে হয়। নিজেকে এবং জনসাধাণকে বুঝতে পারলে সব সমস্যার সমাধান পায়া যায়। স্বল্প ও সীমিত সময়ে মানুষকে প্রভাবিত ও বশীভূত করার সহজতম উপায় হচ্ছে বক্তৃতা। তাই, শ্রোতাদেরকে স্বমতে আনতে হলে বক্তৃতাতে তাদের মনের কথা দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে পরিষ্কার ও সুষ্ঠুভাবে প্রতিধ্বনি ও প্রকাশ করতে হয়। নিষ্ক্রিয় ও নির্জীব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সফলতা অর্জন করা যায় না। সক্রিয় ও সজীব আকাঙ্ক্ষার জন্যে অধ্যবসায়ের সাথে নিজবিষয় অনুসরণ করতে হয় এবং বুল-ডগ যেভাবে বিড়ালকে তাড়ায় ঠিক সেভাবে চলতে হয়। তা হলে কোন বাধাই তাকে পরাভূত করতে পারে না। যেরাজনীতিবিদ মতিস্থির রেখে অগ্রসর হতে পারে না সে অর্ধপথে পথ হারিয়ে ফেলে। সুতরাং, সফলতার জন্যে তাকে লক্ষ্যস্থির করে যাত্রা শুরু করতে হয় এবং লক্ষ্যস্থল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে স্থিরমস্তিষ্কে এগুতে হয়। এশক্তি অর্জন করতে পারলে সে সমাজে গৌরবান্বিত ব্যক্তি হয় আর তার

www.pathagar.com

মর্যাদা সমাজে সবার ওপরে হয়। তাই, কথা বলার প্রয়োজন একথা নিশ্চিত হবার আগে সে মুখ খুলতে নেই। কথা বলার প্রয়োজন হলে চিন্তা করে নিতে হয়, যেসম্পর্কে বলবে তা জানা থাকতে হয় এবং বদ্ধমূল ও নিশ্চিত হলে বক্তব্য সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করতে হয়। এতে তার বক্তব্য অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ হয় এবং শ্রোতারা মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়। কিন্তু, অভ্যাস ব্যতীত কোনকিছু সঠিকভাবে করা যায় না। দৃঢ়মনোবল ও স্নায়ুনিয়ন্ত্রণের প্রবল ইচ্ছাই অভ্যাসের পথ সুগম করে এবং জুলাই মাসের উজ্জ্বল সূর্যালোকের মতো সাফল্য ঝলমল করে। তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বা নিরবধি চিন্তা ও চিন্তার বিষয়বস্তুকে গভীরভাবে অনুভব করতে হয় এবং সে তার সব চিন্তাকে যুক্তিসম্মত পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে হয়। এভাবে সে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের অবসান ঘটাতে পারে বা তা ভঞ্জন করতে পারে, কেননা সব আন্দোলন ও সংস্কারের জয় হচ্ছে জনগণকে প্রভাবিত করে। তার বক্তব্যে প্রকাশিত হতে হয় তার দৃঢ়ব্যক্তিত্ব এবং শ্রোতারা বুঝতে পারতে হয় তার স্বাতন্ত্র্য বা অনন্যপরতা। তাকে হতে হয় সুবক্তা এবং তার বক্তৃতার সুসমাপ্তি হতে হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদকে সুদৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার চিন্তাধারাকে বলিষ্ঠ করে। তার মুক্তমন ও উদারনৈতিক চিন্তাধারা সঠিক কর্মপন্থার জন্ম দেয় এবং তার সাফল্যের পথ সুগম করে। রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সমন্বয়ই তার মুক্ত মনের ও উদার চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। সে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সমন্বয়সাধন করতে ব্যর্থ হলে জ্বলে ওঠে প্রতিবাদের ও প্রতিহিংসার দাবানল বা দাবাগ্নি। তাকে অটুট রাখতে হয় পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ, কেননা এগুলোর অভাবে নানাধরনের কাহিনীর সূত্রপাত বা সূচনা হয়। তাকে জানতে হয় যেকোন আন্দোলনের কারণ এবং তা প্রতিহত করার মতো কার্যকর ও বাস্তবানুগ পন্থা। যেকোন আন্দোলনের উৎস হচ্ছে সেটার দর্শন। কাজেই, একটি আন্দোলনের মুকাবিলা অপর একটি আন্দোলনের দ্বারা করতে হয়, অর্থাৎ একটি দর্শনকে অপর একটি দর্শন দিয়ে প্রতিহত করতে হয়। তাই, অন্যান্য দর্শনের চেয়ে তার দর্শন হতে হয় বেশি উপাদেয় ও চিত্তাকর্ষক। জাতীয় ঐক্যের ও নিরাপত্তার প্রশ্নে সব শ্রেণীর ও সব অঞ্চলের লোকের মতামত প্রণিধানযোগ্য। কাজেই, একজন ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদকে অপরিণামদর্শী না হয়ে সর্বসময় সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে পরিণামদর্শী বা দূরদর্শী হতে হয়। সম্ভাবনা ও আশার অন্ত নেই। কাজেই, তাকে সজাগ থাকতে হয় যাতে সে যেটা সুচিন্তিভাবে সম্ভব মনে করে তা অসম্ভব না হয় এবং সে এমনকোন আশা পোষণ করবে না যা দুরাশায় বা অবাস্তব আশায় পর্যবসিত বা পরিণত হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, খ্যাতি

www.pathagar.com

কিংবদন্তির বা জনরবের মতো হলেও দুষ্কর্মের কারণে কালের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হতে হয় ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। কাজেই, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাকে দুষ্কর্ম বর্জন করে চলতে হয়।

ওধরনের রাজনীতিবিদ দেশ ও জাতির শত্রু যে শুধু নিজে টিকে থাকার জন্যে ছলেবলেকৌশলে ক্ষমতা আঁকড়িয়ে রেখে জনগণকে স্বৈরশাসনের শিকলে আবদ্ধ করে। তবে, একজন সত্যদর্শী রাজনীতিবিদের প্রকৃত দায়িত্ব হচ্ছে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে হলেও জনগণকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা বিনা বাধায় বজিয়ে রাখার পথ সুগম করে দেয়া এবং সেপথ কণ্টকাকীর্ণ হলে কণ্টকমুক্ত করা। তবে, তাকে সজাগতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যাতে এস্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত বা রূপান্তরিত না হয় এবং মানুষ যেকোন সমাজবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মে আকৃষ্ট হয়ার বা মনোনিবেশ করার সুযোগসুবিধা না পায়, কেননা নৈরাশ্য ও অরাজকতা অনবরত বিদ্যমান থাকলে যেকোন উগ্র মতবাদ গৃহীত হতে পারে। তার কর্মসূচি তার কাছে যেন দ্ব্যর্থক ও অস্পষ্ট না হয়। তার রাজনৈতিক কার্যকলাপ যেন জাতীয় নীতিকে কেন্দ্র করে হয়, ক্ষমতার ও ব্যক্তিত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে না হয়। যখন গণসংযোগের মাধ্যমগুলোর প্রচারণার ফলে মানুষ রাজনীতির প্রতি অত্যুৎসাহী হয়ে ওঠে তখন নেতৃবর্গ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির চেয়ে রেডিওতে ও টিলিভিশনে প্রচারণাকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এতে বক্তৃতাবাজি ও প্রচারণাভিযান অর্থনৈতিক উন্নয়নের তুলনায় অত্যধিক অগ্রগামী হয় বলে এক বিস্ফোরণোন্মুখ ও ক্রমপ্রসারণমান নৈরাশ্যবোধের সৃষ্টি হয়, কারণ জনসাধারণ এমন সব দাবি আরোপ করতে চালিত হয় যেগুলো তাদের রূপান্তরণশীল সমাজ মেটাতে পারে না এবং এভারসাম্যহীনতা নতুন নেতৃত্ব ডেকে আনার পথ সৃষ্টি করে। একজন বাস্তববাদী ও জ্ঞানবান রাজনীতিবিদ বক্তৃতাবাজি ও প্রচারণাভিযান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে কোনপ্রকার বিস্ফোরণোন্মুখ ও ক্রমপ্রসারমান নৈরাশ্যবোধের পথ সৃষ্ট হতে দেয় না। তাকে দেশের জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হয় এবং সেগুলো জনগণের নিকট সহজবোধ্য করে তুলতে হয় ও জনমতকে সরকারী নীতিতে পরিণত করতে হয়। তাকে আবেগের পরিবর্তে যুক্তিকেই প্রাধান্য দিতে হয়। সময় একভাবে অতিবাহিত হয় না। কাজেই, তাকে অনুধাবন করতে হয় যে, একই পন্থা সর্বদা উপযোগী হয় না, যেমন শীতের সময় শরীরে কাপড় জড়িয়ে রাখতে হয় এবং গরমের সময় তা জড়িয়ে রাখা যায় না। একজন সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিবিদ তীক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখে যে, কোন বিকৃত তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে কিনা, কোন গুজব রটছে কিনা, কোনপ্রকার আশঙ্কা সৃষ্ট হয়েছে কিনা এবং সমাজের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রচারণা গ্রহণ করছে কিনা। যেপ্রচারকার্য মানুষের প্রয়োজনকে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে, সমস্যার কারণকে সহজবোধ্য উপায়ে

www.pathagar.com

বর্ণনা করে ও তা সমাধানের পথ বিশদভাবে নির্দেশ করে এবং জনসাধারণের মধ্যে কার্যকরভাবে বক্তব্যের প্রকাশ ঘটায় সেপ্রচারণাই জনসমর্থন লাভে সক্ষম।

সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচারমাধ্যমগুলোকে কোন শক্তিশালী গোষ্ঠী একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে তথ্যাদি বিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। সংবাদপত্রগুলো কেবল রাজনৈতিক তথ্যাদি প্রচার করে না, তাদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিভিন্ন বিষয়েও ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে মতামত ব্যক্ত করে। তবে, একজন সর্ববিষয়ে দক্ষ রাজনিতিবিদকে বুঝতে হয় যে, সব সংবাদপত্রে দেশের সব শ্রেণীর মতামত অবাধভাবে প্রকাশিত হয় না। দেশের রাজনীতি মুষ্টিমেয় বা অল্পসংখ্যক উৎসাহী ব্যক্তির পেশায় পরিণত হলে জাতীয় স্বার্থ ব্যক্তিস্বার্থে পরিণত হয় এবং স্বার্থকামী ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক দলের ভেতর প্রচ্ছন্নভাবে বা গুপ্তভাবে কাজ করে বলে রাজনীতি সমষ্টির কল্যাণে আসে না। তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কর্মসূচির সুষ্ঠু সমালোচনা করতে জানতে হয় এবং কোন্ কাজ কতোটুকু অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হয় তা জানতে হয়। তার দৃঢ় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সুষ্ঠু কর্মসূচি রাজনীতিতে গুণ্ডাপাণ্ডা পোষার ভূমিকা বর্জন করতে সহায়ক হয়। দেশের জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সমাধানে পুরো জনসমষ্টির কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করার মতো দক্ষতা ও কৌশল তার মধ্যে থাকতে হয় যাতে দেশের অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি জোরালোভাবে ত্বরান্বিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতামতের দ্বারা উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়। তবে, তাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় কিনা সেদিকে তাকে নজর দিতে হয়। তাছাড়া, যেকাজে যার নিরপেক্ষ তদারকের দরকার সেকাজ সে-ই নিরপেক্ষভাবে তদারক করলে কল্যাণের পথ সুনিশ্চিত না হয়ে পারে না। তাকে জনগণের মধ্যে মতানৈক্য মীমাংসা করার মতো ধীশক্তির অধিকারী হতে হয়। সে সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণীকে সরকারী নীতিতে বা কর্মকাণ্ডে অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ বা চাপসৃষ্টি করতে দিতে নেই। তার মধ্যে নাগরিকদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করার ও তা সংরক্ষণ করার গুণ বিদ্যমান থাকতে হয়। ব্যক্তিগত লাভক্ষতির কারণে ঘোর অর্থনৈতিক সংকট, বিশৃঙখলা, অরাজকতা ও বিভিন্ন পেশাগত, ধর্মীয় ইত্যাদি গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ববিরোধ কখনোকখনো এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে, সেগুলোর সুশৃঙখল সমাধান ও মীমাংসা অসাধ্য হয়ে পড়ে। এধরনের পরিস্থিতি উদ্ভবের সম্ভাবনার বীজ প্রনষ্ট করার মতো পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ বুদ্ধিমত্তা তার মধ্যে থাকতে হয়। তবে, তাকে সর্বসময় স্মরণ রাখতে হয় যাতে দমননীতির মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছাশক্তি বিনষ্ট না হয়, কেননা যেখানে দমননীতি ও জোরজবরদস্তির মাধ্যমে জনমত গঠন ও প্রকাশের স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করা হয় সেখানে সহজেই বিপজ্জনক পরিস্থিতি উদ্ভুত হয়।

www.pathagar.com

দলীয় নেতা হিসেবে একজন রাজনীতিবিদের ভূমিকা অপরিসীম। তাকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বণ্টনে যথোচিত ভূমিকা পালন করতে হয়। রাজনৈতিক দল একটি সংগ্রামী সংগঠন। তাকে এসংগঠনের মধ্যে সাফল্যের সাথে সংগ্রাম করার নিয়মকানুন মেনে চলার প্রবণতা ও আসক্তি সৃষ্টি করতে হয়। রাজনীতির লড়াই হচ্ছে ক্ষমতার লড়াই। দলীয় সদস্যরা ক্ষমতার লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকা অপরিহার্য। তবে, এতে অস্ত্রের প্রশ্ন আসলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা ও আক্রোশ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীকেই নির্বাচিত করতে হয়। দলের নেতা উপযুক্ত হলেই যে দলের অন্যান্যরা উপযুক্ত তা বলা ঠিক নয়। কাজেই, নেতার যোগ্যতা প্রার্থীদের যোগ্যতা হতে পারে না এবং নেতা এটা উৎসাহিত করতে পারে না যে, তার যোগ্যতার আলোকেই তার দলের প্রার্থীদেরকে তাদের যোগ্যতাঅযোগ্যতা বিবেচনা না করে জনগণ একচেটিয়াভাবে ভোটপ্রদান করে নির্বাচিত করুক। পক্ষান্তরে, নেতা এটা উৎসাহিত করলে তার দলের প্রার্থীরা একচেটিয়াভাবে ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলে শেষপর্যন্ত জনগণ নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়, কেননা এতে দেশের আইনসভা লোকদেখানো অন্তঃসারশূন্য আইনসভাতে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন ধ্যানধারণার অবাধ প্রকাশ থাকে না বলে তার দলের বক্তব্যকেই সত্য হিসেবে মেনে নিতে হয়। কাজেই, জাতীয় স্বার্থে দলনেতা তার দলের প্রার্থীদেরকে তাদের নির্বাচিত হয়ার যোগ্যতা থাকলে নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়ে শক্তিশালী বিরোধী দল টিকিয়ে রাখার প্রবণতা জনগণের মধ্যে জোরদার করা অত্যাবশ্যক। এ বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনাই ক্ষমতাসীন দলের সামনে আয়নার কাজ করে। আয়নাতে যেমন কোন লোক তার চেহারা পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় এ বিরোধী দলের সমালোচনাতে তেমনি ক্ষমতাসীন দল তাদের সবরকম ভুলভ্রান্তি শুধরে বা সংশোধন করে নিতে পারে। তাকে বাছবিচার করে দলের সদস্যপদ দিতে হয় এবং দলের মধ্যে সেনাবাহিনীসুলভ শৃঙখলা বজিয়ে রাখতে হয়। দলের সদস্যরা উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হয় এবং জনসাধারণের তুলনায় তারা উৎকৃষ্টতর গুণাবলীর অধিকারী হতে হয়।

ক্ষমতাসীন দলের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা প্রশাসনযন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। কাজেই, ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিবিদদেরকে সুদক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা চালু রাখতে হয়। প্রশাসনিক অদক্ষতার কারণে কোন বিশেষ নীতির স্বপক্ষে গঠিত জনমতকে যথোপযুক্ত সময়ের মধ্যে কার্যকর করার ব্যর্থতা অনেক সময় ক্ষমতাসীন দলকে বিপর্যয়ের বা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এসব রাজনীতিবিদকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যাতে প্রশাসনযন্ত্রের কাজ সময়োচিত হয় এবং দ্রুতগতিতে.ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। প্রশাসকেরা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। তাছাড়া, সরকারী কাঠামোতে তারা অত্যন্ত

www.pathagar.com

ক্ষমতাশীল। এসব প্রশাসককে দিয়ে ক্ষমতাসীন দল তাদের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা যথোপযুক্তভাবে বাস্তবায়িত করার জন্যে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ও বাস্তববাদী হতে হয় এবং অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের নেতৃত্ব মেনে নিতে হয়, কেননা এরাই এসব প্রশাসকের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। এভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এসব রাজনীতিবিদের জানা প্রয়োজন যে, মানুষের সূক্ষ্মঅনুভূতিগুলোর ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করা যায় না, কারণ একখানি কুঠার যেমন একটি পেন্সিল কাটার পক্ষে অনুপযোগী কোনপ্রকার প্রভাবো তেমনি মানুষের অন্তর্জগৎ ও অন্তর্জীবনের অতি সূক্ষ্মঅনুভূতিগুলোর উন্নয়নে অনুপযোগী এবং ব্যবহারিক জগতে যেরূপ কোন বিষয়ের আতিশয্য ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় চিন্তাজগতেও তদ্রূপ কোন চিন্তাধারার আতিশয্যের ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে বিপরীতমুখী চিন্তাধারা প্রবর্তন করে। এদেরকে প্রশাসনযন্ত্রের কাজের ও দায়িত্বশীলতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করে আদর্শ শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে হয়। তবে, নিরপেক্ষ, দক্ষ, কর্মঠ, নৈতিক,মানবিক,নীতিবান,সহনশীল, সহিষ্ণু, সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল শাসনপরিচালনাই আদর্শ শাসনব্যবস্থা। শাসনতন্ত্রে প্রশাসনযন্ত্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলী বর্ণিত থাকে। কাজেই, কেউ জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে শাসনতন্ত্রবিরোধী কোন কাজ না করাই প্রকৃত আদর্শ। এটার ক্রমবিকাশের জন্যে দলীয় নেতাদের অনন্যসাধারণ প্রভাবের প্রয়োজন। এটা শাসনকার্যকে সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও সুসংহত করে এবং জনগণের মধ্যে সোহার্দ্য বৃদ্ধি পায় বলে জাতীয় অগ্রগতিতে ভাটা আসে না ও অন্তরায় সৃষ্ট হয় না।

মানুষ স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদদের ক্রীড়নকে বা খেলার পুতুলে পরিণত হতে চায় না। তারা চায় তাদের জীবনের অনিশ্চয়তাদূরীকরণ ও নিরাপত্তাপূর্ণ জীবনযাত্রা। যখন কোন বিশেষ কারণে কোন ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় তখন সে জাতীয় স্বার্থের নামে ক্ষমতা আঁকড়িয়ে রাখতে চায়। এজন্যে বিভিন্নভাবে জনগণের কল্যাণের জন্যে সে শাসকশ্রেণীর ওপর নির্ভর করে এবং সুযোগ পেলে রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে ও তার দলকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সে নানা উপায় উদ্ভাবন করে এবং কাজকর্ম এমনভাবে নির্বাহিত হয় যে, শুধু শাসকশ্রেণী এবং সুবিধাবাদীশ্রেণীই লাভবান হয়। কাজেই, রাজনীতির উদ্দেশ্য সুবিধাবাদীশ্রেণী ও শাসকশ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের জন্যে না হয়ে জনগণের স্বার্থসংরক্ষণের জন্যে হলে সুবিধাবাদীশ্রেণী ও শাসকশ্রেণী জনগণের মধ্য হতে বাদ পড়ে না বলে সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়। রাজনীতি করে ক্ষমতাসীন হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করাটা যেদেশে যতোবেশি সেদেশে রাজনৈতিক দলো ততোবেশি এবং দলগুলোর মধ্যে সংঘাতো ততোবেশি। দলীয় নীতিই সরকারী নীতি বা সরকারী নীতিই দলীয় নীতি। তবে, দলীয় নীতি জাতীয় স্বার্থে হলে ব্যক্তিস্বার্থের কথা আসতে পারে না। ক্ষমতা অপব্যবহৃত হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। কাজেই, যেখানে ক্ষমতার

www.pathagar.com

অপব্যবহার হয় না সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকে। স্বেচ্ছাচারিতা দমন করতে গিয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়াটাও স্বেচ্ছাচারিতা। এতে একটি দলই তৎপর থাকে এবং এদলটি সমালোচনামুক্ত থাকে বলে বল্‌গাহীন বা লাগামছাড়া হয়। এবল্‌গাহীনতাও স্বেচ্ছাচারিতা ব্যতীত অন্যকিছু নয়।

যেকোন দলের কৃতকার্যতা নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর নির্ভর করে। একটি দলের কর্তৃত্ব এবং অন্যান্য দলের প্রতি সেদলের দমননীতি নির্বাচকমণ্ডলীর সচেতনতার পথে এক বিরাট অন্তরায়। জনগণের সাথে নিবিড় ও মঞ্জুল বা মধুর সম্পর্ক স্থাপন করা রাজনৈতিক দলেরই কাজ। যখন একটি দলের কারণে অন্যান্য দল জনগণের সাথে নিবিড় ও মঞ্জুল সম্পর্ক রাখতে ব্যর্থ হয় তখন সেদল সমালোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সব ব্যাপারে অবহিত হয় না। এতে এমনএমন সমস্যার উদ্ভব হয় যেগুলোর সমাধান দিতে সেদল ব্যর্থ হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে চাপাক্ষোভ বিরাজ করে যা অদূর ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির জন্যে অমঙ্গলজনক হয়। বিকল্প সরকারের সম্ভাবনা সরকারী দলকে অত্যন্ত সতর্কতার ও সংযমের সাথে শাসনকার্যপরিচালনা করতে বাধ্য করে। তবে, একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ জাতীয় সংকটে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পরামর্শ নিয়ে কাজ করে। তাছাড়া, সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলের সাথে পরামর্শ করে কর্মসূচিগ্রহণ করতে হয় এবং বিরোধী দলের নেতাকে বাস্তবে শাসনকার্যপরিচালনার অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচনা করতে হয়। বিরোধী দলের অস্তিত্ব সম্পর্কে চেতনাই সরকারকে ঠিক পথে পরিচালিত করে। আজ যেকর্মসূচি সরকারের নিকট দাবি করা হচ্ছে ভবিষ্যতে সেটাকেই নিজেদের কর্মসূচি করতে হয়। কাজেই, শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যেদল ক্ষমতায় আসে তাদের মনোভাবানুযায়ী প্রশাসন তাদের তোষামোদে লেগে যায়াটা জাতীয় জীবনে এক বিরাট বিপর্যয়। সরকারী দল চেষ্টা করলেই বিরোধী দলকে দমন করতে পারে। অন্যদিকে বিরোধী দলো অযৌক্তিক বাধা সৃষ্টি করে শাসনকার্যপরিচালনা অসম্ভব করে তুলতে পারে। কাজেই, কোন দলই কোন সময় সাময়িকভাবেও নিজস্ব স্বার্থচরিতার্থ করার জন্যে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেয়াটা আদৌ সমীচীন নয়। যেদল ক্ষমতায় আসে অনেক সময় যোগবিয়োগে দেখা যায় যে, তারা অধিকাংশ জনগণের ভোটে ক্ষমতাসীন নয়। কাজেই, এটা ঠিক নয় যে, সব লোক ক্ষমতাসীন দলের কর্মসূচিকে পুরোপুরি মেনে নেয়। এচেতনার আলোকেই ক্ষমতাসীন দলকে উপযুক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থে কাজ করে এগিয়ে যেতে হয়।

দলপরিচালনে নেতৃত্ব অপরিহার্য। কিন্তু, দক্ষতা ব্যতীত নেতৃত্ব অসম্ভব। এনেতৃত্ব একটি দুর্লভ গুণ। খুবকমসংখ্যক লোকই এগুণের অধিকারী হয়। দলের সাধারণ সদস্যরা সর্বসময় সব ব্যাপারে সমভাবে উৎসুক ও আগ্রহী থাকে না। কাজেই, যাদের

www.pathagar.com

নেতৃত্বের গুণ আছে তারা নেতৃত্বপ্রদানে অগ্রসর হয় এবং সাধারণ সদস্যদের সমর্থন লাভ করে। একজন নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদকে স্মরণ রাখতে হয় যাতে তার প্রতি সাধারণ সদস্যদের সমর্থন শুধু তার নিজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থচরিতার্থ করতে ব্যবহৃত না হয়। তবে, জনগণের প্রভাব ও সক্রিয়তা একেবারে অর্থহীন নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যুগেযুগে জনগণ শুধু স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার প্রতি প্রতিবাদ জানায়নি, তারা সেটার অবসানো ঘটিয়েছে। উত্তম শাসনব্যবস্থার জন্যে রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ গণপ্রতিনিধিদের সমভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হয়, কেননা আজকের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল কাল হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হতে পারে। এদিক দিয়ে একজন রাজনীতিবিদকে সর্বপ্রকার নৈরাজ্য বা যথেচ্ছাচার পরিহার করে চলতে হয়। তাকে সতর্ক থাকতে হয় যাতে মানবতাপ্রতিষ্ঠার নামে আদর্শহীনতা প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং কেউই তার সৃজনশীল ও সুচিন্তিত মনোভাবপ্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত না হয়। যে রাজনৈতিক দলের যেআদর্শই থাকুক-না-কেন এবং তারা যেমতবাদেরই ধারক ও বাহক হোক-না-কেন তাদের কাজ হলো আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে শান্তিশৃঙখলা রক্ষা করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশের দ্বারা জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

বিভিন্ন দলের ধ্যানধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। একজন ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদকে খেয়াল করতে হয় যাতে বিভিন্ন দলের মধ্যে দ্বন্দ্ববিরোধ ও ষড়যন্ত্রের ফলে জনগণের বৃহত্তম কল্যাণ ব্যাহত না হয়। জনগণ যাতে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে অবাধভাবে সাধন করার ব্যাপারে সরকারী বিধিনিষেধ অমান্য করতে গিয়ে কোন জটিল সমস্যা সৃষ্টি না করতে পারে সেদিকে তাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ও সংস্থার মধ্যে সঠিক সম্পর্ক বজিয়ে রাখার মতো জ্ঞান ও কুশলতা তার মধ্যে থাকতে হয়। কার্যকর শাসনব্যবস্থা টেকায়ে রাখার জন্যে ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিবিদদেরকে জনগণের মনোভাব বুঝার ব্যাপারে সম্ভাব্য সব পদ্ধতি কাজে লাগাতে হয় এবং তদনুযায়ী তাদের নীতিগুলোকে জনমতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তাছাড়া, তাদেরকে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের ওপর নতুননতুন সরকারী কার্যব্যবস্থার বিভিন্নধরনের ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হয়। ক্ষমতাসীন দলের সব কাজ জনকল্যাণের উদ্দেশ্য ও উদ্যমেই সম্পন্ন করতে হয়। আইনশৃঙখলা রক্ষা করা এবং সুবিচার সুনিশ্চিত করা যেমন জনকল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য জনগণকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানো তেমনি জনকল্যাণের জন্যে অপরিহার্য। তবে, জনকল্যাণ অন্যযেকোনকিছুর চেয়ে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর যথোচিত ও যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহারের ওপর বেশি নির্ভরশীল। যেসব কাজে মানবিক কষ্ট বা সামাজিক ক্ষতি সৃষ্ট হয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান, যেমন – শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা ও মজুরির হার, শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত নিরাপত্তা, শিল্পের অচলাবস্থা, পেশাজনিত রোগ ও

www.pathagar.com

রোগ ও অন্যান্য ঝুঁকি, যেসব কাজের দায়িত্ব জনগণ নিতে অনিচ্ছুক, যেমন – বনভূমি গড়ে তোলা, খাল খনন করা ও জনপথের গভীরতা বৃদ্ধি, করা এবং জনগণের কল্যাণের জন্যে যেসব প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা বা সম্পদ জনগণের নেই, যেমন – ব্যাপকভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ, নগরায়নের কাজ ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা, সেগুলো ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে সুচিন্তিতভাবে ও বিচক্ষণতার সাথে সুসম্পন্ন করাতে উদ্যমী ও তৎপর হতে হয়।

যেকোন রাজনীতিবিদকে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হয়। মানুষের মধ্যে যাতে কোনপ্রকার নৈরাজ্য সৃষ্ট না হয় সেজন্যে তাকে তাদের নিরাপত্তাবিধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হয়। সে যেকোন জটিল সমস্যার সহজ ও সরল সমাধান দিতে পারতে হয় এবং যেকোন তীব্রসংকট কেটে ওঠার মতো সাহসিকতা ও প্রজ্ঞা বা উৎকৃষ্ট বোধশক্তি তার মধ্যে থাকতে হয়। সে যথাবিহিত ও যথোচিত সদ্ব্যবহারের দ্বারা তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রলুব্ধ করতে পারতে হয়। তাকে জনগণের পথপ্রদর্শক ও পথিকৃত হতে হয়। তার মধ্যে থাকতে হয় সমন্বয় ও ভারসাম্যের চেতনা এবং যশ ও সুখ্যাতির মাধ্যমে তাকে সৃষ্টি করতে হয় গৌরবময় ও স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। তার জানা ও বুঝা দরকার অতীতকে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানে তাকে ভবিষ্যতের জন্যে কর্মপন্থা স্থির করতে হয়। তাকে মেনে নিতে হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের সঙ্গেসঙ্গে মানবিক সম্পর্কাদির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই, তাকে জনগণের মনোভাব মূল্যায়ন করার মতো ধীশক্তির অধিকারী হতে হয়। যখন সত্যের পরিবর্তে অসত্যকে প্রকাশ ও প্রচার করা হয় তখন স্বভাবতই জনসাধারণের মধ্যে ভুলবুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এতে উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ববিরোধের সম্ভাবনা থাকে। এ জটিল পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সমঝোতা অসম্ভব না হলেও কঠিন হয়ে দেখা দেয়। ফলে, দ্বন্দ্ববিরোধের যুক্তিসংগত সমাধানের এবং সরকারী নীতিনির্ধারণে সুচিন্তাপ্রসূত পদ্ধতির অভাবে জনগণের স্বার্থ বিপর্যস্ত বা বিপন্ন হয়। এক্ষেত্রে যথোচিত সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে একজন ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদের দায়িত্ব সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। রাজনীতিবিদদের অজানা থাকার কথা নয় যে, যেদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ রাজনৈতিক দিক দিয়ে অশিক্ষিত তারা তাদের ঐক্য ও সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে অচেতন বা চেতনাশূন্য। তাই, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা কখনো নৈতিকতার স্বীকৃত নীতিগুলো অগ্রাহ্য না করে মেনে চলতে হয়। তারা সচেতন হতে হয় যাতে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে দেশে প্রচলিত সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস না হয়। এজন্যে তাদেরকে বলপ্রয়োগনীতি ও দমননীতি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হয়। তাদের কেউই এককভাবে নেতা হয়ার প্রয়াস না চালিয়ে দলের

www.pathagar.com

সবার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটাবার পন্থাগ্রহণ করতে হয়। তাদের কেউই নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী তার ক্ষমতানির্ধারন করতে নেই। তার ক্ষমতা যাতে আইনগতভাবে সুনির্দিষ্ট ও সীমিত থাকে। তাকে আত্মসংযমের পরিচয় দিতে হয়, কেননা তার বলগাহীন ও যথেচ্ছ আচরণ তার নিজের ও তার দলের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। তার প্রভাবের ও ক্ষমতাচর্চার ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই তার দলের পরামর্শ ও সমর্থন গ্রহণ করতে হয়। তাকে দ্বন্দ্বসংঘাত দূরীভূত বা অপসৃত করতে পারতে হয় এবং শ্রেণীগত, অর্থনৈতিক, বর্ণগত ও অন্যান্যধরনের স্বার্থগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে হয়। সে রাষ্ট্রকে সামরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করতে হয় এবং রাষ্ট্রের মানবসম্পদ ও বস্তুসম্পদের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারতে হয়।

রাজনৈতিক ক্ষমতা বলগাহীনভাবে বা যথেচ্ছভাবে চর্চা করলে দুর্নীতিপরায়ণতা বৃদ্ধি পায়। রাজনীতিবিদদের ভূমিকা ও অগ্রবর্তিতা বলিষ্ঠ হতে হয় যাতে বিভিন্নশ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে আপসরফা ও সামঞ্জস্যবিধান করতে গিয়ে দেশের সংখ্যালঘুদের স্বার্থজলাঞ্জলি না যায়। তারা যাতে তাদের ভুলভ্রান্তি ধামাচাপা না দেয় বা অন্যায়ভাবে লোকচক্ষু হতে অপসারিত না করে এবং তাদের কার্যকলাপসম্পর্কিত সঠিক তথ্যাদি গোপন না রাখে, কেননা এগুলো চিরদিনের মতো ধামাচাপা দেয়া ও গোপন রাখা যায় না। তারা উপলব্ধি বা হৃদয়ঙ্গম করা বাঞ্ছনীয় যে, হিংসাত্মক, নৈতিকতাবিহীন ও অবৈধ উপায় অবলম্বন করে বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। ক্ষমতা স্থায়ী নয়। দু'দিন আগে বা দু'দিন পরে একজন ক্ষমতায় আসে এবং অপরজন ক্ষমতাচ্যুত হয়। এটাই বিধির বা বিধানকর্তার বিধান। কাজেই, ছলেবলেকৌশলে ও জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ার বা ক্ষমতা আঁকড়িয়ে ধরার খেয়াল বাদ দিয়ে প্রত্যেক রাজনীতিবিদ জাতীয় স্বার্থে ও মানবকল্যাণে উদ্বুদ্ধ ও উৎসর্গীকৃত হলে জাতীয় অগ্রগতির সাথেসাথে মানবতার দ্বার উন্মোচিত বা বন্ধনমুক্ত হয়। রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্য কতোটুকু সফল হবে তা নির্ভর করে তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ওপর। তাই, প্রজ্ঞার সাথে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে সম্মুখবর্তী বা অগ্রবর্তী হতে হয়।

একজন রাজনীতিবিদকে খেয়াল করতে হয় যাতে কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হচ্ছে এমন সুবিধা যেটার দ্বারা ব্যক্তি তার স্বীয়স্বার্থ বিনা প্রতিবন্ধকতায় রক্ষা করতে পারে। তাকে আরো লক্ষ্য করতে হয় যাতে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কার্যাদিতে অংশগ্রহণ করার সুবিধা হতে বঞ্চিত না হয়। সে যাতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদিতে তার স্বমতপ্রকাশের সুযোগসুবিধা হতে কোনক্রমেই বঞ্চিত না হয়। শিক্ষাই একজন নাগরিককে স্বমতপ্রকাশে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। কাজেই, এজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের অনন্য কর্তব্য হচ্ছে প্রতিটি নাগরিক শিক্ষিত হয়ার সুযোগ

www.pathagar.com

সৃষ্টি করা এবং তার দলের স্বার্থকে নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ব্যবহার করা। জ্ঞানের মাধ্যমে সত্যকে লাভ করা যায়। জ্ঞানবিজ্ঞান চিন্তা করার ও ভাবপ্রকাশ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। জনগণ একদিকে সার্বভৌম বা সর্বোচ্চ হবে এবং অপরদিকে অবহেলিত ও শোষিত হবে তা হতে পারে না। জনগণের নিরাপত্তা, শৃঙখলা ও কল্যাণের সাথে সংগতি রেখে তাদেরকে সর্বাধিক পরিমাণে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সম্ভাব্য উপায়ে ব্যাপকতর সুযোগসুবিধা প্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাতে রাজনীতিবিদদেরকে প্রয়াস, অর্থাৎ পরিশ্রমের সাথে চেষ্টা, চালাতে হয়। তবে, সব জনসাধারণ কখনো কোন ব্যাপারে একই মনোভাব বা মতামত পোষণ করে না এবং কোন অভিন্ন সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে না। তারা জনগণের মধ্যে মতানৈক্য বা মতভেদ মীমাংসার সুযোগসৃষ্টি করে দিতে হয়। মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সামাজিক জীব। এবিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেই তারা তাদের সব সমস্যা সমাধান করে তাদের ভাগ্যের ও অবস্থার উন্নতিসাধনকল্পে সচেষ্ট বা উদ্যোগী। সুনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও সুচিন্তিত মতামতের ও সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তবে, কখনোকখনো মানুষ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে আবেগের বশবর্তী হয়ে তাদের মতামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। হিংসা ও প্রতিহিংসাকে ঘৃণার চোখে দেখতে হয়, কেননা এগুলো মানুষের বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও সুচিন্তিত মতামতে এক বিরাট অন্তরায়। এজন্যে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব বর্জন করে বিবর্তনকে বা ক্রমোৎকর্ষকে গ্রহণ করতে হয়। ফলে, সমাজের মানুষ অধিকতর উদ্ভাবনশীল, উৎপাদনশীল, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ও নৈতিকতাবাদী হয়। মানুষের সুনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে তা সংকুচিত করা মানে তাদের বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও সুচিন্তিত মতামতকে অস্বীকার করা। স্বাধীনতার সাথে বিচারবুদ্ধি ও সুচিন্তার সমন্বয় থাকতে হয় এবং ক্ষমতা কার্যাবলীর সাথে সমানুপাতিক হতে হয়। তাছাড়া, স্বাধীনতার ও কর্তৃত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজিয়ে রাখতে হয়, কেননা এভারসাম্যের অভাবে স্বাধীনতা উচ্ছৃঙখলতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত বা রূপান্তরিত হয়।

যেকোন রাজনীতিবিদকে ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে হয় যে, আইন সার্বজনীন এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োজ্য ; কিন্তু আদেশ তা নয়। আদেশের সম্পর্ক শাসনের সাথে, আইনের সাথে নয়। আইন আদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং আইন ও আদেশের মধ্যে অপ্রতিভ বা যুগপৎ বিব্রত অবস্থা রাষ্ট্রের শৃঙখলা নষ্ট করে। আইনপ্রণেতারা আইন যথার্থভাবে পালন করতে হয় ; কিন্তু আদেশপ্রদানকারীরা আদেশ মান্য না করেও পারে। আদেশের ক্ষেত্রে একশ্রেণী আদেশ জারি করে আর একশ্রেণী তা গ্রহণ করে ; কিন্তু আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিয়মশৃঙখলা রক্ষিত হয়। ক্ষমতাসীন দলই

www.pathagar.com

সরকার। কাজেই, প্রকৃতপক্ষে সরকারই সব ক্ষমতার অধিকারী এবং এদিক দিয়ে সরকার ও রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন। তবে, ক্ষমতাসীন দলের কোন চরম ক্ষমতা নেই, কারণ তাদের ক্ষমতা আইন দ্বারা সীমিত। রাজনীতি সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে পারে। এজন্যে দরকার কুশলতা, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও নিপুণতা। কুশলতার দ্বারা মানুষের কলহপ্রিয় ও আক্রমণাত্মক প্রবণতা প্রতিহত করা সম্ভব। এতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ঐক্য ও ধারাবাহিকতা বজিয়ে রাখা যায়। পারিবারিক জীবনে পিতা যেমন শিশুর সব নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধান করে নাগরিক জীবনে তেমনি ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ ও আইন ব্যক্তির নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে। কল্যাণব্রতী আইন মানুষের বিভিন্নধরনের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ, কেননা এআইন বিভিন্নস্তরের মানুষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে তাদের জীবনধারণের উপায়উপকরণ সুনিশ্চিত করে। তাই, আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদেরকে নিবেদিত, অভিজ্ঞ, পরিস্থিতির জটিলতাসম্পর্কিত জ্ঞানসম্পন্ন, উত্তম বিচারবিবেচনাসম্পন্ন ও সদিচ্ছাশীল হতে হয়। আইনপ্রণয়নকারী রাজনীতিবিদদেরকে হতে হয় জনগণের কণ্ঠস্বর এবং তাদেরকে জনগণের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে হয় ঐকান্তিকভাবে কাজের মাধ্যমে। তারা ভুলে গেলে চলে না যে, সমাজের বিভিন্নশ্রেণীর পরস্পরবিরোধী ও পরস্পরপ্রতিকূল স্বার্থগুলোর বহিঃপ্রকাশের মধ্যে নিঃস্বার্থ আইন প্রণয়ন করা একটি জটিল ব্যাপার। ফলে, অভ্যন্তরীণ অমীমাংসিত বিরোধগুলো আরো জটিল আকার ধারণ করে এবং নিঃস্বার্থ আইনের অভাবে গণজীবন দুর্বিসহ বা দুঃসহ হয়ে ওঠে। আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হতে হয় সমাজের সার্বিক কল্যাণসাধন করা। বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে আইনেরো পরিবর্তন হয় এবং এপরিবর্তনের মাধ্যমে অনগ্রসর সমাজ প্রগতিশীল সমাজে রূপান্তরিত হয়। কাজেই, আইনকে একটি স্থিতিশীল শক্তি না বলে গতিশীল শক্তিরূপে পরিগণিত করতে হয়। আইন মান্য করলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সুনাগরিকের সংখ্যা বেশি হলে আইনের প্রতিফলন বা প্রতিবিম্বপাত বেশি হয়। তাছাড়া, যেআইন জনমতকে অনুসরণ করে চলে এবং জনকল্যাণের রূপটি প্রকাশ করে তা সহজেই স্বীকৃতি লাভ করে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাতে আছে অর্থনৈতিক অগ্রগতি। কাজেই, অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর নির্ভর করেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সম্ভব। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক যন্ত্রের মাধ্যমে এসম্ভাবনাকে কাজে রূপান্তরিত করা যায়। কাজেই, প্রশাসনে যে যেকাজের উপযুক্ত সে যাতে সেকাজে নিয়োজিত থাকে একজন ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয় বা দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে হয়। তাকে এমন অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় যাতে জনসাধারণ বেকারজীবন হতে রেহাই পায়

www.pathagar.com

এবং চাকরিতে সচ্ছল বা সংগতিপন্ন জীবনযাপন করতে পারে। যেকাজে উৎসাহ ও প্রেরণা থাকে না তাতে কোন কর্মচারী আনন্দ পায় না। তাই, বিভিন্ন সুবিধার মাধ্যমে সচ্ছলতা সৃষ্টির দ্বারা কর্মচারীদের কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগানো চাই এবং বহু লোকের শ্রম ও কষ্টের বিনিময়ে যাতে কিছু লোক বিলাসবহুল জীবন কাটানোর সুযোগ না পায়। সবাই স্বীয় স্বার্থরক্ষার্থে ব্যস্ত থাকলে এবং পরের কথা একটুও না ভেবে অনুক্ষণ স্বস্ব কল্যাণের কথা ভাবলে স্বাভাবিকভাবেই নৈতিক অবনতি ঘটে এবং অন্যায়ভাবে ও অসদুপায়ে স্বার্থরক্ষার প্রবণতা প্রকট ও বীভৎস হয়। তবে, সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এটা দূর করতে হয়। এতে রাষ্ট্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যেহিংসাবিদ্বেষ থাকে তা দূর হয়, রাষ্ট্রের ঐক্য জোরদার হয় এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে সবাই সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতি অর্থনৈতিক দিক হতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চায়। কাজেই, রাজনীতি অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়, কেননা নাগরিক জীবনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদান পরস্পর নির্ভরশীল। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা এটা দেখা অতীব প্রয়োজন যে, জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবেলা করার জন্যে যে নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয় তা যাতে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের জন্যে কোন বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে না দেয়া। অর্থনৈতিক সংকট একটি জটিল সমস্যা। এসমস্যার উপযুক্ত সমাধানের ওপর মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতমান নির্ভর করে। এসমস্যার উপযুক্ত সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়ে কোনক্রমেই স্বেচ্ছাচারী হয়া উচিত নয়। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতার কারণে একদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা অপরদেশের অনুরূপ সমস্যাকে প্রভাবিত করে। কাজেই, নিজদেশের সমস্যাবলী সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী পর্যালোচনা করা অত্যাবশ্যক।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। জনসাধারণ চায় সামাজিক নিরাপত্তা, পূর্ণ কর্মসংস্থান ও উচ্চমানের জীবনধারণের উপায়। কাজেই, এপরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হতে হয় বর্ধিত উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের সুষম বণ্টন ও ভোগ, শুধু পরিকল্পনার খাতিরে পরিকল্পনা নয় এবং অর্থনৈতিক মালিকানা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা একই হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়। অর্থনৈতিক ও মর্যাদাগত পার্থক্য হতেই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয় এবং অর্থনৈতিক ও মর্যাদাগত দ্বন্দ্ববিরোধ হতেই একটি রাজনৈতিক দল তার প্রাণশক্তি, স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব অর্জন করে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা বা সতেজ করে তোলা এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান বজিয়ে রেখে জনকল্যাণসাধন করা। তারা কর আরোপণের ক্ষমতাচর্চার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার সাধারণ মানকে প্রভাবিত করতে পারে। তাছাড়া, জাতীয় অর্থনীতির ওপর সরকারী অর্থব্যবস্থা বেশি প্রভাব বিস্তার

www.pathagar.com

করে বলে সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কাজটি দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে জনমত ও অপরদিকে ক্ষমতার দণ্ড–এ দুটোর সংঘাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। কাজেই, জনসাধারণের সম্পদ বৃদ্ধির, মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের এবং দেশের স্বাধীনতারক্ষা ও প্রতিরক্ষাক্ষমতার দৃঢ়তার জন্য জাতীয় জীবন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হতে হয়। এতে দেশের প্রতিটি মানুষই সমাজউন্নয়নে সাধ্যমত অংশগ্রহণ করতে পারে এবং কাজ করাটা একটি সম্মানজনক ব্যবস্থাতে পরিণত হয়। উন্নয়নমনা ক্ষমতাসীন দল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুতায়নের জন্যে এমন সব নীতি গ্রহণ করতে পারে সেগুলোতে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

অর্থনৈতিক সাম্যের অভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সৌখিন পোশাকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কাজেই, যেসমাজব্যবস্থা সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেখানেই জনসাধারণ প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। অর্থনৈতিক সাম্যবিহীন সমাজে সবাই জরাগ্রস্ত। অর্থনৈতিক সাম্য বলতে বুঝায় বিশেষ প্রয়োজনীয় অভাবের পরিতৃপ্তি। সমাজে প্রকৃত সাম্যের জন্যে শুধু প্রাপ্তবয়স্কদেরকে সমান ভোটদানক্ষমতা প্রদান করলে চলে না, সাম্যনীতি সমাজজীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়। অর্থনৈতিক সাম্যের অভাবে রাজনৈতিক সাম্য বাস্তব রূপলাভ করতে পারে না। সম্পদবণ্টনে মাত্রাতিরিক্ত বৈষম্য থাকলে মানুষের পক্ষে রাজনৈতিক অধিকারগুলোর সমান সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় না। বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় অল্পসংখ্যক ধনী ব্যক্তি সাধারণ মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত বা হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক সাম্য না থাকলে জনগণ আইনের দিক দিয়েও সুবিচার পেতে পারে না। বিত্তশালী ব্যক্তিরা অন্যায় করেও অর্থের জোরে শাস্তি এড়াতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তিরা অর্থের অভাবে সুষ্ঠুভাবে তাদের মামলাপরিচালনা করতে না পারায় অনেক সময় ন্যায়বিচার হতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক জীবনে সর্বক্ষেত্রে সাম্যনীতি প্রবর্তিত না হলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হয়। বিচক্ষণ রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে সমষ্টিগতভাবে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থে অর্থনৈতিক সাম্যের পথ সুগম ও কণ্টকমুক্ত করা।

সংবিধানই রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রকৃত পথ প্রদর্শন করে। কাজেই, একটি দেশের সরকার ও শাসনব্যবস্থার উৎস হচ্ছে সংবিধান। কোন রাজনীতিবিদ সংবিধানের কোন অংশের যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে হলে তাকে সে অংশটি সংবিধানের অন্যান্য অংশের সাথে একসঙ্গে অধ্যয়ন করতে হয়। তবে, সংবিধানে সমাজের বিভিন্নশ্রেণীর আশাআকাঙ্ক্ষা, ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হতে হয় এবং সেগুলো বাস্তবায়নের

www.pathagar.com

জন্যে রাজনীতিবিদদেরকে নিরলসভাবে বা আলস্যহীনভাবে কাজ করে যেতে হয়। স্বাধীনতা মানুষের এমন একটি অধিকার যাতে অন্যান্যের ন্যায্য অধিকারগুলো লংঘিত হতে দেয়া যায় না। তবে, স্বাধীনতার মূলনীতি হচ্ছে ন্যায়বিচার এবং ন্যায়বিচারের রক্ষাকবচ হচ্ছে আইন যার ভিত হচ্ছে সংবিধান, কেননা এর মৌলনীতিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তা রচনা করতে হয়। কাজেই, রাজনীতিবিদদেরকে স্মরণ রাখতে হয় যে, জনগণের নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণের জন্যেই সংবিধান। জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষা ও ধ্যানধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সংবিধানের যখন যেঅংশটি পরিবর্তন করা দরকার তখন তা করা বাঞ্ছনীয়। তবে, যখনতখন যেসেভাবে শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত বা সংশোধিত হলে তাতে ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধার অনুপ্রবেশ ঘটে বলে দেশের ক্রমবিকাশ ঘটানো দুরূহ হয়। তাই, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্যের বা শ্রেষ্ঠতার কথা এসে যায়। শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাই সরকারের সব ক্ষমতার উৎস। পরিবর্তন ও সংশোধনের দ্বারা এউৎসকে একনায়কত্বে রূপান্তরিত করাই ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধার অনুপ্রবেশ বা অবৈধভাবে প্রবেশ। এতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে কোনক্রমে ক্ষুণ্ন হলে তারা সেটার প্রতিবিধান বা প্রতিকার করতে পারে না, অর্থাৎ সেটা নিবারণের বা দূরীকরণের কোন উপায় অবলম্বন করতে অপারগ হয়। সংবিধানানুযায়ী তাদের অধিকারগুলো সুরক্ষিত হলে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হতে পারে। তবে, শুধু শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ বা ব্যবস্থাপিত থাকলেই নাগরিক অধিকারগুলো সুরক্ষিত হতে পারে না। এগুলো কোনভাবে ব্যাহত হলে প্রতিকারের উপায় থাকা একান্ত আবশ্যক। এদিক দিয়ে তারা যেকোন বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হতে পারে এবং কোনপ্রকার অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে এটা ক্ষুণ্ন করা যায় না। কাজেই, শাসনতন্ত্রবিরোধী কোন কাজ কেউ জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে না করাই আদর্শগত নীতি। এক্রমবিকাশের জন্যে ক্ষমতাসীন দলীয় নেতাদের অনন্যসাধারণ প্রভাবের প্রয়োজন। এটা শাসনকার্যকে সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও সুসংহত করে এবং জনগণের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় বলে জাতীয় অগ্রগতিতে ভাটা আসে না। প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রের অগ্রগতি রাজনীতিবিদদের নৈতিকতার ওপর নির্ভর করে, সংবিধানের ওপর নয়। রাজনীতিবিদদের নৈতিক অধঃপতন দেখা দিলে সংবিধান যতো উত্তমই হয়-না-কেন রাষ্ট্রের কাঠামো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে।

এক রাজনৈতিক দলের রাজনীতিবিদ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য তুলনামূলকভাবে জানতে হয়। তার মধ্যে থাকতে হয় মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তাগুলো দূর করার আগ্রহ। তাকে এমন ভূমিকা পালন করতে হয় যাতে জনসাধারণ স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদদের ক্রীড়নকে পরিণত না হয়। তাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্যের মধ্যেকার পার্থক্য জনগণের নিকট পরিষ্কার করে তুলে ধরতে

www.pathagar.com

হয়। তাকে তার নিজনীতির ভিত্তিতেই জনসাধারণের নিকট তার বক্তব্য পেশ করতে হয়। তাকে জনগণের রাজনৈতিক অজ্ঞতা, নিষ্ক্রিয়তা ও নির্লিপ্ততা দূরীকরণার্থে যথোপযুক্ত কাজ করতে হয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিবিদেরাই তার সমালোচক। তারা তার কাজের সমালোচনার মাধ্যমে তার ত্রুটিগুলো উদ্‌ঘাটন করে। ফলে, সে তার ত্রুটিগুলো সহজে সংশোধন করে নিতে পারে, অনমনীয়তা ও দায়িত্বহীনতা থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং কল্যাণব্রতী হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। তাকে স্মরণ রাখতে হয় যে, দেশের জনসাধারণ কিছুকালের জন্যে একবার একদলকে সমর্থন করে ও পরে অন্যদলকে সমর্থন করতে পারে এবং একটি দল ক্ষমতায় এসে তাদের নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে এবং এপরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হলে বিরোধী দলো ক্ষমতায় এসে তাদের পূর্ববর্তী দলের দ্বারা গৃহীত কর্মপন্থা অব্যাহত রাখতে পারে। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা কপট ও দুর্নীতিপরায়ণ হলে জনগণকেই সেটার খেসারত বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তাদের শোষণ ও নির্যাতনের চেয়ে তাদের ভুল ও নির্বুদ্ধিতা জনগণের জন্যে কম দুঃখদুর্দশা বয়ে আনে না। তাদেরকে দ্রুত সমস্যানির্ণয় করতে সক্ষম হতে হয় এবং নির্দ্বিধায় কাজ করতে পারতে হয়। তারা হতে হয় সাহসের অধিকারী, কেননা কোন সাহসী ও নির্ভীক মানুষ প্রকৃতভাবে মরার আগে বারবার মরে না এবং একজন কাপুরুষ প্রকৃতভাবে মরার আগে বারবার মরে। যেকোন উত্তম প্রস্তাবকে স্বীকৃতিদানের গুণ তাদের মধ্যে থাকতে হয় এবং তাদেরকে তা তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে গ্রহণ ও অন্তর্ভুক্ত করার কৃতিত্বের অধিকারী হতে হয়। তারা তাদের মহত্ত্বকে উপযুক্ত ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ করে জনসাধারণকে অভিভূত ও বিমুগ্ধ করতে পারে। তারা এমন গুণাবলীর অধিকারী হতে হয় যেগুলো তাদেরকে সম্মোহনীশক্তিসম্পন্ন করে তুলতে পারে এবং তারা তাদের আচারাচরণে জনগণের নিকট অসাধারণ, মহান ও রহস্যময় বলে প্রতীয়মান হতে হয়।

ক্ষমতালাভ করে তা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করাটাই একটি রাজনৈতিক দলের কলাকৌশল। এটাকে সম্ভবপর করে তুলতে হয় মানবপ্রকৃতি অনুধাবন এবং অতীত থেকে আহরিত অসংখ্য উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের আলোকে বর্তমানে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। তবে, ইতিহাসই অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধ বা সংযোজন। যে ইতিহাসের শিক্ষাগ্রহণ করে না তাকে একদিন–না–একদিন ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। একজন সফলকাম রাজনীতিবিদকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে হয় যে, কিভাবে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহ রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও স্খলন ঘটায়। তাকে আরো জানতে হয় কিভাবে

www.pathagar.com

ও ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে সদ্ভাবের অভাবে রাজনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সামাজিক শক্তিগুলোকে রাজনীতির সর্বাঙ্গীণ দীক্ষায় দীক্ষিত হতে হয় এবং প্রথাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ সাধিত হতে হয়। তা না হলে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজমান থাকে জটিলতা ও সামঞ্জস্যের অভাব। তাছাড়া, সর্বজনস্বীকৃত ও লালিত কোন রাজনৈতিক রীতিনীতি না থাকলে যে যেভাবে খুশি কাজ করে। এতে লুটেপুটে নেয়ার রাজনীতিটাই সুস্পষ্ট।

সাধারণত, রাজনীতিবিদেরা ক্ষমতায় আরোহণকালে সামাজিক স্বার্থের প্রবক্তা ও জাতীয় স্বার্থের নিশানবরদার হয়ে ওঠে। ফলে, এসময় গলাবাজ রাজনীতিবিদদের আবির্ভাব ঘটে এবং ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রবল হুমকি শোনা যায়। অথচ, ক্ষমতায় গিয়ে তারা এ ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতের মুঠোতে ঢুকে যায় এবং এদের নিকট নিজেদেরকে বিকিয়ে দেয়। এটা জাতি ও দেশের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও মোনাফেকি। যেদেশে রাজনৈতিক দল যতোবেশি সেদেশে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অভাব ততোপ্রকট। একজন প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অনুসন্ধান ও সত্যানুসন্ধানের গৌরবময় নবদিগন্ত উন্মোচন করতে পারে এবং ভারসাম্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে সক্ষম। তাছাড়া, সে অনুধাবন করতে পারে যে, অতিরিক্ত চাপের বা শূন্যতার দরুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সময়েসময়ে বিভিন্নধরনের সংকটের সম্মুখীন হয়। জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টির আলোকে তার সময়োচিত পদক্ষেপ এসংকট উত্তরণ বা অতিক্রম করতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে সমাজে বৈধ, শৃঙ্খলারক্ষাকারী ও রূপান্তরসাধনকারী ব্যবস্থা। এব্যবস্থা তার অভ্যন্তরীণ দিক থেকে পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে যেকোন সংকট কেটে ওঠতে বা দূর করতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা, ভারসাম্য ও অস্তিত্ব রক্ষা করা ছাড়াও তাকে কাম্য পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতিবিধানের উপযোগী করে ব্যবস্থাটির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে এবং যেপরিস্থিতি এব্যবস্থার অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে তা এড়িয়ে যেতে পারতে হয়। তাকে সদা সতর্ক থাকতে হয় যাতে বিপরীত ঘটনাপ্রবাহে ব্যবস্থাটির অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়। তাকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হয় যে, কিভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংযুক্ত এবং কোন্‌ধরনের রাজনৈতিক বিকাশের সাথে কোন্‌ধরনের অর্থনৈতিক বিকাশের সংস্রব বা সম্বন্ধ থাকে।

অধিকাংশ মানুষ অনাদিকাল থেকে মুষ্টিমেয় লোকের আধিপত্যের কাছে বারবার পরাভূত হচ্ছে। কোন দল যতোবেশি বিকাশলাভ করে তাদের কার্যক্রমপরিচালনা এতো অবাধ হয় যে, তারা ততোবেশি ক্ষমতা হস্তগত করে কায়েমীস্বার্থে বা কায়েমীস্বার্থবাদী লোকে পরিণত হয়। তারা বাগ্মিতা এবং বিভিন্নধরনের পদ্ধতি ও

www.pathagar.com

হুজুগের বা গুজবের দ্বারা জনতাকে বোকা বানায়। তারা একবার ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছতে পারলে তাদের পতন ঘটানোর সাধ্য কার। তাদের আধিপত্য কমানোর জন্যে আইন পাস হলেও তারা দুর্বল হয় না, বরং দুর্বল হয়ে পড়ে আইন। বিপ্লব ঘটে, স্বেচ্ছাচার অপনোদিত হয় ; কিন্তু সহসাই আবার নতুন স্বেচ্ছাচার জন্ম নেয় এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতি ঠিক আগের মতোই চলতে থাকে। এমনকোন রাজনীতিবিদ আছে কি যে এগুলো চিন্তাভাবনা করে নিজেকে মানবতার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে উৎসর্গ করে ধন্য হতে পারে? স্বার্থকে কেন্দ্র করেই দল আর স্বার্থই দলের কর্মতৎপরতার গতিশক্তি। তবে, সচেতন রাজনীতিবিদদের পরম কাজ হচ্ছে জাতীয় স্বার্থকে দলীয় স্বার্থে রূপান্তরিত করা, কেননা জাতীয় স্বার্থসিদ্ধি হলে দলীয় স্বার্থ তার থেকে বাদ পড়ে না। তাদের মনমগজে এটা স্থান পেতে হয় যে, মানুষের স্বাধীনতার জন্যে সম্পদের সুষম বণ্টনের চেয়েও ক্ষমতাবণ্টনের পর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুঞ্জীভবনের ন্যায় রাজনৈতিক ক্ষমতার পুঞ্জীভবনো মানুষের সৃজনশীল উদ্যমের পক্ষে ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক। ক্ষমতার নেশা বিরক্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব তীব্রতর করে এবং নিষ্ঠুর দমনমূলক শাসনব্যবস্থা কায়েম করে। এতে মানুষের মধ্যে অসহায়তা ও নির্জীবতা সৃষ্ট হয়। একজন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদকে এগুলো পরিহার করে এগিয়ে যেতে হয়। এজন্যে অনেক সময় তাকে ক্ষমতাগ্রহণ করার চেয়ে ক্ষমতাগ্রহণ না করে ক্ষমতা বেশি খাটিয়ে এগুলো প্রতিহত করতে হয়। আকাঙ্ক্ষিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যার্জনের উপযোগী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাকে তার ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে হয়। এতে তার রাজনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত না হয়ে পারে না। তাকে যে যেটার জন্যে প্রশংসনীয় তার সেটার প্রশংসা করতে হয়। তাকে কলহের বা অস্ত্রের রাজনীতি পরিহার করে যুক্তি ও শান্তির রাজনীতির বীজ বপন করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও কৃষ্টিগত বিকাশের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিকাশসাধন করার জন্যে অবিরাম কাজ করে যেতে হয়। এতে বিকাশী বা বিকাশশীল রাজনীতিই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশসাধন করতে পারে। এজন্যে তাকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থানপতনের ইতিহাসের আলোকে বুৎপত্তি অর্জন করতে হয়।

মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসেবের দিক দিয়ে দেশ অতি অগ্রসর হলেও ব্যক্তিমানুষ অবদমিত হতাশা, বিক্ষোভ, সংঘাত ও হিংসাবিদ্বেষে গুমরে মরতে থাকলে রাজনৈতিক বিকাশ সাধিত হতে পারে না। কাজেই, রাজনৈতিক বিকাশ দীর্ঘপ্রেক্ষিতে উচ্চতর হারে জাতীয় উৎপাদনের সাথেসাথে তুষ্ট ও তৃপ্ত জনসাধারণের ওপর নির্ভর করে। এজন্যে যেরাজনীতিবিদ রাজনৈতিক বিকাশে অবদান রাখতে চায় সে এমন একব্যক্তি যে জনসাধারণের সাথে সুখে বাস করতে চায়। তাছাড়া, দলের প্রতি

www.pathagar.com

আনুগত্যকে ও জাতির প্রতি আনুগত্যকে এক করে দেখা হলে এবং দলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণকে দেশ ও জাতির প্রতি বিরুদ্ধাচরণ বলে ধরে নিলে রাজনৈতিক বিকাশ সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এতে জাতীয় ঐক্যসাধন অসম্ভব হয় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এধারণা বদ্ধমূল হয় যে, রাজনৈতিক দলই জাতির ভেতর অনৈক্য আনে ও উন্নয়নপরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত করে। তাই, ক্ষমতাসীন দলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ঐক্যসাধনের ও অবাধ উন্নয়নপরিকল্পনার মাধ্যমে রাজনৈতিক বিকাশের সংকট নিরসনে তাদের ও তাদের দ্বারা গঠিত সরকারের সাফল্যের ওপর। জাতীয় নীতি নির্ধারণকে প্রভাবিত করাতে রাজনৈতিক দলের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এজন্যে তাদেরকে দ্বিমুখী যোগাযোগ চ্যানেলের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। একদিকে তাদেরকে জনগণের দাবিদাওয়া ও স্বার্থগুলোর মূর্তপ্রতীক হতে হয় এবং অপরদিকে তারা জনগণকে রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান ও কর্মসূচি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করতে হয়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ। কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি তার সদস্যদের মনোবৃত্তির, বিশ্বাসের, অনুভূতির ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এ রাজনৈতিক সংস্কৃতিই নাগরিকদের রাজনৈতিক মাত্রাবোধ ও মূল্যবোধের প্রতীক। কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক মতৈক্য তার স্থায়িত্বের স্বপক্ষের শক্তিকে জোরদার করে। অন্যদিকে, তার লক্ষ্য ও কাঠামোগত চরিত্র নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্যের অভাব তার ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে। এজন্যে একজন সচেতন রাজনীতিবিদকে তার অধিকার, কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকতে হয়। তাছাড়া, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণে ও তা মূল্যায়নে তার নিবিষ্টতা অত্যন্ত প্রকট হতে হয় এবং তাকে সংকীর্ণতামুখী রাজনীতি পরিহার করে চলতে হয়। তাকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনসাধারণের মনোভাবের এবং সরকারী নীতি ও সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক ও যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারতে হয়। তাকে রাজনীতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে মনমানসিকতা সৃষ্টি করতে হয় এবং মূল্যবোধপ্রতিষ্ঠা করে এটার অগ্রগতিসাধন করতে হয়। এমনমানসিকতা ও মূল্যবোধকে বলা হয় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। এর সাহায্যেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংরক্ষিত ও পরিবর্তিত হয় এবং শিশুদের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ার পথে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক মনোবৃত্তির ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। মানুষের মনোবৃত্তি, অর্থাৎ স্মৃতি, চিন্তা, বিচার, সংকল্প প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া, কোন একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকে না। অভিজ্ঞতার আলোকে এটা কখনো অপরিবর্তিত অবস্থায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে,

www.pathagar.com

আবার কখনো পরিবর্তিত হয়। শিশুদের মধ্যে যেসব রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তি জাগ্রত হয় বয়স বাড়ার সাথেসাথে তাদের মধ্যে সেগুলোর আমূল পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। তাছাড়া, হঠাৎ একটা বা কতকগুলো ঘটনা গোটা সমাজকে আলোড়িত করে অনেক মানুষের জীবনে নতুন রাজনীতির ভূমিকা ও নতুন মূল্যবোধের আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে।

কোনকোন রাজনৈতিক দল কোনকোন অসামান্য ব্যক্তিত্বের দ্বারা জনসাধারণের ওপর ঢের বা যথেষ্ট মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করে, কেননা এধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অতিসহজেই লোকের আচরণ ও মনোবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এধরনের ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর পরো সেদল তাকে ভিত্তি করে সেদলের প্রতি সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু, একজন প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে তা করতে হয়। তাকে পারতে হয় সামাজিক ও আর্থিক সংকটজনক সমস্যাবলীর যথোপযুক্ত ও সময়োচিত সমাধান দিয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। রাজনৈতিক বিকাশের স্থায়িত্বের জন্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের পাশাপাশি রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারার ওপর তীক্ষ্নজর রাখতে হয়। তদুপরি, দেশের অগ্রগতির পাশাপাশি নজর রাখতে হয় রাজনৈতিক মতদীক্ষার ব্যক্ত ও সুপ্ত উভয়বিধ ধারার ওপর। এমতদীক্ষার প্রক্রিয়ার মাধ্যমগুলো হলো পরিবার, বিভিন্ন বিদ্যালয়, বন্ধুমহল, পঠনপাঠন, চাকরিকালীন অভিজ্ঞতা, প্রচারমাধ্যম ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সরাসরি সম্পর্ক। তবে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদক্ষতা ও দুর্নীতির দরুন দেশ যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কবলে পড়লে নাগরিকদের মনোভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বদলে যায় এবং ঘটনার চাপে অনুগত ব্যক্তি হয় বিদ্রোহী, মিত্র পর্যবসিত হয় শত্রুতে ও সহযোগিতার মনোভাবের পরিবর্তে জন্ম নেয় আগ্রাসনী মনোভাব। তাই, রাজনৈতিক মতদীক্ষা যেমন সমদর্শী বা মতবিরোধহীন ও ধারাবাহিক হতে পারে তেমনি বহুদর্শী বা মতবিরোধপূর্ণ ও অধারাবাহিক হতে পারে। সমদর্শী রাজনীতিবিদদেরকে সজাগদৃষ্টি দিতে হয় যাতে স্বার্থকেন্দ্রিক গ্রুপ মাঝেমাঝে বিভিন্ন ব্যপদেশে বা অজুহাতে চাঙ্গা হয়ে ওঠতে না পারে, কোন মহল অর্থনৈতিক ও পেশাগত লাভালাভের উদ্দেশ্যে সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে না পারে এবং হাঙ্গামাবাজ স্বার্থগ্রুপ হৈ-হল্লোড় করে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ঢুকে না পড়ে। তাছাড়া, সমাজের মধ্যে কোনকোন গ্রুপ তাদের স্বার্থ ও চাহিদা জ্ঞাপনের কোন সুযোগ না পেলে তাদের অভাবঅভিযোগ অপূর্ণই থেকে যায়। এমনিভাবে অনেক অভাবঅভিযোগ অপূর্ণ থেকে গেলে সেগুলো একযোগে একসময় বিস্ফোরণ ঘটায়। তবে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ওসব গ্রুপই হাঙ্গামায় ও বিক্ষোভে সবচেয়ে বেশি নেমে পড়ে যাদের হারাবার আশংকা

www.pathagar.com

কম এবং সব বিক্ষোভ যেমন সার্বজনীনবিমুখতা ও হতাশার অভিব্যক্তি বা সম্যক প্রকাশ নয় এগুলো তেমনি রাজনৈতিক ব্যবস্থা উৎখাতের সুপরিকল্পিত কার্যব্যবস্থাও নয়। কখনোকখনো বিশেষবিশেষ সংস্কৃতি বিক্ষোভের চেতনাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। স্বার্থজ্ঞাপন আবেগবিজড়িত ও কট্টর বা চরম হতে পারে। আবেগবিজড়িত স্বার্থজ্ঞাপনে থাকে কৃতজ্ঞতা, ক্ষোভ, হতাশা ও আশাবাদের অভিব্যক্তি আর কট্টর স্বার্থজ্ঞাপনে থাকে দরকষাকষি ও তার পরিণতি কি হবে সেসম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি নিয়েই তা করা হয়। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদেরকে তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে হয় যে, কোন্ স্বার্থজ্ঞাপন আবেগবিজড়িত ও কোন্ স্বার্থজ্ঞাপন কট্টর এবং তদনুযায়ী তাদেরকে সুচিন্তিত পথ ও পন্থা অবলম্বন করে অগ্রসর হতে হয়।

মানুষ যেমন পরস্পর নির্ভরশীল পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের তেমনি অভ্যন্তরীণ ব্যাপারাদি ছাড়াও বাইরের ব্যাপারাদি আছে। বাইরের ব্যাপারাদি আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক ব্যাপার। এজন্যে একজন রাজনীতিবিদকে জানতে হয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি হতে হয় ঐক্য, সামঞ্জস্য, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা। তাছাড়া, এনীতির লক্ষ্য হতে হয় দেশের সংহতি, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন, জাতীয় নিরাপত্তা, দেশের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করা এবং জাতীয় মর্যাদা সংরক্ষণ করা। তবে, বাস্তবতার আলোকেই এসব নীতি ও লক্ষ্য কার্যকর ও অর্জন করতে হয়। বৈদেশিক নীতি কার্যকরভাবে প্রণয়ন করাটা নির্ভর করে ক্ষমতাসীন দলের ওপর এবং ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিবিদদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যে, বহু রাজনৈতিক দল থাকলে এবং সাধারণ সম্মতি সহজলভ্য না হলে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করার ব্যাপারটা অনেকটা জটিল হয়। বৈদেশিক নীতি বাস্তবায়নের কোন চূড়ান্ত উপায় বা পর্যায় নেই। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অপরিবর্তনশীল নয়। এটা পরিবর্তনশীল। কাজেই, বৈদেশিক নীতি বিচক্ষণতার সাথে কার্যকর করতে হয় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সেটাকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে দীর্ঘস্থায়ী মৈত্রী ও শান্তি স্থাপনের প্রয়াস চালাতে হয়। তাদেরকে এসব দেশের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ, নিবিড়তম ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। তাদেরকে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হয় যাতে এসব দেশের সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উত্তরোত্তর বা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তারা ঘৃণা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বপূর্ণ জগতে সাফল্যের সাথে নিরপেক্ষ নীতি বজিয়ে রাখতে সক্ষম হতে হয়। তারা নিজস্বনীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তিতে বিশ্বাসী হতে হয়। তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়। তারা

www.pathagar.com

বিশ্বাস করতে হয় যে, শান্তির পথই মানবগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির পথ এবং সামরিক জোট ধ্বংসের পথ। বিশ্বের ইতিহাসে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধের বা শান্তির যুগ কখনো আসেনি। তাই, শান্তি ও নিরাপত্তার আশায় সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদবিসংবাদ নিষ্পত্তির প্রচেষ্ঠা চলে আসছে এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসাই শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার একটি অন্যতম ব্যবস্থা। যৌথ নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসা যুদ্ধরোধ করার দু'টি পন্থা। তবে, শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ছাড়া যৌথ নিরাপত্তার কথা কল্পনাও করা যায় না। যৌথ নিরাপত্তার সাথে একত্রিত হয়ে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায়বিচারের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বশৃঙখলা আনতে সক্ষম।

আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আন্তর্জাতিক জীবনযাত্রার এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তার নিজস্ব প্রয়োজনেই অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসাবাণিজ্য করতে হয়। কিন্তু, প্রত্যেক রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপরিচালনা করতে গিয়ে তার অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের ওপর এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে তার অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্নমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে। এসব নিয়ন্ত্রণ অভ্যন্তরীণ কল্যাণসাধনের বা অন্যকোন রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে গৃহীত হতে পারে। এভাবে জাতীয় নীতি বাস্তবায়নের জন্যে যেসব নিয়ন্ত্রণ কলাকৌশলের মাধ্যমে আরোপ করা হয় সেগুলোকে অর্থনৈতিক হাতিয়ার বলে অভিহিত করা হয়। এসব হাতিয়ার হচ্ছে শুল্ক, আন্তর্জাতিক কার্টেল, আন্তঃসরকার পণ্যচুক্তি, কম মূল্যে পণ্য বিক্রি (ডামপিং), অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ক্রয়, শত্রু সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ, ঋণ ও অনুদান, পণ্য বিনিময় চুক্তি, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, কোটা ও লাইসেন্স, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাণিজ্য, সাবসিডি বা ভর্তুকি, দুষ্টসূচি, মুল্যহার বৃদ্ধি বা স্থিরীকরণ এবং এম্বার্গো ও বয়কট। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আন্তর্জাতিক সমস্যা যতোই জটিল হচ্ছে নতুননতুন অর্থনৈতিক হাতিয়ারের জন্ম ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই, আজকের দিনে অর্থনীতিই হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল। কিন্তু, এসব হাতিয়ারকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করা হয়েছে, কারণ অন্যান্য রাষ্ট্রকে আঘাত করার বা তাদের ক্ষতিসাধনের জন্যে কোনকোন রাষ্ট্র এগুলো প্রয়োগ করে থাকে। এগুলোর প্রয়োগকে খুবসহজে সমালোচনা করা যেতে পারে ; কিন্তু এপ্রয়োগ রহিত করা সহজসাধ্য কাজ নয়। বস্তুত, কিভাবে এপ্রয়োগ রহিত করা যায় সেটাই আধুনিক বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মারত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু, এটা লক্ষণীয় যে, অবাধ ও সহজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক

www.pathagar.com

আদর্শ বাস্তবায়নের পথে আধুনিক সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো তাদের সার্বভৌমত্বের বলে বিরাট বাধার সৃষ্টি করে। তাছাড়া, নিজেদের নাগরিকদের প্রতি তাদের কর্তব্য এবং বিশ্বসমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য–এ দু'য়ের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে পার্থক্য নির্দেশ করা একটি কঠিন কাজ। এসব কারণেই এসব হাতিয়ারের প্রয়োগ রহিত করা খুব কঠিন। এসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও একথা সত্য যে বিগত চার দশকে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের বিকাশের সঙ্গেসঙ্গে অনেক রাজনীতিবিদই এধারণার বশবর্তী হয়েছে যে, সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনের পথে যেবাধা রয়েছে তা দূর করা প্রয়োজন। তাছাড়া, কোন রাষ্ট্র একচেটিয়াভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর যেসব উপায়ে তার ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে পারে সেগুলোর প্রয়োগো সীমিত করা প্রয়োজন। বর্তমানে যদিও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এটা লক্ষণীয় যে, তারা তাদের জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থের দিকে পুরোপুরিভাবে মনোনিবেশ করছে তবুও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বা বিশ্বঅর্থনীতির স্বার্থসংরক্ষণের প্রতি প্রয়াস চালানো হচ্ছে। এপ্রয়াসকে সার্থক করে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বা বিশ্বঅর্থনীতি সমৃদ্ধ করার পথে কাজ করার দায়িত্ব প্রত্যেকটি সচেতন রাজনীতিবিদের।

রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে কূটনীতি অত্যাবশ্যক। বিশ্বের সমস্যা যতোই জটিল হচ্ছে কূটনীতির গুরুত্ব ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের জটিল সমস্যাগুলো সমাধানের একমাত্র পথ হলো কূটনীতি। কূটনীতির ইতিহাস হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস অনুসন্ধানের একটি অন্যতম ক্ষেত্র। তাই, আজ কূটনীতির গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। কোন রাষ্ট্রের মতাদর্শগত লক্ষ্যসীমায় পৌছার প্রয়াসে যে বৈদেশিক নীতিনির্ধারণ করা হয় তার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনই হচ্ছে কূটনীতির সারকথা। তবে, কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি অভিন্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে, কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণ আলাদা ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে পররাষ্ট্র সম্পর্কের সারবস্তু আর কূটনীতি হচ্ছে পররাষ্ট্রনীতিকে কার্যে প্রয়োগ করার পদ্ধতি। একজন কূটনৈতিক রাজনীতিবিদকে গণতান্ত্রিক কূটনীতি, গোপন বনাম উন্মুক্ত কূটনীতি, সর্বাত্মক কূটনীতি, সম্মেলন কূটনীতি ও ব্যক্তিগত কূটনীতির ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। একজন কূটনৈতিক রাজনীতিবিদের কাজ হচ্ছে তার কূটনৈতিক কার্যাবলীর মাধ্যমে তার দেশের স্বার্থসংরক্ষণের জন্যে তার দেশকে ঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করা, অন্যদেশ সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রেরণ করা এবং অন্যদেশের সাথে ফলপ্রসূ আলাপআলোচনা করা। কূটনৈতিক পর্যায়ে তাকে একজন ভালো সংবাদদাতা ও ব্যাখ্যাদাতা হতে হয় এবং যেদেশে সে কূটনৈতিক ব্যাপারে যায় সেদেশ সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা থাকতে হয়।

www.pathagar.com

বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রে শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। তাই, জাতীয় শক্তি ছাড়া কোন জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। জাতীয় শক্তি হচ্ছে একটি রাষ্ট্র কর্তৃক জাতীয় স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত যথোপযুক্ত ক্ষমতা। একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদকে সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে জাতীয় শক্তির উপাদানগুলোর সময়োপযোগী ও যথোপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার ভূমিকা পালন করতে হয়। যেরাষ্ট্রে জাতির মনোবল সুদৃঢ়, জাতীয় চরিত্র নিষ্কলুষ ও সুন্দর, জনগণের মধ্যে সামাজিক সাদৃশ্য আছে, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের প্রতি জনগণের বিশ্বাস গভীর এবং জনসমাজে কোন্দল কম সেরাষ্ট্রের জাতীয় শক্তি অধিক হতে বাধ্য। আধুনিক বিশ্বে ক্ষুধাই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাই, অভাবদূরীকরণ, প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান এবং খাদ্যের ক্ষেত্রে পরনির্ভলশীলতা পরিহার জাতীয় শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। জাতীয় শক্তির উপাদান হচ্ছে ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা ও লোকবল, প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষিজাত ও শিল্পজাত উৎপাদন, সামরিক সংগঠন, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিক্ষার মান, জাতীয় মনোবল ও চরিত্র এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থান। প্রতিটি রাষ্ট্রই জাতীয় শক্তির এসব উপাদানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করছে। জাতীয় শক্তির জন্যে একটি দেশের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবস্থান এমন হয়া প্রয়োজন যাতে তাকে পরনির্ভরশীল না হতে হয়, কেননা পরনির্ভরশীল কোন রাষ্ট্র কখনো নিরংকুশ জাতীয় শক্তির অধিকারী হতে পারে না।

একজন রাজনীতিবিদকে জাতীয়তাবাদের চেতনাতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেউপকারিতা ও অপকারিতা রয়েছে সেসম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। তবে, তাকে দেশাত্মবোধ ও ঐক্যবোধের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা সমুন্নত ও সমুজ্জ্বল রাখতে হয়। জাতীয়তাবাদের বিকৃতরূপ অত্যন্ত ভয়ংকর, বিভীষিকাময়, শান্তি ও উন্নতির পরিপন্থী এবং সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সহায়ক। জাতীয়তাবাদের রূপ থেকেই একদিন সাম্রাজ্যবাদ গড়ে ওঠেছিলো এবং অনুন্নত জাতিগুলোর প্রতি অকথ্য উৎপীড়ন মানুষকে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছিলো। তাই, আজ রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে এরূপ বিকৃত জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত করা। তবে, এমুক্তি জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের উপযুক্ত সমন্বয়ের মাধ্যমেই সম্ভব। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ চরম পর্যায়ে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার কারণেই জাতীয়তাবাদের

www.pathagar.com

অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দীর্ঘদিন ধরে কোন জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আশাআকাঙক্ষা পূরণের কোন সম্ভাবনা না থাকলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে ; কিন্তু সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের নীতি স্বীকৃতি পেলে এবং উপনিবেশিকতা, অর্থনৈতিক শোষণ ও জাতিতে জাতিতে বিরাট বৈষম্য সমূলে উৎপাটিত হলে জাতীয়তাবাদ মানব সভ্যতার সমৃদ্ধির পথ প্রসারিত করতে পারে। তাই, বর্তমান কালে রাজনীতিবিদদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আশাআকাঙক্ষাকে আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে বিকশিত করে তোলা। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের ধরন যেরকমই হোক-না-কেন এগুলো এবং বর্ণবৈষম্যবাদ সভ্যতার চরম শত্রু। আন্তর্জাতিক রাজনীতিবিদদের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছাপূর্ণ হস্তক্ষেপই এসবের অবসান ঘটাতে পারে। বর্তমানে শক্তিসাম্যনীতিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি প্রধান ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে, কেননা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য। শক্তিসাম্য হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যাতে পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে শক্তির বণ্টন এমনই যথার্থ যে কেউ কারো ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে না। শক্তিসাম্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তিরক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। তবে, যেকোন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের শেষ চিহ্নটুকুরো অবলুপ্তি, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা এবং শক্তিসাম্য রক্ষার কৌশলগুলোর, বিশেষতঃ নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টার, সফলতাই এআদর্শে পৌছতে বিপুলভাবে সাহায্য করতে পারে।

কোন প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ তার রাজনৈতিক দলের সদস্যদেরকে যা-তা করার লাইসেন্স দিতে পারে না। এধরনের লাইসেন্স পেলে তাদের অনেকেই হিতাহিতজ্ঞান বা ভালোমন্দবোধ হারিয়ে ফেলে এবং জনসমাজে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। কোন সদস্য যাতে দলের নামে বা দলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ না পায় এবং কোন নাগরিকের প্রতি জোরজুলুম ও নির্যাতন না করতে পারে। দলের কোন সদস্যের কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে সে তার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয়ে আদালতে তা করবে। এঅভিযোগকারী-সদস্য যাতে দলের নামে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বিচারককে প্রভাবিত করতে না পারে সেদিকে দলনেতাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এতে আইন শান্তিশৃঙখলারক্ষার ক্ষেত্রে একটি অনন্য বা অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন করতে পারবে, কেননা আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায়প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তিশৃঙখলা রক্ষা করা, আইনের

www.pathagar.com

প্রতি জনসাধারণ শ্রদ্ধাশীল হবে এবং কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ থাকবে না বলে বিচারকেরা নির্বিঘ্নে আইনসম্মতভাবে বিচারকার্যপরিচালনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে পারবে। দলে ষণ্ডাপাণ্ডা বা গুণ্ডাপাণ্ডা থাকলে তাদেরকে হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু, এরা দলকে এমন একপর্যায়ে নিয়ে যায় যেখানে এরা দলের জন্যে কাল বা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাকেও গর্হিত বা জঘন্য কাজে ব্যবহার করলে তাকে গর্হিত বা অতীব নিন্দিত সুযোগসুবিধা না দিয়ে পারা যায় না, কেননা গর্হিত কাজ করে গর্হিত সুযোগসুবিধা না পেলে সে বিরুদ্ধাচরণ করবে। ফলে, শেষপর্যন্ত দলের ষণ্ডাপাণ্ডাদের গর্হিত কাজের সীমাপরিসীমা বা অন্ত থাকে না বলে জনগণ শান্তিশৃঙ্খলা ও নিশ্চয়তার অভাবে অতিষ্ঠ বা অস্থির হয়ে ওঠে এবং যেকোন একপর্যায়ে দলের পতন ঘটে।

এমন অনেক রাজনীতিবিদ আছে যারা ঘনঘন রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করে। একেক দলের একেক আদর্শ ও কর্মসূচি থাকে। একজন রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক কর্মীর একটি আদর্শ থাকে। তার কয়েকটি আদর্শ থাকতে পারে না। তাই, বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে বিচারবিশ্লেষণের পর যে রাজনৈতিক দলের আদর্শ ও কর্মসূচি যার নিকট গ্রহণযোগ্য সে সেদলের রাজনীতিবিদ বা কর্মী হয়। তারপর সে তার দলের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা না থাকলে বা তার দলের পতন ঘটলে বা তার দল ক্ষমতাচ্যুত বা পরাজিত হলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনাময় দলে বা যেদল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সেদলে যোগ দিলে তাকে সত্যিকারার্থে রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক কর্মী বলা যায় না, সুবিধাবাদী, স্বার্থপর ও ক্ষমতালিপ্সু বলা যায়। এধরনের রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীদের আদর্শ বলতে কিছুই। নেই। এরা যেদলে যোগ দেয় এদের কারণে সেদল একভাবে-না-একভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিক দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যেদলের যথার্থ নীতি আছে সেদল এদেরকে গ্রহণ করতে পারে না। তবু, সেদল এদেরকে এটা মনে করে গ্রহণ করে যে, সেদলের রাজনীতিবিদের ও কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তবে, রাজনীতিবিদের ও কর্মীর সংখ্যা এভাবে বৃদ্ধির জন্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকারী কোন আদর্শ ও নীতিহীন সুবিধাবাদী, স্বার্থপর ও ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদকে বা রাজনৈতিক কর্মীকে সেদলে গ্রহণ করা অবাঞ্ছনীয় ও চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ। কাজেই, একদলের রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক কর্মী অপরদলে স্থান না পেলে আদর্শ ও নীতিহীন সুবিধাবাদী, স্বার্থপর ও ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীদের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন প্রতিহত হবে বলে রাজনৈতিক পরিবেশ অনেকটা ঝঞ্ঝাটমুক্ত বা ঝামেলা ও জটিলতামুক্ত থাকবে।

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন দল ব্যক্তিগত শত্রুতা উদ্ধারের ও প্রতিশোধগ্রহণের প্রবণতা বর্জন করা বাঞ্ছনীয়, কেননা এপ্রবণতা দলের পর দলের বা গোষ্ঠীর পর গোষ্ঠীর চলতে থাকলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয় এবং সাময়িকভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থচরিতার্থ হয় বটে ; কিন্তু কালক্রমে ওসব ব্যক্তিরাও প্রতিশোধের ও শত্রুতার করালগ্রাস বা ভয়ানক কবল হতে নিষ্কৃতি পায় না। এটা কারো জন্য হিতকর নয়, সবার জন্যে অহিতকর। এপ্রসঙ্গে বলতে হয় যে, যার ধোঁকা দেয়ার অভ্যাস সে ধোঁকাই দেবে এবং যেটা ভুলের মধ্যে শুরু হয় সেটা ভুলের মধ্যেই শেষ হয়। কোন অংক ভুলভাবে কষা শুরু করলে তার ফল কখনো মিলবে না এবং ভুলের মধ্যে তা যতোভাবেই কষা হবে না কেন তার শুদ্ধ ফল পায়া যাবে না। অথচ, তা শুদ্ধভাবে কষে তার শুদ্ধ ফল বের করতে না পারলে পরীক্ষায় নম্বর না পেয়ে অকৃতকার্যই হতে হয়। এঅকৃতকার্যতা জীবনসংগ্রামে ব্যর্থতা ছাড়া অন্যকিছু নয়। রাজনীতিতে ব্যক্তিগত শত্রুতার ও প্রতিশোধের অব্যাহত গতি সম্পূর্ণরূপে ভুল পন্থা। এ ভুল পন্থায় শত্রুতা উদ্ধার ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্ভব ; কিন্তু রাজনীতির যে মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের ও জাতির অগ্রগতি তা বিভিন্নদিক দিয়ে ব্যাহত হয়, কেননা এ ভুল পন্থার রাজনীতি শত্রুতা ও প্রতিশোধপরায়ণতার রাজনীতিতে পর্যবসিত হয়। যেকোন রাজনৈতিক দলের রাজনীতিবিদদের অভিব্যক্তি, এ'যে, তারাই শৃঙখলা, শান্তি ও অগ্রগতির অগ্রদূত ও পথিকৃত। কিন্তু, বাস্তবে তারা বিস্মৃত যে, বিশৃঙখলা, অশান্তি ও অনগ্রগতির পথে কখনো শৃঙখলা, শান্তি ও অগ্রগতি অর্জন করা যায় না। রাজনীতিবিদেরা সত্যিকারার্থে শৃঙখলা, শান্তি ও অগ্রগতির অগ্রদূত ও পথিকৃত হতে হলে তাদেরকে শত্রুতা ও প্রতিশোধপরায়ণতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে এবং ধৈর্য, সহনশীলতা ও স্থিরতার মূর্তপ্রতীক হতে হবে।

রাজনীতি অর্থনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কেননা যে ক্ষমতাসীন দল অর্থনৈতিক উন্নয়ন যতো ত্বরান্বিত করতে পারে সেদলের প্রতি জনগণের আস্থা ততো বাড়ে। কাজেই, প্রত্যেক দলেরই অর্থনৈতিক কর্মসূচি থাকে। একর্মসূচির গতিপ্রকৃতি যা-ই হোক-না-কেন মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষির ও শিল্পের উন্নয়ন। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে যেদল ক্ষমতায় আসে সেদল ক্ষমতাচ্যুত দল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেখানে গিয়ে থামে সেখান থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং প্রয়োজনবোধে নতুন ক্ষেত্রে নতুন কর্মপন্থা অবলম্বন করে। এতে জাতীয় স্বার্থে তাদের মনে কখনো এভাব বা ধারণার উদ্রেক হয় না যে তারা অন্যদলের কর্মসূচিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু, অনুন্নত ও উন্নয়নগামী দেশগুলোতে এটা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এসব দেশে যেদল বা গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসে সেদল বা গোষ্ঠী সাধারণত ভাবে যে, তারা অন্যদলের বা গোষ্ঠীর অসম্পূর্ণ কর্মসূচি সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

করার পথে এগিয়ে গেলে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হবে এবং জনগণ ভাববে যে, তারা নতুনভাবে কিছু না দিতে পেরে অন্যদলের কর্মসূচিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেদলইতো ভালো ছিলো। এআশংকায় তারা অন্যকায়দায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুনভাবে পা বাড়ায়। এতে পূর্ব দলের কর্মসূচি অনুযায়ী অগ্রসরমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায় বলে জাতি এক বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এভাবে একদল অপরদলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেয়াতে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতো সাধিত হয়ই না, বরং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জগাখিচুড়িতে পরিণত হয় বলে জাতীয় জীবনে জনগণের কপালে থাকে দুর্ভোগ ও দুর্দশা এবং তাদের মধ্যে সর্বসময় নৈরাশ্য ও হতাশা বিরাজ করে। দেশ ও জাতিকে উন্নত করতে হলে অনুন্নত ও উন্নয়নগামী দেশগুলোর রাজনীতিবিদদের মনমানসিকতা উন্নত দেশগুলোর রাজনীতিবিদদের মতো উন্নত হতে হবে এবং তারা উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া, তারা যখনতখন যেসেভাবে যেকোন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের প্রবণতা বাদ দিতে হবে। কর্মসূচির ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে যেক্ষমতাসীন দল যতোবেশি সাফল্য দেখাতে পারবে সেদল জনগণের নিকট ততোবেশি সমাদৃত ও গ্রহণীয় হবে। তবে, মতবাদগত কর্মসূচির কথা আলাদা। কোন সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দল ক্ষমতায় আসলে তারা গণতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক ও ইসলামতান্ত্রিক কর্মসূচির ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে না, কেননা তাদের কর্মসূচি এসব কর্মসূচির সম্পূর্ণ বিপরীত। অপরদিকে, ইসলামতান্ত্রিক কোন দল ক্ষমতায় আসলে তারা অন্যকোন দলের কর্মসূচির ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে না, কেননা ইসলামের কর্মসূচি ওসব কর্মসূচি থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। তবে, একই মতবাদের ওপর বিভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন দল আছে এবং এসব দলের একদল ক্ষমতাচ্যুত হলে এবং অপর একদল ক্ষমতার আসন গ্রহণ করলে সেদল পূর্ববর্তী দলের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা তাদের চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল করে রক্ষা করতে পারে।

হত্যার পরিসমাপ্তি হত্যাতেই, অপসারণের পরিসমাপ্তি অপসারণেই, প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার পরিসমাপ্তি প্রতিশোধেই ও প্রতিহিংসাতেই এবং অত্যাচারঅবিচারের পরিসমাপ্তি অত্যাচারঅবিচারেই ঘটে। এটা আমার কথা নয়। এটার সাক্ষ্য বহন করছে রাজনৈতিক ইতিহাস ও ক্ষমতার লড়াইয়ের ইতিহাস। তাই, মানুষ কথায় বলে যে, যেভাবে উৎপাত সেভাবে নিপাত। কিন্তু, এধরেনর উৎপত্তি ও পরিসমাপ্তিতো কোন মানুষের কামনা হতে পারে না। ক্ষমতাপ্রাপ্তিতো এধরনের উৎপত্তি ও পরিসমাপ্তির জন্যে নয়। ক্ষমতাপ্রাপ্তি হচ্ছে কাজের মাধ্যমে যশ ও খ্যাতি অর্জনের জন্যে। উপরোক্ত উৎপত্তি ও পরিসমাপ্তিতে কি যশ ও খ্যাতি নিহিত? আবশ্যই না। যশ ও খ্যাতি নিহিত থাকে

www.pathagar.com

শান্তিপূর্ণ উৎপত্তি ও পরিসমাপ্তিতে। কাজেই, প্রত্যেক রাজনীতিবিদকে শান্তিপূর্ণ উৎপত্তি ও পরিসমাপ্তির উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হতে হয়। এতে রাজনীতির ইতিহাস হয় গৌরবোজ্জ্বল ও সোনালী। প্রত্যেক দলই জাতীয় অগ্রগতিসাধনে ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে দৃঢ়সংকল্প ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যেদল ক্ষমতায় থেকে জাতীয় অগ্রগতিসাধনে ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নে অপারদর্শী বা ব্যর্থ হয় শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ বলবৎ থাকলে জনগণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেদলকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারে এবং সেদলের অপরিণামদর্শিতা ও ব্যর্থতা দেখে অন্যকোন দল অত্যুৎসাহী হয়ে অরাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অশান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে সেদলকে ক্ষমতাচ্যুত করার আবশ্যকতা থাকে না। অন্যদলের অরাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এঅত্যুৎসাহ প্রমাণ করে যে, সেদল অবশ্যই ক্ষমতালোভী এবং ক্ষমতালাভের জন্যে সেদল যেকোন পর্যায়ে যেতে পারে। এপর্যায় দাঙ্গাহাঙ্গামার পর্যায়, এমনকি হত্যার পর্যায়ো হতে পারে। অপরদিকে, ক্ষমতাসীন দল তাদের অপরিণামদর্শিতা ও ব্যর্থতা আঁচ বা আন্দাজ করতে পারলে এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে যে, প্রয়োজনবোধে শেযপর্যন্ত একনায়কত্ব কায়েম করে। এটাও ক্ষমতার একটি চূড়ান্ত পর্যায়। কাজেই, বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রত্যেকটি দলই ক্ষমতালোভী এবং যেকোন দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার বা ক্ষমতা অর্জন করার জন্যে রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্বরতম অধ্যায় পর্যন্ত পৌছতে এবং সভ্যতার ইতিহাসকে কলংকিত করতে পারে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জিত না হলে যে, জাতীয় অগ্রগতিসাধন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যায় না তা সম্পূর্ণরূপে একটি ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা। যেকোন লোক নিজের ন্যায়সঙ্গত ও নিঃস্বার্থ কাজের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতির ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। সার্বিক অগ্রগতির ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন নেই তা নয়, প্রয়োজন আছে। কিন্তু, লোভ না থাকবেতো রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্বরতম অধ্যায় পর্যন্ত পৌছে বা সভ্যতার ইতিহাসকে কলংকিত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করবে কেন? তাই, কোন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদের এধরনের ক্ষমতার লোভ বা মোহ থাকতে পারে না। সে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হলে তার দায়িত্ব হচ্ছে শুধু কাজ করে যায়া। সে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বা প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করতে না পারলেও ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করবে যে, সে একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ এবং সে শুধু কাজ করে, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে না। তাছাড়া, একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদের কাজ ছেড়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ার সময় কোথায়।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে জাতীয় নির্বাচনের সব আয়োজনের মাধ্যমে তাতে অংশ নেয়াটা রাজনৈতিক দলের একটা সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন রাজনীতিবিদের বুঝা দরকার যে, জাতীয় জীবনে এধরনের নির্বাচন অত্যন্ত অশুভ। এতে জাতির উপকার না হয়ে অপকারই হয়ে থাকে। ক্ষমতাসীন দল এভাবে নির্বাচনে জয়যুক্ত হলে স্বভাবত বা সংগত কারণে প্রশ্ন ওঠে যে, প্রশাসন, পুলিশ ও নির্বাচনী কাজে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষ এদলের ভয়ে বা যেকোন কারণবশতঃ এদলের পক্ষে কাজ করেছে এবং নির্বাচনে কারচুপি বা শঠতা হয়েছে। তাছাড়া, পরাজিত দলগুলোতো উক্তধরনের প্রচার ও প্রপাগাণ্ডা করেই। ক্ষমতাসীন দল স্বভাবতই উত্তরে বলে যে, প্রশাসন, পুলিশ ও নির্বাচনী কাজে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের পক্ষেতো কাজ করেইনি বরং তাদের বিপক্ষে কাজ করেছে এবং তাদের পক্ষে নির্বাচনে কারচুপির প্রশ্নই ওঠে না। এটাই এদলের উত্তর হলে একটা নির্দলীয় সরকার গঠন করে নির্বাচনের সময় সাময়িকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের নিকট হস্তান্তর করে নির্বাচনে অংশ নিতে এদলের কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়। তাছাড়া, এদল ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন দিলে এদলের কর্মীরা সন্ত্রাস, দাঙ্গাহাঙ্গামা, ভয়ভীতি ও জোরজবরদস্তির মাধ্যমে এদলের পক্ষে ভোটপ্রদান করানোর সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায়, ক্ষমতাসীন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের নৈতিকতা, সততা ও মনোবল থাকলে তারা সব দলের মতানুসারে একটা অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠন করে, নির্বাচন শেষ না হয়া পর্যন্ত, তাদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করে নির্বাচনে নামতে পারে। এ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই সব দল ও জনগণ চায়।

নির্বাচনে টাকা দিয়ে ভোট কেনার একটা প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু, যে নির্বাচনে অংশ নেয় সে বলে যে, নির্বাচিত হলে সে দেশ ও জনগণের সেবায় তাকে নিয়োজিত করবে। যার এআদর্শ ও উদ্দেশ্য সে টাকা দিয়ে ভোট কিনবে কেন? আসলে তার আদর্শ ও উদ্দেশ্য এটা নয়। তার আদর্শ বলতে কিছুই নেই। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে টাকা দিয়ে ভোট কিনে হলেও নির্বাচিত হয়ে বিভিন্নভাবে স্বীয় স্বার্থচরিতার্থ করা। নীতিবান রাজনীতিবিদেরা এঅপকর্ম করতে পারে না। সব দলের পেছনেই কমবেশি বড়বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও পুঁজিপতি রয়েছে। দলগুলোর টাকাপয়সা সাধারণত এদের থেকেই আসে। কিন্তু, কোন দলই এটা স্বীকার করে না। অথচ, যেদলই ক্ষমতায় আসে তারা এসব ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের স্বার্থের প্রতিকূলে তেমনকোন কাজ করতে পারে না। যেকোন নীতি ও কর্মপন্থা এদের দ্বারা সহজে প্রভাবিত হয়। যেসব রাজনীতিবিদ দেশ ও জনগণের সার্বিক স্বার্থ ও কল্যাণ চায় তারা টাকার জন্যে কোনক্রমেই উক্ত শ্রেণীর লোকের করায়ত্ত হতে পারে না। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদেরা

www.pathagar.com

আপনজন, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকে, কেননা এদের কারণে অনেক সময় বিপাকে বা দুর্ভোগে পড়তে হয়, এমনকি জীবন ও ক্ষমতা হারাতে হয়। এদেরকে কোন ব্যাপারেই যা-তা করার লাইসেন্স দিতে নেই। এদের যেকোন কথা ও প্রস্তাব বিচারবিশ্লেষণ করে অগ্রসর হতে হয়। এদেরকে উপযুক্ততার বাইরে কোনকিছু করতে দিতে নেই। এসব কারণে এরা অভিমানী হলেও কিছু যায়আসে না, কেননা এরা দেশের ও জাতির এবং দেশীয় ও জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে নয়।

কোন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলই প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদেরকে সেদলের হাতের পুতুল মনে করা অনুচিত। সরকার যেনীতি নির্ধারণ ও যেপরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের নিজনিজ পরিসরে বা পরিমণ্ডলে সেনীতি নির্বাহ ও সেপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। কিন্তু, ক্ষমতাসীন দল নির্ধারিত নীতি ও গৃহীত পরিকল্পনার বাইরে এদের দ্বারা যখনতখন যেসেভাবে যেসে কাজ করিয়ে নিলে এনীতি ও এপরিকল্পনা ব্যাহত হয়। এতে, প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারী এবং ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে ভুলবুঝাবুঝি হয়। এটা দেশের ও জাতির জন্যে অমঙ্গলজনক। ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিবিদেরা যেদেশের মানুষ প্রশাসক ও সরকারী কর্মচারীরাও সেদেশেরই মানুষ। এদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে একদল রাজনীতি করছে এবং অপরদল নীতি নির্বাহ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। কৃষক শস্য উৎপাদন করছে এবং জেলে মাছ ধরছে। জেলে কৃষক থেকে শস্য ক্রয় করছে আর কৃষক জেলে থেকে মাছ ক্রয় করছে। তাই বলে জেলে কৃষকের অধীনস্থ বা কর্মচারী নয় এবং কৃষকো জেলের অধীস্থ বা কর্মচারী নয়। এউদাহরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পেশায় বা কাজে নিয়োজিত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। এ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অর্থ এ নয় যে, একজন অপরজনের অধীনস্থ বা কর্মচারী। যেকোন দেশের প্রশাসক ও কর্মচারী সেদেশেরই নাগরিক। সেদেশে তাদের নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। তারা প্রশাসক ও সরকারী কর্মচারী না হয়ে রাজনীতিবিদ হতে পারতো, শিল্পপতি বা পুঁজিপতি হতে পারতো এবং অন্যযেকোন পেশা গ্রহণ করতে পারতো। কাজেই, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের রাজনীতিবিদ ও সদস্য এবং প্রশাসক ও সরকারী কর্মচারীর মধ্যকার সম্পর্ক পারস্পরিক। ক্ষমতাসীন দলের প্রত্যেক রাজনীতিবিদের কর্তব্য হচ্ছে এ পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থে কাজ করে যায়া। এতে রাজনীতিবিদ ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যেসুসম্পর্ক গড়ে ওঠে তা জাতীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত না করে পারে না।

সাধারণত যে অধ্যয়ন করে তাকে বলা হয় ছাত্র। অধ্যয়নাবস্থাকে বলা হয় ছাত্রাবস্থা। বাস্তবে অধ্যয়নের সীমাপরিসীমা নেই। তবে, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত যে

www.pathagar.com

একটা সময় সেটাই হচ্ছে ছাত্রাবস্থা। এঅবস্থা শিক্ষাগ্রহণ করার ও জানার অবস্থা। কোনকিছু না জেনে করা যায় না, জেনেশুনেই করতে হয়। না জেনে করলে বিপদে নিপতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। বিদ্যালয়ের কাঠামো রাজনৈতিক জীবন ও সামাজিকীকরণের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শিক্ষিত লোকের মধ্যে সরকারের কার্যক্রমের ও নীতির প্রভাব সম্পর্কে গভীর উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাদের সচেতনতার মাত্রা ও তাদের রাজনৈতিক দক্ষতা সমাজের অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশি বলেই প্রত্যাশিত। রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ আদানপ্রদান, নিজস্ব সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সজাগ মনোভাব ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণসঞ্জাত অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সচেতন মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। বিদ্যালয়ের জীবনে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনেক অলিখিত নিয়ম গ্রথিত হয়ে যায় বা গেঁথে যায়। নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্যের এবং পৌর জীবন ও প্রশাসনের আলোচনা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য দৃঢ়তর হতে সাহায্য করে এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন প্রকাশের জন্যে কতকগুলো প্রতীক গড়ে তুলতে পারে। পাঠ্যসূচিতে দেশের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর জোর দিয়ে মূল্যবোধ গড়ে তোলা হয়। রাজনীতির সাথে রাষ্ট্রীয় সব ব্যাপার জড়িত। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি পরিচালনের জন্যে রাজনীতি করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। অধ্যয়ন ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি পরিচালন এককথা নয়। যারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি পরিচালনা করে তারা অধ্যয়নরত নয় এবং যারা অধ্যয়নরত তারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদিতে নিয়োজিত নয়। আমি আগেই বলেছি যে, যে অধ্যয়নরত তাকে বলা হয় ছাত্র। যারা রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে নিয়োজিত তারা ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ, প্রশাসক ও বিভিন্নধরনের সরকারী কর্মচারী। তা হলে ছাত্ররা অধ্যয়নরত অবস্থায় যে রাজনীতি করছে তাতে কি তাদের লাভ হচ্ছে, না ক্ষতি হচ্ছে? সোজা উত্তর হচ্ছে যে, লাভ না হয়ে ক্ষতি হচ্ছে। এক্ষতি কি তাদের নিজস্ব, না জাতীয়? এক্ষতি তাদের নিজস্ব এবং জাতীয় উভয়ই। এদিক দিয়ে তাদের রাজনীতি সত্যিকারের রাজনীতি নয়, রাজনৈতিক অঙ্গনে তারা রাজনীতির হাতিয়ার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির এবং ক্ষমতাসীন হয়ার জন্যে ছাত্রদেরকে তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করছে। এতে ছাত্ররা অধ্যয়নাবস্থার পর খাঁটি রাজনীতিবিদ বা যেকোনধরনের রাষ্ট্রপরিচালক হয়ার জন্যে যেভিতের প্রয়োজন তা মজবুত করতে এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে যেপ্রস্তুতি প্রয়োজন তা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে না। ফলে, তাদের পরিণত সময় তারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আসলে নড়বড়ে ভিতের কারণে ও জ্ঞানলব্ধ প্রস্তুতির অভাবে তা সঠিকভাবে পালন

www.pathagar.com

করতে পারে না বলে শুধু যে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, পুরো দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নপ্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং এপ্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় বলে জাতীয় অগ্রগতি জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় না এবং বেকারত্বের সংকট বড় জটিল আকার ধারণ করে। এতে ছাত্ররা ছাত্রাবস্থায়ই তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা ভেবে চরম ও উগ্ররূপ ধারণ করে এবং রাজনীতির নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়। কাজেই, যারা দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ তারা ছাত্রদেরকে তাদের ভিত মজবুত করার পর্যায়ে এবং জ্ঞানলব্ধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাধাসৃষ্টি করে রাজনৈতিক প্রহসনের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করতে পারে না। তবে, যেকোন জাতীয় বিপর্যয়, দুর্যোগ বা সংকটে জাতীয় স্বার্থরক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকের পবিত্রতম দায়িত্ব বলে ছাত্ররা তাদের এ নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসাটাকে রাজনীতির সাথে এক করে দেখাটা অবাস্তব ও অযৌক্তিক।

রাজনীতি দু'প্রকার–তত্ত্বীয় রাজনীতি ও ব্যবহারিক রাজনীতি। রাজনীতির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে হলে তত্ত্বীয় রাজনীত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হয়। সুশিক্ষাই এজ্ঞানের একমাত্র বাহন। কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও অশিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন রাজনীতিই মানব কল্যাণের অনুকূলে হতে পারে না। রাজনীতিতে শুনা যায় উত্তম জীবনের কথা। তবে, শিক্ষা অবহেলিত হলে বিকাশশীল, অর্থাৎ অনুন্নত অবস্থা অতিক্রম করে উন্নতিসাধনে নিরত, রাজনৈতিক আলোকপ্রদীপো নির্বাপিত হয়। সুশিক্ষাই রাজনীতিকে সুসংহত করতে পারে। এশিক্ষাই রাজনীতিবিদদের মনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে তাদেরকে ব্যবহারিক রাজনীতির উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে। এশিক্ষাই রাজনীতিবিদদের মন হতে স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা দূর করে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনপূর্বক সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে উদ্বুদ্ধ করে। এশিক্ষাই তাদের সহজাত ক্ষমতার বিকাশসাধন করে তাদের মধ্যে সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালনের যথার্থ উপযুক্ততা সৃষ্টি করে। তাই, প্রত্যেক রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মী উপযুক্ত সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়া একান্ত প্রয়োজন।

বস্তুতঃ, সরকার বলতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকেই বুঝায়। সরকারই নীতিনির্ধারণ করে, বিধিবিধান ও আইনকানুনপ্রণয়ন করে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজকর্ম তদারক করে। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শিক্ষাগতযোগ্যতার, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ও বিভিন্নপ্রকার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন

www.pathagar.com

হয়। তা হলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের যেসব রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রপরিচালনের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে নীতিনির্ধারণ করে, বিধিবিধান ও আইনকানুনপ্রণয়ন করে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজকর্ম তদারক করে তাদের কি রকম শিক্ষাগতযোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন? যে তদারক করে তার সবধরনের যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ যাকে তদারক করা হয় তার চেয়ে বেশি থাকতে হয়। তা না হলে তদারকের কাজ কোনভাবেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না এবং ছেলে স্কুল থেকে আসার পর একই সময় অশিক্ষিতা মা তাকে ভাত খায়ার জন্যে ডাকাতে ও অশিক্ষিত বাবা তার অংকের পরীক্ষার ফল জানতে চায়াতে তার একই উত্তর 'আশি'–র মতোই হয়। এউত্তর শুনে মা বুঝেছে যে, ছেলে ভাত খেতে আসছে আর বাবা বুঝেছে যে, সে অংকে ৮০ নম্বর পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সে অংকে পেয়েছে শূন্য। যদি মা ও বাবা শিক্ষিতা ও শিক্ষিত হতো তা হলে ছেলের এচালাকি তাদের নিকট অবশ্যই ধরা পড়তো। এসব কারণে রাজনীতিবিদদেরকে উচ্চতম শিক্ষাগতযোগ্যতা ও বাস্তবসম্মত অভিজ্ঞতার অধিকারী এবং যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হয়। তাদেরকে হতে হয় পরহেযগার, আমানতদার, বিশ্বস্ত, সামর্থবান, গরীয়ান ও মহীয়ান। তাদেরকে আরো হতে হয় প্রাজ্ঞ, চিন্তাশীল, যথাযথ ও যথোচিত সার্বিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ও দেয়ার মতো বিচক্ষণ এবং ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতিমুক্ত। সর্বোপরি, তাদেরকে হতে হয় ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা ও দুর্নীতিমুক্ত। মানুষের মনে ধূমায়িত ও পুঞ্জিভূত অসন্তোষের মূল কারণ হচ্ছে অবাধ অন্যায় ও দুর্নীতি। ন্যায় ও সুনীতির অনুপস্থিতিতেই অন্যায় ও দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম হয় এবং অবিচার ও বিভিন্নধরনের অত্যাচার অবাধ গতিতে চলতে থাকে। ন্যায়, সুবিচার ও সুনীতির কার্যকারিতার নিরংকুশ দায়দায়িত্ব সরকারের। কাজেই, সার্বিকভাবে রাষ্ট্রপরিচালনের দায়িত্বে নিয়োজিত ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরকে সর্বাগ্রে ন্যায়বান, সুবিচারক ও সুনীতিপরায়ণ হতে হয়। নিজেরা অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতিতে, পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে, মত্ত থেকে ন্যায়, সুবিচার ও সুনীতির জন্যে যতো পদক্ষেপই গ্রহণ ও যতো গলাবাজিই করে না কেন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে সেগুলোর কার্যকারিতা থাকে না। তাই, কথায় বলে যে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে বা ধর্মের ঢাক আপনি বাজে এবং আপনি আচারী ধর্ম অন্যকে শিখান। যারা অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতি করে তারা যখন দেখবে যে, যারা তাদেরকে তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করছে তারা এগুলো হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং তাদের বলতে দেশ ও জনগণ ব্যতীত অন্যকিছু নেই তারা তখনই স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুলো হতে মুক্ত থাকবে, কেননা তাদেরকে তখন এগুলোর দোষে দোষী হয়া থেকে রক্ষা করার মতো কেউ

www.pathagar.com

থাকবে না এবং তারাও কোন উপায়েই রক্ষা পাবে না। তাই, কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হলেই বা রাজনীতি সম্পর্কে কথাবার্তা বললেই একজন সফলকাম রাজনীতিবিদ হয়া যায় না। সে-ই একজন সফলকাম রাজনীতিবিদ হতে পারে যে এগ্রন্থে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী হতে এবং বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যবিধান করে সব কর্ম সম্পাদন করতে পারে। আল্লাহ্ প্রত্যেক রাজনীতিবিদকে সব রাজনৈতিক গুণাবলী অর্জনের দ্বারা উভয় দুনিয়ার ও আখেরাতের স্বার্থে বাস্তবসম্মত রাজনীতি করার তৌফিক দান করুক।

——— সমাপ্ত ———

www.pathagar.com

www.pathagar.com